পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন (১৯০১-১৯৭১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোছা. রূপালী খাতুন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০৮/২০১৪-২০১৫

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০২০

অঙ্গীকার পত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, 'পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন (১৯০১-১৯৭১)' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের রচনা। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে অন্য কেউ কোনো গবেষণা করেননি। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোরূপ ডিগ্রির জন্য জমা দেওয়া হয়নি এবং এটি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিতও হয়নি।

(মোছা. রূপালী খাতুন)

পিএইচ ডি গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০৮

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পিএইচ ডি গবেষক মোছা. রূপালী খাতুন (রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০৮, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫) এর পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন (১৯০১-১৯৭১)' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত। ইহা একটি মৌলিক গবেষণা। এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ গবেষক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি। আমি অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য দাখিল করার সুপারিশ করছি।

আমি তাঁর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অঙ্গীকার পত্র	ii
প্রত্যয়ন পত্র	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	V
ভূমিকা	০১
প্রথম অধ্যায় : বাংলার সমাজে নারী : কালিক সমীক্ষা	৪৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসার : স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিনির্মাণ	৭৭
তৃতীয় অধ্যায় : উনিশ-বিশ শতকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন : স্বরূপ সন্ধান	১১৩
চতুর্থ অধ্যায় : পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন : মুক্তির মন্দির সোপান তলে (১৯০১-১৯৪৬)	১৪৮
পঞ্চম অধ্যায় : জাগরণ ও আন্দোলনে নারী : সাফল্যের খতিয়ান (১৯৪৭-১৯৭১)	২৪২
ষষ্ঠ অধ্যায় : জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বাঙালি নারী : চেতনা ও বাস্তবে	২৮২
উপসংহার	৩৪৭
পরিশিষ্ট-১	৩৫৭
পরিশিষ্ট-২	৩৬৩
পরিশিষ্ট-৩	৩৬৯
পরিশিষ্ট-৪	৩৭৮
পরিশিষ্ট-৫	৩৮২
গ্রন্থপঞ্জি	৩৮৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন (১৯০১-১৯৭১)' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে আমার দীর্ঘ সময়ের গবেষণার ফসল। এ বিভাগ থেকে আমি বি এ (অনার্স) এবং এম এ ডিগ্রি অর্জন করেছি। ২০১৫ সালে আমি পিএইচডি ডিগ্রির জন্য গবেষণা শুরু করি। প্রথমে খণ্ডকালীন এবং পরবর্তীতে পূর্ণকালীন গবেষক হিসেবে কাজ করি। আমার সম্মানিত শিক্ষক ডক্টর মো. তৌফিকুল হায়দারের উৎসাহ এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রথমে আমি গবেষণা শুরু করি। তিনি আমাকে নারী বিষয়ক গবেষণায় আসার পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু গবেষণা শুরু করার প্রায় দু'বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন করতে হয়। এ পর্যায়ে পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে এর বিশ্লেষণ পর্যন্ত গবেষণার প্রতিটি স্তরেই তিনি আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এককথায় তিনি আমাকে অভিসন্দর্ভ রচনার পদ্ধতি হাতে কলমে শিখিয়েছেন। এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করেছেন। এমনকি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত এবং বইপত্র কোথায় পেতে পারি তা জানিয়ে দিয়েছেন। বেশ কয়েকটি দুর্লভ বই তিনি আমাকে সরবরাহ করেছেন।

গবেষণার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আমার দিকে অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে উৎসাহিত করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আতাউর রহমান মিয়াজীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়ার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী যথাসময়ে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করায় পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার শিক্ষাগুরু অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অসীম। আমার তত্ত্বাবধায়কের পর যে মানুষটির কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি বা নিয়েছি তিনি হলেন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এ কে এম খাদেমুল হক, তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর সীমাপরিসীমা নেই। এছাড়াও বিভাগের সকল শিক্ষক বিশেষ করে অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম, ড.

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, মিসেস সুরাইয়া আক্তার, ড. মো. আবদুর রহিম, ড. এটিএম শামসুজ্জোহা নানা পরামর্শ ও সাহায্য সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিশেষ করে জনাব মো. ছরোয়ার হোসেন, জনাব সাজেদা সুলতানা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করেছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আবু মহামেদ স্মৃতি পাঠাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারের দুর্লভ পত্রিকা শাখা। এসকল গ্রন্থাগারের কর্মচারীরা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. সানজিদা আক্তারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এ বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগারটি ব্যবহারের সুযোগ দানের জন্য। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গ্রন্থাগারটি আমাকে বিশেষভারে সমৃদ্ধ করেছে। এ গ্রন্থাগারের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকর্তা সালেহা বানু সাবা সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গবেষণাকর্মের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস এ অনেকবার গিয়েছি। এখানকার গবেষণা কর্মকর্তা মো. ইলিয়াছ মিয়া সহ অন্যান্য কর্মচারীরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন। *বেগম পত্রিকা* অফিসের সংগ্রহ ও পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ দানের জন্য পত্রিকাটির বর্তমান সম্পাদক ফ্লোরা নাসরীন খানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগার, ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল গ্রন্থাগার ও শামসুন নাহার হল গ্রন্থাগার, উইমেন ফর উইমেন লাইব্রেরি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, ইডেন মহিলা কলেজ গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার এবং হেরিটেজ আর্কাইভস থেকেও সহায়তা নিয়েছি। এসকল গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। রাজশাহীতে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক অধ্যাপক ড. কাজী মো. মোস্তাফিজুর রহমান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হেরিটেজ আর্কাইভসটি আমাকে একইসাথে মুগ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আতিয়ার রহমান এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত

শিক্ষক অধ্যাপক ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া আমাকে নানা পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করে ঋণী করেছেন।

গবেষণার প্রয়োজনে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার কাজে বাংলাদেশের বাইরে যে সকল গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তার মধ্যে অন্যতম কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার। এসকল গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বরহমপুর মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দেবরাজ চক্রবর্তী। কলকাতার প্রতিটি পাঠাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে আন্তরিকভাবে অতি দ্রুততার সাথে তথ্য উপাত্ত ও বই সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাগারিক ড. সংঘামিত্রা চৌধুরীর সহায়তা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করায় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশীষ কুমার দাস এবং বেথুন কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মমতা রায় (চৌধুরী) কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের প্রাক্তন ডীন এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুজাতা মুখার্জী আমার অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস।

গবেষণা কর্মটি মানসম্মত করার লক্ষ্যে যে সকল প্রতিথযশা নারী সাক্ষাতকার প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন, তাঁরা হলেন- ভাষাকন্যা ও জাতীয় অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমেদ (১৯৩২-২০২০), ভাষাসৈনিক রওশন আরা বাচ্চু (১৯৩২-২০১৯), অধ্যাপক ড. শাহানারা হোসেন (১৯৩৭-২০১৯), অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন, নারীনেত্রী অধ্যাপক ড. মালেকা বেগম, অধ্যাপক মাহফুজা খানম, নারীনেত্রী আয়শা খানম এবং কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অন্য যাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. হাসনা বেগম, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ এম মাসুদুজ্জামান, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মেজবাহ কামাল এবং অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলমের নাম আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক এবং আমার বন্ধু অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাফিজউদ্দিন ভূঁঞার সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনেওয়াজ, ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. আরিফা সুলতানা এবং এ বিভাগের

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. আতিকুল ইসলাম আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়ে ঋণী করেছেন। সুফিয়া কামালের সুযোগ্য কন্যা মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল আমাকে নানা পরামর্শ দিয়ে গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সহায়তা করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার জন্য বাংলা একাডেমি পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক জনাব মোবারক হোসেনকে ধন্যবাদ জানাই। ঢাকাস্থ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক রণবীর পাল আমাকে নানা তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে বিশেষভাবে ঋণী করেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে যাদের সহযোগিতা আমার গবেষণার পথকে সুগম করেছে তাদের মধ্যে ইডেন মহিলা কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সহিফা বানু ইভা অন্যতম। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা কাজটি করার সময় সার্বক্ষণিকভাবে আমার পাশে থেকে মানসিক শক্তি ও উৎসাহ যুগিয়েছেন আমার বড় বোন তুল্য সহকর্মী ড. মাহমুদা খানম (সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা হয়না।

আমার গবেষণাকর্মের অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণা আমার মা সাহেদা বেগম এবং বাবা মো. আলাউদ্দিন বিশ্বাস। দীর্ঘসময় ধরে গবেষণার কাজটি করতে গিয়ে আমার একমাত্র কন্যা রাখশান্দা রুদমিকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি। তাকে দেখাশোনা সহ আমাকে কলকাতার গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়ে যেয়ে সহযোগিতা করেছেন আমার স্বামী মো. ইফতেকার আলী। আমার পরিবারের সদস্যদের কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রয়োজন হয় না। কেননা আমার যে কোনো অর্জনে তাদের অবদান অপরিসীম।

মোছা. রুপালী খাতুন

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০

ভূমিকা

'পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন (১৯০১-১৯৭১)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি বিশ শতকের প্রথম থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল সময় পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস অনুসন্ধান এবং এর সঠিক গতিধারা বিশ্লেষণ ও স্বরূপ নির্ণয়মূলক। বর্তমানে নারীর কাজের ক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যাতেও বেড়েছে নারী। সামাজিক মূল্যবোধ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, নারী স্বনির্ভর হয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে এবং নারী চেতনা পৃথক শাখা হিসেবে চর্চা করা হচ্ছে। আজ বাঙালি নারী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে নিজেকে সম্মানজনক স্থানে উন্নীত করে চলেছে। বর্তমান যুগ নারীর ক্ষমতায়নের যুগ, নারীর ক্ষমতায়নের এই প্রক্রিয়াটি এক দিনে তৈরি হয়নি। এর জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রথমে নারী জাগরণ ছিলো অবরোধবাসিনীর আর্তনাদ, আজ সেটি সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রূপায়িত হয়েছে। বিদেশি শাসক শোষকের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে একদা সংগঠিত নারীসমাজ বিশ শতকের শেষ পর্যায়ে এসে যুক্ত হয় শোষণ ও বৈষম্যহীন সমাজ কাঠামো এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। নারীর এ সংগ্রামী জীবন এবং ইতিহাসে তার যথাযথ ও যোগ্য স্থানের স্বীকৃতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও এর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সমাজ সৃষ্টির প্রাথমিক যুগ থেকে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্তমান যুগের এই সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সৃষ্টির বিকাশ সাধন হয়েছে। এমনকি ধর্মরক্ষা এবং রাষ্ট্র রক্ষার কঠোর পরীক্ষায় নারীও যুগে যুগে লৌহ কঠিন পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছেন। ইসলাম ধর্ম প্রথম গ্রহণ করেছিলেন একজন নারী। সে যুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নারী পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র গঠনে সর্বাধিক সহায়তা করেছেন। তাই সে সময় হতেই নারীর ভূমিকা পুরুষের সমকক্ষতার দাবি রাখে। আবার বিশ্বের প্রতিটি দেশের সমাজ অগ্রগতির মাপকাঠি হলো সে সমাজে নারীর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক গুণের বিকাশ এবং নারীর আত্মবিকাশের উপযোগী সুযোগ সুবিধা। সমাজে নারীর অবস্থান আলোচনার অপরিহার্য উপাদান হলো সে সমাজে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন। জীবনের প্রতিটি ধাপে নারী কিভাবে নানা সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং কোন প্রক্রিয়ায় সে এই সমস্যাগুলি সমাধান করে– সেটিও সমাজে নারীর অবস্থান নিরূপিত করে।

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার নারীসমাজ নানাভাবে উপেক্ষিত। সামাজিক রীতিনীতির নামে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর দ্বারা নারীকে অধস্তন অবস্থায় রাখা হয়েছে শত শত বছর ধরে। পারিবারিক গৃহাস্থলির

দায়িত্ব পালন, সন্তান প্রতিপালন ও পতিসেবা করে উত্তম স্ত্রী হওয়া ছিলো তাদের জীবনের অন্যতম এবং একমাত্র লক্ষ্য। এসময় দু'একজন নারী ব্যক্তিগত গুণাবলির অধিকারী হলেও সমাজের চাপে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ছিলো না। বাঙালি নারীর অধঃপতিত অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয় উনিশ শতকের নবজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে। এ আন্দোলনের পথ প্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), মদনমোহন তর্কালংকার (১৮১৭-১৮৫৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৪৩-১৮৮৪) প্রমুখ উদারপন্থী ও মানবতাবাদী মনীষী। এসময় বাংলায় সমাজ পরিবর্তনের যে একটি ঢেউ এসেছিলো তা দ্বারাই নারীমুক্তি আন্দোলন সূচিত করে। এক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে 'আত্মীয় সভা'র খসড়া কর্মসূচিতে তিনি 'নারী অধিকার ও শিক্ষা' বিষয়টিকে প্রথমবারের মতো সংযুক্ত করেন। উনিশ শতকের নবজাগরণের পরিক্রমায় নারী জাগরণের ইতিহাস সঙ্গত কারণেই যুক্ত হয়। এভাবে ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু সমাজে যে নারী জাগরণ শুরু হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রতিবেশী মুসলিম সমাজে তার ছোঁয়া লাগে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে এক গভীর পরিবর্তনের সূচনা হয়। এ সময় বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, সমাজের অর্ধাংশ অধঃপতিত নারীজাতির অবস্থার উন্নয়ন না ঘটানো পর্যন্ত সমাজের সার্বিক অগ্রগতি সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে সৈয়দ আমীর আলীর *Central National Muhammadan Association (1877)* কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তিনি ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের জন্য শিক্ষার সম সুযোগের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কেননা নারী পুরুষ একত্রে সমান উন্নতি করতে না পারলে প্রকৃত সুফল লাভ সম্ভব নয়। পরবর্তীতে আমরা ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) কে নারীমুক্তির একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে পাই। আবার ঢাকা কলেজের কতিপয় ছাত্রের *মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী*র মাধ্যমে নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা ছিল লক্ষ্য করার মতো বিষয়। অন্যদিকে *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি*র সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন নারীশিক্ষার উপর ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেন। উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩) এক অদম্য নারী ব্যক্তিত্ব। ১৮৭৩ সালে তিনি কুমিল্লায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। এ সময় বিবি তাহেরুন্নেসা ও করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯৩৬) অবরোধবাসিনী হয়েও নারী সমাজের জাগরণের জন্য নারী প্রগতির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

বিশ শতকের শুরু থেকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। তিনি ছিলেন নারী জাগরণের অক্লান্ত কর্মী এবং সমাজ সংস্কারক। নিজের জীবনে অবরোধের যন্ত্রণা এবং নারীর অমর্যাদা তিনি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। এজন্য তাঁর বক্তব্যে হতাশা প্রকাশ পেয়েছে যে, দাসব্যবসা নিষিদ্ধ হলেও ঘরে ঘরে নারীর অবস্থা ক্রীতদাসের চাইতেও কোনো অংশে কম নয়। বাঙালি নারী দাসত্বমুক্তির কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাদেরকে কোণঠাসা করে রেখেছে। তাই রোকেয়া নির্ভীক, সৃজনশীল ও বৈপ্লবিক লেখনীর মাধ্যমে একদিকে যেমন যুগ যুগ ধরে অধিকার বঞ্চিত নারীর কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে সমাজকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে তিনি *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল* এবং বাংলার প্রথম মুসলমান মহিলা সমিতি *আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম* প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আজীবন নারীর সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনা ও লেখনীর মূল বিষয় ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতি তুলে ধরা, নারীর প্রকৃত শক্তি প্রকাশে সহযোগিতা করা এবং নারীকে সচেতন করা। রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে *আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম* দীর্ঘদিন ধরে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মুসলিম নারীসমাজে সঞ্চার করেছিলো সচেতনতা ও গতিশীলতা– যা বাঙালি নারীকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে।

সমাজের কল্যাণের জন্য নারীমুক্তি তথা নারী জাগরণ অপরিহার্য। বিশ শতকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের পিলসুজ। এর প্রবাহ গতিশীল রাখেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের নারীমুক্তিকামী ও নারীবাদীগণ। এ সময় নারীকে সকল মৌলিক অধিকার প্রদান যে ন্যায়নীতির পরিচায়ক এই অভিমতের স্বপক্ষে জনমত সক্রিয় এবং শক্তিশালী হতে থাকে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি নারীর চিন্তাচেতনার ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেন। এসকল নারীর অধিকাংশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাননি। তাঁরা বাল্যবিবাহ, কঠোর পর্দা ও অবরোধপ্রথার স্বীকার, আবার অনেকে রক্ষণশীল পরিবেশে স্বামীর সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে স্বামীকে পরিত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা পরিণত বয়স ও বুদ্ধিতে উপনীত হয়ে নিজ চেষ্টায় জ্ঞানানুশীলন করেছেন এবং নারীকেন্দ্রিক নানা সমস্যা ও পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। এভাবেই বিশ শতকে নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এসময় প্রগতিশীল নারী লেখনীর মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায়ের অনাচারের তীব্র সমালোচনা করেন। নারী সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি তুলে ধরে তাঁরা যে প্রগতিশীল ধ্যান ধারণার সঞ্চার করেন তার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে এক ধরণের নারীবাদী সচেতনতার সৃষ্টি হয়।

সমসাময়িক সময়ে খায়রুন্নেসা খাতুন (১৮৭০-১৯১২) নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তিনি নারীশিক্ষার অসুবিধার কারণগুলি অনুসন্ধান করেছেন এবং এ সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে সুসন্তান পেতে চাইলে সু মাতা তৈরি করতে হবে, আর এজন্য নারীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। খায়রুন্নেসার নারী ভাবনা ও সমাজ সচেতনতা ছিল যুগের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসরমান। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সুযোগ্য উত্তরসূরী মিসেস এম. রহমান (১৮৮৫-১৯২৬) মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি ইসলামের নামে পর্দাপ্রথার দোহাই দিয়ে মেয়েদেরকে ঘরের কোণে অবরুদ্ধ করে রাখার তীব্র সমালোচনা করেছেন। মিসেস এম. রহমান লেখনীর মাধ্যমে মেয়েদের অবমাননাকর অবস্থার জন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে দায়ী করেছেন। সমাজের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সোচ্চার। পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনের অক্লান্ত কর্মী ফাতেমা খানম (১৮৯৪-১৯৫৭) সমাজের সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে নারী পুরুষের সম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন। তিনিও মেয়েদের অধঃপতিত অবস্থার জন্য পর্দাপ্রথা তথা অবরোধপ্রথাকে দায়ী করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী ফজিলতুননেসা (১৮৯৯-১৯৭৭) নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বাঙালি নারীকে উদ্বুদ্ধ করে সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করেছেন। আলোচ্য সময়ে লীলানাগের বহুমুখী অবদান লক্ষ্য করার মতো বিষয়। তিনি একদিকে যেমন নারীশিক্ষার জন্য একের পর এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, অন্যদিকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে তাদেরকে দীক্ষাও দিয়েছেন। *জয়শ্রী পত্রিকা* প্রকাশ করে লীলানাগ বাংলার নারীর মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। সমাজ বিশ্লেষক রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী (১৯০৭-১৯৩৪) সমসাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ, কবিতা ও ছোট গল্প প্রকাশের মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতির কথা তুলে ধরেছেন। তিনি সমাজে নারীকে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস ব্যক্ত করেছেন। নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রাজিয়া খাতুন মেয়েদের অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের যোগ্য উত্তরসূরী এবং সুদীর্ঘ সময় ধরে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)। তিনি লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরেছেন এবং এটি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে বাঙালি মুসলিম নারীকে সামাজিক কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙ্গে জেগে উঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তুরস্ক ভ্রমণ করে স্বচক্ষে সেখানকার নারী প্রগতির অভিজ্ঞতার বিষয়টি বাঙালি মেয়েদেরকে অবহিত করেন। নানা মহিলা সমিতি ও সংগঠনে এবং রাজনীতিতে সারাজীবন নিজেকে সংযুক্ত রেখে শামসুন নাহার মাহমুদ নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বাঙালি নারীর ভোটাধিকার অর্জনে কার্যকরী

ভূমিকা রেখেছেন। মহীয়সী নারী সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) কবিতার মাধ্যমে মেয়েদের মানসিক চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নারীর মধ্যে আছে অপরিসীম শক্তি, সুযোগ পেলে সে এর প্রকাশ ঘটাতে পারে। তাই তিনি নারীমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন এবং নারীমুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে পুরুষের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন। সুফিয়া কামাল অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সমাজের দুঃস্থ নারীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিশ শতকের সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী সুফিয়া কামাল নারীমুক্তি আন্দোলনে এবং নারীর সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন। আলোচ্য সময়ে পূর্ব বাংলার নারীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে তাঁর নিজের যথাযোগ্য স্থান নিরূপণের সংগ্রাম ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের সঠিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সামাজিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা অপ্রতুল। আর এদিক থেকে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

পূর্ব বাংলা : লর্ড কার্জন কল্পিত প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৯০৫ সালে বৃহৎ প্রদেশ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বিভক্ত করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' প্রদেশ গঠন করা হয়। নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ থেকে আসাম পৃথক করলে যে অঞ্চল অবশিষ্ট থাকে তাকেই পূর্ব বাংলা বলে অভিহিত করা হতো। এটি বৃহৎ বাংলার পূর্বাংশ বলে একে পূর্ব বাংলা বলা হতো। অবশ্য এই পূর্ব বাংলার কতিপয় আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। অর্থাৎ এই পূর্ব বাংলা ছিল কৃষি অধ্যুষিত। এখানকার সিংহভাগ মানুষ ছিল কৃষিজীবী। এরা অধিকাংশ ছিল মুসলমান। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ। এখানে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নেই বললেই চলে। কৃষি মানুষের একমাত্র অবলম্বন। ভৌগোলিকভাবে এটি ছিল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। মৌসুমী বায়ুর প্রভাব ক্রিয়াশীল। এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে জলপাইগুড়ি, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ত্রিপুরা এবং মায়ানমার এর অংশ বিশেষ। প্রাচীনকালে এটি পরিচিত ছিল বঙ্গ, সমতট, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র ও হরিকেল জনপদে। মুঘল আমলে এটি সুবে বাংলার ভাটি অঞ্চল বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর এটি পাকিস্তানের পূর্ব অংশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল। পাকিস্তানের সাথে নানা বৈষম্যের কারণে এবং তাদের চাপিয়ে দেয়া বিভিন্ন অনায্য কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বর্তমানের খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ নিয়ে যে অঞ্চল গঠিত ছিল তাই পূর্ব বাংলা। এ অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল ঢাকা। মধ্যযুগে সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে এর সমৃদ্ধির সূচনা হয়। আমাদের আলোচ্যপর্বে পূর্ব বাংলা বলতে বর্তমান বাংলাদেশকেই আমরা বুঝিয়েছি।

নারী জাগরণ ও আন্দোলন : 'জাগরণ' ও 'আন্দোলন' শব্দ দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বাংলা 'জাগরণ' শব্দের অর্থ নিদ্রাভঙ্গ, জাগ্রত অবস্থা, নিষ্ক্রিয় বা অচেতন অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করা। আমাদের গবেষণায় 'জাগরণ' বলতে 'মুক্তিলাভ করা' বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে 'আন্দোলন' শব্দের অর্থ কম্পন, দোলন, আলোড়ন বা কোনো লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য প্রচার, উত্তেজনা, সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা। 'জাগরণ' থেকেই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। আমাদের এখানে 'আন্দোলন' বলতে অস্ত্রের স্থলে লেখনী, কথা ও বক্তব্যের মাধ্যমে নারীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়নকে বোঝানো হয়েছে। বিশ শতকে প্রথমেই মেয়েদেরকে জাগরিত করার প্রয়াস দৃষ্টিগোচর হয়। দীর্ঘদিন ধরে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ নারীকে জাগরণের আহবান জানানো হয়, এর সাথেই শুরু হয় নারীমুক্তি (সকল প্রকার অবরোধ বা দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পুরুষের সাথে মিলেমিশে নারীর সবধরণের কাজে অংশগ্রহণ করা) আন্দোলন। এভাবে বাঙালি নারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর এ থেকে তারা দেশের অস্তিত্বের সংকটকালীন সময়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, স্বদেশী পণ্য উৎপাদন এবং স্বদেশী পণ্যের ব্যবহারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাঙালি নারী অংশগ্রহণ করেন। এমনকি এ সময় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মেয়েরা চরকায় সুতা কেটে, কাপড় বুনে তা ব্যবহার করতে শুরু করেন। তৎকালীন হিন্দু পরিবারের পাশাপাশি মুসলমান নারীও স্বদেশী আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। আবার ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলার গ্রামে ও শহরে অসংখ্য নারী এই রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। এ সময় মেয়েরা জেল জুলুম, পুলিশের লাঠিপেটা উপেক্ষা করে বিভিন্ন জায়গায় সভা সমাবেশ ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ বিরোধী এ সকল সংগ্রামে মুসলমান নারীর অংশগ্রহণ হিন্দু নারীর তুলনায় অনেকটা কম ছিল। তৎকালীন সামাজিক অবরোধের কঠোর বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে যে কয়জন মুসলিম নারী দুঃসাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম সিলেটের জোবেদা খাতুন চৌধুরী। তিনি পরবর্তীতে সিলেট কংগ্রেস মহিলা সংঘের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তৎকালীন রাজনীতিতে জোবেদা খাতুনের অবদান মুসলিম নারী জাগরণ, নারীমুক্তি আন্দোলন ও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বাঙালি নারীর অংশগ্রহণ ছিলো লক্ষ্য করার মতো একটি বিষয়। বরিশালের মনোরমা বসু, প্রফুল্লকুমারী বসু, ময়মনসিংহের ক্ষিরোদাসুন্দরী দেবী, উষা গুহ, সিলেটের সরলাবালা দেবী, দিনাজপুরের প্রভা চট্টোপাধ্যায়, ভোলার সরযুবালা সেন, নোয়াখালীর সুশীলা

মিত্র, খুলনার স্নেহশীলা চৌধুরী প্রমুখ নারী নিজ নিজ অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ব্যাপকভাবে নারীসমাজকে সংগঠিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করেন। তারা ছিলেন বাঙালি নারীর আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতীক। আবার ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি একত্রিত হয়ে খিলাফত আন্দোলন শুরু হলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বহু সংখ্যক নারী এ আন্দোলনের বিভিন্ন সভায় যোগ দিয়ে আন্দোলনকে বেগবান করেন। খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবাদি বেগম বানুর (বি-আম্মা) উদ্দীপনামূলক ভাষণ বাংলার হাজারো মুসলমান নারী পুরুষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বদেশভূমি মুক্ত করার প্রত্যয়ে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করে। অন্যদিকে সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনে পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরের আশালতা সেন ঢাকায় সভা সমিতিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সে অপরাধে ব্রিটিশ সরকার আশালতা সেনের *গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি* নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং *কল্যাণ কুটির আশ্রমে* তালা লাগিয়ে দেয়। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অহিংস আন্দোলনের মূলধারার পাশাপাশি সশস্ত্র লড়াইয়ের যে ধারাটি (বিপ্লবী আন্দোলন) জন্ম নিয়েছিল সে ধারাতেও দেখা যায় বাংলার বেশ কিছু সাহসী তরুণী ও কিশোরী নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জীবনের কোনো পরোয়া না করে অংশগ্রহণ করেন। এ সকল বীরদের মধ্যে তরুণী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মদানের গৌরবোজ্জল দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। আবার বিপ্লবী কার্যক্রমে কল্পনা দত্ত সহ আরো অনেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এসব বিপ্লবী মেয়েদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত হাজার হাজার মুক্তিকামী নারীকে জাগরিত ও আন্দোলিত করে স্বাধীনতা অর্জনে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলায় ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে এবং ছাত্রী সংগঠন বিকাশের মাধ্যমে বাঙালি মেয়েরা কমিউনিস্ট রাজনীতির অনুসারী হয়। আবার বিশ শতকের মধ্যভাগে তেভাগা, টংক ও নানকার আন্দোলনে পূর্ব বাংলার গ্রামীণ নারীকে সংঘবদ্ধ হতে দেখা যায়। বাংলার কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে নারীর অবদান অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বাংলার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। দেশ ভাগের সাথে সাথে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর দমননীতির ফলে নারী আন্দোলন স্তিমিত হতে থাকে। পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ার কারণে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারীর অধিকাংশই এসময় দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে বাধ্য হন। ফলে ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব বাংলায় মুসলিম মেয়েদের অধিকমাত্রায় সংগঠিত হতে দেখা যায়। এ পর্যায়ে এসে যুঁইফুল রায় 'আয়েশা' ছদ্মনামে বেশ কিছু প্রগতিশীল মুসলিম নারীর সাথে যোগাযোগ করেন। এদের মধ্যে রোকেয়া রহমান কবীর, কামরুন নাহার লাইলী, তোবা খানম, লায়লা

সামাদ, আফসারী বেগম প্রমুখ নারীনেত্রী অন্যতম। দেশ বিভাগের পর রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আদর্শের অনুসারী শামসুন নাহার মাহমুদ ও সুফিয়া কামাল নারীমুক্তি আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। সুফিয়া কামাল সরাসরি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাথে নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে কাজ করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশে নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শামসুন নাহার মাহমুদ, লীলানাগ, আশালতা সেন, দৌলতননেছা খাতুন সহ আরো অনেক নারীর সাহচর্য লাভ করেন। এ সকল নারী প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে নারী আন্দোলন পরিচালনা করেন। এ পর্যায়ে শামসুন নাহার মাহমুদের বলিষ্ঠ অবদান লক্ষ্য করার মতো বিষয় ছিল।

দেশ বিভাগের পর সর্বপ্রথম *All Pakistan Women's Association* (1949) সংগঠনটি সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী নারী কল্যাণে কাজ করে। এর উদ্দেশ্য ছিলো মেয়েদেরকে সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এ সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল–

1. The informed and intelligent participation of the women of Pakistan in the growth and development of their country.
2. The advancement of the welfare of Pakistani women through the improvement of their Legal, Political, Social and Economic status.
3. The promotion of education and cultural programmes and policies all over the country.
4. The Health and Wellbeing of the people of Pakistan in the home and in the community.
5. The promotion of international goodwill and the brotherhood of mankind.

তবে *All Pakistan Women's Association* ছিল শহর কেন্দ্রিক, তাই গ্রামীণ নারীর মধ্যে সংগঠনটি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি। এছাড়া *গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি*, *উয়ারী মহিলা সমিতি* সহ অন্যান্য যেসকল সমিতি ছিল তাদের কার্যক্রমও পরিচালিত হতো শহরকেন্দ্রিক। তাই বলা যেতে পারে গ্রামীণ নারীর অধিকার রক্ষার বিষয়টি এসময় অবহেলিত থাকে।

বাঙালি নারী বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সোচ্চার হতে থাকে। এ ধারায় ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে যে ভাষা আন্দোলন ঘনীভূত হয় তার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালে। তাই ভাষা আন্দোলনের প্রথম প্রহর থেকে বাঙালি নারীর বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের সফলতার ফলে বাঙালি নারীকে আর কখনো পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তাই পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্রদের সাথে ছাত্রীদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৬ সালের ছয় দফার পথ ধরে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান শুরু হলে বহু ছাত্রী ও সংগ্রামী নারী আন্দোলনে সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছেন। সবশেষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

এভাবে দেখা যায় বিশ শতকের শুরুতেই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হন। তারই আদর্শের অনুরাগী হিসেবে আলোচ্য সময়কালে আমরা আরো কতিপয় নারী নেত্রীকে দেখতে পাই যারা নারীমুক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৪৭ সালের পর নারী আন্দোলনের ধারার ব্যাপক একটি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ সময় এসে আর নারীকে জাগরিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি বরং এ পর্যায়ে নারী সচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, শিক্ষাদীক্ষায় মেয়েরা এগিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

গবেষণার সময়কাল : বর্তমান গবেষণার সময়সীমা ১৯০১-১৯৭১ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সময়সীমা বেছে নেওয়ার কারণ হলো ১৯০১ সাল বিশ শতকের সূচনালগ্ন, যা একটি নতুন শতক শুরুর নির্দেশক। বিশ শতক বাঙালি নারী জাগরণ ও আন্দোলনের ইতিহাসে মাইলফলক। বিশেষ করে এ শতকের শুরুতে বাংলার নারীসমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য আহ্বানের বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং সামাজিক অধিকার বঞ্চিত নারীকে জাগরিত করার প্রয়াস শুরু হয়। ১৯০১ সালের আদমশুমারীর প্রেক্ষিতে জানা গেল যে, বাঙালি নারী শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে এসেছে। নানা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের ধারা গড়ে ওঠে। এ শতকে বাংলা ও বাঙালির অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, সংস্কার, জাতীয়তাবাদের পূর্ণতা ও স্বাধীকার-স্বাধীনতার মতো মহান অর্জন সম্পন্ন হয়েছে। তাই এ শতকের শুরু থেকে গবেষণার সময়কালের প্রারম্ভ হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে নারী স্বাধীনতা সর্বত্র লক্ষণীয়। এসময় থেকে নারীকে আর অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে হয়নি। বরং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা

সার্বিকভাবে নারীর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। তাই এসকল দিক বিবেচনায় **১৯০১-১৯৭১** সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলার নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের নানা দিক গবেষণায় উঠে এসেছে।.

গবেষণার যৌক্তিকতা : বিশ শতকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কঠোরতা, নানারকম সামাজিক কুসংস্কার এবং কঠোর অবরোধপ্রথার মধ্যে থেকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন শুরু হয়। বিশ শতকের শুরু থেকেই কতিপয় মহীয়সী নারী ব্যক্তিত্ব নারী জাগরণে ও আন্দোলনে অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখেছেন। আর তার জন্য এসকল নারীকে এক পাহাড় সমান সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়েছে। এ দুরূহ কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাঁরা জীবনব্যাপী আন্দোলনে নিয়োজিত থেকেছেন। পরিবারের দায়িত্ব পালনে, সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে, এমনকি মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেও পূর্ব বাংলার তথা বাংলাদেশের নারী ইতিহাসে তাঁর যথাযথ ও যোগ্য স্থানের স্বীকৃতিতে অদৃশ্য থেকে গেছে। এসব দিক বিবেচনায় পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

গবেষণার উদ্দেশ্য : উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁ বা নবজাগরণের মাধ্যমে বাঙালি সমাজে সচেতনতার বৃদ্ধি এবং তা থেকে পিছিয়ে পড়া নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা ভাবনা থেকেই বিশ শতকের শুরুতে নারী জাগরণ ও আন্দোলনের সূত্রপাত লক্ষ্য করার মতো বিষয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলার নারী সচেতনতা সুদীর্ঘ সময়ের ভাবনার ফসল। বিশ শতকে নারী জাগরণের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয় তা অব্যাহত গতিতে একই ধারায় চলতে থাকে। **১৯৪৭** সালে দেশভাগের পর নারী জাগরণ ও আন্দোলনের ধারার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে এসে বাঙালি নারী সকল দিক দিয়ে সচেতন হয়, পর্দাপ্রথার শিথিলতা ঘটে, তারা সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান করে রাজপথে মিছিলেও অংশগ্রহণ করে। এভাবে **১৯৭১** সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাঙালি নারীসমাজ আন্দোলনে ও জাতীয় দুর্যোগে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করে তাদের একটি আলাদা ভুবন তৈরি করে।

নারীমুক্তির লক্ষ্যেই নারী জাগরণ ঘটে। বাঙালি নারী প্রথমে সমাজ সংস্কার এবং পরে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে। এ গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো নারী জাগরণের মাধ্যমে কিভাবে নারীমুক্তি ঘটেছিলো তার প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা। এছাড়া গবেষণাপত্রে আলোচিত হয়েছে কিভাবে অবরোধপ্রথার অবয়ব ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিলো। পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষা গ্রহণ করে নারী সচেতনতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি কতখানি প্রয়োজন এবং নারী

কিভাবে উপার্জনক্ষম হতে থাকে তা এ গবেষণায় উঠে এসেছে। সর্বোপরি বিশ শতকে (১৯০১-১৯৭১) পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনের স্বরূপ নির্ণয়, সঠিক ধারা নির্ধারণ ও মুল্যায়ন করা এবং এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট অনুসন্ধান– এ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে বাঙালি নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা স্থাপনের সংগ্রাম ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের সঠিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ হলো এ গবেষণার প্রত্যয়। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর সমন্বিত ও সুশৃংখল গবেষণার মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মোচন ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

গবেষণার উৎস : এ গবেষণায় সরকারি নথিপত্র, সরকারি শিক্ষা রিপোর্ট, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় নারীর লেখনী ও বক্তৃতা, সমকালীন নারী কর্তৃক রচিত আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, ব্যক্তিগত ডায়েরি, গবেষকদের রচিত অভিসন্দর্ভ, আদমশুমারীর রিপোর্ট, বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত নারীর স্মৃতিচারণমূলক কথোপকথন রেকর্ড প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যা প্রাথমিক সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নির্বাচিত দ্বৈতীয়িক বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ। তবে প্রাথমিক উৎসের অপর্যাপ্ততার কারণে দ্বৈতীয়িক উৎসের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি : গবেষণাকর্মটিতে ব্যবহৃত তথ্য উপাত্তের সংগ্রহের পদ্ধতি অনুসন্ধানের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের নির্দেশক। সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত প্রধানত প্রাথমিক এবং দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যসমূহ কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির রেকর্ডরুম, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমি দুর্লভ পত্রিকা শাখা, রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর প্রভৃতি জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গবেষকদের প্রকাশিত গবেষণাকর্ম ও নানা সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে অভিসন্দর্ভটি রচনায় সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বহু জ্ঞাত বিষয়কে যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা ও বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। মূলত গবেষণাপত্রটি রচনায় মানবিকবিদ্যা গবেষণার ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য তথ্য বিশ্লেষণের (Analytical Research) পদ্ধতি অনুসরণ এবং তার সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়েছে।

নারীবাদ : নারী জাগরণ ও আন্দোলনের বিষয় আলোচনার পূর্বে 'নারী' ও 'নারীবাদ' বিষয়ক ধারণা লাভ করা একটি পূর্বশর্ত। তাই এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও যৌক্তিক একটি আলোচনার আবশ্যকতা রয়েছে। এখানে 'নারী' ও 'নারীবাদ' নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনার অবতারণা করা হলো।

'নারী' বলতে বুঝায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের স্ত্রী-বাচকতা নির্দেশক রূপ। এর বিপরীত শব্দ পুরুষ, নর প্রভৃতি। সংস্কৃত 'নৃ' শব্দটি থেকে নারী শব্দটির উৎপত্তি (নৃ+ঈ=নারী)। 'নারী' শব্দটি সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেখানে 'মেয়ে' শব্দটি ব্যবহৃত হয় স্ত্রী-শিশু বা কিশোরীর ক্ষেত্রে। তবে বয়সের বাধা ডিঙিয়ে 'নারী' শব্দটি সমগ্র স্ত্রী-জাতিকে নির্দেশ করতে ব্যবহার করা যায়। যেমন- 'নারী অধিকার' দ্বারা সমগ্র স্ত্রী-জাতির প্রাপ্য অধিকারকে বোঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের সাথে নারীর সামান্য জৈবিক ভিন্নতা (যেমন- নারী তার গর্ভে সন্তান ধারণ করে, সন্তান জন্মের পর তাকে স্তন্যদুগ্ধ দান করে, যা পুরুষের পক্ষে সম্ভবপর হয় না) ব্যতীত মানুষ হিসেবে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু সমাজ পুরুষের সাথে নারীর ভিন্নতা তৈরি করে অভিমত দেয় কোমলতা, সতীত্ব, মমত্ব, বাৎসল্য প্রভৃতি হচ্ছে নারীসুলভ গুণ। এসব ধারণা তৈরি করে সমাজ নারীকে অধস্তন অবস্থায় রেখে পুরুষতন্ত্র তথা পিতৃতন্ত্রের শাসনে অবদমন করেছে। এ কারণে বিশ্বব্যাপী নারীবাদী আন্দোলন এবং জেন্ডার ধারণা নারীকে এসবের বেড়াজাল থেকে বের করে আনার জন্য সক্রিয় হয়েছে।

ইংরেজি 'Feminism' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'নারীবাদ'। ইংরেজি 'Feminism' শব্দটি এসেছে ফরাসী শব্দ 'femmenisme' থেকে। 'femmen' অর্থ নারী এবং 'isme' অর্থ মতবাদ। আভিধানিক অর্থে, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার বিষয়ক মতবাদই হলো 'নারীবাদ'।[১]

নারীবাদ সম্পর্কে *Encyclopedia Britannica* তে বলা হয়েছে,

> Feminism, the belief in the social, economic, and political equality of the sexes, feminism originated largely in the West but is manifested worldwide and is represented by various institutions committed to activity on behalf of women's right and interests।[২]

---

১ *Oxford Learners Dictionary*, Alif Publications, Dhaka, 2014, p. 27

২ *The New Encyclopedia Britannica*, volume 19, Founded 1768, 15th Edition, Chicago, p. 160

বিশ শতকের প্রারম্ভে ব্রিটেনে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের নেত্রী ও নারীবাদী লেখক Teresa Billington-Greig নারীবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,

> Feminism, may be defined as a movement seeking the reorganization of the world upon a basis of sex equality in all human relations; a movement which would reject every differentiation between individuals upon the ground of sex, would abolish all sex privileges and sex burdens, and would strive to set up the recognition of the common humanity of woman and man as the foundation of law and custom.[৩]

'নারীবাদ' একটি সামাজিক আদর্শ ও আন্দোলন যা লিঙ্গসাম্যে আস্থাশীল এবং লিঙ্গ বৈষম্যবাদী প্রাধান্যবশ্যতার পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙ্গে লিঙ্গসাম্য ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দায়বদ্ধ এবং যা নারীর দৈহিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, যৌনতাকেন্দ্রিক, ক্ষমতাকেন্দ্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সচেতন ও সম্মিলিত প্রয়াস।[৪] নারীবাদ কোন একক বা একচ্ছত্র মত নয়, নানা মতের সম্মিলিত শক্তিতেই এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলিতে নারী আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক বিকাশ হলেও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলায়ও নারীশক্তির একক ও সম্মিলিত সচেতন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নারীবাদের ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে।

প্রাচীন গ্রীসে প্রথম পিথাগোরীয়[৫] দর্শনে নারীবাদ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। পিথাগোরীয় সমাজে সতেরো জন নারীবাদী প্রবক্তার কথা জানা যায়। তবে তাঁদের মধ্যে ছয়জনের নাম আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা- এসারা

---

[৩] Teresa Billington-Greig, *The Militant Suffrage Movement : Emancipation in a Hurry*, F. Palmer, University of California, 1911, p. 82

[৪] সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড [অ-ন], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৭৬০

[৫] সামোসের পিথাগোরাস (Pythagoras of Samos) (খ্রিস্টপূর্ব ৫৭২-৪৯৭ অব্দ) ছিলেন একজন আয়োনিয় গ্রিক দার্শনিক, গণিতবিদ এবং পিথাগোরাসবাদী দর্শনের জনক। তিনি এমন কিছু নীতির উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন যা পরবর্তীতে প্লেটো ও এরিস্টটলের মত দার্শনিকদের প্রভাবিত করে। পিথাগোরাস এজিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূল অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কের কাছে অবস্থিত সামোস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিশরসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পর ৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে ইতালীর দক্ষিণে অবস্থিত গ্রিক উপনিবেশ ক্রোতোন নামক স্থানে চলে যান এবং এখানে একটি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভ্রাতৃত্বমূলক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্প্রদায় ক্রোতোনের সমাজ ও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে প্রাচীন গ্রীসে পিথাগোরীয় দার্শনিক ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(Aesara), মেলিসা (Melissa), মিয়া (Myia), পেরিকটোন (Periktone), ফিনটিস (Phintys) ও থিয়ানো (Theano)।[৬] উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেকেই পিথাগোরীয় সমাজের নারী ছিলেন। এ সকল নারী দর্শনের নানা বিষয়ের সাথে সমাজে নারীর অবস্থান নিয়েও মত প্রকাশ করেন। পিথাগোরীয়রা মনে করেন, সুষ্ঠু সামাজিক জীবন ও আত্মার মুক্তির জন্য প্রয়োজন একটি বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন। তাঁরা নারী পুরুষ উভয়কে সমভাবে বিচার করেছেন, ফলে তাদের সমাজে নারী পুরুষের ন্যায় সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।[৭] অন্যদিকে পিথাগোরীয় সমাজে যে সকল নারীর রচনা পাওয়া গেছে সেগুলি পত্রাকারে লিখিত। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে পত্র রচনা ছিল নারীর মত প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। উল্লেখ্য নারী কর্তৃক রচিত এসব পত্রের অধিকাংশ ছিল সমাজপতি তথা সমাজের পুরুষকে উদ্দেশ্য করে লেখা। এভাবে নারীসমাজ তাদের চিন্তা-ভাবনা, অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ও তার সমাধানের দিক নির্দেশনা তুলে ধরতেন। পিথাগোরীয় সমাজে এমন একজন পত্র রচয়িতা ছিলেন থিয়ানো। থিয়ানো বলেন, পিথাগোরীয় সমাজে সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক রক্ষা করা বা উন্নত করা প্রত্যেক ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দেখা হতো। আবার সামাজিক ঐক্য যেন বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ রেখে নৈতিক দায়িত্ব পালন করা হতো।[৮] ফলে দেখা যায় সমাজে বিরাজমান আন্তঃসম্পর্কগুলির মধ্যে নারী-পুরুষ সম্পর্ক অন্যতম।

পিথাগোরীয় সমাজে নারী-পুরুষের উভয়ের জন্য অভিন্ন নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করা হতো। নারীবাদী পত্ররচয়িতা ফিনটিস অভিমত জ্ঞাপন করেন, সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রকৃতি ও কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন নারীর কাজ হচ্ছে গৃহস্থালির কাজ করা, স্বামীর সেবা করা ও স্বামীর প্রতি অনুগত থাকা।[৯] কেননা নারীর বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলীর মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। পিথাগোরীয় মতবাদে, পুরুষের অন্যান্য কাজের ন্যায় গার্হস্থ্য কাজও সমাজে সমান মর্যাদাপূর্ণ। অর্থাৎ পিথাগোরীয় সমাজে নারীর কাজ গৃহ অভ্যন্তরে বা পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সম্পন্ন হলেও তা পুরুষের বর্হিমুখী কাজের ন্যায় সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পিথাগোরীয় সমাজে নারী কর্তৃক রচিত যে সকল পত্রাবলী পাওয়া যায় সেগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হয়- এ সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সমতা ছিল।

---

[৬] E. B Cole and S. Coultrup-McQuin, (eds.), *Explorations in Feminist Ethics*, Indian University Press, Bloomington, 1992, p. 58; উদ্ধৃত, রাশিদা আখতার খানম, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৩

[৭] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫

[৮] F.B Cole and S. Coultrap-McQuin (eds.), *op.cit.*, p. 63

[৯] *Ibid*, p. 64

প্রাচীন গ্রীসে প্লেটোর দর্শনেও নারীবাদের ধারণা পাওয়া যায়। আদর্শ রাষ্ট্রে নারীর ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে প্লেটো *Republic* গ্রন্থে স্বাবলীল ভাষায় তার মতামত তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে (Book-V) নারী-পুরুষে সমঅধিকার এবং সর্বক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্লেটো মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী, তাই আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা বাস্তবায়ন করতে হলে নারীশক্তিকে কাজে লাগানো প্রয়োজন।[১০] প্লেটো অভিমত প্রকাশ করেন, বিশুদ্ধ সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক নিয়মের অধীনে একই ব্যবস্থার সুফল ভোগ করবে।[১১] এটি দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্লেটো নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছেন যেখানে নারী-পুরুষের জন্য অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রচলিত থাকবে এবং নারী-পুরুষ উভয়ের সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকার একরকম হবে। পরিবার ব্যবস্থায় অভিভাবক শ্রেণি তথা পিতৃতন্ত্রের ধারণা গুরুত্বহীন বিবেচিত হয়। প্লেটো মনে করেন, দক্ষতা থাকলে একজন নারীও পরিবারের অভিভাবক হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারে এবং সে পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে।[১২] অর্থাৎ সমাজে একজন নারী পুরুষের মতোই যে সকল কাজের যোগ্যতা অর্জন করবেন, সে সকল কাজ করার সুযোগ লাভ করবেন। এখানে লিঙ্গ বা জেন্ডার নয় বরং যোগ্যতাকে কাজের মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। এককথায় প্লেটোর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে নারী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই।

প্লেটো মনে করেন যোগ্যতা অর্জনের জন্য নারীকে পুরুষের সাথে একই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত করতে হবে। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনায় বলেন, পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত শরীরচর্চা ও নিয়মিতভাবে আহার গ্রহণ, সঙ্গীত-বাদ্যযন্ত্র এবং সাহিত্যচর্চা থেকে শুরু করে নানা প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়কে রপ্ত করে এবং শাসন কাজে ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে যে সকল নারী কঠিন কাজ সম্পাদনে পারদর্শিতা অর্জন করবে তখন তাঁরা অভিভাবকত্ব দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত বলে প্রতীয়মান হবেন।[১৩] প্রয়োজনে নারী শাসনকার্য পরিচালনায় পুরুষের সহযোগিতাও করতে পারেন। অর্থাৎ নারী শুধু ঘরের কাজ, রান্না-বান্না, সন্তান পালন ও স্বামী সেবা করবে না প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও পালন করবে। সমাজ নারীর জন্য কোন কাজকে পৃথক করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। নারী ও পুরুষে শারীরিক শক্তি ও

---

[১০] হাসনা বেগম, "প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে নারী", *নৈতিকতা নারী ও সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২০

[১১] রাশিদা আখতার খানম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

[১২] হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১

[১৩] *ঐ*, পৃ. ২২-২৩

কর্মদক্ষতায় কিছুটা পার্থক্য থাকলেও মেধা ও মননে বা বুদ্ধিমত্তায় কোন পার্থক্য নেই। তাই উভয়ের সমান অধিকার দেওয়ার ধারণায় বিশ্বাসী প্লেটো।

সভ্যতার ইতিহাসে রোমান সাম্রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এ যুগের প্রথম দিকে নারী সমাজে খুব একটা অধিকার ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে রোমান সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সাথে সাথে নারীর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সমাজে ক্রমান্বয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। রোমান নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার, চুক্তি করার এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য মামলা করার অধিকার লাভ করে।[১৪] তবে এসময় সমাজে কঠোর পিতৃতন্ত্র প্রচলিত থাকায় নারী স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর যীশুখ্রিস্টের মতবাদ সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ মতবাদে বাহ্যিকভাবে নারীর জন্য আধ্যাত্মিক মুক্তি ও অন্যান্য মর্যাদার ঘোষণা দিলেও বাস্তবে তা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ।[১৫] খ্রিস্টধর্মে নারীকে পুরুষের অধীনে রাখার স্বপক্ষে মতবাদ দিয়ে বলা হয়, পুরুষ স্রষ্টার আদলে তৈরি আর নারী পুরুষের আদলে গড়া। তাই পরিবারে নারীর ভূমিকা হবে অধঃস্তন এবং তারা পুরুষের অধীনে থাকবে।[১৬] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চার্চের প্রধান একজন পুরুষ। আজ পর্যন্ত কোন নারীকে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি। অন্যদিকে খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রধান গ্রন্থ বাইবেলের (Old Testament) দশম খণ্ডে (Book-X) নারীকে দাসদাসী ও গৃহপালিত পশুর সাথে একীভূত করে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭] এককথায় খ্রিস্ট ধর্মে নারীকে তাঁর অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে নারী-পুরুষে সমতা বা নারীবাদের ধারণা প্রথম বিকাশ লাভ করে ফরাসি Christine de Pizan (জন্ম ১৩৬৪) এর লেখায়। ১৪০৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *The Book of the City of Ladies* নামক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেন, নারী ও পুরুষ উভয়ে ঈশ্বরের প্রজা এবং মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। নারী-পুরুষের চেয়ে ভিন্ন কোন প্রজাতি বা গোষ্ঠী নয়। তাই তাদের নৈতিক শিক্ষা

---

[১৪] আগস্ট বেবেল, *নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে*, কনক মুখোপাধ্যায় (অনুদিত), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৫

[১৫] রেজিনা বেগম, *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-৪৭)*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৪

[১৬] রিটা মে কেলী ও মেরী বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, নূরুল ইসলাম খান (অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৯

[১৭] *ঐ*, পৃ. ৩৬

থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।[১৮] উল্লেখ্য Christine de Pizan শুধু নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণে সমাজে নানারকম বৈষম্যের স্বীকার হয়েছিলেন। অন্যদিকে সে যুগে নারীশিক্ষা এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল। তাই নিজের জীবনের নানা বঞ্চনা ও প্রতিকূলতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে *The Book of the City of Ladies* রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তিনি সমাজে নারীকে অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত করে রাখায় পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

পনেরো শতকে ইউরোপে 'Renaissance' তথা পুনর্জাগরণ ঘটে। রেনেসাঁর মাধ্যমে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের উত্তরণ ঘটে। এ সময় ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনার উন্মেষ, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা তথা শিল্পকলা ও সাহিত্যের চর্চার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। মানুষের মেধা, মনন ও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। রেনেসাঁর সময়কালে সামন্তপ্রথার বিলুপ্তির ফলে গ্রামাঞ্চলে নারী ও পুরুষ ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। তবে এসময় সমাজে নারী পুরুষতন্ত্র তথা পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। উল্লেখ্য তৎকালে সামান্য সংখ্যক উচ্চবিত্ত ও ধনী শ্রেণির মেয়ে ব্যতিত অধিকাংশ সাধারণ ঘরের নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিকার লাভ করতে পারেনি। উচ্চবিত্তের কিছু মেয়ে Covent School এ পড়াশুনা করে। এ স্কুলগুলি উঁচু দেওয়াল ঘেরা ছিল এবং এ জায়গা থেকে মেয়েরা বাইরে যেতে পারতো না। পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল ধর্মশিক্ষা, সেলাই, হাতের কাজ এবং লিখতে, পড়তে ও গুণতে শেখা।[১৯] উল্লেখ্য এ শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। সাধারণ পরিবারের মেয়েদের জন্য সীমিত পরিসরে elementary school এ সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তবে এ ধরণের শিক্ষাকে সমাজ সুনজরে দেখতো না। সমাজ চাইতো না মেয়েরা ছেলেদের পাশে বসে পড়াশুনায় অংশগ্রহণ করুক, এর চেয়ে ঘরের কাজকে নারীর জন্য অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হতো।[২০] আবার এ সময় নারী রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং প্রশাসনের কাজে যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়নি, সৈন্যবাহিনীতে কোন নারী সৈনিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকি নারী কোন চুক্তি করতে বা চুক্তির সাক্ষী হওয়া বা সাচিবিক দায়িত্ব পালনের সুযোগও পায়নি।

মধ্যযুগে শিল্প ও ব্যবসায় সংগঠন 'গিল্ড' (Guild) নারীর পক্ষে ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের বিরোধিতা করে এবং রেনেসাঁ যুগেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ রেনেসাঁ মানবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের

---

[১৮] মাহমুদা ইসলাম, *নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১০৫

[১৯] *ঐ*, পৃ. ৮৯

[২০] Martine Sonnet, "A Daughter to Educate" in 'A History of Women-Renaissance & Enlightenment Paradoxes', (ed. Duby and Perrot); উদ্ধৃত, মাহমুদা ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯

স্ফুরণ ঘটালেও সামগ্রিক অর্থে নারীর অবস্থার তেমন কোন উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। এসময় পর্যন্ত নারী পূর্বের ন্যায় গৃহস্থালির কার্যক্রমের পরিমণ্ডলেই নিয়োজিত থাকে। আয়ারল্যান্ডের প্রখ্যাত সাহিত্যিক Richard Steele (1672-1729) তাঁর লেখায় তাচ্ছিল্যের সাথে বলেছেন যে, "নারী হচ্ছে কন্যা, ভগ্নী, স্ত্রী এবং মাতা- মানবজাতির একটি পরিশিষ্ট মাত্র।"[২১] স্কটল্যান্ডের প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক John Knox (1505-1572) *English Women in Life and Letters* গ্রন্থে বলেন, "মেয়েরা দুর্বল, বোকা ও নিষ্ঠুর। মেয়েদের চেতনা বৃদ্ধির চেষ্টা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাতে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা হয়।"[২২]

প্রকৃতঅর্থে নারীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয় সতেরো শতকের শেষ ভাগ হতে। এসময় থেকেই বিশ্বের ইতিহাসে নারী জাগরণ শুরু হয় বলে অভিমত দেওয়া যায়। ১৬৬২ সালে ডাচ নারী Margaret Lucas Cavendish (1623-1673) তাঁর 'Female Orations' নামক একটি রচনায় বলেন, "পুরুষ আমাদের বিরুদ্ধে দারুণ বিবেচনাহীন ও নিষ্ঠুর আচরণ করে, ওরা সব ধরণের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে কিন্তু আমাদের বেলায় অবরোধ সৃষ্টি করে, এমনকি মেয়েদের সাথেও মিশতে দেয় না। আমরা বাদুড় অথবা পেঁচার মতো বাস করি, পশুর মতো ভারবাহী জীব যেন আমরা। আমরা প্রতিনিয়ত পোকামাকড়ের মতো মৃত্যুবরণ করি।"[২৩] এ লেখাটিতে একদিকে যেমন নারী অন্তরের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে অন্যদিকে নারীর সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জেগে উঠার বার্তাও লক্ষণীয়। ১৭৬৫ সালে একজন স্কুল শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারক Hannah Woolley (1622-1675) *The Gentle Women's Companion* (1673) নামক বইয়ে মত প্রকাশ করেন যে, নারীর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সমাজের সর্বত্র অবহেলিত এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজই এর জন্য দায়ী।[২৪] নারীকে পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রে তাঁরা অনন্য অবদান রাখতে পারে।[২৫] উল্লেখ্য এ রচনার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং মেয়েরা ছেলেদের চাইতে মেধা ও প্রতিভার দিক দিয়ে যে কোনো অংশে কম নয় সে বিষয়টি সকলের সামনে উঠে আসে। ব্রিটিশ লেখক Mary Astell

---

[২১] *ঐ*, পৃ. ৯০

[২২] মালেকা বেগম, *নারীমুক্তি আন্দোলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৮

[২৩] *ঐ*, পৃ. ১৭

[২৪] *ঐ*

[২৫] রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬

(1666-1731) তাঁর বিখ্যাত *Some Reflections Upon Marriage* (1700) গ্রন্থে নারী অধিকার বিষয়ে বলিষ্ঠভাবে তার মতামত তুলে ধরেছেন।[২৬]

আঠারো শতকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। নতুন নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারী কারখানায় শ্রমিকের কাজে যোগদান করে। এভাবে নারীর জন্য গৃহ পরিমণ্ডলের বাইরেও নতুন পরিবেশে কাজ করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তবে এখানেও নারী-পুরুষে মজুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আবার গৃহকর্মেও নারী-পুরুষে অসমতা পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ একই পরিবারের নারী ও পুরুষ কলকারখানায় কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে পরিবারের কাজ ও সন্তান পালনসহ প্রভৃতি কার্যক্রমে শুধু নারীকেই অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এককথায় শিল্প বিপ্লব কর্মজীবী নারীর কর্মঘন্টা দীর্ঘায়িত করে দেয়।[২৭] তবে এ সময় অর্থ উপার্জনের সুযোগ লাভ করায় নারীর সামাজিক অবস্থান খানিকটা উন্নত হয়।

আঠারো শতকের শেষার্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন পাশ্চাত্য সমাজে নারী জাগরণকে প্রভাবিত করে। ব্রিটিশদের বিতাড়িত করে ১৭৭৬ সালে 'The Declaration of Independence' প্রণেতা John Adams (1735-1826) এর কাছে তাঁর স্ত্রী Abigail Adams (1764-1818) 'Remember the Ladies' শীর্ষক একটি চিঠি লিখেন, যা নারীর নিজের অধিকার দাবির সূচনা বা দলিল বলা যায়।[২৮] এটি একটি চিঠি হলেও প্রকৃতপক্ষে লেখাটি ছিল একজন আইন প্রণেতার কাছে বিশ্বের সকল নারীর পক্ষ হতে পেশ করা যৌক্তিক দাবি দাওয়া। Abigail Adams আশাবাদ ব্যক্ত করেন দেশ শাসনের জন্য নতুন সংবিধান রচনায় স্বামী John Adams নারী অধিকারের বিষয় বিবেচনায় রাখবেন এবং নারীর জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ নানাদিকে গুরুত্ব দিবেন। অন্যদিকে ১৭৮৯ সালে ইউরোপের ফ্রান্সে Liberty, Equality and Fraternity-র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে বিপ্লব সংঘটিত হয় সেখানে নারীসমাজ পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করে। এ সময় নারী শুধু ফরাসী রাজতন্ত্র নয় পিতৃতন্ত্রেরও অবসান এবং নারীর জন্য নানা প্রকার ন্যায্য অধিকার দাবি করেন। তৎকালে বিপ্লবী নারী Olympe de Gouses (1748-1793) রচনা করেন 'The Declaration of the Rights of

[২৬] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

[২৭] মাহমুদা ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১

[২৮] রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭

Women' (1791)। নারী অধিকারের লক্ষ্যে প্রকাশিত এ ঘোষণা পত্রটি বিরোধিতার মুখে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ফরাসী সরকার প্রচণ্ড চাপের কারণে ঘোষণাপত্রের কয়েকটি প্রস্তাব, যেমন- অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করার অধিকার, উত্তরাধিকার আইনের স্বীকৃতি, বিবাহ-বিচ্ছেদে নারীর মামলা করার অধিকার ইত্যাদি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। এ আইন নারীর জীবন নিয়ন্ত্রণে খানিকটা স্বস্তি এনে দেয়। যা নারীবাদের একটি বিশেষ অর্জন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

উনিশ শতকে বিশ্বব্যাপী যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দর্শনচর্চার প্রচলন আরম্ভ হলে নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণ প্রসঙ্গে লেখালেখি শুরু হয়। এ সময় ধীরে ধীরে নারী-পুরুষ সমতা দাবি করা হয় এবং এভাবে নারীবাদ শব্দটি সামনে আসে। উল্লেখ্য ১৮৩৭ সালে ফরাসী দার্শনিক ও ইউটোরিয়ান সমাজবাদী Charles Fourier (1772-1837) ফ্রান্সে সর্বপ্রথম নারীবাদ (Feminism) শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে ইংরেজি ভাষায় এটি গৃহীত হয়।[২৯] চার্লস ফুরিয়ে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যাশী ছিলেন। এসময় ইংল্যান্ডের সমাজে Harriet Martineau (1802-1876) *Household Education* নামক নারীশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থে মত প্রকাশ করেন যে, শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত নারী আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না এবং নারী নির্যাতনও বন্ধ হবে না।[৩০] প্রকৃতপক্ষে নারীবাদের মূল লক্ষ্য হলো নারীমুক্তি অর্জন করা। এ লক্ষ্য অর্জনে মত ও পথের বিভিন্নতার কারণে নারীবাদের প্রবক্তাগণের মধ্যে তত্ত্বগত ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এসকল তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্যতম হলো উদারপন্থী নারীবাদ, উগ্রপন্থী নারীবাদ, মার্কসীয় নারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, অস্তিত্ববাদী নারীবাদ, সাংস্কৃতিক নারীবাদ, পরিবেশ নারীবাদ, উত্তর আধুনিক নারীবাদ ইত্যাদি। নারীবাদের নানামুখী ধারা সম্পর্কে Rosemarie Patnam Tong বলেন,

> Feminism thought is old enough to have a history compete with its own set of labels: liberal, radical (libertarian or cultural), Marxist-Socialist, psychoanalytic, existentialist, post-modern, multicultural, global and ecological.[৩১]

---

[২৯] রাশিদা আখতার খানম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭; মাহমুদা ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫

[৩০] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩

[৩১] Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought,* Westview Press, Oxford, 1998, p.1

অন্যদিকে নারীবাদের সক্রিয় আন্দোলন ও তাত্ত্বিক বিকাশের ধারাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। ফাস্ট ওয়েভ বা প্রথম প্রবাহ, সেকেন্ড ওয়েভ বা দ্বিতীয় প্রবাহ এবং সাম্প্রতিক বা তৃতীয় প্রবাহ। প্রথম দিকে নারীবাদ ১৮৪৮ সালের 'সেনেকা ফলস কনভেনশন' (Seneca Falls Convention)[৩২] এর মধ্যদিয়ে শুরু হয়ে বিশ শতকের গোঁড়ার দিক পর্যন্ত সামাজিক কাঠামোকে বজায় রেখে নারীর আইনি ও রাজনৈতিক সমানাধিকার অর্জন ও প্রকাশ্য পেশায় বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণের লক্ষে পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় প্রবাহের সূত্রপাত হয় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনটি নারীবাদী আকরগ্রন্থ, যথা- Betty Friden রচিত *The Feminine Mystique* (1965), Kate Millett রচিত *Sexual Politics* (1970) ও Germaine Greer এর *The Female Eunuch* (1970) প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এ নারীবাদেই প্রধান চারটি ঘরানার (উদারপন্থী, চরমপন্থী, সাংস্কৃতিক ও সমাজতন্ত্রী) সূত্রপাত করে।[৩৩] তৃতীয় প্রবাহে শুরু হয় উত্তর আধুনিক, উত্তর উপনিবেশবাদী ও তৃতীয় বিশ্বকেন্দ্রিক নানা নারীবাদের উত্থান। এ পর্বেই ক্রমশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতীয় পটভূমিতে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠে এ উপমহাদেশের নিজস্ব নারীবাদ।

নারীবাদের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

উদারনৈতিক নারীবাদ : প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক চিন্তাচেতনার অধিকারী নারীবাদীরা অভিমত প্রদান করেন যে, নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার অসাম্য দূর করে নারীর বিদ্যমান অধস্তন অবস্থার জন্য দায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার ও সংশোধন করে বৈষম্য ও অসমতা দূরা করা সম্ভব। এ নারীবাদী ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রবক্তাগণের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমিত আকারে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উদারনৈতিক নারীবাদের মূল বক্তব্য হলো- সমাজে প্রচলিত প্রথা ও আইনগত ব্যবস্থার মধ্যে যা নারীর জীবনে সফলতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তা নারীর অধস্তনতার মূল কারণ।[৩৪] তাই নারীকে পুরুষের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে, তাহলে নারী প্রগতির পথে অগ্রসর হবে এবং পুরুষের ন্যায় সকল কাজে সমান পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হবে। উদারনৈতিক নারীবাদের অগ্রপথিক

---

[৩২] সেনেকা ফলস কনভেনশন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নারী অধিকার রক্ষার জন্য একটি সম্মেলন। ১৮৪৮ সালের ১৯-২০ জুলাই নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফলস শহরের Wesleyan Chapel এ সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়। এখানে বিশ্বের নারীর সামাজিক, পারিবারিক এবং ধর্মীয় অবস্থা ও অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

[৩৩] সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬১

[৩৪] মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, অবসর প্রকাশনা, ২০০৬, পৃ. ৮

ছিলেন Mary Wollstonecraft (1759-1797)। তিনি শৈশবে নিজ মায়ের প্রতি পিতার নিষ্ঠুর আচরণে বিচলিত হন এবং প্রতিবাদ জানান। তখন থেকেই সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষ বৈষম্য তাকে ভাবিয়ে তোলে। মেরি লেখনীর মাধ্যমে নারী সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় তুলে ধরেন। তার প্রথম গ্রন্থ *Thoughts on the Education of Daughters* (1787) এ মেরির বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার প্রথম প্রকাশ ঘটে। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট সংস্কারের সমর্থকদের অনেক উদারপন্থী ব্যক্তির সহায়তায় বইটি প্রকাশিত হয়।[৩৫]

নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনার পূর্বে মেরি উলস্টোনক্রাফট মানুষের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেন। কেননা তিনি ছিলেন রাজতন্ত্র ও সামন্তবাদ বিরোধী একজন মানুষ। তিনি মনে করেন, নাগরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। জ্ঞানের অভাবে একজন মানুষ মনুষ্যত্ব হারাতে পারে এবং স্বৈরাচারিতা মানুষের অধিকার প্রদানে বাধার সৃষ্টি করবে।[৩৬] এ লক্ষ্যে তিনি রচনা করেন *A Vindication of the Rights of Men* (1790)। এ গ্রন্থে তিনি মানুষের মুক্তির পথে প্রতিবন্ধকতাগুলিকে চিহ্নিত করে এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং সেটি থেকে উত্তোরণের উপায় বর্ণনা করেন। এরপর তিনি রচনা করেন *A Vindication of the Rights of Women* (1792)। এ গ্রন্থে তিনি প্রথমবারের মতো যৌক্তিকতাসহ নারীমুক্তির সপক্ষে একটি অকাট্য নৈতিক কাঠামোকে ভিত্তি করে বক্তব্য প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করে মেরি তদানীন্তন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আক্রমণের শিকার হন। উল্লেখ্য ফ্রান্সে গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়ে পাঠক সমাজের হাতে যায় এবং প্রশংসিত হয়। ফরাসী সাহিত্যিক ও রাজনীতি বিষয়ক লেখক Thomas Paine (1737-1809), Joel Barlow (1754-1812), Helen Maria Williams (1761-1827) এবং ফরাসী বিপ্লবের নেতা Pierre Francois Tissot (1768-1854) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মেরিকে অভিনন্দিত করেন।[৩৭] মূলত মেরি *A Vindication of the Rights of Women* এমন একটি সময় রচনা করেন যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় তথা সারা পাশ্চাত্য বিশ্বে নারীর মানবাধিকার বিষয়ে তখন পর্যন্ত সচেতনতার সৃষ্টি হয়নি। মেরি তাঁর গ্রন্থে সর্বপ্রথম নারীবাদের একটি মেনিফেস্টো (দাবিনামা) তুলে ধরেন। তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি অভিন্ন মানদণ্ড দাবি করেন এবং নারী যে পুরুষের সমমানের মানুষ সে সত্যটি যৌক্তিকতার সাথে সামনে নিয়ে আসেন।

---

[৩৫] হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১

[৩৬] Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Men*, London, 1790, p. 26

[৩৭] হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩

তাই বলা যায় মেরির গ্রন্থটি ছিল তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিবাদ ও বিস্ফোরণ। সৃষ্টিকর্তা নারীকে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন- এ কথাটি সমাজপতিরা ধর্মীয় আবরণে আবৃত করে সমাজে নারীকে পুরুষের অধীনে অধিকতর দুর্বল ব্যক্তিত্বে পরিণত করে রেখেছে। এ বিষয়টিকে আঘাত করেন মেরি। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, যে সকল মনোভাব বা প্রবণতা এবং রীতিনীতি নারীকে অধস্তন করে রাখার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছে সেগুলিকে পরিত্যাগ করে নারীবান্ধব এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে নারীমুক্তির স্বপক্ষে একটি স্থায়ী অবস্থান নেওয়া সম্ভব।[৩৮] তিনি বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করেন, নারীর উচিত নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজের মেধা ও কর্মদক্ষতার উন্নতিসাধন করা। পুরুষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে কর্মসংস্থানে নিজেকে সম্পৃক্ত করা। তাহলে সমতাভিত্তিক সমাজ কাঠামো গড়ে উঠবে এবং এ সমাজে নারী তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

A Vindication of the Rights of Women গ্রন্থে মেরি সর্বপ্রথম নারীর জন্য পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার দাবি করেন। তিনি যুক্তিনির্ভর পরিবার ও সমাজ গঠনে প্রয়াসী ছিলেন। ইতোপূর্বে Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804) প্রমুখ প্রতিথযশা ব্যক্তিবর্গ আদর্শ সমাজ গঠনের মাধ্যমে মানবমুক্তির কথা বলেছেন। কিন্তু মেরি উলস্টোনক্রাফটের সাথে তাদের চিন্তাভাবনার অমিল লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ রুশোর সাথে নারী অধিকার বিষয়ে মেরির মতামতের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ রুশো মনে করেন, পুরুষ যুক্তি শিখবে কিন্তু নারী নয়; কারণ যুক্তিবাদী পুরুষের জন্য আবেগময়ী নারী সহায়ক হবে। আবার নারী ও পুরুষের শিক্ষা হবে ভিন্ন। নারীর নমনীয়তা, কোমলতা ও সৌন্দর্য গুণ পুরুষের নিকট নারীকে আকর্ষণীয় করে তুলবে।[৩৯] কিন্তু মেরি উলস্টোনক্রাফট রুশোর এ ধরণের মতের বিরোধিতা করেন।

প্রকৃতপক্ষে মেরি মানবমুক্তির পথে তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873) এবং Karl Marx (1818-1883) দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি মানবাধিকার প্রাপ্তির সপক্ষে নানা যুক্তি উত্থাপন করেন। তিনি গ্রন্থের শুরুতেই বলেন- নারী কেবল

---

[৩৮] Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman*, J. Johnson, London, 1796, p. 23

[৩৯] Rosemarie Putnam Tong, *op.cit.*, p. 14; মোঃ আব্‌দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯

পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে কথাটি সত্য নয়। আদমের বুকের হাড় দিয়ে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে- এসব কল্প কাহিনী মাত্র।[৪০] মেরি উলস্টোনক্রাফট জোরালোভাবে মত প্রকাশ করেন যে, সৃষ্টিকর্তা একটি পূর্ণসত্তা এবং তিনি ন্যায়পরায়ণ। তাই পুরুষের ন্যায় নারীকেও মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং একই রকম মেধা ও প্রতিভা তথা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান প্রদান করেছেন। তাই নারী কোন অংশে পুরুষের চেয়ে কম নয়।[৪১] মূলত তিনি সমসাময়িক ইউরোপ-আমেরিকায় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত এককথায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সকল শ্রেণির নারীর অধস্তন জীবন পরিলক্ষিত করেন। তাই লেখনীর মাধ্যমে নারীকে এ দুদর্শাগ্রস্ত অবস্থা হতে মুক্তির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন। মেরি উলস্টোনক্রাফট ছিলেন মানবতাবাদী এবং নারী-পুরুষে সমতা প্রত্যাশী। তবে পুরুষকে বাদ দিয়ে নয় বরং তাদেরকে নারীর পাশে রেখে প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ায় প্রয়াসী ছিলেন।

John Stuart Mill ছিলেন উনিশ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য উদারনৈতিক নারীবাদী। ব্যক্তি জীবনে একজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও মিল নারীবাদী ভাবধারার তাত্ত্বিক ছিলেন। মিল নিজ পিতা James Mill ও শিক্ষক Jeremy Bentham এর উপযোগবাদ (Utilitarian) দ্বারা অণুপ্রাণিত হন। অন্যদিকে মিল ও তাঁর বন্ধু (পরবর্তীতে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন) Harriet Taylor Mill (1807-1858) দু'জন মিলে রচনা করেন "Early Essays on Marriage and Divorce" শীর্ষক প্রবন্ধটি। আবার পৃথকভাবে মিল রচনা করেন *The Subjection of Women* (1869) এবং Harriet Taylar রচনা করেন *Enfranchisement of Women,* উভয় রচনাতে নারী বিষয়ে দু'জনের চিন্তাভাবনার সমতা পরিলক্ষিত হয়। নারী অধিকারের প্রবক্তা মিলের উপযোগবাদের মূল কথা ছিল যে, সমাজের সকল মানুষের জন্য সুখ বৃদ্ধি করা এবং এ লক্ষ্যে সকলকে তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে দেওয়া। তবে কেউ কারোর কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। অন্যদিকে উদারনৈতিকতাবাদী নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমান অধিকার, স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করে।[৪২]

John Stuart Mill ও Taylor অভিমত প্রকাশ করেন যে, শুধু শিক্ষা নয় বরং পুরুষের মতো নারীকেও নাগরিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করতে হবে। ফলে শুধু নারী উপকৃত হবে না বরং

---

[৪০] হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬

[৪১] Mary Wollstonecraft, *op.cit.*, p. 42

[৪২] মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩

সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে।[৪৩] সমাজ দীর্ঘদিন ধরে পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষতান্ত্রিকতার চর্চা করছে, এ ব্যবস্থায় নারীকে দুর্বল প্রতীয়মান করে এবং পুরুষকে শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই অধিকতর দুর্বল নারীকে পুরুষের কর্তৃত্বের অধীনে রাখা হয়েছে। এভাবে যুগ যুগ ধরে নারী অবমূল্যায়িত হয়ে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এ বিষয়টি চিহ্নিত করে Mill ও Taylor অভিমত প্রদান করেন যে, আধুনিক যুগ ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ। তাই পুরুষ ও নারী সমান অধিকার লাভ করবে। এক্ষেত্রে তাঁরা মেরি উলস্টোনক্রাফটের ন্যায় নারীশিক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। মিল বলিষ্ঠভাবে উল্লেখ করেন, পুরুষের মত সমশিক্ষার সুযোগ নেই বলে নারীর অধস্তন অবস্থা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, নারীর প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজ করছে না।[৪৪] তাই নারীর জন্য পুরুষের ন্যায় উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে নারীসমাজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে।

অন্যদিকে নারী কখনোই পুরুষের চেয়ে কম দক্ষ নয়, সুযোগের অভাবে তাঁরা দক্ষতা প্রমাণ করতে পারেনি। সীমিতঅর্থে শারীরিক ভিন্নতা ব্যতীত নারী-পুরুষের মেধা, প্রতিভা ও দক্ষতার কোন পার্থক্য নেই। তাই নারীকে স্বাধীনতা দিতে হবে। মিল প্রচলিত বিবাহমতে স্ত্রীর স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারহীনতার সমালোচনা করে উল্লেখ করেন যে, বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী তাঁর স্বামীর দস্তখত দেওয়া দাসীতে পরিণত হয়, বিয়ের পীড়ীতেই নারী জীবনব্যাপী স্বামীর আনুগত্যের শপথ নেয়।[৪৫] আবার বিবাহিত নারী গৃহকর্ম, পরিবার প্রতিপালন ও স্বামীর সেবাকে জীবনের পরমব্রত বলে মনে করে। মিল নারীর স্বাধীনতার জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে তিনি নারীকে যে কোনো সম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন করার পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁর মতে, নারী অর্থ উপার্জন করে না বলেই এতটা অবনত জীবনযাপন করে। তাই অর্থ উপার্জন করে স্বনির্ভর জীবনযাপন করলে নারীর মানসিক শক্তি দৃঢ় হবে এবং কণ্ঠ সোচ্চার হবে। এভাবে সে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিগড় থেকে নিজেকে মুক্ত করে ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করবে। অন্যদিকে সমগ্র মানবসমাজকে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, মিল ১৮৬৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হলে নারী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের মনে আশার সঞ্চার করে। তিনি এ সময় নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের

---

[৪৩] Susan Moller Okin, *Women in Western Political Thought*, Virago Publishing, London, 1980, p. 212

[৪৪] John Stuart Mill, *The Subjection of Women*, Longmans, London, 1869, P. 105

[৪৫] *Ibid*, p. 107

মুখপত্র হিসেবে পার্লামেন্টে কাজ করেন।[৪৬] অবশ্য ইংল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলন সফল হতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল।

প্রকৃতপক্ষে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারী নিপীড়নের কেন্দ্র ছিল। তাই মিল পরিবারের পুরুষ সদস্যদের আহ্বান জানান নারীকে শিক্ষিত করে স্বাধীন করে দিতে। অন্যদিকে স্বাধীন নারীকে পরামর্শ দেন পছন্দমত একটি পেশা পছন্দ করে অর্থ উপার্জন করতে। মিলের আশা ছিল, নারী-পুরুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুন্দর উপযোগবাদী ও উদারনৈতিক একটা সমাজ গড়ে উঠুক। সবশেষে তিনি বলেন, নারীর জীবনের সবচেয়ে মহৎ পেশা জীবনকে সুন্দর ও সুমার্জিত করা, কেননা প্রকৃতিই তাদেরকে অধিকতর মার্জিত ও সুরুচি প্রদান করেছে। অন্যদিকে যতদিন পুরুষের ন্যায় নারীকে স্বাধীনতা না দেওয়া হবে ততদিন সমাজের কেউ নিরাপদ বোধ করবে না।[৪৭] তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে মিলের নারীবাদী চিন্তাভাবনা ছিল নির্ভীক ও দুঃসাহসিক।

উদারনৈতিক নারীবাদী প্রবক্তা Betty Friedan (1921-2006) *The Feminine Mystique* (1963) গ্রন্থে Mystique অর্থে 'যে সমস্যার কোন নাম নেই'- এ অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৪৮] এ গ্রন্থে মূলত তিনি নারী বিয়ে ও সন্তান পালনকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে কেন- সে প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করেছেন। ফ্রাইডান নারীকে ক্ষমতাহীন Sex Class হিসেবে ব্যাখ্যা দেন। তবে নারী ইচ্ছা করলে ক্ষমতাবান শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তিনি মনে করেন নারী সুপ্রাচীনকাল থেকে স্ত্রী ও মাতৃত্বের ভূমিকায় নিজেকে দেখতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। জগতে এর বাইরেও যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে তার ধারণা নারীর নেই। তাই ফ্রাইডান অভিমত ব্যক্ত করেন যে, স্ত্রীত্ব ও নারীত্বের আকর্ষণ থেকে নারীকে মুক্ত করতে হবে। এজন্য নারীকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ঘরের কাজ সম্পাদন করেও নারী বাইরের জগতে নানা কাজে অবদান রাখতে পারে এবং অর্থ উপার্জন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। ফ্রাইডান বলেন, নারীর পরিচয় ও ক্ষমতার অর্থ এই নয় যে, সে কোনো পুরুষকে ভালোবাসবে না বা নিজেকে ভালোবাসবে না। অথবা নিজের

---

[৪৬] মাহমুদা ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯

[৪৭] John Stuart Mill, *op.cit.*, p. 109

[৪৮] Maggie Humm, *A Readers Guide to Contemporary Feminist Theory Criticism*, Harester Wheat Sheaf, New York, 1996, p. 39; উদ্ধৃত, মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬

সন্তানের যত্ন নেওয়া পরিত্যাগ করবে।[৪৯] তাই তিনি ঘরে ও বাইরে নারী-পুরুষে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। কেননা নারী-পুরুষে সমতা প্রতিষ্ঠা পেলেই পরিবার সুন্দর ও সুখী হতে পারে।

উদারনৈতিক নারীবাদীরা সমাজে নারীর জন্য পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তাঁরা নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন দাবি করেন। নারী স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। উদারনৈতিক নারী প্রবক্তাগণের মধ্যে আরো যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম Sarah Grimke (1792-1872), Frances Wright (1795-1852), Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), Susan B. Anthony (1820-1906), Millicant Garrett Fawcett (1847-1929), Emmeline Pankhurst (1858-1929) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রগতিবাদী নারীবাদ : উদারনৈতিক নারীবাদের চেয়ে অগ্রবর্তী ধারার নারীবাদ হলো প্রগতিবাদী বা Radical Feminism। এ ধারার প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, নারীর অবস্থার জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি বহুধা বিস্তৃত ও দৃঢ়মূল। এর শিকড় উৎপাটন না করলে নারী মুক্তি পাবে না।[৫০] এক কথায় প্রগতিবাদীরা মনে করেন পুরুষের বৈশিষ্ট্য নির্যাতনমূলক এবং তারা নারী ও প্রকৃতি বিদ্বেষী। তাই এমন বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করতে হবে। নারী ও প্রকৃতিকে প্রাপ্য মর্যাদা দেয় এমন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। এ ধারার নারীবাদীদের মধ্যে অন্যতম Marilyn French (1929-2009), Kate Millett (1934-2017), Paula S. Rothenberg (1943-), Shulamith Firestone (1945-2017) প্রমুখ।

প্রগতিবাদী নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সমূলে ধ্বংস না করলে নারী ও পুরুষে সমতা এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাঁরা বলেন পৃথিবীর ইতিহাসে নারী প্রথম নিপীড়িত গোষ্ঠী এবং সকল সমাজেই নারী নিপীড়ন পরিলক্ষিত হয়। তারা আরও বলেন, সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা নারীর অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যায় না। তাই পুরুষ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত যৌনতা থেকে নারীর পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নারীর যৌনতাকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। ফায়ারস্টোন মনে করেন, মানব সমাজে বিদ্যমান মূল শ্রেণি বৈষম্য হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মধ্যে। নারী পুরুষের চেয়ে অধস্তন- এর

---

[৪৯] Betty Friedan, *The Feminine Mystique*, Dall, New York, 1994, p. 180

[৫০] সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬৩

জন্য অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার চেয়ে জীববিজ্ঞানের ব্যাখ্যার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নারী নিপীড়নের মূল হলো জৈবিক, তাই নারী মুক্তির জন্য জৈবিক বিপ্লব (Biological Revolution) প্রয়োজন।[৫১]

প্রজনন নিয়ন্ত্রণকারী প্রযুক্তি ব্যবহৃত হলে নারীর প্রজনন ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তার সম্ভব। অর্থাৎ নারীর প্রজনন ভূমিকার কারণে পুঁজিবাদী সমাজ তাঁকে পারিবারিক জীবনে বন্দি করে এবং এখানে নারীকে মজুরীবিহীন শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়। যদি প্রজননের দায়িত্ব নারীকে পালন করতে না হয় তবে গৃহবন্দি হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। বরং সে বাইরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবে এবং নানারকম সম্মানজনক পেশা অবলম্বন করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। তাই ফায়ারস্টোন মনে করেন, যখন নারী ও পুরুষ প্রজননমূলক ও উৎপাদনমূলক এরূপ পৃথক ভূমিকা পালন করবে না তখন সমাজে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।[৫২]

প্রগতিবাদী নারীবাদে মাতৃত্বের (Motherhood) বিষয়টি বিতর্কিত। ফায়ারস্টোন মনে করেন, সকল নারীকেই সন্তান জন্ম দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পুরুষতন্ত্র মনে করে একজন উত্তম মাতার পারিবারিক কাজকর্ম ও সন্তান পালন ছাড়া আর কোন ভূমিকা নেই। প্রগতিবাদী নারীবাদী Kate Millett মনে করেন, নারী নিপীড়নের মূল নিহীত সেক্স বা জেন্ডার ব্যবস্থার মধ্যে। তিনি *Sexual Politics* (1970) গ্রন্থে বলেন, নারীর স্বাধীনতা লাভের জন্য পিতৃতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট পুরুষের নিয়ন্ত্রণ নির্মূল করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে গড়ে ওঠা যৌন সম্পর্ক নির্মূল করা।[৫৩] নিজ গ্রন্থে তিনি D.H. Lawrence (1885-1930), Henry Miller (1891-1980), Norman Mailer (1923-2007) প্রমুখ সাহিত্যিকদের নারীর উপর পুরুষের যৌন আধিপত্যের স্বপক্ষে লেখনীর সমালোচনা করেন। অন্যদিকে Marilyn French মনে করেন, পুরুষতন্ত্রই হচ্ছে সকল ধরণের নারী নিপীড়নের মূল।

ফলে দেখা যায় প্রগতিবাদীরা সরাসরি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তথা পুরুষতন্ত্রকে আঘাত করা হয়েছে। এ ধারার প্রবক্তাগণ সমাজে প্রচলিত পিতৃতন্ত্র ভেঙ্গে দেওয়া, নারী-পুরুষে জৈবিক চাহিদার সমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীকে স্বাধীনতা প্রদানের ব্যাপারে অভিমত দিয়েছেন।

---

[৫১] Shulamith Firestone, *The Dialect of Sex*, Bantan Books, New York, 1970, p. 12; উদ্ধৃত, মো. আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭

[৫২] *ঐ*, পৃ. ৩৯

[৫৩] *ঐ*, পৃ. ৪২

মার্কসীয় নারীবাদ : মার্কসীয় নারীবাদী ভাবধারার অন্যতম প্রবক্তা হলেন Karl Marx (1818-1883) ও Friedrich Engels (1820-1895)। উনিশ শতকের মধ্যভাগে তাঁরা সর্বপ্রথম নারীর দাসত্বের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁরা অভিমত প্রদান করেন, একমাত্র শ্রেণি শোষণহীন সমাজেই নারীর সম্পূর্ণ মুক্তি সম্ভব।[৫৪] মার্কসের তত্ত্বমতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের মধ্যে কোন শ্রেণিভেদ ছিল না। তখন কেউ কাউকে তথা পুরুষ নারীকে শাসন ও শোষণ করতো না। বরং তখন নারী-পুরুষে সমতা ছিল, এমনকি পুরুষ নারীকে সম্মান প্রদর্শন করতো। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় কৃষিকাজ আবিষ্কার করে নারী। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে পুরুষ কৃষিকাজ শুরু করে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের চাইতেও অধিক ফসল উৎপাদন করায় ব্যক্তিগত উদ্বৃত্ত সম্পত্তির মালিক হতে থাকে। এভাবে সমাজে শ্রেণি বৈষম্য এবং তা থেকে শ্রেণি শোষণের উদ্ভব ঘটে। নারী কৃষিকাজের দায়িত্ব হারিয়ে পরাধীন হতে থাকে। এভাবে নারী উৎপাদনমুখী কাজ থেকে পৃথক হয়ে অনুৎপাদনমুখী গৃহকাজে বন্দি হয়। তবে বর্তমানে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম কোনোভাবেই অনুৎপাদনশীল কাজ নয়। নারী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ঠিক এ ধারার সমাজব্যবস্থায় দাসত্ব, সামন্তবাদিতা, ধনতান্ত্রিকতা ইত্যাদির সূত্রপাত ঘটে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এ ধরণের পরিবারে নারী পরাধীন। মূলত শ্রেণি শোষণের সাথে নারীর পরাধীনতা, শোষণ-নিপীড়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অন্যদিকে এঙ্গেলস *The Origin of the Family, Private Property and the State* (1895) গ্রন্থে মার্কসের মতো বলেন শ্রেণি বা দল সামাজিক উৎপাদনের কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং তারাই একসময় সে উৎপাদনের উপর কর্তৃত্ব করে। সামাজিক শ্রেণি বিভেদের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে সমাজের সকল উৎপাদন ব্যবস্থা পুরুষের হাতে চলে যাওয়ায় পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উত্থান ঘটে। তাই বলা যায় নারী চিরকাল পুরুষের অধীনে ছিল না।

আবার পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবারের গণ্ডি পার হয়ে বৃহৎ পরিসরে শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। তখন পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে নারী উৎপাদনমুখী কাজে অংশগ্রহণ করে না। তাই অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ফলে পরিবার ও সমাজে নারীর গুরুত্ব হ্রাস পায়। অন্যদিকে এ সময় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়। ইতোপূর্বে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ

[৫৪] রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫

ব্যবস্থার মাতৃগোষ্ঠীর লোকেরা সম্পত্তির মালিক হতো। এঙ্গেলস মাতৃতন্ত্রের তথা জননীবিধির উচ্ছেদকে নারী জাতির চূড়ান্ত পরাজয় হিসেবে বর্ণনা করেন।[৫৫] পিতৃতন্ত্রে উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তনের ফলে সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণের জন্য নারীকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীনে বন্দি করা হয়। উল্লেখ্য এসময় একবিবাহ প্রথার উদ্ভব ঘটলেও এটি শুধু নারীর জন্য প্রযোজ্য ছিল। পুরুষ একবিবাহ করলেও অন্য নারীর সাথে বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক বজায় রাখতে পারতো।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কলকারখানায় নারী শ্রমিক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেলেও নারীমুক্তির পথ প্রশস্ত হয়নি। পিতৃতন্ত্রের পরিবর্তন তো দূরের কথা, নারীর অধস্তনতা বিদ্যমান এমনকি পরিবারগুলি নারীর দাসত্ব তথা মজুরীবিহীন পারিবারিক শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।[৫৬] মূলত Karl Marx এর মানবতাবাদী দর্শনে পৃথিবীর সকল শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির প্রত্যাশা করা হয়েছে। মার্কসের দর্শন এঙ্গেলস ও লেনিন (Vladimir Lenin 1870-1924) পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করে বলেন, শ্রেণি শোষণের সাথে নারীর উপর শোষণ-নিপীড়ন জড়িত। নারী শোষিত হয় শাসক কর্তৃক, আর এ শাসক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পুরুষ সদস্যরা। তাই পুঁজিবাদের ধ্বংসের মাধ্যমে নারী মুক্তি লাভ করতে পারে। শ্রেণি বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের অবসান ঘটাতে হবে। পুরুষের অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের অবসান হলে তারা আর নারীকে শোষণ ও অত্যাচার করবে না। এ লক্ষ্যে দার্শনিকরা বিশ্বের সকল নারীকে একতাবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। মার্কসীয় মতবাদে নারীকে সামাজিক উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জোর তাগিদ প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে Tong বলেন,

> Marxist Feminists more than any other group of feminists, have made woman's economic well-being and independence their primary concern and have focused on the intersection, between women's experience as worker and their position in the family.[৫৭]

---

[৫৫] কনক মুখোপাধ্যায়, *নারী মুক্তির প্রশ্নে মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিন*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, পৃ. ৩৮

[৫৬] *ঐ*, পৃ. ২৫-২৬

[৫৭] Rosemarie Putnam Tong, *op.cit.*, p. 11

তাই নারীকে গৃহ অভ্যন্তরের অনুৎপাদনশীল কাজ থেকে মুক্তি দিতে হবে অথবা ঘরের কাজে নারীর সাথে পুরুষকেও সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন হবে সমনাধিকারের ভিত্তিতে এবং অর্থনৈতিক দাসত্বমুক্ত। পুঁজিবাদ, শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণ মুক্ত সমাজে নারী থাকবে স্বাধীন।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ : সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী ভাবধারা মার্কসীয় নারীবাদী বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল পরিলক্ষিত হয়। এ নারীবাদী প্রবক্তাগণও বিশ্বাস করেন যে, বর্তমান সমাজে প্রচলিত বুর্জোয়া ব্যবস্থাই নারীর অধস্তন অবস্থার জন্য দায়ী। যে সমাজে ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সম্পদ উৎপাদন করে, কিন্তু গুটিকয়েক শক্তিশালী লোক তা অধিকার করে নেয়, সে সমাজে কেউ বিশেষ করে নারী সত্যিকারভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। তাই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস না করলে নারীমুক্তি সম্ভব নয়।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী ভাবধারার অন্যতম প্রবক্তা Alison Jaggar (1942) বলেন, সমাজতন্ত্রী নারীবাদে মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ তত্ত্বের সংশোধিত ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নারী নিপীড়ন ব্যাখ্যা করে।[৫৮] তাই বলা যায় মার্কসীয় মতবাদের মূল বিষয়গুলি কিছুটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও পরিমার্জন করে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীবাদের ব্যাখ্যায় সমাজতন্ত্রী প্রবক্তাগণ দুটি রীতি যথা-১. দ্বৈত-ব্যবস্থা তত্ত্ব (Dual-Systems Theory) এবং ২. একীভূত ব্যবস্থাতত্ত্ব (United System Theory) প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। দ্বৈত ব্যবস্থা তত্ত্বে বলা হয় পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্র সামাজিক সম্পর্ক ও স্বার্থের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। যখন এ দুটি কাঠামো পরস্পর যুক্ত হয় তখন মারাত্মকভাবে নারী নিপীড়নের স্বীকার হয়।

Juliet Mitchell (1940-) *Woman's Estate* এবং *Psychoanalysis and Feminism* গ্রন্থদ্বয়ে মার্কসীয় নারীবাদে নারীকে শুধু পুঁজিবাদ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার বিরোধিতা করেন। মিশেল বলেন নারীর কার্যাবলী এবং প্রজনন, সন্তানের সামাজিকীকরণ ও যৌনতায় যৌথ ভূমিকা দ্বারা নির্ধারিত হয়।[৫৯] তিনি বিশ্বাস করেন, নারী জীবনের কিছু উপাদান অর্থনৈতিক, কিছু দৈহিক-সামাজিক (Bio-Social) এবং কিছুটা আদর্শিক (Ideological)। তাই উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটলেও নারীর সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। আর এ জন্য পুঁজিবাদ ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে পিতৃতন্ত্র নসাৎ না হলে নারী নিপীড়ন চলতে থাকে।

---

[৫৮] বাসবী চক্রবর্তী, *নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা*, রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পাদিত), প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, পৃ. ৪৭

[৫৯] Rosemarie Putnam Tong, *op.cit.*, p. 176

মিশেল মনে করেন সমাজে নারীর অগ্রগতি অনেকটা ধীর। কারণ সমাজের সাথে নারীর প্রজনন, যৌনতা ও সন্তানের সামাজিকীকরণ জড়িত। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি অর্থনৈতিক একক হিসেবে পরিবারের সমাপ্তি ঘটালেও তা আদর্শগত ও দৈহিক সামাজিক একক হিসেবে পরিবারে উন্নতি ঘটাতে পারে না। এ পরিবারের মানুষের মনস্তত্ত্বে নারী নিপীড়ণের মূল কারণ নিহীত। তাই মানুষের মনস্তত্ত্ব যে শক্তি প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে তাতে অর্থনৈতিক বিপ্লবের মতো বিপ্লব ব্যতীত নারী নিপীড়ন বন্ধ হবে না।[৬০] কাজেই নারীর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, ভোটাধিকারসহ নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারিত করতে হবে। পাশাপাশি পুঁজিবাদ ও পুরুষতন্ত্র উভয়কেই সমাজ হতে অপসারণ করতে ঘটাতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের অন্য একজন প্রবক্তা Heidi Hartman (1945-) *Women, Work and Poverty* গ্রন্থে পুরুষতন্ত্রের বস্তুগত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন নারীবাদী বিশ্লেষণের মূল বিষয় নারী-পুরুষ সম্পর্ক যা মার্কসবাদে অনুপস্থিত।[৬১] তিনি শুধু উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে নারী নিপীড়নের ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী নন। কেননা বাস্তবে সকল নারী উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত নয়। তথা সকল নারী শ্রমজীবী নয়, কিন্তু তাঁরা কোনো না কোনোভাবে নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। আবার পরিবার ও পরিবারের বাইরে নারী পুরুষের অধীনে থাকে। তাই নারী পুরুষের সম্পর্ক বোঝার জন্য পুঁজিবাদের সাথে পিতৃতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। Heidi Hartman এর মতে, পিতৃতন্ত্র নারীর শ্রমশক্তির উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টিকে আছে। তাঁর নিকট পুরুষতন্ত্র হচ্ছে 'পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের একটি সেট (Set)' যার বস্তুগত ভিত্তি আছে এবং এটা পদক্রমিক হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে। যা তাদেরকে নারীর উপর প্রভূত্ব করতে সক্ষম করে।[৬২] Heidi বলেন, নিজস্ব শ্রমশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণহীনতা নারী নিপীড়নের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। পুঁজিবাদ যেমন শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, ঠিক একইভাবে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহবোধ করে। তাই পুঁজিবাদ ও পিতৃতান্ত্রিক পৃথকভাবে প্রতিহত করতে হবে, তবেই নারীমুক্তি ঘটবে।

---

[৬০] মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬

[৬১] রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮

[৬২] Heidi Hartman, "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a more Progressive Union," Lydia Sargent (ed.), *Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism,* South End Press, Boston, 1981, p. 14; উদ্ধৃত, মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭

অন্যদিকে একীভূত ব্যবস্থার তাত্ত্বিকরা পুঁজিবাদ ও পুরুষতন্ত্রকে ভিন্ন আঙ্গিকে নয় বরং এক ও অভিন্ন ধারণার মধ্যে বিশ্লেষণ করেন। এ মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা Iris Marion Young (1949-2006) "Socialist Feminism and the Limits of Dual System Theory" এবং "Beyond the Unhappy Marriage : A Critique of the Dual System Theory" প্রবন্ধদ্বয়ে নিজের মতামত উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শ্রেণি বিশ্লেষণের চেয়ে শ্রম বিভাজন বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। কারণ শ্রেণি বিশ্লেষণ উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদন সম্পর্কের বিশ্লেষণ করে তথা সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে। কিন্তু শ্রমবিভাজন বিশ্লেষণ সমাজে উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তি মানুষদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে এ তত্ত্বটি মার্কসীয় তত্ত্বের চেয়ে নারী অধস্তনতার কারণ সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে।[৬৩] উল্লেখ্য Alison Jaggar *Feminist Politics and Human Nature* গ্রন্থে একীভূত ব্যবস্থাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

এককথায় সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ শুধু পুঁজিবাদ বা পুরুষতান্ত্রিকতা নয় সম্পূর্ণ সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের জোর দাবি জানায়।

অস্তিত্ববাদী নারীবাদ : বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও দার্শনিক Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-1980) এর ঘনিষ্ট সহযোগী Simone de Beauvoir (1908-1986) অস্তিত্ববাদী নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা। ১৯৪৯ সালে রচিত *Second Sex* গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন সমাজ পুরুষকে ইতিবাচক ও নারীকে নেতিবাচক (দ্বিতীয় লিঙ্গ) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বোভোয়ার মত প্রকাশ করেন, পুরুষ হলো আত্ম (self) এবং নারী হচ্ছে 'অপর' (other)। অপর আত্মের জন্য হুমকীস্বরূপ তথা নারী পুরুষের কারণে বিপদগ্রস্থ।[৬৪] বেভোয়ার নারী ও পুরুষে পার্থক্যের ক্ষেত্রে সন্তান জন্মদানের বিষয়টি উল্লেখ করেন। সন্তান ধারণের ক্ষমতা প্রকৃতিগতভাবে শুধু নারীরই আছে। আবার সন্তান জন্মদান করে বলেই নারী, পুরুষ হতে পৃথক সত্ত্বায় পরিণত হয়। তবে নারী পুরুষ হতে খানিকটা পৃথক হলেও তাঁরা পুরুষ হতে অধস্তন নয়।

অষ্ট্রিয়ার স্নায়ুবিদ এবং মনোসমীক্ষণবিদ Sigmund Freud (1856-1939) মনে করেন যে, নারীর শরীর পুরুষের মতো নয়। কাজেই সমাজে কর্তৃত্ব করার মতো ক্ষমতা নারীর নেই, এজন্য নারী

---

[৬৩] *ঐ*, পৃ. ৩৪

[৬৪] Rosemarie Putnam Tong, *op.cit.*, p. 179

সামাজিকভাবে অধঃস্তন।[৬৫] কিন্তু বোভেয়ার এ বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, নারীর শরীর পুরুষের মতো না হলেও সমাজ পুরুষকে যে সকল সুযোগ সুবিধা দিয়েছে নারীকেও তা দিতে হবে। এর জন্য শারীরিক পার্থক্য কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে না। বোভোয়ার মার্কসবাদী ধারণারও সমালোচনা করে বলেন, পুঁজিবাদের উৎখাত ঘটালেই যে সমাজে নারী–পুরুষ সমতা আসবে এমন ধারণা ভুল। কেননা পুরুষ কর্তৃক সমাজে নারীকে অধস্তন ভাবার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে পুরুষের মস্তিস্কে গেঁথে আছে। এ প্রসঙ্গে পুরুষ কতিপয় অযৌক্তিক বিষয়কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে নারীকে নীচু করে রাখার জন্য।

দীর্ঘদিন হতে নারীকে পুরুষ স্বকীয় সত্ত্বা হিসেবে নয় বরং একটি যৌনসত্তা হিসেবে দেখতে পছন্দ করে। তাঁরা (পুরুষ) নারীকে দ্বিতীয় সত্তা ভাবে। বোভোয়ার বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, কিভাবে নারী কোনো রকম প্রতিবাদ না করে, বিষয়টি মেনে নিয়ে সুখ অনুভব করে। নিজ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পুরুষের বিপরীতে পরমসত্তা হিসেবে নিজেকে দাঁড় করানোর মতো বাস্তব কোন উপায় নারী খুঁজে পায় না। নারীর কোনো অতীত নেই, কোনো ইতিহাস নেই এবং কোনো ধর্ম নেই। নারী নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের দ্বারা পিতা বা স্বামীর সাথে যুক্ত আর এজন্য নারী পিতৃতন্ত্রকে নস্যাৎ করার কথা ভাবতে পারে না।[৬৬] মূলত নারী একরকম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে, পিতৃতন্ত্র ধ্বংস হলে তাঁরা যদি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে না পারে। আসলে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা নারীকে দুর্বলচিত্তের করে গড়ে তুলেছে। বোভোয়ার এসব অবাস্তব চিন্তাভাবনা থেকে নারীকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সামাজিক ভূমিকা স্পষ্ট করার মধ্যদিয়ে নারীকে 'অপর' (other) নয় বরং 'আত্ম' (self) হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে সমাজ 'নারী' শব্দটিকে অত্যন্ত দুর্বল ও নিকৃষ্ট জীব হিসেবে পরিগণিত করেছে। বোভোয়ার বলেন, কেউ নারী হয়ে জন্মায় না বরং কন্যা শিশু জন্মের পর থেকেই সমাজ তাকে শেখাতে থাকে সে নারী, অর্থাৎ পুরুষের চেয়ে অধিকতর নিকৃষ্ট প্রাণী। তিনি অভিযোগ করেন নারী ও পুরুষের মধ্যে গভীর ভালোবাসা থাকলেও বিবাহ প্রথার নিয়ম-কানুনে কর্তব্য ও অধিকার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ করে দেখানো হয়, যা দ্বারা বিয়ের মাধ্যমে নারী পুরুষের দাসীতে পরিণত হয়। আবার

---

[৬৫] হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯

[৬৬] Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, (ed. Alice S. Rossi), 'The Feminist Papers: From Adams to de Beauvoir', Northeastern University Press, Boston, p. 675

গর্ভধারণের মাধ্যমে নারী তার নিজের সত্তা হারিয়ে 'সন্তানের মা' পরিচয়ে পরিচিত হয়। তাই স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকা নারীর স্বাধীন সত্তা বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে।[৬৭] অন্যদিকে কর্মজীবী নারী ও নারীত্বের বেড়াজালে আরো বেশি বন্দি হয়ে যায়। সমাজ প্রত্যাশা করে কর্মজীবী নারী সারাক্ষণ আদর্শ নারী হয়ে থাকবে এবং নারীর সামাজিক কাজগুলি আরো বেশি গুছিয়ে সম্পন্ন করবে। তাই কর্মজীবী নারী কর্মক্ষেত্র ও সমাজ-দুটি জায়গাতে মানিয়ে চলতে এক প্রকার পরাধীন জীবন অনুভব করে।

তাই নারীর উচিত নিজেকে নিয়ে নতুন করে ভাবা বা স্বপ্ন দেখা। নিজের ও সমাজের কল্যাণের জন্য নারীকে Second Sex (দ্বিতীয় লিঙ্গ) বা 'অপর' (other) নয় বরং নিজেকে 'আত্ম' (self) বা subject হিসেবে বিকশিত হতে হবে। এজন্য নারীকে 'পিতৃতান্ত্রিক' সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হতে হবে এবং নিজেদের দাবি-দাওয়া ও অধিকারের কথা বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করতে হবে।[৬৮] বোভোয়ার অভিমত জ্ঞাপন করেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নারীকে অর্থ উপার্জন করতে হবে, বেশি পরিশ্রম হলেও ঘরের কাজ করতে হবে-এভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়। আবার নারীকে লেখনীর মাধ্যমে নিজেদের অসুবিধার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবে এবং সর্বোপরি সমাজ পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন (Social Movement) করতে হবে।

সাংস্কৃতিক নারীবাদ : আদিকাল হতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে শারীরিক পার্থক্যের দোহাই দিয়ে দুর্বল ভেবে সমাজে নারীর ভূমিকাকে নেতিবাচক গণ্য করা হয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক নারীবাদের প্রবক্তাগণ সমাজে নারীর বৈশিষ্ট্যকে ইতিবাচক ভূমিকায় তুলে ধরেন। এ মতবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক Sarah Margaret Fuller Ossoli (1810-1850), *Woman in the Nineteenth Century* (1843) গ্রন্থে অভিমত জ্ঞাপন করেন, নারীর মধ্যে কতিপয় গুণ আছে যা পুরুষের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত। এসব গুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ধৈর্য্য, সেবা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, ধীরতা, মাতৃত্বসুলভ বিষয় প্রভৃতি। নারীর প্রকৃতি অসিংহ এবং পুরুষের প্রকৃতি আক্রমণাত্মক। এজন্য একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী পরিবার গঠনের জন্য প্রয়োজন নারীর গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।[৬৯] মার্গারেট ফুলার মনে করেন, নারীর অভ্যন্তরীণ গুণাবলির চর্চা অব্যাহত থাকলে তাঁর দুরদৃষ্টির বৃদ্ধি ঘটবে এবং সমাজের মঙ্গল বয়ে আনবে। তবে একটি

[৬৭] *Ibid*, p. 679

[৬৮] *Ibid*, p. 680

[৬৯] Margaret Fuller, *Woman in the Nineteenth Century*, Brown, Taggard and Chase, Boston, 1860 (Originally Published in 1845), p. 101; রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২

বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, সাংস্কৃতিক নারীবাদে সমাজে পুরুষের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ এ মতবাদের প্রবক্তাগণ নারীকে তাঁর গুণের বৃদ্ধি ঘটানোর উপর বেশি গুরুত্ব দেন। অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা দ্বারা নারী পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে বলে অভিমত দেওয়া হয়। অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তিত করতে পারলেই প্রকারান্তে সমাজে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে শুধু শারীরিক অবস্থায় নারী হওয়ার কারণে অর্থাৎ সন্তান জন্মদান, সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব নেওয়ার মধ্যদিয়ে নারীকে পুরুষের চাইতে ভিন্ন শ্রেণির মনে করা অন্যায়। উপরন্তু এসবের মধ্যদিয়ে নারীর অন্তর্গত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। যা আগ্রাসন, হিংস্রতা ও যুদ্ধবাদের পরিত্যাগ ঘটায়। নারী বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য Carol Gilligan (1936) জন্ম নিয়ন্ত্রণ, গর্ভধারণ ও গর্ভপাত বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি বলেন এ শরীরবৃত্তীয় বিষয়গুলি একান্তভাবে নারীর সাথে সংশ্লিষ্ট কেবল তা নয়, এগুলি নারী স্বাধীনতাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খর্ব করে ও নিয়ন্ত্রণ করে। নারীর কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করে, এমনকি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও অনেক সময় হরণ করে। অন্যদিকে নারী বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক সামর্থ্যের বলীয়ান। তাই নানা প্রতিবন্ধকতা থাকলেও নারী পুরুষের ন্যায় নৈতিক দ্বন্দ্ব সমাধান করতে সক্ষম।[৭০]

মূলত সাংস্কৃতিক নারীবাদ সমাজে নারী-পুরুষ দ্বন্দ্ব নিয়ে গভীরে অনুসন্ধান করে এবং প্রয়োজনমত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস ব্যক্ত করে।

পরিবেশ নারীবাদ : পরিবেশ নারীবাদ বা Ecofeminism শব্দটি সর্বপ্রথম Francoise d'eaubonne (1920-2005) বা ফ্রাঁসোয়া দোবান সর্বপ্রথম *Feminism or Death* নামক রচনায় ব্যবহার করেন। পরিবেশ বিপ্লব ঘটানোর কাজে নারীর ক্ষমতা আছে সে বিষয়টি এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।[৭১] এ মতবাদে কেবল নারীকে প্রকৃতির সাথে এবং পুরুষকে সংস্কৃতির সাথে তুলনা করা হয় না, বরং নারী-পুরুষ উভয়কে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। তাত্ত্বিক Val Plumwood (1939-2008) *Feminism and the Mastery of Nature* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, প্রকৃতি যেমন সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে, গ্রহণ করে, আত্মস্থ করে, সেরকম নারী ও পুরুষ উভয়ে প্রকৃতির সাথে একীভূত হয়ে

---

[৭০] রাশিদা আখতার খানম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯-৫৭

[৭১] Karen J. Waren, 'Introduction', K.J Waren (ed.), *Ecological Feminism,* Routledge, London and New York, 1994, p. 1; Joseph R. Desjardins, *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*, Wardsworth Publishing, New York, 1997, p. 237

বৈষম্যবাদী সাংস্কৃতিক অবস্থার বিলোপ ঘটাতে সক্ষম হয়।[৭২] আবার পরিবেশ নারীবাদ নিম্নোক্ত বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা-

প্রথমত : নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার নিপীড়নের সাথে প্রকৃতির উপর আধিপত্য ও শোষণের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : পুরুষতন্ত্রে নারীকে প্রকৃতি এবং পুরুষকে সংস্কৃতির সাথে তুলনা করা হয়। বাস্তবে সংস্কৃতিকে প্রকৃতির চেয়ে বড় করে দেখা হয়, তাই নারীকে পুরুষের অধস্তন ভাবা হয়।

তৃতীয়ত : নারী এবং প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা যায়।

চতুর্থত : নারীবাদী ও পরিবেশবাদী আন্দোলন একযোগে পরিচালিত হতে পারে এবং এভাবে সমাজের নানা অসঙ্গতি দূর হতে পারে।[৭৩]

Karen J. Warren (1947) *Ecological Feminism* গ্রন্থে নারীর সমস্যাগুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। নারীর সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে তার সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে হবে। পরিবেশের সাথে নারীর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষ পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায় লাগামহীনভাবে। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা প্রকৃতপক্ষে নারী সম্পর্কে মানুষকে যত্নশীল করে তুলবে। পরিবেশ ও নারী উভয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। তাই পরিবেশ নারীবাদীরা মনে করেন, পরিবেশ এবং নারী উভয়কেই রক্ষা করতে হবে।

উত্তর আধুনিক নারীবাদ : উত্তর আধুনিক নারীবাদের প্রবক্তাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Jacques Lacan (1901-1981), Michel Foucault (1926-1984), Jacques Derrida (1930-2004), Luce Irigaray (1930-), Helen Cixous (1937-), Julia Kristeva (1941-) প্রমুখ। এ সকল তাত্ত্বিকেরা মনে করেন আধুনিকতার সাথে পুরুষতন্ত্রের সম্পর্ক রয়েছে, তাই এটি বাতিল না করলে নারীমুক্তি ঘটবে না। আধুনিক চিন্তা-চেতনার মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য অর্থাৎ নারী-পুরুষ ভিন্নতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করলেই নারীমুক্তি পাবে না। তাই

[৭২] রাশিদা আখতার খানম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫

[৭৩] মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫; রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা নারীর নানা অধিকার অর্জনে সহায়ক হলেও চিন্তা কাঠামোতে কোন পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে।[৭৪] নারীকে সনাতন চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করতে হবে এবং ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় মনোযোগী হতে হবে।

উত্তর আধুনিক নারীবাদীরা মনে করেন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে তারা শাসক শ্রেণি এবং যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে না তারা শাসিত বা অধস্তন শ্রেণি। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে শোষিত হয়েছে নারী। তাদের মতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক মূলত রাজনৈতিক এবং পুরুষতন্ত্রের মূল ভিত্তি ক্ষমতা বা শক্তি। এজন্য পুরুষতন্ত্রকে ভেঙ্গে দিতে হবে, পাশাপাশি নারীকে সাহসী করে গড়ে তুলতে হবে। দার্শনিক Helen Cixous মনে করেন, যৌনতা ও ভাষাগত উভয়দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।[৭৫] তিনি আরো মনে করেন পুরুষের রচিত সাহিত্য, নারী কর্তৃক লিখিত সাহিত্যের উপর আধিপত্য করে। তিনি সমালোচনা করে বলেন পুরুষের লেখায় যুগলের (একটি পুরুষ ও আরেকটি নারী) সৃষ্টি করে। যেমন- চন্দ্র/সূর্য, উঁচু/নিচু, মুক্তি/বন্দি, প্রভৃতি বিপরীতার্থক ধারণা পুরুষ ও নারীকে পৃথক হিসেবে নির্দেশ করে। এভাবে পুরুষ মনে করে নারী তাদের ছাড়া অচল। অর্থাৎ পুরুষ ব্যতীত নারীর নিজের কোন অস্তিত্ব নেই। আর এজন্য নারীকে সাহিত্য রচনা করতে হবে এবং এমন বিষয় নির্ধারণ করবে যার মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রূপান্তর ও পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হবে। এভাবে পুরুষতন্ত্রে পরিবর্তিত বিপরীত ধারণার জন্ম হবে এবং নারীমুক্তি সম্ভব হবে।

উত্তর আধুনিক নারীবাদী ও মনোবিশ্লেষক Luce Irigaray (লুই ইরিগারে) মনে করেন, একজন নারী ও পুরুষের ভাবনার জগতে তথা কল্পনার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। তাই নারীর বন্দিত্ব, নারীমুক্তি ও নারীমুক্তির কৌশল ইত্যাদি তাঁর রচনায় গুরুত্ব পায়। উল্লেখ্য ইরিগারে নারীমুক্তির তিনটি কৌশলের কথা উল্লেখ করেন, যা নারী সাহিত্য রচনার মাধ্যমে অবলম্বন করতে পারে। যথা-

> ১। প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ (Word)ই পুরুষতান্ত্রিক। তাই ভাষার প্রকৃতির প্রতি নারীকে নজর দিতে হবে।
>
> ২। নিজেদের মুক্তির জন্য নারী তাদের কথা বলার ধরণ ও চিন্তা করা বিষয়টি পরিচর্যা করবে।

---

[৭৪] *ঐ*, পৃ. ৪৭

[৭৫] Maggie Humm, *Feminism : A Reader*, Routledge, London and New York, 1992, p. 134

৩। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নারী মূকাভিনয়ের কৌশল তথা পুরুষের সামনে নিজের প্রতিকৃতিকে বড় করে তুলে ধরতে পারে।[৭৬]

দার্শনিক ও মনোসমীক্ষণবিদ Julia Kristeva মত প্রকাশ করেন যে, নারী বলতে কিছু নেই (Women as such does not exist)। 'একজন নারী' (one is a women) বিশ্বাসটি 'একজন পুরুষ' (one is a man) বিশ্বাসটির মতো প্রায় হাস্যকর ও অস্পষ্ট। কাজেই 'আমরা নারী' (we are women) কথাটি আমাদের দাবির জন্য বিজ্ঞাপন বা স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করি। তাই মূল কথা একজন নারী হতে (be) পারে না; এমনকি হওয়ার (being) প্রক্রিয়াতেও থাকে না।[৭৭] উত্তরাধুনিক নারীবাদের প্রবক্তাগণ নারী সংশ্লিষ্ট সকল পুরাতন ধ্যান-ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন একটি অগ্রসরমান ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছেন যার মাধ্যমে নারীসমাজ সংস্কৃতিতে তাদের বিশেষ স্থান দখল করতে পারেন।

এভাবে সুপ্রাচীনকাল হতে নারীর সামাজিক অবস্থানগত বিষয় নিয়ে নানা রকম মতবাদের সূত্রপাত ঘটেছে। নারী যে মানুষ এবং মানুষ হিসেবে পুরুষের ন্যায় নানা প্রকার অধিকার ভোগ করার দাবিদার সে কথাটি বিভিন্ন লেখনী, তত্ত্ব ও মতাদর্শের মাধ্যমে লোকচক্ষুর সম্মুখে উঠে এসেছে। পাশ্চাত্য সমাজের নারী জাগরণ ও আন্দোলনের ঢেউয়ের ছোয়া উনিশ শতকে ভারতবর্ষ তথা বাংলার সমাজে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকাল হতে বাংলার নারী নানাভাবে অধিকার বঞ্চনার শিকার হতে থাকে এবং ব্রিটিশ শাসনামলে এ অবস্থার চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে। পরবর্তীতে উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্রাহ্ম ও হিন্দু মনীষীর প্রচেষ্টায় নারীর বিভিন্ন অধিকার প্রদান লক্ষ্য করা যায়। এসকল বাঙালি সমাজ সংস্কারক পাশ্চাত্য জগতের নারীবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়। উল্লেখ্য বাংলায় উদারনৈতিক নারীবাদী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। পরবর্তীতে বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর নানা রকম অধিকার প্রদান শুরু হয়। বিশ শতকের শুরুতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীজাগরণ ও আন্দোলনে কাজ শুরু করেন। রোকেয়া উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক নারীবাদী ভাবধারা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলায় সমাজতন্ত্রের প্রভাব বিস্তার করায় এসময় মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী ভাবধারায় অনুপ্রবেশ ঘটে। এরপর বাংলার নারী ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয় এবং বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

---

[৭৬] মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০

[৭৭] Kristeva has been Quoted in *Feminist Thought, op. cit.*, p. 230; *ঐ*, ৫১

গ্রন্থ পর্যালোচনা : বর্তমান সময়ে নারী বিষয়ক অধ্যয়ন বিশেষ বিভাগ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালসমূহে পড়ানো হচ্ছে। তাই নারী বিষয়ক গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূত্রপাত করেছে। নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন, শিক্ষার বিকাশ ও অগ্রগতি, অর্থনীতিতে ভূমিকা পালন এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা লক্ষণীয়। আবার বিশ শতকে বাংলায় নারী জাগরণে যে সকল নারী বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের কয়েকজনের (অতি নগণ্য সংখ্যক) নামে পৃথকভাবে গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণায় ব্যক্তি নারীর সমাজ প্রগতিতে ও নারী উন্নয়নে নানা কার্যক্রম উঠে এসেছে। তবে এসকল গবেষণা নারী জাগরণ ও আন্দোলনের মূল স্রোতধারায় সুসংগঠিতভাবে স্থান পায়নি। কেননা এসব গ্রন্থগুলির অধিকাংশই বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণ মূলক নয়। আবার উল্লিখিত সময়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিচ্ছিন্ন কিছু গবেষণা লক্ষ্য করা যায়। তবে এসকল গ্রন্থ বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের পটভূমি কিভাবে রচিত হয়েছিল, নারী কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে সচেতন হয়েছিল, নারী জাগরণের জন্য তারা কিরূপ পন্থা অবলম্বন করেছিল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনের ইতিহাসে গোলাম মুরশিদ একজন প্রতিষ্ঠিত গবেষক। তিনি নারী বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এরমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো *Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905* যা ১৯৮৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য গ্রন্থটি পরবর্তীতে লেখক কর্তৃক বাংলায় অনুদিত হয়ে *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* শিরোনামে ১৯৮৪ সালে প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে লেখক আলোচনা করেছেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অভিজাত পরিবারে নারী সম্পর্কে যে নতুন সচেতনতা জন্ম নেয় তা দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভদ্রলোকেরা নারীশিক্ষার প্রচলন করে যা নারীর আধুনিকায়নের পূর্বশর্ত। এরপর পুরুষসমাজ কিভাবে নারীকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে বাইরের জগতে নিয়ে এসে সামাজিক কার্যক্রমে তাদেরকে সংযুক্ত করে পরিবারে নারীর মর্যাদার উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং সবশেষে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতি নারীর প্রতিক্রিয়া নিরূপিত হয়েছে। উল্লেখ্য গ্রন্থটির সময়সীমা ১৯০৫ সাল পর্যন্ত হওয়ায় এখানে বিশ শতকের ইতিহাস বিবৃত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি।

পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনের ইতিহাসে গবেষক মালেকা বেগম একজন পথিকৃত লেখক। তাই পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের প্রতিথযশা নেত্রী মালেকা বেগম রচিত *নারীমুক্তি আন্দোলন* গ্রন্থটির কথা উঠে আসে। গ্রন্থটি ১৯৮৫ সালে

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। এখানে আদিম যুগে নারী পুরুষের সম্পর্ক বা গোত্রপ্রথায় নারীর প্রাধান্যের দিক আলোচিত হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে সমাজ পরিবর্তনের সাথে নারীর সার্বিক অবস্থার পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজে নারী ভাবনার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পরিশেষে ১৯৭৯ সালের নারী অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের সনদের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত আকারে এবং মাত্র ৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হলেও গ্রন্থটি নারীমুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার একটি শক্তিশালী সংযোজন।

বিদগ্ধ নারী গবেষক মালেকা বেগম রচিত আরেকটি গ্রন্থ *বাংলার নারী আন্দোলন* (১৯৮৯)। বইটি বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ গ্রন্থের শুরুতে প্রাচীন কাল থেকে উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষ তথা বাংলার সমাজে নারীর জীবনযাত্রা এবং সমাজে তাদের অবস্থান কেমন ছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকে নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন মনীষীরা। আবার এসময় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বাঙালি নারীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ তথা ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্তি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, নানা প্রকার নারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা এবং দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসনামলে নারী আন্দোলনের গতিধারা আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের নতুন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে গ্রন্থটির সমাপ্তি টানা হয়েছে। তবে গ্রন্থটিতে সুদীর্ঘকালের ঘটনাবহুল ইতিহাস বর্ণনার পরিসর সংক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছে।

পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন সম্পর্কে জানার অন্যতম গ্রন্থ *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্যকর্ম*। গ্রন্থটির লেখক মোহাম্মদ শামসুল আলম। এটি ১৯৮৯ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। তিনটি অধ্যায়ে লিখিত বইটির প্রথম অধ্যায়ে উনিশ শতকের নবজাগরণ ও নারীমুক্তি সম্পর্কে বাঙালি সমাজের ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিকুল পরিবেশে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক নারীশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমের বিষয় উঠে এসেছে। শেষ অধ্যায়ে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও অবরোধপ্রথার মধ্যে থেকে মেয়েদের জাগরিত করার প্রয়াসে রোকেয়ার লেখনীসত্ত্বা তুলে ধরা হয়েছে। এটি জীবনীমূলক গ্রন্থ হলেও পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণায় এ গ্রন্থটি একটি অপরিহার্য উপাদান। তবে এটি পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়।

এরূপ আরেকটি গ্রন্থ তাহ্‌মিনা আলম রচিত *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তা চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম*। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থ হতে বিশ শতকের প্রথমদিকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়ার নানা কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।

পূর্ব বাংলার নারী বিষয়ক গবেষক গোলাম মুরশিদ রচিত অন্যতম গ্রন্থ *নারী প্রগতির একশো বছর রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* (১৯৯৩)। গ্রন্থটিতে কয়েকজন বাঙালি নারী যেমন- রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, তাহেরন নেছা প্রমুখ যারা উনিশ শতকে নারী জাগরণে কাজ করেছেন তাদের কথা বিবৃত হয়েছে। সবশেষে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবন ও কর্মকাণ্ডের আলোচনা লক্ষণীয়। এ বইটির মাধ্যমে নারী জাগরণে ব্যক্তি নারীর ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়। তবে এর পরিসর বা ব্যাপ্তি খুবই স্বল্প।

কনক মুখোপাধ্যায় রচিত এবং কলকাতা থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা* গ্রন্থটি এখানে উল্লেখযোগ্য। লেখক ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। তিনি *মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি* গঠনের উদ্দেশ্য এবং এর কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থী নারীর ভূমিকা এখানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার অন্যতম একটি গ্রন্থ সোনিয়া নিশাত আমিন রচিত *The World of Muslim Women in Colonial Bengal 1876-1939*. গ্রন্থটি লেখকের পিএইচডি অভিসন্দর্ভ। ১৯৯৬ সালে এটি নিউইয়র্ক থেকে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। (উল্লেখ্য ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি পাপড়ীন নাহার *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেন, যা ২০০২ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়)। এটি বাংলার নারী সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকাতে উনিশ শতকে বাংলায় অভিজাত মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা, সে সমাজে নারীর মর্যাদা এবং সামাজিক আধুনিকীকরণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন, বাংলার সনাতন ব্যবস্থায় পরিবার প্রথা, বিবর্তনশীল পরিবার ব্যবস্থায় মাতৃত্বকে কিভাবে দেখা হচ্ছে তার বিশদ বিশ্লেষণ দেখা যায়। পঞ্চম অধ্যায়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্ভব, বাংলায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং নারীশিক্ষার প্রতি বাঙালি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। এরপর সমসাময়িক মেয়েদের সাহিত্যচর্চা এবং সমকালীন সাহিত্যে নারীকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নবম অধ্যায়ে

উপসংহার দিয়ে গ্রন্থটির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এ গ্রন্থটিও বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলনকে পুরাপুরি বুঝানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

বাংলার নারী বিষয়ক আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক রচিত *আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস* (২০০১)। গ্রন্থটিতে তিনশত বছরের তথা আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালি নারীর ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থে তিন শতকের বাঙালি নারীর জীবন সংগ্রামের ইতিহাস তথা অবরোধপ্রথা, সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সমস্যাগুলি তুলে ধরে নারীশিক্ষার প্রয়েজনীয়তায় বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে রাজনীতি এবং নানামুখি আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরা হয়েছে। একটি বইয়ে তিনশত বছরের ঘটনাবহুল ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লেখা দুরূহ, তাই এখানে দীর্ঘ সময়ের বাঙালি নারীর ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লক্ষণীয়।

মালেকা বেগম রচিত নারী *আন্দোলনের পাঁচ দশক* (২০০২) গ্রন্থটি একটি তথ্যবহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। গ্রন্থকার এটিকে আত্মজীবনী বলে স্বীকৃতি দিতে না চাইলেও গ্রন্থটিতে লেখকের জীবনের পশ্চাৎপর্ব, বাস্তব অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত বৈপ্লবিক জীবনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বইটিতে লেখক ১৯৪৭-২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের নারী সংশ্লিষ্ট নানা কার্যক্রমের কথা তুলে ধরেছেন। পঞ্চাশের দশক (১৯৪৭-১৯৬০) এবং ষাটের দশক (১৯৬১-১৯৭০) অধ্যায়ে বাংলার নারী আন্দোলনে সম্পৃক্ততার কথা উঠে এসেছে। উল্লেখ্য গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে।

আনোয়ার হোসেন কর্তৃক নারী আন্দোলনের উপর লিখিত এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১* (২০০৬) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এখানে প্রাক ইসলামি যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নারীর সামাজিক অবস্থা এবং নারী কেন্দ্রিক নানা সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাব, এক্ষেত্রে বর্হিবিশ্ব থেকে বাঙালি মনীষীদের অনুপ্রাণিত হওয়া এবং নারীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রয়াস দেখানো হয়েছে। ধীরে ধীরে মুসলিম মেয়েদের সাহিত্য জগতে প্রবেশ এবং সর্বোপরি তারা বাংলার রাজনীতিতে প্রবেশ করে সে বিষয়টি উঠে এসেছে। সবশেষে অতি সংক্ষেপে দেশ বিভাগোত্তর কালে পূর্ব পাকিস্তানের মেয়েদের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থ থেকে শুধু মুসলিম নারীর নানারূপ কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য বাংলায় নারী জাগরণে মুসলমান নারী ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের নারী এবং পুরুষের অবদান ছিলো লক্ষ্য করার মতো বিষয়।

অদিতি ফাল্গুনী রচনা করেছেন *বাংলার নারী সংগ্রামের ইতিহাস* (২০১০)। গ্রন্থটিতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলায় একের পর এক নারী সংগঠগুলি গড়ে উঠার বর্ণনা রয়েছে। বাঙালি নারীর রাজনৈতিক অভ্যুদ্বয়, কংগ্রেস আন্দোলনসহ ভোটাধিকার সংগ্রাম, বৈপ্লবিক আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহে নারীর লড়াই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ অংশে দেশবিভাগোত্তর কালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা উঠে এসেছে। স্বল্প পরিসরে অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা এ গ্রন্থে লক্ষণীয়। এ গ্রন্থের দুর্বল দিক হচ্ছে এতে নারীর সামগ্রিক সত্ত্বার বিষয়টি অনুপস্থিত।

শাহিদা পারভীন রচিত *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি* (২০১২) গ্রন্থটি এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ গ্রন্থে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও অক্লান্ত কর্মী শামসুন নাহার মাহমুদের জীবন, নারীশিক্ষা ও নারীকল্যাণমূলক কার্যাবলী, বাংলার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং তদানীন্তন সরকারের কাছ থেকে নারীবান্ধব বিভিন্ন অধিকার আদায়ে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আবার শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সেবায় সমকালীন বাংলার নারী সমাজের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এ গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। এটি একটি জীবনী গ্রন্থ হলেও পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন গবেষণায় এ পুস্তকটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা লাভ করার প্রয়াসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গ নারী* (১৩৬১ বঙ্গাব্দ)। এখানে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি নারীর সংগ্রামী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামে বাঙালি নারীর দুঃসাহসিক অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে গ্রন্থটিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলেও নারী জাগরণ ও নারীমুক্তির জন্য তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা নেই বললেই চলে।

অধ্যায় বিন্যাস : 'পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন (১৯০১-১৯৭১)' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের পরিকল্পনার প্রথমে রয়েছে একটি ভূমিকা। সমাজ সৃষ্টির প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আজকের এ সভ্যতা। কিন্তু প্রথমবস্থায় নারীর অগ্রযাত্রা সহজ ছিল না। বিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন শুরু হলে মেয়েরা শিক্ষাসহ নানা অধিকার আদায় করে নিতে থাকে। ধীরে ধীরে বাঙালি নারীর সাহসিকতার বৃদ্ধি ঘটে এবং তারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিতে সফল ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য ভূমিকাতে নারীবাদের নানাপ্রকার তত্ত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : 'বাংলার সমাজে নারী : কালিক সমীক্ষা' শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন কাল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত সময়ে বাংলার মেয়েদের সামাজিক অবস্থান পর্যায়ক্রমিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে সমাজ সৃষ্টির প্রাথমিক যুগে উৎপাদন কাজে নারীর ভূমিকা মুখ্য থাকায় নারী পুরুষ সম অধিকার লাভ করতো। সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী অধিকার হারিয়ে সমাজে তার গুরুত্ব কমতে থাকে। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে অভিজাত পরিবারের নারী ব্যতীত সাধারণ পরিবারের নারীর মর্যাদা খুব একটা ছিলো না। অথচ সংখ্যার বিচারে তারা ছিলেন অধিক।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য হলো 'পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসার : স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিনির্মাণ'। এ অংশে নারী সচেতনতা বা নারী জাগরণের পূর্ব শর্ত নারী শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রাচীন কাল থেকে অর্থাৎ পাল ও সেন আমল এবং মধ্যযুগের সুলতানী ও মুঘল শাসনামলে সীমিত পরিসরে প্রচলিত থাকা নারীশিক্ষার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনে মিশনারিদের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার ধরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন প্রগতিশীল ব্যক্তিদের দ্বারা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং বিশ শতকের শুরুতে ছাত্রীদের নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান করে নারীশিক্ষার প্রচেষ্টা এবং ধীরে ধীরে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো হয়েছে মর্মে বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'উনিশ-বিশ শতকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন : স্বরূপ সন্ধান'। শুরুতে পাশ্চাত্যের নারী জাগরণ ও আন্দোলনের বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। এ আন্দোলনের প্রভাব নিঃসন্দেহে বাংলার সমাজে পড়েছে। আবার উনিশ শতকের রেনেসাঁ বা নবজাগরণের প্রভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মানস জগতে পরিবর্তন ও সমাজ সচেতনতার সৃষ্টি হয়। এসময় দীর্ঘদিন ধরে পশ্চাদ্‌গামী নারীসমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়ে ভাবনা শুরু হয়। তখন বিভিন্ন প্রগতিশীল পুরুষকে নারীশিক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

চতুর্থ অধ্যায় : 'পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন : মুক্তির মন্দির সোপান তলে (১৯০১-১৯৪৬)' শিরোনামে ১৯০১-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলন বিশ্লেষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুরু থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আবির্ভাব এবং দীর্ঘকালব্যাপী নারী জাগরণে তার নানামুখী কর্মপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তিনি মেয়েদের সচেতন করতে শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, নারীকে বন্ধনমুক্তির আহ্বান জানিয়ে লেখালেখি

করেছেন, অন্যদিকে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজকল্যাণে কাজ করেছেন। রোকেয়ার অন্যতম কৃতিত্ব হলো তিনি কিছু সুযোগ্য উত্তরসুরী তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রোকেয়ার আদর্শের অনুসারী এসকল নারী বাংলার সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন এবং তাদের লেখনীর মাধ্যমে নারীর সমস্যাগুলি চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তোরণের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এসময় কয়েকজন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পুরুষের নারী জাগরণের পথে নানা কর্মপ্রচেষ্টা তুলে ধরা হয়েছে। আবার সমসাময়িক পত্রিকাগুলি ছিলো নারী জাগরণের উন্মুক্ত এবং কার্যকরী ক্ষেত্র। তাই নারী প্রগতিতে এসকল পত্র পত্রিকার ভূমিকাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : 'জাগরণ ও আন্দোলনে নারী : সাফল্যের খতিয়ান (১৯৪৭-১৯৭১)'। এ পর্যায়ে ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলনের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাংলার নারীকে আর জাগরিত করার প্রয়োজন পড়েনি। এসময় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করে মেয়েরা বেশ সচেতন হয়েছেন। তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তানের নারী প্রগতির ইতিহাস তুলে ধরে বাঙালি নারীর আধুনিকীকরণের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এসময় মেয়েরা নানা সংগঠন ও সমিতিতে সম্পৃক্ত থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মুখর হয়েছেন। আবার দেশ বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় নারীসমাজ একত্রিত হয়ে পারস্পারিক ভাব বিনিময় তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাঙালি নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এককথায় বিশ শতকের প্রথমভাগে যে নারী জাগরণ ও আন্দোলন শুরু হয় তা এসময় পরিণতি লাভ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বাঙালি নারী : চেতনা ও বাস্তবে' শীর্ষক এ অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তথা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বাঙালি নারীর বহুমাত্রিক ভূমিকার বিষয়টি উঠে এসেছে। স্বদেশী আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ অধ্যায় শুরু হয়ে অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনে নারীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিরূপন করা হয়েছে। আবার গ্রাম বাংলার কৃষক বিদ্রোহে বাঙালি নারীর দুঃসাহসিক ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। দেশবিভাগের পর গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নারীসমাজ রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন তা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীর বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ আমাদের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

সবশেষে লিখিত হয়েছে উপসংহার। এখানে দেখা যায় বিশ শতকের শুরু থেকে বাঙালি নারীর সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। নারীর মানসিক শক্তির উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি ঘটে। তারা সামাজিক ও আইনগত অধিকার অর্জনের সংগ্রামের সাথে সাথে রাজনীতিতে বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানকালের জেন্ডার সমতার দাবি এবং শাসনতন্ত্রে নারী বান্ধব নীতি, নারীর ক্ষমতায়ন- নারীর এ অগ্রসরমান অবস্থানের পথ বিশ শতকের নারী জাগরণ ও আন্দোলনের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

বাংলার সমাজে নারী : কালিক সমীক্ষা

বাংলার সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনধারার যে ভিত্তি শতকের পর শতক ধরে গড়ে উঠেছে তার সম্পূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছে অ্যালপাইন ও আদি অস্ট্রেলিয় জাতির কর্মকাণ্ড ও চিন্তাচেতনার ফলস্বরূপ। পরে আর্য ভাষাভাষী আদি নর্ডিক জনগোষ্ঠীর বিস্তার ঘটলেও তা বাঙালির সমাজ জীবনের উঁচু স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, নানাকারণে গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। আদি নর্ডিক জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আর্যদের আগে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের বসবাস ছিল। সে সময় জাতিভেদপ্রথা ছিল না। বিবাহসহ নানা রকম সামাজিক মিথস্ক্রীয়ার সমন্বয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। দ্রাবিড়দের[৭৮] মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থাতে অন্যদের তুলনায় নারীর প্রাধান্য বেশি ছিল। এদের একদল যেমন নারীর স্বেচ্ছাচার মানত তেমনি উচ্চতর অংশ বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসধর্মকে নারীর ভূষণ বলে মনে করতো।[৭৯] দ্রাবিড়দের মধ্যে নারীর প্রভূত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল, তাই সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। নারী ইচ্ছামত পুরুষ নির্বাচন করে সংসার করতো। নারীর এ প্রাধান্যের কারণে সে সময় বংশ ও অধিকার পুত্রগত ছিল না, ছিল কন্যাগত।[৮০] ক্রমে এদেশে আর্যদের আগমন ঘটে। দ্রাবিড়দের মাতৃতন্ত্রের প্রভাব আর্যদের মধ্যে প্রথমদিকে কার্যকর থাকায় সমাজে নারীর স্থান কিছুটা উচ্চ পর্যায়ে ছিল। তাই আর্য সমাজে এ সময় নারীর মাতৃত্ব ছিল শ্রদ্ধার বিষয়। প্রাথমিক অবস্থায় আর্যসমাজে নারীর সম-অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে বহু তথ্য প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়।[৮১] এমনকি খ্রিস্টপূর্ব আঠারো শতকের শেষভাগে ব্যবিলনের শাসক হাম্মুরাবি (আনুমানিক ১৭৯২-১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আইন সংহিতা প্রণয়ন করেন, যা পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইন। এ আইনে মেয়েদের বিষয়ে বলা হয়েছে, সন্তানের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের কর্তৃত্ব ও অধিকার সমান, নারী উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির মালিক হতে পারবে এবং নিজ সম্পত্তি ইচ্ছামত উইল(দান) করতে পারবে। বিয়েতে পুরুষ নয় বরং নারী যৌতুক পাবে এবং স্ত্রী প্রয়োজনে নিষ্ঠুর স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে। নারী সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে এবং সে বিচারক, কুলপতি,

[৭৮] 'দ্রাবিড়রা' ছিল ভারতবর্ষের ভূমিসন্তান। পরবর্তীতে আর্যরা এসে দ্রাবিড়দের পরাজিত করে। পূরবী বসু, *প্রাচ্যে পুরাতন নারী*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৯

[৭৯] ক্ষিতিমোহন সেন, *প্রাচীন ভারতে নারী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থমালা, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৮২-৮৫

[৮০] *ঐ*, পৃ. ৮২-৮৫

[৮১] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২

সাক্ষী ও করণিক হতে পারবে বলে আইনে প্রয়োজনীয় বিধান রাখা হয়। ফলে সহজেই অনুমান করা যায় তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ে ছিল।[৮২]

অন্যদিকে *বেদ* এর মন্ত্রে কোন কোন পণ্ডিত মেয়েদের অধিকার না দিলেও জানা যায় বহু বেদমন্ত্র নারী কর্তৃক রচিত।[৮৩] বৈদিক যুগে নারী পৈতা (উপনয়ণ) গ্রহণ করতেন ও পুরোহিত হতেন। গার্গী, অপলা, মৈত্রেয়ী, শতরুপা, মদালসা, ঘোষা, লোপামুদ্রা, লীলাবতী, কাক্ষীবতী, বাক ব্রহ্মবাদিনী, মুদগালিনী, বিশপলা, বধ্রিমতী প্রমুখ নারী *বেদ* এর বহু শ্লোকের রচয়িতা। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসরে তর্ক ও আলোচনা করতেন নারী ঋষি ও জ্ঞানী তাপসীরা।[৮৪] আবার এটিও লক্ষ্যণীয় যে, মেয়েদের অন্তঃপুর ও অবরোধপ্রথার কথা *মহাভারতে* উল্লেখ আছে।[৮৫] ঐতিহাসিকরা মনে করেন, প্রাচীন কালে ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার আর্য জাতির মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনার্যদের কাছ থেকেই এ প্রথা আর্যসমাজে এসেছে। পঞ্চনদ প্রদেশের তক্ষশিলা অঞ্চলে গ্রিকদের প্রভাব ছিল বলে জানা যায়; যীশু খ্রিস্টের জন্মের তিন-চারশ বছর আগে এসকল স্থানে সতীদাহ বেশি হতো।[৮৬] *ঋগ্বেদের* যুগে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০-১১০০ অব্দ) নারী পুরুষের সমমর্যাদার কথা জানা যায়। গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে বৃহত্তর সমাজ চেতনার দিকে যাত্রার এ সময়ে পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকায় নারী গো-চারণ, কৃষিকাজ, গৃহকাজ ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরির কাজ করতো।[৮৭] অর্থাৎ উৎপাদনের কাজে নারী ছিল মূল শক্তি। বহুবিবাহ তখন সামাজিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতো না, যদিও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না।[৮৮] নারীর

---

[৮২] মাহমুদা ইসলাম, *নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪১-৪২

[৮৩] পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩

[৮৪] *ঐ*, পৃ. ২৪

[৮৫] প্যারীচাঁদ মিত্র, *এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা*, শ্রীকালীকিঙ্কর কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৮৮০, পৃ. ১০৫

[৮৬] সতীদাহ প্রথা অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সমাজে প্রচলিত ছিল। বিশেষত রাজপরিবার, অভিজাত শ্রেণি ও ব্রাহ্মণ সমাজে এটি চালু ছিল। এমনকি বিদেশেও অর্থাৎ প্রাচীন ব্রিটেন, গ্রিস, মিশর, চীন, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এ প্রথার প্রচলন ছিল। বৈদিক সাহিত্যে, *রামায়ণ* ও *মহাভারতে* তথা হিন্দুযুগে ভারতের নানাস্থানে সতীদাহ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। সতীদাহ প্রথা রদ করার চেষ্টা হয় বিশেষত সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬২৭) রাজত্বকালে। আধুনিক যুগে মিশনারি সম্প্রদায় ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্মচারিরা এ নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক যখন গভর্ণর জেনারেল হয়ে ভারতে আসেন, তিনি এ প্রথা বিলোপ করার কাজ শুরু করেন। তবে ইতোপূর্বে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে কলকাতায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। (শীলা বসাক "রামমোহন ও নারীর স্বাধিকার", ড. তাহা ইয়াসিন কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত, *নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায়*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৬৯; ক্ষিতিমোহন সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪)

[৮৭] মাহমুদা ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৮

[৮৮] *ঐ*, পৃ. ৪৬

অবরোধের কথা *বেদ* সাহিত্যে পাওয়া যায় না। আর্যদের আগমনের পর *অথর্ববেদে* সমসাময়িক কালের সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা পাওয়া যায়।[৮৯]

বৈদিক যুগে আর্যদের প্রধান দুটি জীবিকা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন, যা প্রথম আবিষ্কার করে নারী। ফসল ও দুধ উৎপাদন করে তারা পরিবারের সকলের খাদ্যের সংস্থান এবং বন্য শন ও গৃহপালিত ভেড়ার লোম দিয়ে কাপড় বুনে সকলের পোষাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ করত। নারী সন্তান জন্মদান ও লালনপালন করে এবং অসুখ বিসুখে গাছগাছড়া ও লতাপাতা দিয়ে ঔষধ তৈরি করে পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা দিয়েছে। কাজেই জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে মেয়েরা ছিল প্রধান শক্তি। ঘরে-বাইরে সকল উৎপাদনমুখী কাজে সর্বত্র তাদের অবাধগতি। পুরুষ নারীর উপর জীবনধারণের জন্য নির্ভরশীল হলেও এসময় কিন্তু নারী পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করেনি বরং পুরুষকে নিয়ে পরস্পরের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে জীবন যাপন করেছে ; অর্থাৎ তখন নারী পুরুষের মধ্যে সমতা ছিল।[৯০] কিন্তু ক্রমে সমাজে সম্পত্তির মালিকানার উপর ভিত্তি করে সামাজিক অসাম্য দেখা দেয়। উপজাতি গোষ্ঠীর কিছু কিছু সদস্য ধনী হয়ে উঠে, পাশাপাশি দেখা দেয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী। চাষের জমি ও পশুর মালিকানা, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ও জমির উপর অধিকারের দাবি নিয়ে বিশেষ সুবিধাবাদী সম্প্রদায়ের সূচনা ঘটে। নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নারীকে পুরুষের অধীনতাপাশে আবদ্ধ করে বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিবিভেদ দেখা যায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্যের পথ ধরে ক্রমান্বয়ে দাসব্যবসায়ী ও ক্রীতদাস, জমিদার ও প্রজা, শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে শ্রেণি বৈষম্যের সূত্রপাত হয়।[৯১] বৈদিক যুগের প্রথমদিকে যাযাবর সমাজে নারীর কিছুটা স্বাতন্ত্র্যতা ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু যখন আর্যরা প্রাগার্যদের কাছে কৃষিবিদ্যা শিখল, তাঁবুর বদলে পোড়া মাটির বাড়িতে বাস করতে শুরু করলো, যাযাবর জীবন যাত্রার বদলে সমাজ কৃষিনির্ভর হয়ে উঠল, লাঙলের ব্যবহার শিখল, পেশি শক্তির মাধ্যমে উৎপাদন বেড়ে গেল এবং জমিতে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হল তখন নারী পরিবার ও সমাজে নিজের স্বাতন্ত্র্যতা ও অধিকার হারাতে শুরু করে। অর্থাৎ নারীর সামাজিক অবস্থানের একটি পরিবর্তন এসময় লক্ষ্য করা যায়।

ধীরে ধীরে বৈদিক আর্যসমাজে ক্রীতদাস প্রথার আবির্ভাব ঘটে। যুদ্ধবন্দিদের শ্রম সহজে ও বিনা পারিশ্রমিকে পাওয়ার সুবিধার জন্য প্রথমে যুদ্ধবন্দিরাই দাস হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু ক্রমেই ধনীর

---

[৮৯] জ্ঞানেশ মৈত্র, *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২৪

[৯০] মাহমুদা ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০

[৯১] *ঐ*, পৃ. ৬৩

ঘরে সমাজের দরিদ্র মানুষ কাজ করার মাধ্যমে ক্রীতদাস হিসেবে গণ্য হতে থাকে। দানা ফসল গুঁড়া করার জন্য মেয়ে ক্রীতদাস নিয়োগের খবর পাওয়া যায় *অথর্ববেদে*।[৯২] ক্রীতদাস প্রথার অস্তিত্বসম্পন্ন বৈদিক আর্যসমাজকে অপরিণত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বলা যায়। এতকাল উৎপাদন ব্যবস্থায় একচ্ছত্র শক্তি হিসেবে নারীর যে ক্ষমতা ও অধিকার ছিল তা ক্রমে পুরুষ ও দাস দখল করলো। আবার সম্মানজনক অধিকার থেকে সরিয়ে বিবাহপ্রথার মধ্যদিয়ে নারীকে পরিবারের দাস হতে হলো এবং নারীর দাসশ্রমের উপর গড়ে উঠল বাঙালি পরিবার প্রথা।[৯৩] তবে শুধু বাঙালি নারীর জীবনেই এমনটা ঘটেনি। মানব জাতির মধ্যে নারীই সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃংখল পরেছে, এটা পৃথিবীর সকল সমাজেই প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসে দাসপ্রথারও আগে নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছে, সেটিও বিশ্বখ্যাত সমাজতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন।[৯৪]

আর্যসমাজ প্রথম পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, পাশাপাশি 'নারী বিনিময়' শুরু হয়।[৯৫] পরিবার ও সমাজে নারীকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। ইতোপূর্বে সন্তান মায়ের পরিচয়েই বেশি পরিচিত হতো। কিন্তু পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সন্তান পিতার সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। তখন পরিবারের কর্তা হতেন স্বামী, ফলে সমাজে নারীর পদমর্যাদার পরিবর্তন হয়ে তাকে স্বামী ও ছেলের উপর নির্ভরশীল করে তোলে এবং বিয়ে পদ্ধতির দ্বারা মেয়েরা সম্পত্তির মতো হস্তান্তরিত হতে থাকে। বিয়ের সময় পণ দিয়ে স্ত্রী কিনে নেওয়ার প্রথার মধ্যদিয়ে পুরুষ অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে স্ত্রীকে ব্যবহার করার অধিকার পেল। এমনকি অর্থের বিনিময়ে স্বামী স্ত্রীকে বিক্রি করতে বা জুয়া খেলায় তাকে বাজি রাখতে দ্বিধা করতো না। বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের সামান্য অধিকারও ছিল না। তখন অন্ধকারে পিঞ্জরাবদ্ধ রেখে কোনো রকমে ভাত কাপড় দিয়ে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারলেই পিতা তাঁর পিতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি

---

[৯২] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২

[৯৩] জ্ঞানেশ মৈত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭

[৯৪] August Bebel (Eng. tr.), *Woman in the Past, Present and Future,* Vol. I, The Modern Press, London, 1885, pp. 37-38

[৯৫] নারী নিজেই নিজের বিনিময় নির্ধারণ করেছে। তারা মনে করেছিল নিজেকে বিনিময় করলে আন্ত:গোত্রীয় বন্ধন স্থাপনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে। যার ফলে তারা সংস্কৃতির পরির্তনে ও নমনীয়করণে অবদান রাখতে পারবে। যে নারী নিজ গোত্র ছেড়ে নতুন গোত্রে যাবে সে দুই গোত্রের মধ্যে যোগসূত্র হয়ে উভয় গোত্রের সংস্কৃতি শিখতে ও আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে। এভাবে তারা যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে তা নারীকে ক্ষমতা ও প্রভাব অর্জনে সহায়তা করবে- এ ধারণার বশবর্তী হয়ে নারী নিজের বিনিময়ে নিজেই সম্মতি দেয়। নারী বিনিময়ে নারীকে দুই গোত্রের মাধ্যে যোগসূত্রের মাধ্যমে উভয় গোত্রে ক্ষমতা ও প্রভাব প্রদান করবে; নারী একথাই ভেবেছিল। সে ভাবতে পারেনি যে আসলে ঘটবে উল্টো, সে (নারী) ক্ষমতা ও প্রভাবের মাপকাঠি না হয়ে বরং পুরুষের অধীন হবে এবং স্বাধীনতা হারাবে। (মাহমুদা ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫)

পেয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন।[৯৬] তাছাড়া, মেয়েদের বিয়ে হতো এতো কম বয়সে যে, তাদের মতামত নেওয়ারও কোনো প্রয়োজন হতো না এবং পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার শিকার হতে হতো নারী।[৯৭] মূলত মেয়েদেরকে সমাজে হীন করে রাখার জন্য বা দমিয়ে রাখার জন্য অল্পবয়সে বিয়ে দিয়ে তাকে একজন পুরুষের অধীনে রাখা হত। অন্যদিকে জাতিভেদ প্রথা চালু হওয়ায় সমাজ আর মেয়েদের সয়ংম্বর প্রথা মেনে নেয়নি। কেননা জাতিকুল রক্ষার জন্য অভিভাবকদের মতানুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ের ব্যবস্থা চালু হয়।[৯৮]

প্রথমদিকে আর্যসমাজে যাগ-যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে নাচ গান করে মেয়েরা পূজা করতো। কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে মেয়েরা পূজা করার অধিকার হারায়।[৯৯] সন্তান জন্মদানের মাধ্যম হিসেবে তো বটেই, বংশধরের মধ্যে বেঁচে থাকার ও সম্পত্তির অধিকার অক্ষুন্ন রাখার নিশ্চয়তার জন্য স্ত্রীকে শুধু স্বামীর ভোগের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হলো। সন্তানের পিতৃত্বের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নারীকে প্রায় আধা কয়েদি করা হলো। সে সাথে সতীত্ব রক্ষার জন্য নারীকে অন্য পুরুষের চোখের আড়ালে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে প্রায় আটক রাখা হতো। তার মুখমণ্ডল, শরীর সবকিছু ঢেকে রাখা হতো। এভাবেই ঘোমটা, বোরকা ও পর্দাপ্রথা তথা অবরোধপ্রথার প্রচলন শুরু হয়।[১০০] কিন্তু পুরুষের বহুগামিতা বন্ধ হলো না। উল্লেখ্য দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের কাজ করার প্রয়োজন থেকেই গেল। সংসার পরিচালনায় গরিব মেয়েরা অর্থ উপার্জনে কার্যকর অবদান রাখতে যাওয়ায় তাদের অবগুণ্ঠিত রাখা সম্ভব হতো না। কিন্তু অন্যভাবে তাদের উপর অত্যাচার চলত। এভাবে দেখা যায় আর্য সমাজে মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ধীরে ধীরে অবনতির দিকে ধাবিত হয়। অন্যদিকে নারী সম্পত্তিতে কোনো অধিকার দাবি করতে পারতো না। শুধু সম্পত্তি নয়, নিজের দেহের উপরও নারীর অধিকার ছিল না। *উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে, সম্ভোগে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে প্রথমে মিষ্টি কথা বলতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে তাকে বস্ত্রালংকার দিতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে তাকে প্রহার করতে হবে।[১০১] এককথায় ব্রাহ্মণ্যবাদ নারী সমাজের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে এবং ধর্মের নামে মেয়েদেরকে সমাজে কোনঠাসা করে রাখার প্রয়াস চালায়।

---

[৯৬] আবুল ফজল, *আবুল ফজলের রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৫, পৃ. ৬৪০

[৯৭] গোলাম মুরশিদ, *নারীপ্রগতির একশো বছর রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪

[৯৮] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

[৯৯] *ঐ*, পৃ. ৪

[১০০] *ঐ*, পৃ. ৫

[১০১] পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪

মনুসংহিতায়[১০২] বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যায় বিধাতার অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক নারী হয়ে ওঠার কথা বলেন মনু। অথচ তিনি নারী চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অবলীলায় তাদের সম্পর্কে বহু অবমাননাকর কথা বলেছেন। পাশাপাশি নারীর কিছু অধিকার এবং তা সুরক্ষার পরামর্শও দিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে, নারীজাতিকে শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী ও স্বামীর মৃত্যর পর ছেলের অধীনেই থাকতে হবে। তবে অনাদরে ও অমর্যাদায় মেয়েরা যেখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং যে বংশকে উদ্দেশ্য করে নারী অপমানিত বা বৈষম্যের শিকার হয়ে অভিশাপ দেয়, সে বংশ বিষপান করা ব্যক্তির ন্যায় সর্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অন্যত্র বলা হয়, যারা ঐশ্বর্য কামনা করে, তারা স্ত্রীলোকদের সম্মান প্রদর্শন দ্বারা সুখী রাখবে এবং উত্তম অলংকার, পোশাক ও খাদ্য দ্বারা সন্তুষ্ট রাখবে। নারীজাতিকে সর্বদা পবিত্র হিসেবে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করবে।[১০৩] এ শাস্ত্রে স্ত্রীকে ত্যাগ করার অধিকার পুরুষ পায়, কিন্তু স্বামী ত্যাগ করা স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ হয়। স্ত্রী কোন কারণে অবিশ্বাসী হলে ভয়ানক শাস্তিসহ মৃত্যুদণ্ড ধার্য হয় ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায়। আবার ছেলেমেয়েদের উপর বাবার অধিকার ও কর্তৃত্ব ছিল এমন চূড়ান্ত যে, বাবা ইচ্ছা করলে সন্তানদের বিলিয়ে দিতে পারতো।[১০৪] অর্থাৎ সন্তানের উপর মায়ের অধিকার খর্ব করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মনুর ধর্মে নারীর অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে এবং পিতৃতন্ত্রের ভিত্তিকে এখানে আরো মজবুত করা হয়েছে।

বৈদিক যুগের পর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর শাসকগোষ্ঠী বাংলা শাসন করেছে। প্রতি যুগেই শাসননীতিতে শাসকের ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে ধর্ম ও সমাজের নামে শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে শাসক ও শাসিতের মধ্যে। একইসাথে নারী ও পুরুষের ব্যবধানও সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধ ধর্মের মুক্তির দর্শন মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এ ধর্মে পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস না থাকায় পুত্রসন্তানের প্রয়োজন জরুরি হয়নি। বৌদ্ধধর্মে ছেলে না থাকলে বাবার সম্পত্তি ও বংশ রক্ষায় মেয়ের অধিকার স্বীকৃত হয়।[১০৫] গৌতম বুদ্ধ পুরুষের পাশাপাশি নারী

---

[১০২] *মনুসংহিতা* পৌরাণিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থকে হিন্দু আইনের ভিত্তিস্বরূপ বিবেচনা করা হয়। হিন্দু ধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ, আচার-আচরণ, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের নিয়ম কানুন সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। মনু কর্তৃক সংকলিত বলে এর নাম *মনুসংহিতা*। পৌরাণিক কাহিনীমতে মনু ব্রহ্মার মন থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন (মন অর্থ বোধ করা বা জানা), সে কারণেই তিনি মনু হিসেবে পরিচিত। কথিত আছে, একে একে ১৪ জন মনু পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তাঁরা হলেন স্বয়ম্ভুর, স্বরোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত বা সত্যব্রত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবতা সাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। (পূরবী বসু, *ঐ*, পৃ. ৫৬)

[১০৩] সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (অনুদিত), *মনুসংহিতা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২৪৮-২৪৯

[১০৪] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪

[১০৫] জ্ঞানেশ মৈত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

সমাজের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। যে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির প্রয়োজনে তিনি নারী সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ প্রদর্শনকে খুবই গুরুত্বর্পূ মনে করেন। ফলে বৌদ্ধযুগে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এসময় নারী ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কাজ করার অবাধ সুযোগ পায়।[১০৬] তবে বৌদ্ধ ধর্মের সূচনাপর্বে চলতি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার আশায় হাজার হাজার নারী সংসার ধর্ম ত্যাগ করে 'ভিক্ষু সংঘ' তে আশ্রয় নেয়। বৌদ্ধ ধর্ম নারীকে মঠজীবনের অধিকার দিলেও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়নি। এ ধর্ম ব্যবস্থায় একদিকে মেয়েদের বিভিন্ন লুপ্ত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে, আবার অন্যদিকে তাদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে মঠ জীবনযাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে অনেক বৌদ্ধ নারী এসময় সংসার ছেড়ে স্বাধীনভাবে বসবাসের মঠ জীবনে চলে আসে। যা নারীকে গৃহহীন করে এবং তাদের সামাজিক মূল্য হ্রাস করে। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হলেও এসময় সমাজ চলতো মনুর মন্ত্রে। তাতে সমাজে নারীর অবস্থান ভালো হয়নি বরং আরো খারাপ হতে থাকে।

রাজা রামপালের (১০৯২-১১৪১ খ্রি.) তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, পালযুগে গর্ভবতী নারী যেন সুদর্শন সন্তান জন্ম দিতে পারে এজন্য অনুষ্ঠান করে তাকে নতুন চাঁদ দেখানো হতো।[১০৭] আবার সমাজে পুত্র সন্তানের কদর বেশি ছিল। যে নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারতো স্বামীর পরিবারে তাঁর দীর্ঘদিন বসবাস করার বিষয়টি পাকাপোক্ত হতো। কন্যা সন্তানও সম্মানিত ছিল, তারা পরিবারের পুরুষ অভিভাবকদের সেবা করতো।[১০৮] অন্যদিকে শাস্ত্রীয় নীতির কারণে এসময় বঞ্চনার স্বীকার হয় নারী, যাদের শুদ্র হবারও প্রয়োজন ছিল না। নারী শুদ্রর মতো বেদপাঠে ছিলো অনুপযুক্ত, এ ব্যাপারে প্রতিবাদী বেশ কিছু নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একজন ছিলেন খনা। বাস্তবজীবনে খনা নামে সত্যিকার অর্থে কোনো একজন বিশেষ নারী ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদরা সম্পূর্ণ একমত নন। অনেকটা কিংবদন্তীসম এ নারীকে একটি শ্রেণিবদ্ধ নারীর মিলিত কণ্ঠস্বর বলে দাবি করা হয়। তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিই খনা বলে অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, বাস্তববাদী, কৃষি ও পরিবেশ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রখর জ্ঞানী এক সনাতন নারীর অস্তিত্ব ছিল।[১০৯] অনুমান করা হয় সপ্তম শতকের পূর্বে খনার আবির্ভাব ঘটে।

---

[১০৬] জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, "নারীর অবস্থান : গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম", *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ৫৭বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, (অক্টোবর-ডিসেম্বর), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৭৯-৮৫

[১০৭] Shahanara Hussain, *The Social Life of Women in Early Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1985, p. 38

[১০৮] *Ibid*, p. 29

[১০৯] পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫০

তখন বাংলায় বৌদ্ধ, বৈদিক, চার্বাক দর্শন ছাড়াও জৈন, শাক্ত, সহজিয়া, বাউল, শৈব, তান্ত্রিক ও নাথপন্থী মতবাদসমূহ পরস্পরের সীমানা ছাড়িয়ে একটি সমন্বয়বাদের সৃষ্টি করে। স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্লেষণের অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে সমাজে খনার উপস্থিতি ক্ষমতাধর পুরুষ সমাজপতিরা সহ্য করতে পারেনি। তাই খনার জিহবা কেটে নেয়া হয় এবং ক্রমাগত অত্যাধিক রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়।[১১০] এটি দ্বারা প্রমাণিত হয় তৎকালীন সমাজের পুরুষ কোনো নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি মেনে নেয়নি। এরপর ধীরে ধীরে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ থেমে যায়, বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী পাল বংশের রাজত্ব শেষ হয়।

সেন শাসনের সূচনাপর্বে দেখা যায় ব্রাহ্মণ্যবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন যুগে বাংলায় মেয়েদের জীবনকাল মনুর মতাদর্শের ন্যায় তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। প্রথমতঃ পিতৃগৃহে বসবাসের সময়কাল, দ্বিতীয়তঃ স্বামীগৃহে বসবাসের সময়কাল এবং তৃতীয়তঃ পুত্র সন্তানের গৃহে বসবাসের সময়কাল। শাস্ত্রে আছে 'পিতাই যোগ্য পাত্রে কন্যা সম্পাদন করিবেন, কন্যা বর প্রার্থনা করিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম'।[১১১] কিন্তু অন্যত্র বলা হয়েছে, 'বিবাহযোগ্য হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে পিতা বা অভিভাবক কন্যা বিবাহের ব্যবস্থা না করিলে তাহারা স্বীয় বর্ণে নিজেদের পছন্দমাফিক স্বামী নির্বাচিত করিবে। ইহার জন্য কন্যা অথবা স্বামী পাপযুক্ত হইবেন না'।[১১২] কন্যা বিবাহে পিতা জামাতাকে যৌতুক প্রদান করতেন, *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* পিতা কর্তৃক যৌতুক দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১১৩] *চর্যাগীতের* একটি গীতেও বর কর্তৃক যৌতুক গ্রহণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১১৪] প্রাচীন বাংলায় (পাল ও সেন শাসনামল) যদি কোনো মেয়ে বিবাহের পূর্বে পিতৃগৃহে বয়ঃসন্ধিকালে উপস্থিত হয়, তবে সে সমাজে শুদ্রের ন্যায় নিগৃহীত হয় এবং যৌতুক ছাড়া কোনো ছেলে যদি তাকে বিয়ে করে, তাহলে সেই ছেলেও নিগৃহীত হয় এবং সমাজ তাকে ঘৃণা করে। মেয়ের পিতাও সমাজের শত্রুতে পরিণত হয়।[১১৫] স্ববর্ণে বিবাহই ছিল তৎকালীন সামাজিক আদর্শ এবং স্বাভাবিকভাবে একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করাই ছিল সাধারণ নিয়ম। তবে রাজা, সামন্তবর্গ,

---

[১১০] *ঐ*

[১১১] পঞ্চানন তর্করত্ন (অনুদিত ও সম্পাদিত), *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ*, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬০৮

[১১২] ভরতচন্দ্র শিরোমণি (সংশোধিত), *মনুসংহিতা*, (কুলুক ভট্টকৃত টীকা), অরুণোদয় ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯২৩, পৃ. ৩৪৩

[১১৩] পঞ্চানন তর্করত্ন (অনুদিত ও সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯৩

[১১৪] সৌমেন্দ্রনাথ সরকার (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকোষ*, গীত নং ১৯, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৩৮

[১১৫] Shahanara Hussain, *op. cit.*, p. 29

অভিজাত ও বিত্তবানরা অনেকসময় বহুপত্নী গ্রহণ করতেন। উল্লেখ্য এ সময় এক স্ত্রী যে সুখী পরিবারের আদর্শ তা সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল। সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান অনুমোদিত ছিল না।[১১৬] এক্ষেত্রে মনুর উক্তি উল্লেখযোগ্য, "বিবাহ বিচ্ছেদ কোনক্রমে অনুমোদিত হইবে না, স্ত্রীকে স্বামী যাহাতে পরিত্যাগ না করেন ইহার জন্য স্ত্রী অত্যন্ত সতকর্তা অবলম্বন করিবেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তাহাদের দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্বের জন্য যত্নবান হইবেন"।[১১৭]

প্রাচীন বাংলায় বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র সন্তান না থাকলে সম্পত্তির মালিক হতো। তবে এ সম্পত্তি বিক্রি, হস্তান্তর বা উইল(দান) করতে পারতো না।[১১৮] এ সময় তারা স্বামীর পিতৃলয়ে বাস করতো ও সম্পূর্ণরূপে সে পরিবারের সদস্যদের অনুগত হতো। যদি মৃত স্বামীর পরিবারে কোন পুরুষ সদস্য না থাকতো তাহলে তাকে অবশ্যই নিজের পিতৃলয়ে চলে যেতে হতো।[১১৯] উল্লেখ্য স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা অত্যন্ত নিম্নমানের জীবন যাপন করতো, তাদেরকে বিলাসিতা বা জাঁকজমকতা বর্জন করতে হতো। অন্যদিকে সুস্বাদু খাবার যেমন মাংস, মাছ, মধু ইত্যাদি খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।[১২০] তারা তখন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতে পারতো না। সকল রীতি-নীতি মেনে চলতো যেন মৃত স্বামীর আত্মা শান্তি পায় এবং বিধবাদের অন্যতম কাজ ছিল সমাজের লোকদের উৎসাহিত করা যেন তাদের স্ত্রীরা নিজেদেরকে স্বামীর চিতায় আত্মবলিদান করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়।[১২১]

প্রাচীনকালে বাংলার মেয়েদের সুখ্যাতি ছিল। বাৎস্যায়ন তাঁদেরকে মৃদুভাষিণী, কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবর্তী বলে বর্ণনা করেন।[১২২] এ সময় স্বামীর যথার্থ সহধর্মিনী হওয়া নারীর কামনা বাসনা ছিল। তাছাড়া

---

[১১৬] *Ibid*, p. 32

[১১৭] সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (অনুদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০১, ৪৪৫

[১১৮] R.C Majumder (ed.), *The History of Bangal*, Vol. I (Hindu Period), University of Dhaka, Dhaka, 1943, pp. 609-610

[১১৯] *Ibid*, p. 610

[১২০] Bhavadeva Bhatta, *Prayaschitta-Prakarana*, (ed. Girish Chandra Vidyaratna), *Varendra Research Society*, Rajshahi, 1927, p. 69; *Brihaaddharma Purana*, (ed. Panchanan Tarkaratna), (II, 8, 11), Nabavarat Pablishers, Calcutta, 1396; *Ibid*, p. 611

[১২১] *Brihaaddharma Purana*, (II. 8.3-10), *op.cit.*, p. 71

[১২২] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪৭২; Vatsyayana, *Kamasutra*, (Eng. tr. Richard Francis Burton), vol. 5, London; Haran Chandra Chakladar, *Social Life in Ancient India : Studies in Vatsyayana's Kamasutra*, cosmo, New Delhi, 1984, p. 117

গুণীপুত্রের মাতা হিসেবে সমাজ ও সংসারে প্রতিষ্ঠিত হতে চরম বাসনা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতো। বল্লালসেনের (আনুমানিক ১১৬০-১১৭৮ খ্রি.) নৈহাটি তাম্রলিপি হতে দেখা যায় বিজয় সেনের (আনুমানিক ১০৯৭-১১৬০ খ্রি.) স্ত্রী বিলাস দেবীকে লক্ষ্মী এবং গৌরীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।[১২৩] তিনি যে বীর ও গুণী পুত্র বল্লালসেনের জন্মদাত্রী একথাও উল্লেখ করা হয়েছে।[১২৪] এতে প্রমাণিত হয় পুত্র সন্তানের জননী হিসেবে স্ত্রীর মর্যাদা স্বামীর সংসারে নিশ্চয় বৃদ্ধি করতো। আবার অনেক সময় স্বামীর সংসারে স্ত্রীর প্রাধান্য এতটা বেশি হতো যে, তিনি বহুক্ষেত্রে স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। স্ত্রী, স্বামীর পথচলার দিকনির্দেশক হতেন এবং তাঁর সংকোচে স্বামী অনেক অসৎ কাজ হতেও বিরত থাকতেন।

সেন যুগে সকল বর্ণের স্ত্রীদের প্রাত্যহিক দায়িত্বের মধ্যে ছিল স্বামী ও সন্তানের পরিচর্যা, রান্না-বান্না, ভিখারীদের ভিক্ষা দেওয়া, অতিথি আপ্যায়ন করা প্রভৃতি। তবে মাতা হিসেবে সন্তান প্রতিপালন প্রধান দায়িত্ব ছিল। এ সময় সম্পদশালী মহিলারা বাড়িতে দাসী রাখতেন।[১২৫] অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছল পরিবারের নারী প্রয়োজনের তাগিদে কোনো শিল্প সংস্থায় সুতা কেটে, তাঁত বুনে অথবা অন্য কোন শিল্পকার্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে পরিবার পরিচালনায় সহায়তা করতেন। আবার মাঝে মাঝে মেয়েরা যেন তাদের স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যদের এ সকল শিল্পকর্মে পাঠাতে সাহায্য করে এজন্য কাজ প্রদানকারী মালিকরা তাদেরকে ঘুষ দিত। কেননা ঐসকল উৎপাদামুখী কাজ সম্পাদনের জন্য অনেক বেশি জনবল প্রয়োজন ছিল।[১২৬] তৎকালে নিম্ন শ্রেণির ডোম্বীনিদের পাটনীর কাজ এবং মদবিক্রয় করে জীবিকা অর্জনের কথাও জানা যায়।[১২৭] অর্থাৎ সেন যুগে পিতৃতন্ত্রের কঠোরতা পরিলক্ষিত হলেও নারীর কর্মসংস্থানের বিষয়টি এখানে নতুন মাত্রা যোগ করে, যা পরবর্তিতে বাংলার নারীসমাজকে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে অনুপ্রাণিত করে। তবে বৃদ্ধ বয়স মেয়েদের জন্য দুর্ভোগের ছিল, এ সময় তারা ঘরের বাইরে যেতেন না।

---

[১২৩] Nani Gopal Majumder, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, (containing inscriptions of the Chandras, the Varmans and the Senas, and of Isvaragosa and Damadora), Verse no.10, (*Naihatee Copper Plate), Varendra Research Society*, Rajshahi, 1929, p. 77

[১২৪] *Ibid*, p. 77

[১২৫] জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, শ্লোক নং ৩০, সান্যাল এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৫

[১২৬] R.C Majumder (ed.), *op.cit.*, p. 611; Jimutavahana, *Dayabhaga*, (Eng. tr. H. T Colebrooke), *The Hindu Law of Inheritance in Bengal,* Oxford University press, 1810, p. 85

[১২৭] সুকুমার সেন (সম্পাদিত), *চর্যাগীতি পদাবলী (চর্যাচর্যটীকা সমেত)*, গীত নং ১৪, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ১৬৮-১৬৯

তৎকালীন মেয়েরা নানা কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। এর মধ্যে নৃত্যগীত অন্যতম। সম্ভবত সমাজের উচ্চ স্তরের নারীও নাচ-গানের চর্চা করতেন। জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী একজন উঁচুমানের গায়িকা ও নর্তকী ছিলেন। *সেকশুভোদয়া* গ্রন্থে উল্লেখ আছে, লক্ষ্মণসেনের (আনুমানিক ১১৭৮-১২০৬ খ্রি.) সভায় পদ্মাবতী একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। জয়দেব তাঁর *গীতগোবিন্দের* গান করতেন এবং সে গানের রাগ-তাল ধরে পদ্মাবতী নাচতেন।[১২৮] এগারো বা বারো শতকে লীলাবতী নামে একজন বিদূষী নারী প্রখর বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রখ্যাত জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'র লেখক ভাস্করাচার্যের কন্যা। লীলাবতী পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যোর্তিবিদ্যায় অভূতপূর্ব প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। লীলাবতী পিতা কর্তৃক রচিত 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'র তিনটি খণ্ড স্বহস্তে লিখে দেন।[১২৯] উল্লেখ্য এসময় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে পর্দা ও ঘোমটার প্রচলন ছিল। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে উল্লেখ আছে, বল্লালসেন পালকিতে বহন করে তাঁর শত্রু রাজলক্ষ্মীকে জয় করে আনেন।[১৩০] ফলে সহজেই অনুমান করা যায়, অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণির পরিবারের মেয়েদের জন্য পর্দার প্রচলন ছিল এবং এতে তাদের অভিজাত্য প্রকাশ পেত। তবে এ যুগে নারীর বিশেষ কোন স্বাধীন সত্ত্বা সমাজে স্বীকৃত ছিল না। তাদেরকে পুরুষের করুণা, বিবেচনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করতে হতো। শাস্ত্র মেয়েদের আচার-আচরণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান করে তাদের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করে।

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় বাংলায় একের পর এক শাসক এসে শাসন করেছেন, তাই নতুন নতুন ধর্ম প্রচারিত হয়েছে। যার কিছু সূত্র বাংলার ভূখণ্ডেই ছিল এবং তা বাঙালি সংস্কৃতির সাথে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগে যখন মুসলমানরা বাংলায় শাসন শুরু করেন (১২০৪ খ্রি.) তখন তারা বিদেশি ধর্ম ও সংস্কৃতি বাংলায় নিয়ে এলেন। উল্লেখ্য ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের যুগে আরবদেশে নারীর জন্য সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় যেসব অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তা সে সময়ের তুলনায় ছিল অনেক উদার এবং তাতে নারী নির্যাতন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হতো। কন্যাশিশু হত্যা, স্ত্রীর প্রতি নির্দয় আচরণ, সৎ মাকে বিয়ে করা ইত্যাদি ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ হয়। নারীশিক্ষার নির্দেশ দেওয়া হলো, স্ত্রীর জন্য খোরপোশ ও মোহরানা বাধ্যতামূলক করা হয়। বহু মুসলিম মেয়ে এসময় শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেদেরকে উন্নত করে। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব, তালাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মে নির্দেশিত

---

[১২৮] সুকুমার সেন, *বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৪৩

[১২৯] পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫০-২৫১

[১৩০] Nani Gopal Majumder, *op. cit.*, pp. 72-76

নারীর অধিকার পূর্ব প্রচলিত ধর্মগুলি থেকে উন্নত হলেও এক্ষেত্রে নারী বঞ্চিত থাকে। অন্যদিকে যেটুকু অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে সেটুকু অধিকারও কিন্তু মুসলিম শাসকরা বাংলার মেয়েদেরকে প্রদান করেননি।[১৩১] যদিও তত্ত্বগতভাবে ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পর্দার মাধ্যমে নারীকে বিচ্ছিন্নকরণ এবং পুরুষের প্রতি আনুগত্য নতুন ইসলামি পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সূচনা করে।[১৩২] আবার এসময় বাল্যবিবাহ নারীজীবনকে অভিশাপের মত গ্রাস করে। পুরুষের মধ্যে বহুবিবাহ তখন হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজেই প্রচলিত প্রথার মতো বিদ্যমান ছিল।[১৩৩] ধারণা করা হয়, বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পর সমাজে নারীর স্থান অবনমিত হয়। কেননা ধর্মের দোহাই দিয়ে বলা হয় মুসলমান শাস্ত্রে মেয়েদের জন্য পর্দাপ্রথা ও অন্দরমহলে বসবাসের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে মুসলমানদের আগমনের অনেক আগে থেকেই সমাজে নারীর অধস্তনতা বিরাজ করছিল সে সম্পর্কে সন্দেহই নেই। অর্থাৎ মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তারা অবরোধবাসিনী হয়েছিল। এরপর মুসলমান শাসনামলে সমাজ আরো বেশি পুরুষতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। মূলত মধ্যযুগে সবচাইতে বেশি নিপীড়িত ছিল নারী। পিতৃতন্ত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে তাঁরা দুর্বিসহ জীবন যাপনে বাধ্য ছিল।[১৩৪] পর্দাপ্রথা, উপপত্নীপ্রথা, ক্রীতদাসপ্রথা, ক্রীতদাসী বিবাহে ধর্মীয় সমর্থন, বিবাহ-বিচ্ছেদে পুরুষের একপক্ষীয় অধিকার ইত্যাদি নারীর সামাজিক অধিকারকে সংকুচিত করে।[১৩৫] বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ সময় নগর সমাজে ও ধর্মে নারীর স্থান যতই ক্ষুন্ন হচ্ছিল, গ্রামীণ সমাজে নিম্নবর্গের মেয়েদের মধ্যে দৈনন্দিন লোক-ধর্মচর্চায় তাদের প্রভাব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মুসলমান সমাজে ও উচ্চবর্গীয় মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, জুম্মার নামাজে শরীক হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। অন্যদিকে গ্রামীণ জীবনে মেয়েরা নিয়মিত দরগা জিয়ারত ও পীর মুর্শিদের সেবাতে অংশগ্রহণ করতো।[১৩৬] সার্বিকভাবে বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পর ইসলাম ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী নারী অধিকার বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু পর্দাপ্রথার নামে মেয়েদের গৃহে বন্দি করে রেখে তাদেরকে প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

---

[১৩১] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬-৭

[১৩২] Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal : 1876-1939*, E. J. Brill, Lieden, New York, 1996, p. 42

[১৩৩] পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২

[১৩৪] মাহমুদা ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩

[১৩৫] পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৬

[১৩৬] *ঐ*

প্রকৃতপক্ষে বাংলায় ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম– এ দুটি প্রধান স্রোতধারা, যা দ্বারা এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামো গঠিত।[১৩৭] তেরো শতকে ইন্দো-মুসলিম শাসনামলেও বাংলার সমাজে নারীর অবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি। কারণ ইসলাম ধর্ম ও সংহতিতে মেয়েদের অবস্থা বৈপ্লবিকভাবে উন্নত করার মতো কোন ব্যবস্থা ছিল না। মুসলমান শাসকরা লেখাপড়া, সামাজিক মর্যাদা কোন ব্যাপারেই বাঙালি নারীর মধ্যে নতুন ধারণা এবং রীতি প্রবর্তন করতে পারেনি। এসবের সাথে কয়েক শতক পর ইংরেজ আমলে যে পরিবর্তন এসেছিল তার তুলনা করলেই বাঙালি মেয়েদের ইতিহাসে ইন্দো-মুসলিম আমলের প্রভাব কত সামান্য তা বোঝা যাবে।[১৩৮] হোসেন শাহী (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) শাসনামলে দেখা যায় বিধবা হওয়ার পর কিছুদিন মুসলমান নারী খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্রালংকার প্রভৃতির ক্ষেত্রে খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করতো। হিন্দুদের মধ্যে সহমরণের ঘটনাও সেকালে দু'চারটা ঘটতো। সমকালীন সাহিত্য ও অন্যান্য প্রমাণ থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীনকালের মতো এসময়ও বিয়েতে নারীর মর্যাদা এবং স্বাধিকার স্বীকৃত হয়নি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে পুরুষই ছিলেন প্রধান নিয়ন্ত্রক।[১৩৯] পরিবারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে গরিব নারীর যতটুকু অধিকার ছিল, ধনীদের ততটুকুও ছিল না। ধনীরা মেয়েদের বস্ত্র ও অলংকারে সাজিয়ে রাখতেন অর্থাৎ ভালোভাবে ভরণপোষণ করতেন। কিন্তু বিনিময়ে নারীর কাছ থেকে তারা দাসীর মতো আনুগত্য আশা করতেন। এমনকি কোনো কারণে তাদের জীবন দুর্বিসহ হলেও বিবাহ ভাঙ্গার মতো অধিকার নারীর ছিল না।[১৪০] অন্যদিকে গরিব নারী যেহেতু অর্থনৈতিক কাজে পুরুষের সহযোগিতা করতেন এবং তাদের কাছ থেকে বস্ত্র-অলংকার পেতেন না, সেজন্য এসকল নারী নিজেদের বক্তব্য এবং প্রতিবাদ উচ্চকণ্ঠেই প্রকাশ করতেন। পুরুষের মতো পেশির জোর না থাকলেও কণ্ঠের জোর দিয়ে তাঁরা সেটা পুষিয়ে নিতেন। উল্লেখ্য উনিশ শতকের গোড়ার দিকে উইলিয়ম কেরী মেয়েদের কথোপকথন এবং কোন্দলের যে নমুনা সংকলন করেন, সেটি থেকে নারীর মুখ যে যথেষ্ট তীক্ষ্ম ছিল, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১৪১] এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে নারী নিজে অর্থ উপার্জন করে এবং স্বামী বা সংসারের অন্য কোন সদস্যের উপর নির্ভরশীল না হয়, সে তাঁর অধিকারের কথাগুলি জোরালোভাবে প্রকাশ করতে পারে।

---

[১৩৭] Momtazur Rahman Tarafdar, *Husain Shahi Bengal (1494-1538A.D) A Socio-Political Study*, University of Dhaka, Dhaka, 1965, p. 310

[১৩৮] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৩২

[১৩৯] *ঐ*, পৃ. ২৩৩

[১৪০] *ঐ*, পৃ. ২৩৪

[১৪১] *ঐ*

মধ্যযুগে মুসলমান শাসনামলে বাংলার সমাজে নারীর মর্যাদার কতগুলি বিশেষ দিক লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, নারী ছিল সাধারণত পুরুষের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, তারা গৃহে পর্দার অন্তরালে বসবাস করতো। তৃতীয়ত, নারীর উচ্চশিক্ষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের কাজকর্ম গৃহ অভ্যন্তরেই পরিব্যাপ্ত ছিল। চতুর্থত, তাদের খুব একটা আর্থিক সক্ষমতা ছিল না, যা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। তারপরও সে যুগে বহু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর দৃষ্টান্ত রয়েছে যারা তাদের অসামান্য ব্যক্তিত্বের গুণে পুরুষের উপর আধিপত্য করেছেন। সমাজে তেজস্বিনী নারীর দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। বাংলায় বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিথযশা নারীর কথা জানা যায়, যাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। কিছু সংখ্যক নারী তাদের সংস্কৃতি ও সুরুচির প্রভাবে সামাজিক জীবন সঞ্জীবিত ও আলোকিত করে তোলেন। মাতা ও ভগ্নি হিসেবে নারী গৃহকে সুমধুর করে তোলেন এবং শিক্ষয়িত্রী হিসেবে তারা পারিবারিক জীবনকে মনোরম ও সুখময় করেন। সুতরাং তখন নারী সমাজে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান অধিকার করেন। শাসকদের স্ত্রীরা রাজকীয় মর্যাদায় বসবাস করতেন, সুলতানের (শাহজাদার) মা পেতেন সবচেয়ে বেশি মর্যাদা। হারেমের মেয়েদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন ছিল উন্নত। অনেক হেরেমে নারীর জন্য মসজিদ (Masjid-i-Khas) থাকতো। আবার পূর্ব বাংলায় মুসলিম স্থাপত্য নির্মাণে নারীর ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। ঢাকার নারিন্দাতে বখ্‌ত বিনতের মসজিদ স্থানীয়ভাবে নারিন্দা মসজিদ নামে খ্যাত- এটি মারামাতের কন্যা বখ্‌ত বিনত তৈরি করেন (১৪৫৬ খ্রি.)।[১৪২]

সুলতানি আমলে গৌড়ে বিবি মালতী একটি মসজিদে ওজু করার জন্য ঘর তৈরি করেন।[১৪৩] অনেক সময় শাসক তাঁর কন্যাকে পুত্র অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য মনে করলে, তাঁকে (কন্যা) পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন।[১৪৪] আবার এমনও দেখা যায় সুলতানের স্ত্রী সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সুলতানকে নানা পরামর্শ দিতেন। হোসেন শাহী শাসনামলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা বিরাজ করতো। স্ত্রীর সহযোগিতায় অনেক সময় শাসকরা পারিবারিক কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন।[১৪৫] হোসেন শাহী শাসনামলের সাহিত্যে দেখা যায়, বাংলার নারী তখন সুতা ও

---

[১৪২] এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, "বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য", *ধারাবাহিক লেকচার-৩*, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১০. ০৭. ২০১৯

[১৪৩] *ঐ*

[১৪৪] Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2009, pp. 237-238

[১৪৫] Momtazur Rahman Tarafdar, *op. cit.*, pp. 354-355

পাট দিয়ে তৈরি সুন্দর বস্ত্র, বিভিন্ন রকমের অলংকার, সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করতেন। তারা সেজেগুজে চুল বেঁধে, বেনিতে ফুল ও ময়ুরের পাখা লাগাতেন।[১৪৬] মূলত সুলতানি আমলে লিঙ্গ বৈষম্য বা নারী পুরুষে পার্থক্য খুব কম করা হতো। কিন্তু তখন সমাজে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল দুটি। যথা- ১. উপপত্নী প্রথা ও ২. পুরুষের বহুগামিতা। পাশাপাশি সুন্দরী দাসীদের প্রচুর চাহিদা পরিলক্ষিত হয় যা সমাজের জন্য ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক।[১৪৭] তবে তৎকালে মুসলিম মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার ছিল এবং এ আর্থিক সঙ্গতি তাঁকে পরাধীনতা থেকে রক্ষা করেছে এবং স্বামীর উপর নির্ভরশীলতা সহনীয় ও সম্মানজনক করে তুলেছিল।

অন্যদিকে তদানীন্তন বাংলার হিন্দু সমাজে মেয়েদের সম্পত্তিতে কোন অধিকার ছিল না। ফলে তাকে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। হিন্দু সমাজে নারী অত্যন্ত শোচনীয় জীবন যাপন করতো। পরিবার ছিল কঠোরভাবে পিতৃতান্ত্রিক এবং স্ত্রীকে সর্বদা স্বামীর আজ্ঞাবহ থাকতে হতো।[১৪৮] কবি ভারতচন্দ্র হিন্দু সমাজে নারীর অমর্যাদাজনক অধীনতার কথা উল্লেখ করে বলেন, "একটা মেয়ের জীবন খুব সুখের নয় ; সে সর্বদা পরনির্ভরশীল এবং তাকে অন্যান্যদের বোঝা বহন করতে হয়"।[১৪৯] একজন হিন্দু নারীর জন্য স্বামীর আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হলে, তার পক্ষে দাঁড়াবার কোন জায়গা থাকতো না যেখানে সুখ ও শান্তিতে তিনি জীবন যাপন করতে পারেন ; এমনকি তাঁর পৈতৃক বাড়িতেও নয়।[১৫০] বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা হিন্দু মেয়েদেরকে অসহায় করে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। দশ বা এগারো বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই হিন্দু মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তাদের নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারেনি।[১৫১] চার্লস গ্রান্ট মন্তব্য করেন, মেয়েদের যে বয়সে বিয়ে হয় তখন তাদের যুক্তি-বুদ্ধিতে বিকাশ হয় না বরং তারা মায়ের 'জেনানা' থেকে নিজেদের 'জেনানা'য় সরাসরি প্রবেশ করে।[১৫২] মধ্যযুগে বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল সাধারণ নিয়ম। কারণ উচ্চ বর্ণের

---

[১৪৬] *Ibid*, p. 354

[১৪৭] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 240

[১৪৮] Amitabaha Mukherjee, *Reform and Regeneration in Bengal, 1774-1823*, Rabindra Bharati University, Calcutta, 1968, p. 204

[১৪৯] ভারতচন্দ্র, *অন্নদামঙ্গল*, *(বিদ্যাসুন্দর)*, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৭৬৯, পৃ. ২২২

[১৫০] *ঐ*, পৃ. ২২৬

[১৫১] *ঐ*, পৃ. ২৮২-২৮৩

[১৫২] *Parliamentary Papers (House of Commons) 1812-13*, Vol. X, Calcutta, p. 29

ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হওয়ায় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের চাহিদা খুব বেশি ছিল।[১৫৩]

অন্যদিকে মধ্যযুগেও হিন্দু বিধবারা অতি দুঃসহ জীবনযাপন করতেন। অবশ্য সন্তানগণ বড় হলে এবং তারা মায়ের প্রতি যত্নবান হলে তা ছিল ভিন্ন ব্যাপার। বিধবাজীবনের দুর্বিসহ অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য এসময়ও প্রতিবছর অনেক হিন্দু নারী তাদের মৃত স্বামীর সাথে সহমরণে উদ্বুদ্ধ হয়।[১৫৪] *সতীদাহ প্রথা* বাংলার হিন্দু সমাজে মেয়েদের অবস্থা তখন আরো দুর্বিসহ করে তোলে।[১৫৫] এ *সতীদাহ প্রথা* বা বিধবাগণের তাদের মৃত স্বামীর সাথে একই চিতায় ভস্মীভূত হওয়াটাই বাংলার হিন্দু সমাজের বিরাট নৈতিক অধঃপতনের এক নিকৃষ্ট উদাহরণ। আবার হিন্দু সমাজে কন্যার চাইতে পুত্র সন্তানের কদর বেশি ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রায় সকল সমাজে পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যাসন্তানের গুরুত্ব কম ছিল। এমনকি কোথাও কোথাও কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হতো। কন্যা জন্মকে দুর্ভাগ্য হিসেবে বিবেচনার কাহিনী পাওয়া যায়।[১৫৬] তবে এ ধারার বিপরীতে এমন তথ্যও আছে যে, কন্যার জন্ম অনেকের কাছে আনন্দের ছিল। বিপ্রদাস পিপলাই এর *মনসাবিজয়* (পনেরো শতক), মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* (ষোলো শতক), দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* (ষোলো শতক), আলাওলের *পদ্মাবতী* (সতেরো শতক) ও মানিকরাম গাঙ্গুলীর *ধর্মমঙ্গল* (আঠারো শতক) কাব্যে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ উপলক্ষে আনন্দ করার উল্লেখ আছে।[১৫৭] তৎকালীন বিয়েতে যৌতুক প্রদানের ব্যাপারটিও পরিলক্ষিত হয়। কামতার (কামরূপ) শাসনকর্তা King Sukranka (১৪০০-১৪১৫ খ্রি.) কন্যার বিয়েতে দুটি হাতি, কয়েকটি ঘোড়া, প্রচুর সোনা ও রূপা যৌতুক হিসেবে প্রদান করেন।[১৫৮] অবশ্য তখন সমাজ যৌতুকপ্রথা মেনে নেয়নি এবং

---

[১৫৩] *Ibid,* p. 204

[১৫৪] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *বাংলার ইতিহাস : ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব ১৬৮৯-১৭২০*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫২-১৫৩

[১৫৫] *ঐ*, পৃ. ১৫৩

[১৫৬] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৯

[১৫৭] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯; মাহমুদা খাতুন, *মঙ্গলকাব্যে নারী*, ইতিহাস একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৯৪-৯৫

[১৫৮] *Deodhai Assam Buranji,* Assam : The Department of Historical and Antiquarian Studies, 1932, pp. 26-27; Nagendra Nath Acharyya, *The History of Medieval Assam : (from the thirteenth to the seventeenth century)*: a critical and comprehensive history of Assam during the first four centuries of Ahom rule, based on original Assamese sources, available both India and England, Omsons Publications, Gauhati & New Delhi, 1984, p.122

ধর্মীয়ভাবেও যৌতুক সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে ইসলাম ধর্মমতে বিয়ের সময় কনেকে 'মোহরানা' শোধ করার বিধান প্রচলিত ছিল, যা কেবল মুসলিম বিয়েতে ধার্য করা হতো।[১৫৯]

অন্যদিকে আর্থিক সচ্ছলতা, উচ্চশ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে বিবাহের ফলে তৎকালীন সমাজে মুসলমান মেয়েরা তাদের প্রতিপক্ষ হিন্দু মেয়েদের ন্যায় অতটা অসহায় ও পুরুষের উপর নির্ভরশীল ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য আফগানদের বিপর্যয়ের পর মুহম্মদ আমিনের স্ত্রী তাঁর স্বামীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করেন। কারণ স্বামী তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি স্বাধীনভাবে ধর্মীয় কাজে মনোনিবেশ করেন। প্রতিভাবান ও তেজস্বিনী জিন্নাতুননেছা তাঁর স্বামী উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা সুজাউদ্দিনের অত্যাধিক নারী আসক্তির স্পৃহা সহ্য করতে না পেরে তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করতে অস্বীকার করেন। তিনি পৃথকভাবে মুর্শিদাবাদে বাস করতেন এবং স্বামী থাকতেন উড়িষ্যায়।[১৬০] জিন্নাতুননেছার কন্যা দুরদানা বেগম ছিলেন সরফরাজ খানের অধীনে উড়িষ্যার নায়েব সুবেদার দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রী। দুরদানা বেগম স্বামীর উপর নানা বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৬১] মধ্যযুগে নারীর জন্য পর্দাপ্রথা ও আবরুপ্রথা সমাজে আভিজাত্য ও শিষ্টাচার বলে গণ্য করা হতো। যদিও ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আব্রু রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবু দেখা যায় ভারতের মুসলিম শাসকরা শুধু নারীর পর্দা বা আবরুর উপরই দৃষ্টিপাত করেন।[১৬২] ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৯) একডালা দুর্গের উপরে একজন নারীকে মুখমণ্ডলের পর্দা সারানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে সাথে সাথে তাঁর সাম্রাজ্যে মেয়েদের ধর্মানুযায়ী পর্দা পালন করার নির্দেশ প্রদান করেন।[১৬৩] ফিরোজশাহ তুঘলক ও সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫৭৭) নারীর জন্য ধর্মীয় পবিত্র স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। এ সময় বোরকা এবং পর্দা ঘেরা গাড়ী ছাড়া মেয়েদের চলাফেরা বন্ধ ঘোষণা করেন এবং বাড়িতে জেনানা মহল তৈরি করা হয়।[১৬৪]

---

[১৫৯] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 233-234

[১৬০] গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ, *সিয়ার উল-মুতাখ্‌খেরীন*, হাজী মোস্তফা (অনুদিত), প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৭৮৯, পৃ. ২৭৫

[১৬১] গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮১-২৮২

[১৬২] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭

[১৬৩] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 234

[১৬৪] Walter M. Gallichan, *Women Under Polygamy*, Alpha Edition, 2019, p.119; উদ্ধৃত, জ্ঞানেশ মৈত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮

পনেরো শতকে ইউরোপীয় পর্যটক বারবোসা বাংলার মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে বলেন যে, উচ্চ শ্রেণির ব্যক্তিরা তাদের মেয়েদেরকে এ সময় আন্দরমহলে আটক অবস্থায় রেখেছিল। তিনি আরো উল্লেখ করেন, এ সময় মেয়েরা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত, স্বর্ণখচিত রেশমি কাপড় এবং হীরা বসানো স্বর্ণ অলংকারে ভূষিত থাকতো।[১৬৫] আঠারো শতকে ইংরেজ লেখক ভেরেলেস্ট লিখেছেন, নারীকে অবরোধ অবস্থায় রাখা এক প্রকার আইন, যা অপরিবর্তনীয়। সমগ্র ভারতব্যাপী এ রীতি প্রচলিত ছিল এবং এটা মানুষের ধর্ম ও শিষ্টাচারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। তবে এ সময় সমাজে সাধারণত প্রচলিত বিষয় ছিল মেয়েদেরকে জনগণ যেন দেখতে না পায় বা পর্দার অন্তরালে রাখা।[১৬৬] আমীর খসরু তাঁর সাত বছর বয়সী কন্যাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, পর্দা পালনকারী নারী সমাজে প্রশংসা পায় এবং যারা বেপর্দা করে রাস্তায় বের হয় তারা অসম্মানিত হয়।[১৬৭] উল্লেখ্য বাল্যবিবাহের কারণে বাঙালি নারী তখন শিক্ষাদীক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু অভিজাত পরিবারে নারী শিক্ষা, জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করেন। তবে স্ত্রীলোক বেআবরু হওয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের চোখেই অমর্যাদাকর ছিল।[১৬৮] এজন্য উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণির হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারী পর্দা এবং অবগুণ্ঠন মেনে চলতো। গোলাম হোসেনের মতে, নবাব আলীবর্দী খান তাঁর স্ত্রীর নিকট পূর্বে খবর না পাঠিয়ে কখনও জেনানা মহলে প্রবেশ করেননি, কেননা সে সময়ে অন্য নারী সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে। এমনকি নবাব আলীবর্দী খানের প্রাসাদে আশ্রিত আফগান মহিলারা যতদিন পর্যন্ত হারেমে বসবাস করেছে ততদিন তিনি প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজ উদ-দৌলাকেও পূর্ব অনুমতি ব্যতিত তাঁর মাতামহীর সাথে দেখা করতে নিষেধ করে দেন। উল্লেখ্য সিরাজ উদ-দৌলার মাতা আমেনা বেগমও পর্দার অন্তরালে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিলেন।[১৬৯] প্রাক মুসলিম যুগে বাংলার হিন্দু সমাজেও পর্দা বা ঘোমটা প্রচলিত ছিল।[১৭০] হিন্দু সমাজের মেয়েদের জন্য যে অবগুণ্ঠন বাধ্যতামুলক ছিল, হিন্দু কবিদের বর্ণনায় তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ

---

[১৬৫] *ঐ*, পৃ. ১২৪

[১৬৬] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 235

[১৬৭] Amir Khusrau, *Ijaz-i-Khusravi*, Nawalkishore Press, Lucknow, 1876, pp. 120-121; Amir Khusrau, *Mathnawi the NUH SIPIHR (Sultan Nameh)*, (Eng. tr. R. Nath & Faiyaz Gwaliar), *India As Seen*, Historical Research Documentation Programme, Jaipur, 1981, p. 196

[১৬৮] H. Verelest, *A View of the Rise and Progress of the Present State of the English Government in Bengal*, J. Nourse, London, 1772, p. 108; K. K. Datta, *Alivardi and His Times*, World Press Private Limited, Calcutta, 1963, p. 89

[১৬৯] গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

[১৭০] M. Abdul Qader, "Purdah and Seclusion in Ancient India", *The Proceedings of the Pakistan History Conference*, 1953, pp. 281-287

পেয়েছে। এ ধরণের মনোভাব প্রকাশ করে রামপ্রসাদ লিখেন, "আমাদের সমাজে এটা কেমন ব্যাপার যে, একজন তরুণী অবগুণ্ঠনহীনা"।[১৭১] রাসসুন্দরী দেবীর জন্ম ১৮১০ সালে পাবনার একটি গ্রামে। তাঁদের পরিবারে কি ধরণের পর্দা পালন করা হতো, তার কোন বর্ণনা রাসসুন্দরী না দিলেও শশুরবাড়ি ফরিদপুরের একটি ছোট জমদারবাড়ীর অন্তঃপুরে কেমন পর্দা পালন হতো সে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এ সময় পর্দার কঠোরতার জন্য তাঁর (রাসসুন্দরী দেবী) স্বামী দিনের বেলায় অন্তঃপুরে স্ত্রীর সাথে দেখা পর্যন্ত করতে আসতে পারতো না।[১৭২]

এ সকল তথ্যে তৎকালীন সমাজে মেয়েদের কঠোর পর্দাপ্রথার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার আঠারো শতকের শেষে ১৭৯২ খ্রি. চার্লস গ্রান্ট পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর পরাধীনতার প্রসঙ্গটি বিশদভাবে আলোচনা করেন। গ্রান্ট স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের সাথে তুলনা করেন।[১৭৩] তবে পর্দাপ্রথার কঠোরতা সমাজে কতখানি ছিল সে বিষয়ে দ্বিমতও পোষণ করা যায়। কেননা বারবোসা একদিকে মুসলমান নারীর অবরোধের কথা বলেছেন আবার তিনি তাদের সৌন্দর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।[১৭৪] তিনি আরও উল্লেখ করেন, মুসলমান নারী যদি সম্পূর্ণরূপে আবরুদ্ধ থাকতেন তাহলে বিদেশি পর্যটকরা কিভাবে তাদেরকে দেখতে পান এবং তাদের সৌন্দর্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয় জানতে পারেন। এছাড়া নারী পুরুষের সাথে সাহিত্য-জ্ঞানের প্রতিযোগিতা করতেন, অভিজাত ঘরের মেয়েদের রাজনীতি করার স্বাধীনতাও ছিল[১৭৫] এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় তাঁরা নিজেদেরকে অবগাহিত করতে পারতেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য শাসক তুঘ্রিলের (১২৬৮-১২৮১) স্ত্রী একজন জ্যোর্তির্বিদ (Astronomer) ছিলেন।[১৭৬] অন্যদিকে তৎকালে নারী বিবাহ অনুষ্ঠানাদি এমনকি শোভাযাত্রাতেও অংশগ্রহণ করতেন।[১৭৭] এসকল দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, মুসলমান নারী গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁরা গৃহের বইরেও যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের পর্দাপালন

---

[১৭১] ভারতচন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫

[১৭২] গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৫

[১৭৩] *Parliamentary Papers (House of Commons), op.cit.*, p. 29; উদ্ধৃত, সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে*, ১৬ সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩

[১৭৪] *ঐ*, পৃ. ৪১

[১৭৫] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 235

[১৭৬] *Ibid*, p. 235-236

[১৭৭] Jadunath Sarkar, *Bengal Nawabs*, Asiatic Society, Calcutta, 1952, p. 153

করতে হতো এবং গৃহের বাইরে চলতে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করতে হতো। তবে পর্দার অন্তরালে বসবাস করলেও মুসলমান নারী সমাজে যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

রিয়াজ-উস-সালাতিনে মুঘল শাসনামলে অভিজাত পরিবারের মেয়েদের প্রভাবশালী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৭৮] মুঘল আমলে মুসলমান সমাজে অভিজাতদের মধ্যেও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, তবে হিন্দু নারীর তুলনায় মুসলিম নারী অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে বিয়ে হতো।[১৭৯] মুঘল সমাজের নারী তাদের পূর্ববর্তীদের তুলনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতেন। গুলবদন বেগমের বর্ণনা থেকে জানা যায়, হুমায়ুনের রাজকীয় হারেমের নারী তাদের পুরুষ বন্ধু ও দর্শনার্থীদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতেন। তাঁরা মাঝে মাঝে পুরুষের বেশে বাইরে যেতেন, পোলো খেলতেন এবং সংগীতে অংশগ্রহণ করতেন। মেয়েরা তীর ধনুক ব্যবহার ও অন্যান্য বাস্তবধর্মী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।[১৮০] বাংলার সমাজে নারীর অবস্থান সর্ম্পকে আলেকজান্ডার ডাউ লিখেছেন, ভারতের নারী এত পবিত্র যে এমনকি সাধারণ সৈন্যরাও হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের সময় তাদেরকে কোনোরূপ আঘাত করেনি। যুদ্ধে বিজয়ীর সমস্তরকম উল্লাস ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে হারেম ছিল নিষিদ্ধ ও পবিত্র স্থান ; এবং দুর্বৃত্তরা স্বামীকে রক্তেস্নাত করেও স্ত্রীদের পবিত্র অন্দরমহলে প্রবেশ না করে দ্বিধাভরে সংকুচিত হয়ে ফিরে এসেছে, অর্থাৎ তারা নারীকে অসম্মান করেনি।[১৮১] ফলে সহজেই অনুমান করা যায় এ সময় বাঙালি সমাজে নারী মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুসলিম শাসনামলে উচ্চ শ্রেণির শিক্ষিত ও প্রতিভাবান নারী সাধারণ লোকদের শ্রদ্ধা লাভ করেন এবং তাদের যুগের সামাজিক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য নবাব সুজাউদ্দিনের কন্যা এবং সরফরাজ খানের ভগ্নি নাফিসা বেগম ছিলেন একজন উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন নারী। তিনি সমাজে ব্যাপক সম্মান অর্জন করেন। আবার বাংলা প্রদেশে মীর্জা নাথানের জায়গীরে যখন তাঁর বোন আসতেন তখন শিকদার ও জমিদারগণ তাঁকে সম্বর্ধনা দিতো এবং অর্থকড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র উপহার দেয়। জাহাঙ্গীরনগরের সুবাদার ইব্রাহিম খানের স্ত্রী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে আতিথেয়তা প্রদান করেন। মীর্জা নাথান নিজের বোনকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করতেন। বহু মূল্যবান জিনিসপত্র এবং দাসদাসী

---

[১৭৮] গোলাম হুসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রী রামপ্রাণ গুপ্ত (অনুদিত ও সম্পাদিত), দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২০৫

[১৭৯] M. A. Rahim, *Social & Cultural History of Bengal*, Vol. II, Karachi, 1967, p. 167

[১৮০] গুলবদন বেগম, *হুমায়ুননামা*, মোস্তফা হারুন (অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৫৮

[১৮১] Alexander Dow, *History of Hindostan*, Vol. II, London, 1768, p. 82; cited, H. Verelest, *op.cit.*, p. 109

বোনকে উপহার দেন।[১৮২] অন্যদিকে নানা সময় সংকটাপন্ন অবস্থায় মুসলমানরা যখন দেখতেন যে তাদের স্ত্রী ও মেয়েদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারছেন না তখন তারা এদেরকে হত্যা করতেন।[১৮৩] আসাম অভিযানকালে অতিচরম অবস্থায় পড়ে মীর্জা নাথান ও তাঁর সৈন্যগণ তাঁদের স্ত্রী ও কন্যাদের সম্মান রক্ষার্থে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মীর্জা নাথান কিছু সংখ্যক মেয়েকে হাতির পিঠে চড়িয়ে পাঠিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যেন অনুচরবর্গ সহ এরা জওহর পান করে। এভাবে পঞ্চাশ থেকে আশিজন নারী সম্মান রক্ষার্থে তাদের জীবন বিসর্জন দেন।[১৮৪] ফলে দেখা যায় তৎকালীন বাংলার সমাজে নারীর মর্যাদাকে উঁচু স্তরে রাখা হয়েছে। এর পরবর্তি সময়ে ক্রমান্বয়ে সুলতানি আমলের তুলনায় মুঘল আমলে এসে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে বাংলার নারী প্রগতির দিকে অগ্রসর হন।

নবাবী আমলে বাংলা প্রদেশে মেয়েদেরকে প্রশাসন পরিচালনায় ও রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। নবাব আলীবর্দী খানের স্ত্রী শরফুন্নেসা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নারী যিনি সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি শুধু স্বামীর যুদ্ধাভিযানেই অংশগ্রহণ করেননি বরং রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি তাঁর স্বামীর একজন মূল্যবান উপদেষ্টা ছিলেন। নবাব আলীবর্দী খান স্বয়ং বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন; তবুও স্ত্রীর পরামর্শের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।[১৮৫] চার্লস স্টুয়ার্ট উল্লেখ করেন, নবাব আলীবর্দী খান কর্তৃক মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় শরফুন্নেছা বেগম সর্বপ্রধান রাজকর্মচারি হিসেবে কাজ করেন।[১৮৬] আলীবর্দী খান তাঁর তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জৈনুদ্দিনের মৃত্যুর পর শরফুন্নেসার পরামর্শে তাঁর জায়গায় দৌহিত্র সিরাজ উদ-দৌলাকে নিয়োগ দান করেন।[১৮৭] অন্যদিকে স্ত্রীর সাথে একমত হয়ে তিনি সিরাজ উদ-দৌলাকে তাঁর ভূ-সম্পত্তি ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।[১৮৮] নবাব সিরাজ উদ-দৌলার শাসনকালে শরফুন্নেসার এ প্রভাব অব্যাহত ছিল। কেবল তাঁরই মধ্যস্ততায় নবাব কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে আনীত ব্রিটিশ ইস্ট

---

[১৮২] এসকল দাসদাসীদেরকে তিনি আসামের এক পার্বত্য অঞ্চল হতে বন্দি করে আনেন। মীর্জা নাথান, *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, খালেদাদ চৌধুরী (অনুদিত), দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৬৬-৬৬৮

[১৮৩] মীর্জা নাথান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৩

[১৮৪] *ঐ*, পৃ. ৫৯৯

[১৮৫] M. A. Rahim, *op.cit.*, p. 170 ; গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬

[১৮৬] Charles Stewart, *History of Bengal,* Cambridge University Press, London, 1813, p. 211

[১৮৭] গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

[১৮৮] *ঐ*, পৃ. ৬৬

ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারি হলওয়েল ও অন্যান্য বন্দিদের মুক্তি দেন। শরফুন্নেছার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে হলওয়েল লিখেছেন যে, "তিনি ছিলেন এমন একজন নারী যাঁর জ্ঞান, মহানুভবতা, বদান্যতা ও অমায়িক ব্যবহার প্রভৃতি গুণের মধ্যে নারী জাতির উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রতিফলিত হয়েছে। সিংহাসন দখলকারী সিরাজ উদ-দৌলার মন্ত্রণায় তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল তবে রাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করা হতো না; কারণ সিরাজ উদ-দৌলা জানতেন যে, শরফুন্নেছা অনেক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবেন এবং সবসময় করেছেন। তিনি মনে করতেন যে এরূপ রাজনীতি পরিবারের ধ্বংসের কারণ হবে"।[১৮৯] মূলত নবাবী আমলে এসে বাংলার নারীর কার্যক্রমের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় যা তাদের আত্মউন্নয়নের একটি ইতিবাচক দিক।

একজন উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিভাবান নারী ছিলেন ঘষেটি বেগম। তিনি ছিলেন আলীবর্দী খানের জ্যৈষ্ঠ কন্যা এবং বাংলার দিওয়ান ও জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব সুবাদার নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর ঘষেটি বেগমকে নবাব আলীবর্দী খান বাংলা সুবার দিওয়ানরূপে নিযুক্ত করেন। তিনি বিচক্ষণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তবে ঘষেটি বেগম খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আলীবর্দীর রাজত্বের শেষের দিকে তিনি সিরাজ উদ-দৌলাকে মসনদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তিনি কৌশলে অর্থ বিতরণ করেন এবং এ অর্থ মীরজাফরের নিকটও প্রেরণ করেন যাতে নবাব সিরাজ উদ-দৌলার বিরুদ্ধে অধিক সংখ্যক সমর্থক সংগ্রহ করা যায়।[১৯০] অন্যদিকে নবাব আলীবর্দীর কনিষ্ঠ কন্যা ও নবাব সিরাজ উদ-দৌলার মাতা আমিনা বেগম তাঁর সুরুচি ও শিষ্টাচারের গুণে সে যুগের সমাজ জীবনের উপর গভীর প্রভাব রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের নারী এবং অনাথ ও গবির দুঃখীদের আশ্রয়স্থল। উল্লেখ্য তিনি রাজকানয়ার নামের এক ক্রীতদাসীকে শিক্ষিত করে তোলেন এবং পরে তাকে লুৎফুন্নেছা নাম দিয়ে স্বীয় পুত্র সিরাজের সাথে বিয়ে দেন।[১৯১] আমেনা বেগম প্রশাসনিক বিষয়েও ভূমিকা রাখেন। ইংরেজদের বিবরণ থেকে জানা যায় সিরাজ উদ-দৌলা আলীবর্দীর অসুস্থ অবস্থায় প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশুনা করেন।[১৯২] তিনি জাহাঙ্গীরনগরের ঘষেটি বেগমের দিওয়ান রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক বিপুল অর্থ আত্মসাতের তথ্য জানতে পেরে তাকে মুর্শিদাবাদে অন্তরীণ করেন। কিন্তু

---

[১৮৯] Dr. Halwell, *Interesting Historical Documents*, Vol. I, p. 170; cited, Brajendra Nath Banerjee, *Begams of Bengal*, S. K. Mitra, Calcutta, 1942, p. 12

[১৯০] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৮১; গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮

[১৯১] *ঐ*, পৃ. ৫৮৫

[১৯২] গোলাম হেসেন তাবাতাবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪২

মায়ের আদেশে সিরাজ উদ-দৌলা রাজবল্লভসহ আরো অনেক ইংরেজ বন্দিকে মুক্তি দেন।[১৯৩] সিরাজ উদ-দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেছা ছিলেন তৎকালে মেয়েদের আদর্শ। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে নিজের গুণাবলির দ্বারা সমাজে সম্মানিত হন এবং নবাবের স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের উচ্চ অন্তঃকরণ সম্পন্ন নারী, যিনি সবসময় বিপদে আপদে স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন। এছাড়া সে সময় সংগীতনিপুণ মুন্নী বেগম সামান্য অবস্থা হতে স্বীয় গুণাবলির দ্বারা মীর জাফরের প্রধান স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেন। মীর জাফরের নবাবী আমলে মুন্নী বেগম শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালক নবাবদের অভিভাবক হিসেবে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বিবেকহীন ও উচ্চাভিলাষী হলেও মুন্নী বেগম খুব কর্মক্ষম, বুদ্ধিমতি ও দৃঢ়চরিত্রের নারী ছিলেন।[১৯৪]

বাংলায় মুসলমান শাসনামলে অনেক নারী সাহস, শক্তি ও বীরত্বের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। আফগান নারীগণ বহুবার তাঁদের সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁরা পুরুষের বেশে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং অনবরত তীর বর্ষণ উপেক্ষা করে দিল্লীর দুর্গ রক্ষা করেন।[১৯৫] সুলতান রাজিয়া তৎকালীন পর্দাপ্রথা ছেড়ে পুরুষের বেশ ধারণ করে মাথায় পাগড়ি, পায়জামা, কোটি এবং কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে সুলতানদের চিরাচরিত পোশাকে সজ্জিত হয়ে প্রকাশ্যে রাজ দরবারে রাজকার্য পরিচালনা করেন।[১৯৬] উল্লেখ্য ইলতুতমিশ তাঁর পুত্র সন্তান থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতা বেশি থাকায় কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন।[১৯৭] অন্যদিকে আহাম্মদনগরের চাঁদ সুলতানার বীরত্বগাঁথা সুবিদিত। মহব্বত খাঁর বিরুদ্ধে নূরজাহানের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ইতিহাসের একটি সুপরিচিত ঘটনা। দারার কন্যা ও শাহজাদা মুহম্মদ আজমের স্ত্রী জাহানজেব বানুর (জানী বেগম) অসামান্য সাহস উল্লেখযোগ্য, ১৬৮২ সালে এক যুদ্ধে

---

[১৯৩] *ঐ*, পৃ. ২১৬

[১৯৪] গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ উল্লেখ করেন যে, মুন্নী বেগম একজন বুদ্ধিমান নারী ছিলেন। নাবাব ছিলেন : নজম উদ্দৌলাহ (১৭৬৫-৬৬ খ্রি.); মুবারক উদ্দৌলাহ (১৭৬৬-৭০ খ্রি.) এবং সায়েফ উদ্দৌলাহ (১৭৭০-৯৩ খ্রি.)।

[১৯৫] মো. এ. রশীদ (সম্পাদিত), *তারীখ-ই-দাউদী*, আলীগড়, ১৯৫৪, পৃ. ৩৩৭

[১৯৬] মীনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনুদিত ও সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩ পৃ. ২১০; Isami, *Futhus Salatin or Shah Namah-i-Hind,* (ed. Aga Mahdi Hussain), Asia Publishing House, London, 1967, p.144

[১৯৭] এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ : সুলতানি পর্ব)*, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৬৪-৬৫; Lyn Reese, 'Sultana Razia', Ruth Ashby And Deborah Gore Orhan (eds.), *In history : Women Who Changed the World*, Viking, 1995, pp. 34-36 ; David E. Jhones, *Women Warriors : A History*, Brassels, 2005, p. 112

তিনি মারাঠাদের হটিয়ে দেন।[১৯৮] শরফুন্নেছা বেগম মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে নবাব আলীবর্দীর সহগমন করেন।[১৯৯] গাউসখানের বিধবা স্ত্রী একদল মারাঠা লুণ্ঠনকারীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ভাগলপুরে তাঁর গৃহ রক্ষা করেন।[২০০] আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফরিদপুর জেলার কার্তিকপুর গ্রামের মুন্সী ইমামদ্দী চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী চাঁদবিবি রাজ্য রক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। একটানা দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ করে শত্রুর নিকট পরাজিত হলেও তাঁর বীরত্ব ছিল গৌরবময়।[২০১] আবার হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের বোন মন্নুজান খানম (১৭১৭-১৮০৩), তিনি নিজেই জমিদারি দেখাশোনা করতেন এবং মোহসীন ট্রাস্ট ফান্ড তাঁরই সৃষ্টি।[২০২] এ সকল ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমান শাসনামলে বাংলার নারী হেরেমে সাধারণ পর্দাপ্রথার মধ্যে অবরুদ্ধ ও পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকা সত্ত্বেও তারা এ প্রদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকার কথা স্বীকার করতে হবে। কেননা নারী যারা বিভিন্নভাবে সমাজে ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা অধিকাংশ সময় তাদের স্বামী, পিতা বা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতার মাধ্যমেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ যদি প্রগতিশীল হয় তবে সেখানে নারী উন্নয়ন সম্ভবপর হয়।

মুসলমান শাসনামলে হিন্দু সমাজেও কিছু সংখ্যক প্রতিভাবান নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের নায়িকা বিদ্যার ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তৎকালে উচ্চ শ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত নারী ছিলেন। তাঁরা সাহিত্য বিষয়ে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন।[২০৩] নাটোরের জমিদার পরিবারের রানী ভবানী একজন খ্যাতনামা নারী ছিলেন। জমিদারি শাসনে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার এবং জনসাধারণের কল্যাণে বদান্যতার জন্য তিনি সে যুগের সমাজে উচ্চ আসন লাভ করেন।[২০৪] জনৈক জমিদারের স্ত্রী জয়দুর্গা চৌধুরাণী রংপুরের একজন অত্যাচারী জমিদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। অন্য একজন উল্লেখযোগ্য নারী দেবী চৌধুরাণী কোম্পানির শাসনামলে

---

[১৯৮] Jadunath Sarkar, *History of Aurangzib*, M.C. Sarkar, Calcutta, 1912, p. 278

[১৯৯] গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১-১৩; গোলাম হুসেন সলীম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৭

[২০০] *ঐ*, পৃ. ৩১৮

[২০১] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩

[২০২] *ঐ*

[২০৩] ভারতচন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৫-২৮৬

[২০৪] K. K. Datta, *op. cit.*, p. 146

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় রংপুর কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[২০৫] উল্লেখ্য হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথা ও অন্যান্য সামাজিক-ধর্মীয় অনুশাসনের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম শাসনামলেও বাংলার বহু নারী ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। মুঘল শাসনামলে সতীদাহ নিবারণের কিছুটা চেষ্টা করা হয়।[২০৬] তবে ধর্মান্তরিত মুসলিম নারী তাদের চিরাচরিত অভ্যাস বদলাতে পারেনি। এজন্য বাঙালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহ চালু হয়, মেয়েদের পছন্দ করার অধিকার (বর নির্বাচনে) বাতিল হয়, বিধবারা হিন্দুদের মতো বৈধব্য পালন করতে থাকে ও কৌলীন্যপ্রথার মতো মুসলিম সমাজে অভিজাত শ্রেণির সৃষ্টি হয়।[২০৭] দীর্ঘদিনের মুসলিম শাসন, বিদেশি মুসলমানদের আগমন এবং মুসলিম দরবেশদের কার্যাবলীর দ্বারা বাংলায় অতি দ্রুত মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বহুদিন একসাথে বসবাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমান একে অপরকে স্বভাবতই বেশ প্রভাবিত করে।[২০৮] তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পাঠান ও মুঘল আমলে বাংলার সাধারণ নারীসমাজের মর্যাদা তেমন একটা বৃদ্ধি পায়নি বরং শিক্ষাসহ বিভিন্ন অধিকার অভিজাত পরিবারের নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নারী এ সময় বিভিন্নভাবে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলার সমাজ উন্নয়নের জন্য ধনী গরীব নির্বিশেষে সকল নারীর অগ্রগতি প্রয়োজন ছিল।

বাঙালি নারীর পতিভক্তি সম্পর্কে প্রায় সকল ধর্মগ্রন্থে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মধ্যযুগে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীভিত্তিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যাপক ধর্মান্দোলন হিন্দু সমাজে পতিভক্তির ধারণাকে অনেকটা শিথিল করে দেয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে তা দৃঢ় ছিল। শেখ সুলায়মানের *অসিয়তনামায়* (ষোলো শতক) বলা হয়েছে, পরপুরুষের সাথে নারী যদি 'পরদার' করে এমনকি সে পরপুরুষকে দেখে, তার সাথে হাসাহাসি করে, তার দ্রব্য খায়, সেজেগুজে তাকে মুখ দেখায়, তাহলে নরকের আগুনে ছারখার হওয়া

---

[২০৫] উত্তরবঙ্গের জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর স্ত্রী দেবী চৌধুরাণীর বীরত্বের কথা সর্বজনবিদিত। অন্য একজন জমিদারের আক্রমণে তাঁর স্বামী ও পুত্র নিহত হলে তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দস্যুদলে যোগ দেন এবং পরে তাদের নেতা নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য ১৭৮০ সালে ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে দেবী চৌধুরাণী নিহত হন। জনসাধারণ তাঁকে দেবীতুল্য মনে করতো। কারণ তিনি ধনীর অর্থে গরীবের দুঃখ দুর করতেন। (মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২; K. K. Datta, *op.cit.*, p. 247)

[২০৬] Vincent A. Smith, *History of India*, Vol. II, cosmo-classics, New York, 1906, pp. 376, 400, 496 and 568; *Akbar The Great Mogul (1542-1605)*, Clarendon Press, Oxford, 1917, pp. 226 and 382; Francis Bernier (Eng. tr.), *Travels in the Mogul Empire*, Vol. I, William Piekering, London, 1826, pp. 44-45

[২০৭] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭

[২০৮] Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and his times*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1963, p. 237

তার জন্য অনিবার্য।[২০৯] এছাড়া সৈয়দ নূরুদ্দীনের *দাকায়েকুল হকায়েক* (আঠারো শতক) এবং আবদুল্লাহর *দোককাতুন নাছেহীন* (আঠারো শতক) গ্রন্থে উপদেশ দেওয়া হয় যে, স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি সর্বদা ভক্তিভাবাপন্ন থাকতে হবে; স্বামীর আহবানে সময়োচিত সাড়া দেওয়া তার কর্তব্য; স্বামীর অনুমতি না নিয়ে বাইরে যাওয়া পাপ এবং স্বামী রাগ করলেও স্ত্রী উত্তর দেবেনা বরং করজোড়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। স্ত্রীদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় যে, স্বামীর প্রতি কটূক্তি করলে জিহবা সত্তর গজ লম্বা হয়ে যায় এবং স্বামীকে দুর্বল ও দরিদ্র বলে অভিহিত করলে সত্তর বছরের পুণ্য নষ্ট হয়।[২১০] অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে নারীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আবার মুঘল আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসনের উনিশ শতক পর্যন্ত নারী পুরুষে নৈতিকতার বৈষম্য প্রচলিত ছিল। ঘরের স্ত্রীর সতিত্ব সম্পর্কে সমাজ ছিল কঠোর। পর্দার আড়ালে আটকিয়ে রেখে বলা হতো স্ত্রী হবে একজন পুরুষ অর্থাৎ স্বামীর প্রতি একমন, একপ্রাণ। কিন্তু স্বামীরা স্ত্রী অন্তপ্রাণ নয়। মুঘল আমলে বাদশাহ, নবাব, আমীর-উমরাহ, জমিদার, জায়গিরদার, রাজকর্মচারি, সেনানায়ক ও ধনী ব্যবসায়ী প্রকাশ্যে বাইজি রাখতো। আলাদা বাড়ি তৈরি করে তারা রক্ষিতা পালন করতো এবং সেখানে মদ্যপান, সংগীতচর্চার সাথে নারীসঙ্গ করতো।[২১১] বাড়িতে স্ত্রী রেখে কলকাতার বাবুরা রক্ষিতা ও উপপত্নীর সাহচর্যে জীবন কাটাতো। ভবানীচরণের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩) থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'(১৮৪০) প্রকাশ অবধি গৃহবধূদের প্রতি স্বামীদের চরম ঔদাসীন্যের অজস্র প্রমাণ মেলে। এসব পুরুষের অনেকেই রক্ষিতার জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নিয়ে বলগাহীন প্রতিযোগিতা চালাতেন।[২১২] তৎকালে পুরুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত হওয়া প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে সমাজে কোনঠাসা করে রাখাও ধর্ম বিরোধী ছিল।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে (১৭৫৭-১৮৫৭) জাতিগত আত্মিক বৈশিষ্ট্যের অধঃপতন ও অবক্ষয় ঘটে। অর্থাৎ সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে ধর্মের নামে পর্দাপ্রথা বা অবরোধপ্রথার নামে মেয়েদের ঘরে আটকিয়ে রাখা এবং পিতৃতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য নারীকে দমিয়ে রাখার প্রবনতা থাকলেও

---

[২০৯] সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৪৯-৬৪

[২১০] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

[২১১] মাহমুদা ইসলাম ও বিলকিস রহমান, "পরিবার সনাতন থেকে আধুনিক", *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৫

[২১২] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, এস. কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯০৯, পৃ. ৫৫; সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮-১৯

তখন বাংলার নারী অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু ইংরেজ শাসন শুরু হলে নারী উন্নয়নের এ ধারা ব্যাহত হয়। তখন পুঁথি সাহিত্যের নমুনায় মেয়েদের অধঃপতিত রূপে চিহ্নিত করা হয়। পুঁথি লেখকগণ মেয়েদের অবিশ্বাসী এবং নীচু মানসিকতার অধিকারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন।[২১৩] মূলত ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কর্তৃক দিওয়ানী গ্রহণের মধ্যদিয়ে বাংলার রাজনীতির সাথে সাথে সমাজের চিত্রও বদলে যায়। ফলে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান আর পূর্বের মত থাকে না। ইরেজ শাসনের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত এদেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চালু ছিল এবং তা সমাজের সর্বস্তরে রক্ষণশীল ভাবধারা সৃষ্টি করে। এ ধরণের সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে নানা প্রথা ও বিধিনিষেধ জারি করে প্রকারান্তে নারীকে শোষণ ও নির্যাতন করা হয় এবং সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়।[২১৪]

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় আঠারো শতকেও বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল। আবার হিন্দু ধর্মীয় স্মৃতিগ্রন্থে কন্যাকে বাল্য বয়সে বিয়ে দেওয়ার বিধান রয়েছে।[২১৫] এ সময় মুসলমান সমাজে কঠোর পর্দাপ্রথার জন্য ছেলে মেয়ের মধ্যে মেলামেশা ও দেখাশুনার সুযোগ ছিল না। কাজেই বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে অভিভাবকদের উপর বিশেষ করে পুরুষের উপর ন্যস্ত ছিল। মুসলমান পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ বিবাহ স্থির করতেন; তবে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নারী চাক্ষুষ কনেকে দেখে তার রূপগুণ সম্পর্কে মতামত দিতেন। উল্লেখ্য উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে এসবের বিরুদ্ধে অনেকে প্রতিবাদ শুরু করে।[২১৬] কেননা শৈশবে পিতৃগৃহে, বাল্যকালে ও কৈশোরে স্বামীগৃহে অসম্মান ও অনাদর জুটতো প্রায় সব বাঙালি নারীর ভাগ্যে। বৈধব্য ও সাপত্নের অভিশাপ ছাড়াও অসম বয়স্ক বিবাহ, স্বামীর দায়িত্বহীনতা প্রভৃতির আঘাতেও জর্জরিত হতো নারীর জীবন। লেখাপড়া শিখলে হিন্দু নারী বিধবা হয় এমন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেও। আবার শশুর বাড়ির নির্মম পরিবেশে বধূ নিজেকে দাসীর অধিক কিছু ভাবতে পারতো না। গৃহকাজে নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য দেখিয়ে ‘ভাল বউ’ হওয়ার প্রত্যাশায় নারী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করে যেতেন। একান্নবর্তী পরিবারের এসব ভাল বউদের

---

[২১৩] Sonia Nishat Amin, *op.cit.*, p. 47

[২১৪] *Ibid*

[২১৫] অতুল সুর, *ভারতে বিবাহের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৬

[২১৬] Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905*, Princeton University Press, USA, 1984, p.124

দাসীবৃত্তি চরমে পৌঁছাত।[২১৭] ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলায় হিন্দু নারীসমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের শুরুতে মুসলিম নারীর ন্যায় হিন্দু সমাজেও নারীর মৌলিক মানবাধিকার বলতে প্রায় কিছুই ছিলনা। এ প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায় বলেন, একই সঙ্গে রান্না করতে পারে শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সাথে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হতো না।[২১৮] মূলত অবরোধপ্রথা, নারীসমাজে শিক্ষার অনগ্রসরতা ও বাল্যবিবাহ এ সবই উনিশ শতকে বাংলার হিন্দু-মুসলিম নারীকে মধ্যযুগীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থানে নিশ্চলাবস্থায় রেখে তাদের প্রগতির পথকে রুদ্ধ করেছিল।[২১৯]

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়ে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্যদিয়ে বাংলার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন ঘটলেও দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। তবে সভ্যতার শুরুতে সমাজে নারীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। প্রচীনকালে কিছু ক্ষেত্রে নারী সীমিত পরিসরে সুযোগ সুবিধা পেলেও ধর্মীয় অনুশাসনের নামে তাদের দমিয়ে রাখার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর বিশেষ করে মধ্যযুগে অভিজাত পরিবারের নারী গৃহ অভ্যন্তরে শিক্ষাসহ নানা সুযোগ সুবিধা পায় এবং সীমিত পরিসরে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু দেখা যায়, নারী অবমাননার শিকারই বেশি হয়েছেন। নারী বিক্রি হয়েছে কখনও বিবাহের নামে স্ত্রীরূপে, কখনও নর্তকী-বাইজীরূপে, কখনও পূর্ণতর দাসীরূপে। এক স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী দাসী ক্রয়ের কথা পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায়। আঠারো শতকেও বাঙালি নারী বিক্রি হয়েছে বিশেষ করে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭০ খ্রি.) সময়। এসময় দারিদ্রের কারণে অনেকে কন্যাশিশু বিক্রি করেছেন মর্মে জানা যায়। উপরন্তু বাঙালি সামাজের অবরোধপ্রথা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল নারীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। অবগুণ্ঠনকে সতীত্ব এবং অবরোধপ্রথাকে কুলমর্যাদা জ্ঞাপনের অভিজ্ঞান করে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। ব্রিটিশ

---

[২১৭] রাস সুন্দরী দেবী, *আমার জীবন*, কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫২; প্রবোধ কুমার সান্যাল, “মেয়েদের একাল-সেকাল”, *আনন্দ বাজার*, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩

[২১৮] রাজা রামমোহন রায়, *রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী*, রাজ নারায়ণবসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (সম্পাদিত), এস. এন, এস. আই, কলিকাতা, ১৮৭৩, পৃ. ২০৫

[২১৯] Usha Chakraborty, *Condition of Bengali Women Around the 2nd Half of the 19th Century*, The University of Verginia, 1963, p. 38; চন্দ্রকান্ত সেন, *বামাসুন্দরী বা অর্দশ নারী*, কলকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২

শাসন প্রতিষ্ঠার পর বিশেষ করে উনিশ শতকে এসে বাংলার মেয়েদের অবস্থা পূর্বের তুলনায় আরো বেশি শোচনীয় হয়। এ সময় পর্দাপ্রথার কঠোরতা অভিজাত রক্ষণশীল পরিবারগুলিতে অতি মাত্রায় বলবৎ ছিল। যে যতো বেশি অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতো সমাজে সে ততো বেশি প্রশংসিত হতো এবং এটাকে আভিজাত্যের প্রতীক বলে মনে করা হতো। অবরোধের কঠোরতা অনুসারে ভদ্রবংশের মাপকাঠি নির্ণয় করা হতো। যার গৃহে যত কঠোর অবরোধ প্রচলিত, তিনি তত ভদ্র বা শরীফ। সতীত্ব, পতিব্রত্য ও নারীত্বের মহিমায় নারীসমাজকে বিভোর রেখে এবং ধর্মীয় অনুশাসনের নামে সমাজপতিদের চাপিয়ে দেওয়া বিধি-নিষেধ তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে শৃংখলিত করে রাখে। বিয়ে, তালাক, বহুবিবাহ এ সকল ক্ষেত্রে পুরুষের যথেচ্ছাচার ধর্মের নামে চালু রাখার মাধ্যমে নারীর সামাজিক নিপীড়ন বেড়ে চলে। উনিশ শতকের শেষের দিকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মাধ্যমে বাঙালি সমাজে মানসিকতার পরিবর্তনের প্রভাবে ধীরে ধীরে নারীর সার্বিক অবস্থার উন্নতি হওয়া শুরু করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসার : স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিনির্মাণ

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে জীবনঘনিষ্ট ও যুগোপযোগী শিক্ষা অপরিহার্য। ব্রিটিশ শাসন শুরু হবার পূর্বে বাংলায় দেশি ও সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণরা গ্রাম্য 'টোলে' এবং মুসলিম মৌলভীরা মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করতেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা ও মক্তব। এ পাঠশালা ও মক্তবে গুরু এবং মৌলভীরা স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতেন। তবে পর্দাপ্রথা মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের (মাদ্রাসায়) শিক্ষা গ্রহণের অন্তরায় ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে নানা জায়গায় আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন শুরু হয়। তবে সে সময় যে সামাজিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল তাতে মেয়েদের ঢালাওভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব ছিল না। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়েদের কঠোর অবরোধপ্রথা, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ইত্যাদি নারীশিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। উনিশ শতকে বাংলায় রেনেসাঁস তথা আধুনিকতার সূত্রপাতে বাঙালি মানসে ব্যাপক সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। এ সময় মুসলমানরা ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ক্রমে অনুরক্ত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে পুরুষের পাশাপাশি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করে। বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে প্রথম দিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মিশনারিরা বাংলার বিভিন্ন জায়গায় নারীশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান তথা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। পরবর্তীকালে নারীশিক্ষা প্রসারে এদেশীয় সমাজ সংস্কারক ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয় এবং রক্ষণশীলদের বিরোধিতা সত্ত্বেও নারীশিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে যেতে থাকে।

বাংলায় মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে মুসলমান পুরুষের পাশাপাশি মুসলিম মেয়েদের ভূমিকাও ছিল অগ্রগণ্য। উনিশ শতকের শেষের দিকে পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা কার্যক্রম প্রসারে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ১৮৭৩ সালে পূর্ব বাংলায় *শুভসাধিনী সভা* কর্তৃক *ইডেন ফিমেল স্কুল* প্রতিষ্ঠা এবং একই বছর কুমিল্লায় *ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়* প্রতিষ্ঠা নারীশিক্ষা বিস্তারে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিশ শতকের প্রথম দশকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়* প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে পূর্ব বাংলায় মেয়েদের জন্য অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে যার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

বাংলায় শিক্ষার ইতিহাসের ক্রমধারায় নারীশিক্ষা বিষয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, আর্য সভ্যতা (১৫০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বা বৈদিক যুগের পর মহাকাব্যের যুগে (রামায়ণ ও মহাভারত খ্রিস্টপূর্ব ৪০০-৪০০খ্রি.) সাধারণ কুলকন্যাদের শিক্ষার কোন অধিকার ছিল না। প্রাচীন বাংলায় পাল যুগ (৭৫০-১১৭৪খ্রি.) এবং সেন যুগে (১০৭০-১২৩০খ্রি.) মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন পরিলক্ষিত না হলেও এসময় নানা গুণে গুণান্বিতা নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। বিলাসবজ্রা নামে গৌড়ের এক বৌদ্ধ ভিক্ষু পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ শাস্ত্র রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। সেন যুগে বিজয় সেনের স্ত্রী বিলাসদেবী ও রাজ অন্তঃপুরে বেশ কয়েকজন বিদূষী নারীর অবস্থানের কথা জানা যায়।[২২০] সেন যুগে অল্পবয়সে বিবাহিত মেয়েরা খুব কমই শিক্ষালাভের সুযোগ পেত। অবশ্য এ দিক হতে শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের কন্যাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। *পবনদূত কাব্যে* বিজয়পুরের মেয়েদের তালপাতায় প্রেমপত্র রচনার উল্লেখ হতে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২২১] আবার *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে সেন আমলে গ্রামের সাধারণ মেয়েদের গান রচনার উল্লেখ আছে।[২২২] ফলে দেখা যায় প্রাচীন বাংলায় পাল আমলের তুলনায় সেন আমলে শিক্ষা লাভের সুযোগ বেশি পায়।

পনেরো শতকে ইন্দ্রমুখী নামক একজন মহিলা কবির কথা জানা যায়। ষোলো শতকে অদ্বৈতাচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী এবং নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবাদেবী বৈষ্ণবশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ সময় চন্দ্রাবতী নামে একজন মহিলা কবি রামায়ণ গীতি, মনসাদেবীর গান, মলুয়া ইত্যাদি কাব্যকাহিনী রচনা করেন।[২২৩] চন্দ্রাবতী তাঁর পিতা বংশীদাস ভট্রাচার্যের আগ্রহে লেখাপড়া শিখেছিলেন। সতের শতকের প্রথম দিকে কাব্য, সাহিত্য ও ব্যাকরণে প্রিয়ম্বদা দেবী পারদর্শিতা লাভ করেন। কাছাকাছি সময়ে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন বৈজয়ন্তীদেবী। শ্রীনিবাস আশ্চার্যের পত্নী পদ্মাবতী এ শতকে শাস্ত্রজ্ঞান এবং সংগীতে পারদর্শিতা লাভ করেন। আবার লাইলী-মজনু কাব্যে সমসাময়িক কালে পাঠশালায় সহ-শিক্ষার কথা উল্লেখ আছে (সুন্দর বালকগণ অতি সুচরিত একস্থানে সভানে করএ আনন্দিত/সেই পাঠশালায় পড়ে কত বালা/সুচরিত সুললিত নির্মল উজ্জ্বলা)।[২২৪] আঠারো শতকে

[২২০] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২

[২২১] ধোয়ী, *পবনদূত*, শ্লোক নং ৩৮, পৃ. ১৪; উদ্ধৃত, এস এম রফিকুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেনযুগ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৯১

[২২২] শ্রীধরদাস (সংকলিত), *সদুক্তিকর্ণামৃত*, ২/১১৮/৩, শ্লোক নং ১০৬৩, পৃ. ২৮৪; এস এম রফিকুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*

[২২৩] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৩৯

[২২৪] এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, "বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য", *ধারাবাহিক লেকচার-৩*, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১০. ০৭. ২০১৯

আনন্দময়ী ও গঙ্গা কিছু গান রচনা করেন। এসব নারী ছাড়াও বাংলা কাহিনী কাব্যে 'বিদ্যা'র মতো লেখাপড়া জানা কতিপয় নারীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এসব দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, লেখাপড়া শেখার অথবা সাহিত্য রচনার ক্ষমতা বাংলার মেয়েদের প্রাচীন কাল থেকেই ছিল।[২২৫] সমসাময়িক কালে আরো দু'জন শিক্ষিত নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। একজন হটী বিদ্যালঙ্কর এবং আরেকজন রূপমঞ্জুরী ওরফে হটু বিদ্যালঙ্কর। এ দু'জন নারী রীতিমত পণ্ডিতদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। উল্লেখ্য তখন যে স্বল্প সংখ্যক নারী পড়ালেখা করতেন তারা অনেকেই বিধবা ছিলেন। তাঁরা লেখাপড়া শিখতেন ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্য, নয়তো জমিদারি দেখাশোনার জন্য। এজন্য নারী জমিদাররা হিসাবশাস্ত্র বেশি করে আয়ত্ব করতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সহায়তা তাঁরা বিদ্যার্জন করতেন।[২২৬]

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অভিজাত পরিবারের মুসলমান বালিকারা যেন তাদের ধর্মীয় মূলনীতি, কোরআন পাঠ ও ধর্মের ক্রিয়াকর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সেজন্য পিতামাতা কন্যাদের শিক্ষিত করে তোলা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাই অভিজাত মুসলিম পরিবারে মেয়েদের ধর্মশিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে গৃহে শিক্ষাদানের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হতো। বালক ও বালিকাদের 'বিসমিল্লাহ্খানি' অনুষ্ঠানের দ্বারা অক্ষর পরিচয় শুরু হতো।[২২৭] সুলতানি ও মুঘল আমলে সাত বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা ছেলেদের পাশাপাশি মসজিদ ও মক্তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ পেত। তবে আনুষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা এসময় ছিলনা বলে জানা যায়।[২২৮] পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলা ভ্রমণের সময় তেরটি মহিলা মাদ্রাসা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[২২৯] সুলতান ইলতুতমিশের কন্যা সুলতান রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০) পড়ালেখা জানতেন। সুলতান ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহের (১৩৪৯-১৩৫২) স্ত্রী একজন শিক্ষিত নারী ছিলেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা উল্লেখ করেন, মালবের সুলতান গিয়াসউদ্দিনের (১৪৬৯-১৫০০) হারেমে পনের হাজার নারী ছিলো এবং

---

[২২৫] গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৯

[২২৬] *ঐ*, পৃ. ২৩

[২২৭] M.A Rahim, *Social and Cultural History of Bengal (1203-1576)*, Vol. I, Pakistan Historical Society, Karachi, 1963, p.139

[২২৮] আরিফা সুলতানা, "উনিশ শতকে বাংলায় নারী শিক্ষা", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৫-২৬, বর্ষ ১৪০৫-১৪০৮/ ১৯৯৮-২০০১, পৃ. ১৩৬-৩৭

[২২৯] ইবনে বতুতা ১৩৪৬ সালে বাংলা ভ্রমণ করেন। পরবর্তীতে তিনি *রেহালা* নামক গ্রন্থে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। (H. A. R Gibb, *Ibn Batuta : Broadway Travellers Series*, Vol. IV, Cambridge, London, 1929, pp. 330-331)

তাঁদের মধ্যে বহু শিক্ষয়িত্রী, কুরআন শরীফ তেলাওয়াতকারী, গায়িকা ও অন্যান্য বৃত্তিধারী নারী ছিলেন।[২৩০] খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, শিক্ষয়িত্রীগণ রাজ অন্তঃপুরে মেয়েদের শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অন্যদিকে সুলতানি আমলে মেয়েদের সাহিত্য প্রতিভার কথা জানা যায়। হাসানহাটির জনৈক কাজীর স্ত্রী হিন্দুশাস্ত্রে খুবই পারদর্শী ছিলেন।[২৩১] 'গদাইমল্লিকের পুঁথি' বা *মল্লিকার হাজার সওয়াল* (মল্লিকার হাজার প্রশ্ন) নামক কাব্য হতে জানা যায়, মল্লিকা নামে একজন মুসলমান বালিকা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন।[২৩২] কবি আবদুল হাকিমের 'সয়ফুল মূলক পুঁথি' নামক অন্য একটি সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায়, এ প্রেম কাব্যের নায়িকা লালমতি (লালবানু) সর্ববিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন।[২৩৩] অন্যদিকে বাউলদের মধ্যে প্রচলিত একটি কিংবদন্তী অনুসারে জনৈক শিক্ষিত মুসলমান নারী মাধব বিবি ছিলেন বাউল মরমি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।[২৩৪] অর্থাৎ সুলতানি আমলে সীমিত পরিসরে হলেও কিছু সংখ্যক নারী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে সক্ষম হন। তবে সুযোগের অপ্রতুলতার কারণে ব্যাপকভাবে তখন শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হন।

মুঘল আমলে অনেক শিক্ষিত নারী ছিলেন, যারা তাঁদের লেখনীর জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে গুলবদন বেগম, নূরজাহান, মমতাজ মহল, জাহান আরা, রওশন আরা এবং জেবুন্নেসা উল্লেখযোগ্য। মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) ফতেপুর সিক্রিতে রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণির মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়।[২৩৫] সতীউন্নেসা নামক জনৈক উচ্চ

---

[২৩০] আবুল কাশেম ফিরিস্তা, এন. এল. ল কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১০১; সম্রাট জাহাঙ্গীরও তাঁর 'তুজুকে' (Elliot, Sushil Publication পৃ. ১১৪) লিখেছেন যে, "মালবের সুলতান গিয়াসউদ্দিনের হারেমে ১৫০০০ রমণী ছিল। তিনি একটি শহর নির্মাণ করেন, এর ৩টি রমণী অধ্যুষিত ছিল। সেখানে মেয়েদের সমস্ত রকম শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা দেয়া হতো।"

[২৩১] বিজয়গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ*, বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য (সংকলিত), শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ৫৬

[২৩২] মল্লিকা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, যে পুরুষ তাঁকে সাহিত্য বিষয়ক বিতর্কে পরাজিত করতে পারবে তাকেই তিনি বিয়ে করবেন। বহু রাজপুত্র ও বিদ্বান ব্যক্তি তাঁর সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হন, কিন্তু সকলেই তাঁর কাছে পরাজিত হন। অবশেষে জনৈক সুফি পণ্ডিত আবদুল হাকিম গদা তাঁর হাজার প্রশ্নের জবাব দান করে বিতর্কে পরাজিত করেন। অতঃপর মল্লিকা বিজয়ীকে বিয়ে করেন। উল্লেখ্য এটি একটি গল্প হলেও এর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে বিদূষী নারীর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। (আবদুল করিম কর্তৃক সংকলিত, *বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯০)

[২৩৩] আবদুল হাকিম, 'সয়ফুল মূলক' (পাণ্ডুলিপি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮

[২৩৪] আবদুল হাকিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

[২৩৫] Nagendranath Law, *Promotion of Learning in India During Muhammadan Rule (By Muhammadans)*, Longmans (Green), London, 1916, p. 202

শিক্ষিত ও প্রতিভাসম্পন্ন নারীর নিকট জাহান আরা ও রওশন আরা শিক্ষালাভ করেন। আওরঙ্গজেবের অনুগ্রহভাজন খাস মুন্সী (সেক্রেটারী) ইনায়েতউল্লাহ কাশ্মিরীর মা হাফিজা মরিয়মের নিকট জেবুন্নেসা শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।[২৩৬] মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান সুলতানগণ, সুবেদার, নবাব এবং অভিজাতমহল তাঁদের কন্যাদের শিক্ষিত করতে গৃহে-শিক্ষয়িত্রী রাখার মুসলিম ঐতিহ্য অনুসরণ করেন। William Adam পাণ্ডুয়ায় ধনী ব্যক্তি কর্তৃক তাদের পুত্র কন্যাদের শিক্ষার জন্য গৃহ-শিক্ষক রাখার রীতি লক্ষ্য করেন, যা বাংলায় মুসলিম শাসনামলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তবে এ ব্যবস্থা শুধু ধনী পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় তৎকালে সাধারণ পরিবারে উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম নারীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত ছিল। তারপরও সুলতানি আমলের তুলনায় মুঘল শাসনামলে শাসকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীশিক্ষা ও মেয়েদের জ্ঞানচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

বাংলার সুবাদার ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গের স্ত্রী রোকেয়া বেগম তাঁর বিদ্যা ও গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।[২৩৭] শায়েস্তা খানের 'ওয়াসিয়ত নামা' থেকে জানা যায় তাঁর সাত পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। তাঁর কন্যাগণ অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন। উল্লেখ্য শায়েস্তা খানের কন্যা বিবিপরি একজন প্রতিভাবান নারী ছিলেন। নবাবী আমলে জিন্নাতুননেসা, নাফিসা বেগম, দুরদানা বেগম, শরফুন্নেসা, ঘষেটি বেগম, মায়মুনা বেগম, আমিনা বেগম ও লুৎফুন্নেসা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন। বাংলার অনেক জমিদার জাগতিক প্রয়োজনে মেয়েদের শিক্ষিত করতেন। উইলিয়াম এডাম (William Adam) মন্তব্য করেন, রাজশাহী জেলার জমিদারেরা প্রায় সকলেই তাদের মেয়েদের কিছুটা গোপনে শিক্ষা দিতেন এবং রাজশাহীর পঞ্চাশ-ষাটটি জমিদারির প্রায় অর্ধেকই মহিলারা চালাতেন। এদের মধ্যে দু'জনের নাম তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন- রানী সূর্যমণি ও রানী কোমলমণি দাসী। তারা শুধু হিসাবপত্রের সুবিধার জন্য অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না, বাংলা ভাষাতেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন।[২৩৮] আবার নাটোরের জমিদার রানী

---

[২৩৬] মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনুদিত), *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১৫৭৬খ্রি.)*, প্রথম খণ্ড, (M.A Rahim, *Social and Cultural History of Bengal (1203-1576),* Vol. I এর বঙ্গানুবাদ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৪৯

[২৩৭] তিনি কামরূপের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত তদীয় ভ্রাতা বাহরামের তত্ত্বাবধানে এবং প্রশাসন কাজে তাকে সহায়তাদানের জন্য মীর্জা নাথানকে অনুরোধ করে একটি পত্র লিখেন। পত্রটিতে তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মীর্জা নাথান, *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, খালেকদাদ চৌধুরী (অনুদিত), অখণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১১৩-১১৭

[২৩৮] Anath Nath Basu (ed.), *Adam's Report on the State of Education in Bengal,* University of Calcutta, Calcutta, 1941, pp. 187-189

ভবানী হিসাবশাস্ত্র ও বাংলাসহ নানা বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।[২৩৯] হাজী মুহম্মদ মুহসীনের বোন মন্নুজান খানম (১৭১৭-১৮০৩) পড়াশুনা শিখেছিলেন। এ সময় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ খুব একটা লক্ষণীয় না হলেও গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় অভিজাত শ্রেণির শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন এবং সুশিক্ষা ও প্রতিভার বলে তাঁরা ইতিহাসের আলোয় আসতে সমর্থ হন। অন্যদিকে সাধারণ ঘরের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হন। কেননা ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলার মুসলিমরা সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাদের আয়ের নানা উৎস বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, তালাক, পণপ্রথা, অবরোধপ্রথা ও নানাবিধ কুসংস্কারের ফলে শিক্ষায় মুসলিম মেয়েদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক।[২৪০]

বাংলায় নারী শিক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ শুরুর ক্ষেত্রে কলকাতার বাঙালি ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা ১৭১৭ সালে কলকাতার কুদালুরে শিশুদের জন্য একটি *অ্যাংলো ভার্নাকুলার বিদ্যালয়* স্থাপন করেন।[২৪১] এ বিদ্যালয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা পড়তে যেত। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের আগেই কলকাতা ও তার আশেপাশে কয়েকটি স্কুল ছিল সেখানে বাঙালি মেয়েরা অল্প সংখ্যক হলেও পড়তো, এমন একটি স্কুলের নাম 'ক্যালকাটা ফ্রি স্কুল'। লর্ড ক্যানিং এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত স্কুলটির ছাত্রী ছিল ৩০ জন, মাসে বেতন ছিল ছয় টাকা। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষিক ছিলেন শ্রীমতী ই. কিয়ান্যানডার। অন্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন কুমারী জে. সি ম্যাকলিন, কুমারী কিটিং ও শ্রীমতী ফ্যারেল।[২৪২] ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করে ইউরোপ থেকে আগত মিশনারিরা এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিরা। আঠারো শতকের শেষভাগে এদেশে বসবাসরত *বেঙ্গল আর্মি* ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারির সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৭৮২

---

[২৩৯] মল্লিকা ব্যানার্জী, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই একটি ভাবনা", *পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ*, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪৯

[২৪০] শামসুন নাহার মাহমুদ, "মুসলিম বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা", *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৫; Gulam Murshid, *Reluctant Debutante Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905,* Sahitya Samsad, Rajshahi University, Rajshahi, 1983, pp. 63-70 ; Ameer Ali, 'The Influence of Women in Islam', *The Nineteenth Century,* May, 1899; Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal : 1876-1939,* E. J. Brill, Lieden, 1996, p. 78

[২৪১] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৪

[২৪২] *ঐ*, পৃ. ১৪

সালে মেজর জেনারেল ক্রিক প্যাট্রিক খিদিরপুরে *আপার অরফ্যান স্কুল* ও আলিপুরে *লোয়ার অরফ্যান স্কুল* নামে দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[২৪৩] কর্ণেল অসবর্ণের স্ত্রী *আপার অরফ্যান স্কুলটি* পরিচালনা করতেন। *লোয়ার অরফ্যান স্কুলের* প্রধান শিক্ষিক ছিলেন শ্রীমতি কল। গরিব নিম্নবর্ণের কিছু বাঙালি মেয়ে এসব স্কুলে পড়তে যেতো। ১৭৮৭ সালে একজন সুইডিস মিশনারি জন জাসারিয়া কিয়ারনান্দার (John Zachariah Kiernander) খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষা দেয়ার জন্য কলকাতায় মেয়েদের জন্য প্রথম একটি স্কুলে বালিকা শাখা খোলেন।[২৪৪] ১৭৯৪ সালে কলকাতায় *ক্যালকাটা ফ্রি স্কুল* এর প্রচেষ্টায় জানবাজারে খ্রিস্টান মেয়েদের জন্য আরো দু'টি স্কুল চালু হয়। এখানে হিন্দু মেয়েরাও পড়তে যেত বলে জানা যায়।[২৪৫] উনিশ শতকের প্রারম্ভে ১৮০৯ সালে ৭০ জন ছাত্রী নিয়ে বউবাজারে *বেনেভালেন্ট ইনস্টিটিউট* এবং ১৮১৮ সালে জানবাজারে *ফ্রি স্কুল ইনস্টিটিউট* নামে মেয়েদের দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বাঙালি মেয়েরা পড়তো কিনা তার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। একই সময় কলকাতার ২নং সুকিয়াস লেনে *নিউ স্কুল* প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্কুলে পর্তুগীজ মেয়েদের সাথে বাঙালি মেয়েরা পড়তো বলে জানা যায়।[২৪৬] এ সকল স্কুলে খ্রিস্টান ধর্ম এবং প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় যেমন- সেলাই, আচার-আচরণ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হতো। এভাবে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের সূচনা হয়।

পূর্ব বাংলার ঢাকায় *ব্যাপটিস্ট মিশনের* কাজ শুরু হয় ১৮১৫ সালে। মিশনের পক্ষে রেভারেন্ড লিওনার্ড এখানে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ৪ টি স্কুল চালু করে। ১৮১৮ সালে *লন্ডন মিশনারি সোসাইটির* পক্ষে পাদ্রি রবার্ট মে চুঁচুড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এখানে ৮ জন বাঙালি মেয়ে পড়তো। ১৮২০ সালে একজন বাঙালি নারীশিক্ষক এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগদান করলে বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ১৩ জনে উন্নীত হয় । কিন্তু কিছুদিন পর তিনি চাকুরি ছেড়ে দিলে ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পায় এবং বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়।[২৪৭] ১৮১৯ সালে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' কলকাতার গৌরীবাড়ীতে 'জুভেনাইল স্কুল' নামক একটি আধুনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে।[২৪৮] ১৮২১ সালের মধ্যে এ

---

[২৪৩] তপতী বসু, "বাঙালী মেয়েদের লেখাপড়া", *শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা*, কলকাতা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২৮

[২৪৪] Amitabaha Mukerjee, *Reform and Regeneration in Bengal 1774-1823*, Rabindra Bharati University, Calcutta, 1968, p. 15

[২৪৫] তপতী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩০

[২৪৬] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

[২৪৭] তপতী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮

[২৪৮] রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪১; যোগেশচন্দ্র বাগল, *বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা ১৮০০-১৯৫৬*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩

সোসাইটি শ্যামবাজারে *লিভারপুল স্কুল*, জানবাজারে *সালেম স্কুল* এবং চিৎপুরের কাছে *বার্মিংহাম স্কুল* নামে আরো তিনটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে *ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি*র স্কুলের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৮২১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় এর স্কুলগুলি থেকে ২ বছরের মধ্যে (১৮১৯-১৮২১) ১১১ জন বাঙালি মেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে।[২৪৯] এ সকল বাঙালি মেয়েদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরা ছিল বলে জানা যায়। তবে মিশনারিদের স্কুলে খ্রিস্টান ধর্ম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রধান হওয়ায় মুসলিম মেয়েরা এমনকি উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও এ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহী ছিল। সাধারণত নিম্ন মধ্যবিত্তের সন্তান এবং স্থানীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মেয়েরা এখানে পড়াশুনা করতো।[২৫০] অন্যদিকে এসময় ঢাকার নারিন্দায় ৩০ জন ছাত্রী নিয়ে একটি স্কুল শুরু হয়।[২৫১] চট্টগ্রাম *মাদারবাড়ি বিদ্যালয়ে* ৫০ জন ছাত্রী পড়তো যারা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ওঠে। মুরাদপুর এবং ভালুয়াদিঘীতে বালিকা বিদ্যালয় ছিল বলে জানা যায়।[২৫২]

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ মিস মেরি এ্যান কুক (Miss Mary Ann Cooke) বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮২১ সালে কলকাতায় এসে *চার্চ মিশনারি সোসাইটি*তে যোগ দেন। এ সোসাইটির সহযোগিতায় ১৮২৪ সালের মধ্যে ৪০০ জন ছাত্রী সম্বলিত ২৪টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫৩] উনিশ শতকে বাংলায় মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান লক্ষণীয়। শ্রীরামপুর মিশনারিরা ১৮২৪ সালের মধ্যে শ্রীরামপুরে ১৩টি, বীরভূমে ৭টি, পূর্ব বাংলার ঢাকায় ৫টি এবং চট্টগ্রামে ৩টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।[২৫৪] শ্রীরামপুর মিশনারি কর্তৃক মুসলিম এলাকায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে মুসলিম মেয়েরা পড়তো বলে সহজেই অনুমান করা যায়। মিস কুক এবং লেডী

---

[২৪৯] গীতশ্রীবন্দনা সেনগুপ্ত, *স্পন্দিত অন্তর্লোক-আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৯

[২৫০] Shahanara Hussain, "Glimpses in the Condition of Bengali Muslim Women, During the later half of the Nineteenth Century : A Study Based on the Bamabodhini Potrika", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Vol. 3, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi, 1978, p. 21

[২৫১] Sonia Nishat Amin, *op.cit.*, p.142

[২৫২] *Ibid*

[২৫৩] Priscilla Chapman, *Hindoo Female Education,* R.B Seeley and W. Burnside, London, 1839, pp. 85-89; Jogesh Chandra Bagal, *Beginnings of Modern Education in Bengal Women's Education,* Ranjan Publishing House, Calcutta, 1944, p. 17

[২৫৪] রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯; মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৭

আর্মহার্স্ট এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ‘Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity’ নামক সোসাইটি ১৮২৬ সালের ১৮ মে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য *কেন্দ্রিয় ফিমেল স্কুল* প্রতিষ্ঠা করে।[২৫৫] এ স্কুলেই প্রথম মেয়েদেরকে শিক্ষক হিসেবে তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অন্যদিকে একজন মুসলিম নারী শ্যামবাজারে ১৮ জন ছাত্রী নিয়ে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মিস কুকের সহযোগিতায় অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নারীশিক্ষা বিস্তারে কার্যক্রম শুরু করেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫ জনে দাঁড়ায়।[২৫৬] এ সময় মিস কুকের অধীনে মির্জাপুর বালিকা বিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রীরা পড়তো বলে জানা যায়।[২৫৭] ১৮২৭ সালে *The Ladies Association* বা ‘নারী সংঘ’ নামক আরেকটি মিশনারি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ১৬০ জন বালিকা স্কুলটিতে পড়াশুনা করে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলমান।[২৫৮] উল্লেখ্য বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা প্রসারে এসকল প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ খুব সীমিত পরিসরে হলেও অত্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল।

১৮২৮ সালে *মিশনারি ইনটেলিজেন্স* পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পূর্ববাংলার যশোর জেলার বিচারক ছিলেন এইচ. এম লিগু। তাঁর স্ত্রী মিসেস লিগু নিজের টাকায় যশোরে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি প্রতিদিন দু'ঘন্টা করে মেয়েদের সেলাই শেখাতেন। উল্লেখ্য পরবর্তীতে বাংলায় নারীশিক্ষা কারিকুলামের অন্যতম বিষয় ছিল সেলাই বা সুচিকর্ম (Needle Work) এবং সরকার সুচিকর্ম শিক্ষকদের জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দ দিতেন।[২৫৯] তবে খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির অধিকাংশই অর্থের অভাবে ১৮৩৮ সালের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।[২৬০] কেননা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ইতোমধ্যে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। তারপরও বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। সমসাময়িক কলকাতার

---

[২৫৫] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬

[২৫৬] মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫২৯

[২৫৭] Priscilla Chapman, *op.cit.*, pp. 79-80

[২৫৮] যোগেশচন্দ্র বাগল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫

[২৫৯] *Proceeding of the Government of Bengal in the Education Department [Education] for the Month of January 1923*, Bengal Government Press, Calcutta, 1925, pp. 21-22 (Bangladesh National Archives)

[২৬০] Sonia Nishat Amin, *op.cit.*, p.145; যোগেশচন্দ্র বাগল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭-২৯

কয়েকটি শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে বাড়িতে মেম সাহেবদের এনে তাঁদের সাহায্যে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হতো। এভাবে যাঁরা লেখাপড়া শিখেন তাদের মধ্যে অন্যতম শিবসুন্দর রায়ের কন্যা হরসুন্দরী এবং ঈশানচন্দ্র মুস্তফীর কন্যা শিবসুন্দরী দেবী। শিবসুন্দরী পরে *তারাবতী* নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। চণ্ডীচরণ তর্কালংকারও তাঁর বিধবা কন্যা দ্রবময়ীকে এভাবে শিক্ষিত করে তোলেন।[২৬১] অন্তঃপুরে মেয়েদের এরূপ শিক্ষা 'জেনানা শিক্ষা' বা অন্তঃপুর শিক্ষা নামে পরিচিত ছিল[২৬২] এবং ধীরে ধীরে মুসলিম পরিবারেও এ শিক্ষাব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে ১৮৪৯ সালের ৭ মে কলকাতায় জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন দেশীয় মনীষীদের[২৬৩] সমর্থনে ও সহায়তায় 'Calcutta Female School' নামক একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে স্কুলটি 'বেথুন স্কুল' নামে পরিচিত হয়।[২৬৪] হিন্দু বালিকাদের অবৈতনিকভাবে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যেই এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। পুস্তকপাঠ, হাতের লেখা, পাটিগণিত, পদার্থবিজ্ঞান, বাংলার ইতিহাস, ভূগোল, সেলাই ও বুনন স্কুলের পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য ২১ জন ছাত্রী নিয়ে বেথুন স্কুলের যাত্রা শুরু হয় এবং ১৮৫১ সালে স্কুলটির ছাত্রী সংখ্যা ৮০ জনে উন্নীত হয়। রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালংকার ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষী নিজ নিজ কন্যাদের বেথুন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। মহানির্বাণতন্ত্রের "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনিয়াতী যত্নতঃ" এ

---

[২৬১] গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪১

[২৬২] 'জেনানা' পারসিক শব্দ, এর অর্থ নারী (Women) এবং 'অন্তঃপুর শিক্ষা' হলো door to door education। ১৮৪১ সালে কলকাতায় Scotland Church নারী মিশনের Miss Saville এর দ্বারা জেনানা শিক্ষা শুরু হয়। হানা ক্যাথরিনা ম্যালেন্স উপমহাদেশের প্রথম জেনানা শিক্ষক। পূর্ব বাংলায় সর্বপ্রথম জেনানা শিক্ষার প্রচলন ঘটে যশোর জেলায়। ১৮৫০ সাল থেকে পুরোদমে এ শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ব বাংলার নানা জায়গায় খুব দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। (Asha Islam, *From Andarmahal to Schools : Female Education in Eastern Bengal in the 19th And Early 20th Centuties,* Unpublished Ph.D Thesis, University of Dhaka, June 2013, pp. 24-26, Dhaka University Central Library)

[২৬৩] বেথুন যেসকল বাঙালি শিক্ষানুরাগীর সমর্থন পেয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন *ইয়ংবেঙ্গল* গোষ্ঠীর রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮) এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালংকার (১৮১৭-১৮৫৮)। এছাড়া হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮), *সংবাদ প্রভাকর* সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৯৫৯), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীকৃষ্ণদেব (১৮০৮-১৮৭৪) প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তি বেথুনকে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করেন। ('Letter from the Honourable J.E.D Bethune, to the Marquis of Dalhousie, Governor General', dated the 29th March 1850 ; J.A Richey, *Selections from Educational Records, 1840-1859,* Part. II, Calcutta, 1922, pp. 52-53; যোগেশচন্দ্র বাগল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪)

[২৬৪] মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, "বাংলাদেশের নারী শিক্ষায় জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটারের ভূমিকা", *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, পৌষ-চৈত্র ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬-৩৮

বচনালংকৃত গাড়ি কলকাতার রাজপথে ছাত্রীদের পরিবহন করতো।[২৬৫] এভাবে এ বিদ্যালয়ে ছাত্রী প্রেরণ করে উচ্চ হিন্দু পরিবারগুলি নারীশিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। ১৮৫১ সালে বেথুন মৃত্যুবরণ করলে লর্ড ডালহৌসি স্বয়ং বেথুন স্কুলের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন এবং পরে ১৮৫৬ সালে স্কুলটি সম্পূর্ণরূপে সরকারিকরণ করা হয়।[২৬৬] উল্লেখ্য বেথুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি ১৮৫০ সালের ৬ নভেম্বর নামকরণ করা হয় *Hindu Female School* এবং ১৮৬২-১৮৬৩ সালে নামকরণ হয় 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয়'। বাংলায় নারীশিক্ষা ও নারী প্রগতির ইতিহাসে *বেথুন বালিকা বিদ্যালয়* একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেথুনের *হিন্দু ফিমেল স্কুলের* সাথে ১৮৭৯ সালে কলেজ শাখা চালু হলে অহিন্দু ছাত্রী গ্রহণের কড়াকাড়ি হ্রাস পায়। ১৮৮০ সালে সর্বপ্রথম অহিন্দু ছাত্রী এ্যালান দ্যক্রে এ কলেজে ভর্তির সুযোগ পান। তবে উপমহাদেশের প্রথম সরকারি এ বালিকা বিদ্যালয়ে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম মেয়েরা পড়ালেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল।[২৬৭] বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৮৪৯ সালে বেথুন বিদ্যালয় স্থাপনের পর অন্তঃপুর শিক্ষার প্রচলনও বৃদ্ধি পায় এবং ব্রাহ্মসমাজ এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরচন্দ্র গুপ্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, শশীপদ বন্দোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ। অন্তঃপুর শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পরে বহন করে 'বামাবোধিনী সভা'। এ সভার মুখপত্র ছিল *বামাবোধিনী পত্রিকা*। উনিশ শতকে বাংলার মেয়েদের সার্বিক উন্নতি ছিল এ পত্রিকার লক্ষ্য। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় বাঙালি নারীর জ্ঞান চর্চার বিষয়ে উল্লেখ করে বলা হয়,

> অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে নারী এই ভারতে জ্ঞানে, ধর্মে, তপস্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সমকক্ষ ছিলেন তাহার প্রমান এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিশ্ববারা নাম্নী মহিলা ঋকবেদের কয়কটি সুক্ত রচনা করেন, গার্গী, মৈত্রয়ী প্রভৃতি প্রাচীন ভারত-নারীগণ দর্শনশাস্ত্রে কিরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন, তাহা বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নত যুগেও অতুলনীয়। শিক্ষা ও তল্লব্ধ জ্ঞানের জন্যই এই সব মহিলা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া স্মরণীয়া ও বরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন।[২৬৮]

---

[২৬৫] বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৪৫০

[২৬৬] Jogesh Chandra Bagal, *op.cit.*, pp. 64-66

[২৬৭] সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, (লেখকের *The World of Muslim Women in Colonial Bengal* গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন পাপড়ীন নাহার), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১০৮

[২৬৮] "স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে দু একটি কথা", *বামাবোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দ/মে ১৯১৫, পৃ. ২১০ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা)

তৎকালে কতিপয় ইংরেজি শিক্ষিত তরুণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে গোপনে তাঁদের স্ত্রীদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবীকে এভাবে শিক্ষিত করেন। বামাসুন্দরী, ব্রহ্মময়ী এবং কুমুদিনী সে সময়কার বিদূষী নারী, যাঁরা এভাবে লেখাপড়া শিখেছেন।[২৬৯] অন্তঃপুর শিক্ষা প্রবর্তনকারী ব্রাহ্ম পুরুষ দৃঢ়ভাবে ধারণা পোষণ করেন ঘরের কাজ, রান্না, সেলাই এবং শিশুপালনের বিষয়গুলি মেয়েদের শেখানো দরকার। ফলে এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে অন্তঃপুর শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম দিকের একটি পাঠ্যক্রম নিম্নরূপঃ

সাহিত্য : কবিতা কুসুমাঞ্জলি-দ্বিতীয় ভাগ-কৃষ্ণকিশোর শর্মা কৃত; মেঘনাদবধ কাব্য-চতুর্থ সর্গ, চারু পাঠ-তৃতীয় ভাগ।

ব্যাকরণ : সন্ধি, লিঙ্গ, কারক, সমাস ও প্রকৃতি।

ইতিহাস : ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রথমভাগ-তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত।

ভুগোল : ভূবিদ্যা-রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত।

অঙ্ক : শুভঙ্করী হিসাব-কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় কৃত।

রচনা : শিশুপালন-শিবচন্দ্র দেব কৃত ও সাধারণ আহার দ্রব্যের পাক প্রকরণ।[২৭০]

১৮৬৩ সালের ১১মে ১৬ জন ছাত্রী নিয়ে ঢাকার সূত্রাপুরে প্রথম সরকারি নর্মাল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭১] এখানে মুসলিম ছাত্রীদের পড়ার সুযোগ ছিলনা, অবশ্য স্কুলটি ১৮৭২ সালে বন্ধ হয়ে যায় এবং বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ১৭ জন মেয়ে এখান থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ সালে পাবনায় বাবু হরিশচন্দ্র শর্মা নিজ বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্ত্রী বামাসুন্দরী এখানে শিক্ষকতা করেন এবং প্রতি মাসে ২০ টাকা করে বেতন পেতেন। এক বছরের মধ্যে এ স্কুলে ২৫ জন হিন্দু-মুসলিম মেয়ে পড়তো বলে জানা যায়।[২৭২] ১৮৬৯ খ্রি. বগুড়ায় মাত্র তিন জন ছাত্রী নিয়ে “ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল” নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ১৮৯৫ সালে সিরাজগঞ্জে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে

---

[২৬৯] গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪২

[২৭০] বসন্তকুমার সামন্ত, *হিতকরী সভা স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৪

[২৭১] Sharif Uddin Ahmed, *Dhaka : A Study in Urban History and Development 1840-1921*, Curzon Press, London, 1986, p. 79

[২৭২] *ঢাকা প্রকাশ*, ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৬৩, পৃ. ৩

খায়রুন্নেসা খাতুন (১৮৭৬-১৯১০) তাঁর জীবনের শেষ পনের বছর শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। খায়রুন্নেসা ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রথম মুসলিম চাকুরীজীবি নারী।[২৭৩] বাংলায় নারী শিক্ষা বিস্তারে ১৮৬৬ সালে Miss Mary Carpenter এবং ১৮৭২ সালে Miss Annette Akroyd বাংলায় আসেন। ১৮৬৯ সালে মিস কার্পেন্টারের অনুরোধে ব্রিটিশ সরকার কলকাতায় মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। অবশ্য তিন বছরের মধ্যে এটি বন্ধ হয়ে যায়। মিস একরোয়েড ১৮৭৩ সালে কলকাতায় একটি মেয়েদের স্কুল চালু করেন এবং মিস কার্পেন্টার ১৮৭৬ সালে স্কুলটিকে কলেজে উন্নীত করেন। দু'বছর পর এটি বেথুন স্কুলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেথুন কলেজে পরিণত হয়।[২৭৪] এ সময় পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় অল্প সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং সেখানে মুসলিম মেয়েরা পড়ালেখা শুরু করলেও বাঙালি মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে খুব বেশি অগ্রগামী হয়েছিল সে সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না। কেননা ১৮১৯ সালে রাজা রামমোহন রায় মাত্র সাতজন শিক্ষিত নারীর নাম উল্লেখ করতে পেরেছিলেন। ১৮২২ সালে গৌরমোহন বিদ্যালংকার তার *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* গ্রন্থে উল্লেখ করতে পেরেছিলেন মাত্র চারজন শিক্ষিত মেয়ের নাম। William Adam তাঁর শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টেও (১৮৩৫ ও ১৮৩৮) দু'চার জন বিধবা নারী অথবা জমিদার কন্যা ছাড়া অধিক সংখ্যক শিক্ষিত নারীর নাম উল্লেখ করতে পারেননি।[২৭৫] অর্থাৎ মিশনারিদের এবং দেশীয়দের তৎপরতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলেও নারীশিক্ষার হার তখন পর্যন্ত তেমন একটা বৃদ্ধি পায়নি।

উনিশ শতকে পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত ধীর গতিতে শুরু হয় এবং এসময় শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালি মেয়েদের পিছিয়ে পড়ার নানাবিধ কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কৈলাশবাসিনী দেবী (জন্ম ১৮৩৭) বলেন, মেয়েদের পড়ালেখা না শেখানোর জন্য দায়ী পুরুষ সমাজ। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন- মেয়েদের পড়ালেখা শিখতে নেই এটাই ছিল সাধারণ নিয়ম এবং যে মেয়ে পুরুষের নিষেধাজ্ঞা না শুনে পড়াশুনা করত তাকে সবাই 'অর্ধ পুরুষ বলে উপহাস করত'।[২৭৬] রক্ষণশীল বাঙালি সমাজে

---

[২৭৩] Asha Islam Nayeem, 'Women's Emancipation Through Education in 19th Century Eastern Bengal : Private Enterprise or Government Agency?', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, (Humanities), Vol. 60 No-1, June 2015, pp. 46-47; সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রুন্নেসা খাতুন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৫৪

[২৭৪] সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৩

[২৭৫] William Adam, *Reports on the State of Education in Bengal 1835 & 1838*, Rabindra Bharati University, Calcutta, 1940, p. 27

[২৭৬] সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে, উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রমহিলা*, ১৬ সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ. ৩৮-৪০

একটা ভীতিবোধ সর্বদা কাজ করেছে- নারী শিক্ষিত হলে পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষের কর্তৃত্ব কমে যেতে পারে। অর্থাৎ নারী শিক্ষিত হলে স্বেচ্ছাচারী হয় এবং পারিবারিক বশ্যতা স্বীকার করে না। তখন অর্থনৈতিক দুর্বলতায় পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহ করাও দুরুহ ছিল। আবার মনে করা হতো মেয়েরা ঘরেই অধিক উপার্জনশীল। অর্থাৎ তারা গৃহস্থালির কাজ করবে, রান্না-বান্না করবে, বাচ্চা লালন পালন করবে, স্বামী ও তার পরিজনদের সেবা করবে। ধারণা করা হতো শিক্ষিত হলে মেয়েরা আর গৃহকর্ম করবে না এবং তাদের সতীত্ব লুণ্ঠিত হবে। সমাজে এসময় অবরোধপ্রথা এবং কঠোর পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। যে কারণে মেয়েদের পক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বিদ্যার্জন করা সামাজিক বিধি নিষেধের মধ্যেই ছিল। অন্যদিকে বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারেনি। আমরা লক্ষ্য করেছি তৎকালে যে কয়েকজন নারী পড়াশুনা করে নারীশিক্ষা বিস্তারে ও নারী জাগরণে ভূমিকা পালন করেন তাঁদের অধিকাংশই বিয়ের পর নিজ নিজ স্বামীদের অনুপ্রেরণায় তাঁরা গৃহে শিক্ষা লাভ করেন। নারীশিক্ষার অপর এক বাধা ছিল সঠিক শিক্ষয়িত্রী না পাওয়া। সামাজিক অনগ্রসরতার জন্য শিক্ষিত নারীর যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলে নারীশিক্ষার গতিসঞ্চার করা যাচ্ছিল না। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের অনুকূল শিক্ষা কারিকুলামের ঘাটতির কারণে মুসলিম শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি পিছিয়ে পড়ে। অনেক সময় নারীশিক্ষার প্রতি সরকারের অসম নীতিমালাও নারীশিক্ষার অন্তরায় হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়। অন্যদিকে আলোচ্যপর্বে মুসলমানদের পুনর্জাগরণে যে সকল নেতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, যেমন- স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮৪০-১৯১২), নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৮-১৯২৮) প্রমুখ ব্যক্তিরা মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। যদিও এক্ষেত্রে সৈয়দ আমীর আলী কিছুটা ব্যতিক্রম ছিলেন।[২৭৭] ফলে দেখা যায় মুসলিম মনীষীদের আগ্রহের অভাব, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসহ নানা কারণে উনিশ শতকের শেষদিকে এসেও বাংলার মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হার অত্যন্ত নগণ্য পরিলক্ষিত হয়।

মূলত আঠারো শতকের শেষের দিকে বর্হির্বিশ্বে নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার বিকাশ ঘটে। এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী কয়েকটি বই চিন্তাশীল মহলে সাড়া ফেলে। এরমধ্যে Marry Wollstonecraft (1759-1797) এর *Vindication of the Rights of Women* (১৭৯৮) বইটি উল্লেখ্যযোগ্য। এছাড়া Jeremy Bentham (1748-1832) এর বই বাংলার শিক্ষিত তরুণদের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সে সময় কলকাতার *হিন্দু কলেজের* শিক্ষক Henry Louis Vivian Derozio (1809-1831) ছাত্রদের মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করতেন। ইংল্যান্ডে মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলন বাঙালি

[২৭৭] ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৯৬

সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ যোগায়। অন্যদিকে ১৮৬৯ সালে John Stuart Mill (1806-1873) এর *The Subjection of Women* শিক্ষিত বাঙালি তরুণদের একাংশকে উজ্জীবিত করে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মিলের বইটি বাংলায় অনুবাদ করলেন। এছাড়া Dorothea Beale (1831-1906), Dame (Jane) Frances Dove (1847-1942), Sophie Bryant (1850-1922), Margaret McMillan (1860-1931) এসকল মেয়েদের ইউরোপ আমেরিকায় নারীশিক্ষার প্রসারে নানা কার্যক্রম ও সফলতা বাংলার সমাজে নারীশিক্ষার বিষয়ে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রভাবে সমাজ পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এসময় পরিলক্ষিত হয় পশ্চিমের মেয়েদের সাথে আমাদের অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েদের প্রথম ও প্রধান পার্থক্য হলো বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার অভাব। এরই পথ ধরে নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে আসেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও ব্রাহ্মসমাজ। এছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এর প্রচেষ্টায় ১৮৫৭-৫৮ সালে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে শুধু ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রিস্টান মেয়েরা নারীশিক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করেন এবং এর কয়েক দশকের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দু ও ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তারা বুঝতে পারেন শিক্ষা ছাড়া মেয়েদের হৃদয় সংকীর্ণ ও অমার্জিত থেকে যায়। আবার যে সকল নারীর স্বামীরা শিক্ষিত ছিলেন তারা শিক্ষিত স্বামীর যোগ্য স্ত্রী হওয়ার জন্য নিজেকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হিসেবে তৈরি করতে প্রস্তুত হন।[২৭৮] নারীশিক্ষা ব্যতিরেকে কোনক্রমেই সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ সম্ভব নয়। নারী ও পুরুষ উভয় নিয়েই সমাজ, সমাজের অর্ধ অংশ নারী ও অর্ধ অংশ পুরুষ। অর্ধ অংশ যদি মূর্খ, অসার ও অপদার্থ হয়ে থাকে সমাজের উন্নতি লাভ সম্ভব নয়। আবার মেয়েদের শিক্ষার সমর্থক পুরুষ মনে করতেন সন্তানকে ঠিকমতো লালন পালন করতে এবং শিক্ষা দিতে হলে মাকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। *বামাবোধিনী পত্রিকায়* এ সম্পর্কে একটি মন্তব্য পাওয়া যায়। আর তা হলো-

> ... নারীর দায়িত্বপূর্ণ জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই শিক্ষার আবশ্যকতা বিদ্যমান। আদর্শ মাতা, আদর্শ পত্নী ও সুগৃহিণী হওয়া সকলই শিক্ষাসাপেক্ষ। সন্তান পালন, সন্তানের চরিত্রগঠন, নীতিশিক্ষা এগুলি সুমাতার হস্তে হইলে যেরূপ সুফল প্রদান করে, অন্যথা সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। শিশু সন্তানের উপর মাতার প্রভাব অপরিসীম ... সুগৃহিণী হইতে হইলে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া,

[২৭৮] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, "স্ত্রী শিক্ষা", *ভারতী*, আষাঢ় ১২৮৮, পৃ. ২৬৩

সেবা, নিঃস্বার্থতা, সমদর্শীতা প্রভৃতি যে সদগুণের আবশ্যক; সুশিক্ষার দ্বারা তাহা অধিকতর উজ্জ্বল ও সহজ হয়।[২৭৯]

আবার এটাও মনে করা হতো যে, মেয়েদের সহজ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শেখানো দরকার, তাহলে তাঁরা পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা দিতে পারবেন। তৎকালে বাঙালি সমাজে একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত ছিল। তাই ধারণা করা হতো নারী শিক্ষিত হলে পরিবারের সকলের সাথে মিলে মিশে থাকবে, তারা অহেতুক ঝগড়া কলহে লিপ্ত হবে না।[২৮০] কেননা শিক্ষা মানুষের মনকে উদার ও প্রশস্ত করে এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি করে। যথার্থ শিক্ষা পেলে ভালো-মন্দের পার্থক্য করার মতো জ্ঞান ও ধর্মীয় ধারণা লাভ করবে। তাঁদের মানসিক বৃত্তি এবং নারীসুলভ গুণাবলি বিকশিত হবে। তারা গৃহকর্মে আরো পারদর্শি হবে, খ্যাতি অর্জন করবে এবং পরিবারের সুনাম বয়ে আনবে। তাই উনিশ শতকের শেষের দিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেয়। ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে এসকল ধারণা বিকাশ লাভ করতে থাকে।

পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মাইলফলক হিসেবে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম করতে হয়। এদের মধ্যে *ইডেন ফিমেল স্কুল* এবং *ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়* ছিল অন্যতম। ১৮৭৩ সালে একই বছরে এ নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটি যাত্রা শুরু করে এবং সুদীর্ঘ সময় নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে *ইডেন ফিমেল স্কুল* এবং *ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়* সম্পর্কে এখানে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

ইডেন ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে দেখা যায়, ১৮৭৩ সালে ব্রাহ্মসমাজের বয়স্ক মেয়েদের পড়াশুনার জন্য Shubha Sadhini Shabha (শুভসাধিনী সভা) এর পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ স্কুল পরিদর্শক Miss Mary Carpenter উক্ত বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে এসে ঢাকায় অনুরূপ আরো একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুপারিশ করে রিপোর্ট প্রদান করেন। ফলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরা (শ্রী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ব্রজসুন্দর মিত্রবাবু ও প্রণবকুমার দাস) শ্রী অভয়চন্দ্র দাসের বাসায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ বিদ্যালয়টি কিছুদিন পর শ্রী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ফরাসগঞ্জের বাসায় স্থানান্তর করা হয়। ইতোমধ্যে বাবু আনন্দমোহন দাস *বয়স্ক নারীশিক্ষা বিদ্যালয়টি* বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত

[২৭৯] "স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে দু একটি কথা", *বামাবোধিনী পত্রিকা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১২

[২৮০] গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫৯

করেন। অল্পদিনের মধ্যে নবকান্ত বাবুর বিদ্যালয় এবং বাবু আনন্দমোহন দাসের বালিকা বিদ্যালয় একত্রিত হয়ে *ঢাকা ফিমেল স্কুল* নামে অভিহিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় পূর্ব বাংলার মাত্র ৪৭ জন মেয়েশিশু নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। *ঢাকা ফিমেল স্কুল* বেশ কয়েক বছর চলার পর ১৮৭৮ সালে জুন মাসে Miss Mary Carpenter এর রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্ণর স্যার অ্যাশলে ইডেনের (১৮৭৭-৮২) নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ *ইডেন গার্লস স্কুল* হয়ে সরকারিকরণ হয়। ১৮৮০-৮১ সালের সরকারি এক প্রতিবেদনে *ইডেন ফিমেল স্কুল* 'the best girls school' হিসেবে প্রশংসিত হয়।[২৮১]

ক্রমে প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং সে অনুসারে শিক্ষার মানও বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৬ সালে বাংলায় মেয়েদের ৬টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম ছিল *ইডেন বালিকা বিদ্যালয়* এবং দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলের একমাত্র সরকারি বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৯৬-৯৭ সালের শিক্ষা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ইডেনে এসময় ১৩০ জন ছাত্রী পড়াশুনা করে এবং এরমধ্যে ১ জন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।[২৮২] ঢাকা বিভাগের অন্যতম বালিকা বিদ্যালয় *ইডেন ফিমেল স্কুলে* ১৯০১ সালে ১০৭ জন ছাত্রী পড়াশুনা করে (১৩০ টি সীট ছিল, ছাত্রী স্বল্পতার কারণে সবগুলি সীট পূরণ হয়নি)। এদের মধ্যে ৮২ জন হিন্দু, ১৯ জন ব্রাহ্ম, ৪ জন খ্রিস্টান ও ২ জন মুসলমান। এ বছর প্রতিষ্ঠানটি থেকে ৩ জন ছাত্রী এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকে তৃতীয় বিভাগে পাশ করে।[২৮৩] সেসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। ১৯০৭-১৯১২ সালে সরকারি রিপোর্টে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের মধ্যে ঢাকার *ইডেন স্কুলকে* 'Excellent High School' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উল্লেখ্য তৎকালে *ইডেন ফিমেল স্কুলের* জন্য একটি ২০ টাকা এবং একটি ১০ টাকা মূল্যমানের দুটি সরকারি বৃত্তি চালু ছিল।[২৮৪]

১৯২১ সালে ঢাকার সদরঘাট এলাকায় নীলকর Wise এর কুঠিবাড়িতে *ইডেন ফিমেল স্কুলটি* স্থানান্তর হয় এবং হাইস্কুলের পাশাপাশি কলেজ শাখা সংযোজিত হয়ে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয় *ইডেন গার্লস স্কুল*

---

[২৮১] *General Report on Public Instruction in Bengal 1880-81,* Calcutta, 1881, p. 85

[২৮২] *Progress of Education in India,* ১৮৯৬-৯৭, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পর্যালোচনা, ১৯৯৮, পৃ. ৩০৪; উদ্ধৃত, সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২২

[২৮৩] *General Report on Public Instruction in Bengal 1901-1902,* Calcutta, 1902, p. 12

[২৮৪] *Proceedings of the Government of Bengal in the Education Department [Education]*, 1907-1912, Bangladesh National Archives, Dhaka, p. 34

এন্ড ইন্টারমিডিয়েট কলেজ।[২৮৫] ইডেনের কৃতি ছাত্রী আখতার ইমাম (জন্ম ১৯১৭) তাঁর *ইডেন থেকে বেথুন* গ্রন্থে ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাতে উল্লেখ করেন- "ইডেনে একটি নিয়ম ছিল যা কোনো বালক স্কুলে ছিল না। আমাদের বেশ কিছু নীচু ক্লাশ থেকেই রামায়ণ ও মহাভারত পড়ানো হতো। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো দিক থেকেই উচ্চবাচ্য ওঠেনি। আমরা মুসলমান মেয়েরাও রাম-রাবণের যুদ্ধ, সীতার বনবাস, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ইত্যাদি কাহিনী বেশ উপভোগ করতাম"।[২৮৬] পরবর্তী সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং এসময় অনেক মুসলমান ছাত্রী পড়াশুনার জন্য এখানে ভর্তি হয়। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন *ইডেন হাইস্কুল এন্ড ইন্টারমিডিয়েট কলেজটি* সদরঘাট থেকে স্থানান্তরিত হয় আবদুল গণি রোডের বর্তমান সচিবালয়ে। বিভিন্ন সময়ে স্থান বদলের পর ১৯৪৭ সালে *ইডেন স্কুল এন্ড কলেজের* শুধু কলেজ শাখার সাথে *কামরুন্নেসা স্কুল এন্ড কলেজের* কলেজ শাখা একত্রিত হয়ে 'ইডেন গার্লস কলেজ' নামে ৭নং বকশি বাজারে স্থানান্তরিত হয়। অন্যদিকে ইডেনের স্কুল শাখা এবং কামরুন্নেসার স্কুল শাখা একত্রিত হয়ে *কামরুন্নেসা স্কুল* হিসেবে থেকে যায় টিকাটুলিতে যা বর্তমানেও বিদ্যমান। ১৯৬২ সালে আজিমপুর ও পলাশীর সংযোগস্থলে গড়ে ওঠে ইডেন কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাস। তখন ইডেনের ডিগ্রি শাখা চলে আসে আজিমপুরে এবং ইন্টারমিডিয়েট শাখা থেকে যায় বকশি বাজারে যার নামকরণ হয় *গভর্ণমেন্ট গার্লস কলেজ* এবং পরে নামকরণ হয় *বেগম বদরুন্নেসা কলেজ*। অবশ্য আজিমপুরে ইডেন কলেজে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুনরায় এখানে ইন্টারমিডিয়েট শাখা খোলা হয়। ১৯৬২-৬৯ সেশনে অনার্স কোর্স ও পরে মাস্টার্স চালু হয়। পূর্ব বাংলায় মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে *ইডেন কলেজ* এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কুমিল্লা জেলার পশ্চিমগাঁও এর জমিদার নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী (১৮৪৭-১৯০৩)। তিনি কঠোর পর্দাপ্রথার বেড়াজালে অবস্থান করেও উপলব্ধি করেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত দেশবাসীর উন্নতি সম্ভব নয়। ফয়জুন্নেছা কুমিল্লা শহরে দুটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। একটি নানুয়াদিঘীর তীরে ১৮৭২ সালে (পরবর্তীকালে এ বিদ্যালয়টি অন্য একজন নারীর নামে 'শৈলরাণী বালিকা বিদ্যালয়' নামকরণ হয়েছে) এবং অন্যটি ১৮৭৩ সালে শহরের কান্দিরপাড়ে। এ স্কুলটির সাথে ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা এবং ছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও

---

[২৮৫] ড. আয়েশা খাতুন, "ইডেন কলেজ : অঙ্কুর থেকে মহীরূহ", *প্রমা*, *ইডেন মহিলা কলেজ বার্ষিকী*, ২০০৪-০৫, পৃ. ২১ (*ইডেন মহিলা কলেজ* গ্রন্থাগার)

[২৮৬] আখতার ইমাম, *ইডেন থেকে বেথুন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৭

করা হয়।[২৮৭] ইতিহাস স্বীকৃত যে, এই প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টি ভারত উপমহাদেশে মুসলিম নারীশিক্ষার জন্য প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠান। ১৮৮০-৮১ সালের সরকারি শিক্ষা প্রতিবেদনে এ স্কুলটি 'the best girls school' (ইডেন স্কুল ব্যতিত) বলে প্রশংসিত হয়।[২৮৮] ১৮৮৯ সালে ফয়জুন্নেছা ব্রিটেনের মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক 'নবাব' খেতাব প্রাপ্তির পর উৎসাহিত হয়ে তিনি স্কুলটিকে জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ে (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) উন্নীত করেন।[২৮৯] প্রথম দিকে এখানে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং পরে ১৯৩১ সালে ইংরেজি মাধ্যমে ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান করা হয়। এখনও স্কুলটি 'নবাব ফয়জুন্নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' হিসেবে কুমিল্লায় নারীশিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটিতে প্রথম অবস্থায় কতজন মুসলিম মেয়ে পড়ালেখার জন্য ভর্তি হয়েছিল তার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত হিন্দু এবং ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরাও অধিক পরিমাণে এখানে পড়াশুনা করতো।[২৯০] সরকারি এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৮৭৭-৭৮ সালে ত্রিপুরা জেলায় ছয়জন ছাত্রী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং তাদের মধ্যে একজন ছিল মুসলমান কৃষক পরিবারের সন্তান।[২৯১] তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার মধ্যে কুমিল্লাতেই মুসলিম নারী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। তাই ছাত্রীটি উক্ত *ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের* মুসলিম ছাত্রী ছিল।

ফয়জুন্নেছা ছাড়াও এসময় তাহেরুন্নেসা নামক একজন মুসলিম নারী পাবনায় *বোদা বালিকা বিদ্যালয়ে* প্রথম শ্রেণিতে পড়েছেন এবং ১৮৬৫ সালে তিনি *বামাবোধিনী পত্রিকায়* মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা কোনো বাঙালি মুসলিম নারীর এবিষয়ে প্রথম রচনা বলে পরিগণিত। তিনি নারী শিক্ষার উপর জোর দিয়ে বলেন,"যদি এই ধরাধামে প্রকৃতই সুখধাম দেখিতে ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রে আপনাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যায় ভূষিত করিতে চেষ্টা করুন"।[২৯২]

---

[২৮৭] ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী, *রূপজালাল*, মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৯-১৬; রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত;* মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫

[২৮৮] *General Report on Public Instruction in Bengal, 1880-81,* Calcutta, 1881, p. 85

[২৮৯] রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৯

[২৯০] সোনিয়া নিশাত আমিন, "নারী ও সমাজ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৫৯

[২৯১] *General Report on Public Instruction in Bengal, 1877-78,* Calcutta, 1878, p. 81; উদ্ধৃত, মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩৪

[২৯২] তাহেরুন্নেছা, "বামাগণের রচনা", *বামাবোধিনী পত্রিকা*, মার্চ ১৮৬৫, পৃ. ২৭৫-৭৭ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা)

১৮৭৩ সালে *আলেকজান্ডার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়* (বর্তমানে *বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়*) নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ময়মনসিংহ শহরের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপিত হয়। ১৮৭৬ সালে পূর্ব বাংলায় উত্তরাঞ্চলের জনপদ রংপুরে "রংপুর বালিকা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়" নামক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত উত্তরবঙ্গে নারী শিক্ষার জন্য এটি প্রথম প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে স্কুলটি "রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়" নামে বর্তমান।

পূর্ব বাংলায় ১৮৭৮ সালে আনন্দচন্দ্র খাস্তগীর চট্টগ্রামে একটি মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটি 'ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' নামে বর্তমানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লখ্য বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার নারী জাগরণের অন্যতম নেত্রী, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও যোদ্ধা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২) এ বিদ্যালয়ের প্রতিথযশা ছাত্রী ছিলেন। ১৮৮০ সালে টাংগাইলে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় যা "বিন্দু বাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়" নামে বিদ্যমান। মূলত ১৮৫০ এর দশক থেকে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় নারী শিক্ষার জন্য কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া শুরু করে। এরপরই সমগ্র বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসার এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়, যা সারণি-১' এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

সারণি-১ : বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রীর সংখ্যা[২৯৩]

বছর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রীদের সংখ্যা
১৮৬৩	৯৫	২,৪৮৬
১৮৭১	৩৪৪	৬,৭১৭
১৮৮১	১,০৪২	৪৪,০৯৬
১৮৯০	২,২৩৮	৭৮,৮৬৫

উৎস : *General Report on Public Instruction in Bengal for the years 1863-64, 1871-72, 1881-82 and 1890-91.*

---

[২৯৩] *General Report on Public Instruction in Bengal for the years 1863-64, 1871-72, 1881-82 and 1890-91*; উদ্ধৃত, শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার ও জাহানআরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

উল্লেখ্য উনিশ শতকে বাংলায় সরকারি এবং বেসরকারি প্রয়াসে প্রাথমিক শিক্ষা বিকাশ লাভ করলেও মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি অনেক পরে পরিলক্ষিত হয়। ১৮৭০ এর দশকের পর *বেথুন স্কুলকে* কেন্দ্র করে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হয়। *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* ১৮৭৮ সালে মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার দেয়।[২৯৪] তবে এ সুযোগ প্রথম দিকে ব্রাহ্মসমাজ এবং খ্রিষ্টানরা ছাড়া অন্য কেউ গ্রহণ করেনি।

১৮৭৮ সালে চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪) *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একবার উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে যাওয়ার পর কয়েক বছরের মধ্যে ১৮৮২ সালে চন্দ্রমুখী বসু এবং কাদম্বিনী বসু (১৮৬১-১৯২৩) বি.এ পাস করেন।[২৯৫] ১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী বসু ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন। অন্যদিকে কাদম্বিনী বসু মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং তিনিই প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য William Hunter ১৮৮৭ সালে সমাবর্তন ভাষণে উল্লেখ করেন যে, ১৮৮৬ সালে বাংলায় ২৩ জন ছাত্রী এন্ট্রান্স, ৪ জন এফ.এ এবং ৩ জন বি.এ পাশ করেন। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে কামিনী সেন, প্রিয়তমা দত্ত, নির্মলাবালা সোম, কুমুদিনী খাস্তগীর, সুপ্রভা গুপ্ত, লীলা সিংহ, সরলা ঘোষাল, শরৎ চক্রবর্তী, জীবনবালা দত্ত, ইন্দ্রিরা ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা বাগচীসহ মোট ১২ জন বি.এ পাস করেন এবং তাঁদের অনেকে এম.এ পাস করেন। এভাবে বাংলায় মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ঘটে। উল্লেখ্য বিশ শতকের প্রথম দিকে সরোজিনী নাইডুর ছোট বোন মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় *কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে দর্শন শাস্ত্রে ট্রাইপস লাভ করেন এবং ১৯৪১ সালে *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে সুরমা মিত্র মেয়েদের মধ্যে প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।[২৯৬] তবে উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় এসময় বাংলায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে এমন মুসলিম নারীর পরিচয় পাওয়া কঠিন।

---

[২৯৪] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৯

[২৯৫] বাংলার ইতিহাসে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু হলেন প্রথম স্নাতক নারী। ১৮৮২ সালে *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের* সিলভার জুবিলী অনুষ্ঠানে উপাচার্য Herbert John Reynolds এ দু'জন নারীর স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকে সে বছরের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া তাঁর ভাষণে সেসময়ের নারীশিক্ষা প্রসারের কথা বলতে গিয়ে বিশেষভাবে 'উত্তরপাড়া হিতকারী সভা'র গৌরবজনক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। (বসন্তকুমার সামন্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪)

[২৯৬] গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৯

সারণি-২ : ১৮৮১-১৮৮২ শিক্ষাবর্ষে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা[২৯৭]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সর্বমোট ছাত্রী সংখ্যা	মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা	শতাংশ
ইংরেজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	-	-
মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৪	১.১
মধ্য বাংলা বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১
প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭৪৫২	১৫৭০	৮.৯
নর্মাল বালিকা বিদ্যালয় (শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)	৪১	-	-

উৎস : *Supplement to the Progress of Education in Bengal 1881-1882*

উপরের সারণিতে স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এসময় বাংলায় মুসলিম নারীর তুলনায় অন্যান্য ধর্মের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল অনেক বেশি। আবার এখানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীর মধ্যে সবচেয়ে অধিক ছিল হিন্দুদের সংখ্যা। অন্যদিকে হিন্দু মেয়েদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার কারণে উচ্চশিক্ষার হারের তারতম্য ছিল, যা ১৯০১ সালের একটি পরিসংখ্যানে নিম্নে দেখানো হলো-

সারণি-৩ : উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীর মধ্যে শিক্ষার হার, ১৯০১ সাল[২৯৮]

বর্ণ	শিক্ষার হার %	ইংরেজি শিক্ষার হার %
ব্রাহ্মণ	৫.৬	০.১
কায়স্থ	৮.০	০.৪
বৈদ্য	২৫.৯	০.৮
ব্রাহ্ম	৫৫.৬	৩০.৯

উৎস : *Census of India, 1901,* Vol. VIA, pt. II, Calcutta, 1902, pp.60-61, 100-104, 106-111.

[২৯৭] *Supplement to the Progress of Education in Bengal 1881-1882*; উদ্ধৃত, গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫০

[২৯৮] *Calcutta University Calender*, 1911

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের জতিকূল বেশি উপরে ছিল বলে তাদের মেয়েদের শিক্ষার হার কম, আবার পর্যায়ক্রমে কায়স্থ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মদের মধ্যে নারীশিক্ষার প্রসার বেশি ছিল। উল্লেখ্য ব্রাহ্মরা নারীশিক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিল এবং বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে তাদের ভূমিকা ছিল অনবদ্য।

পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা প্রসারে ১৮৮৩ সালের ২৪ ফেব্রয়ারি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মিলনী'। অল্প সময়ের মধ্যে এ সংগঠনটি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারকে মুল কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে।[২৯৯] তৎকালে ঢাকা কলেজের কতিপয় ছাত্র যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- আবদুল আজিজ, আবদুল মজিদ, ফজলুল করিম প্রমুখ এ সম্মিলনী গড়ে তোলেন। পর্দাপ্রথার কঠোরতার কারণে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষাদান অসম্ভব ভেবে এ সম্মিলনী গৃহশিক্ষাকে অবলম্বন করে ছাত্রীদের গৃহশিক্ষক দ্বারা গৃহে পড়ানো এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে। এ শিক্ষাপদ্ধতি প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং সম্মিলনী কর্তৃক পাঠ্যসূচি ও পুস্তক নির্ধারিত ছিল। পরীক্ষকগণ ছাত্রীদের বাড়িতে যেয়ে অভিভাবকের সহায়তায় উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাতে পরীক্ষা নিতেন। পরবর্তীতে এ শিক্ষার স্তর ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। ১৮৮৩ সালে সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরের বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৪ জন পরীক্ষার্থী সফলতা লাভ করে এবং তারা সকলেই ছিলেন মুসলিম কন্যা সন্তান।[৩০০] উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সার্টিফিকেট, পদক ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ববাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে ফয়জুন্নেছা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলের পরই ছিল *ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর* স্থান।[৩০১] উল্লেখ্য ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এ সংগঠনটি টিকে ছিল।[৩০২]

ঢাকা সুহৃদ সম্মিলনীর অনুরূপ ১৮৭৬ সালে কলকাতার 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' শ্রীহট্ট শহরে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মেয়েরা এখানে পড়াশুনা করতো।

---

[২৯৯] Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal 1884-1912*, University Press Limited, Dhaka, 1996, p. 248

[৩০০] মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩৬

[৩০১] ওয়াকিল আহমদ, "বাংলার বিদ্বৎসভা : ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৭ম সংখ্যা, জুন ১৯৭৮, পৃ. ১২৫

[৩০২] মুনতাসির মামুন, "উনিশ শতকের পূর্ববাংলার সভা সমিতি", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৬৩-১২৫; মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, "ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী", *সাহিত্যিক*, ১৪শ বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬-২১

এমনকি অন্তঃপুরে ও সম্মিলনীর নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারতেন। ১৮৮৩ সালে ১২১ জন নারী এ সম্মিলনীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ২২ জন ছিলেন মুসলমান।[৩০৩] প্রকৃতপক্ষে কোনো বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত না হয়ে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শিক্ষাপদ্ধতি ছিল এটি। নিজেদের আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও সমাজের বিরূপ মনোভাবের দিকে চেয়ে এরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সমাজের জাগরণ ও উন্নতির সাথে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির যে গভীর সম্পর্ক আছে, তা উপলব্ধি করে উক্ত সম্মিলনী দুটি তাদের সামর্থ্যের মধ্যে এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে।

অন্যদিকে ১৮৯৭ সালের ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় মুসলিম মেয়েদের জন্য 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা' নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদের জমিদার নওয়াব শামসি জাহান ফেরদাউস মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় ২৫ জন ছাত্রী নিয়ে স্কুলটি যাত্রা শুরু করে।[৩০৪] এ বিদ্যোৎসাহী মহীয়সী নারী প্রতিমাসে স্কুলের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৫০ টাকা করে চাঁদা দিতেন। বাংলার প্রথম এ মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় উদ্বোধন করেন তৎকালীন ছোট লাট পত্নী লেডি মেকেঞ্জি। বেগম ফেরদাউস মহল একই বছর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি স্বর্ণপদক ও দু'টি রৌপ্যপদক প্রদান করেন।[৩০৫] তিনি নওয়াব আবদুল লতিফের *মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি*র কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং *কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়নে*র একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৩০৬] দেখা যায় প্রায় একই সময়ে ১৮৯৬ সালে কলকাতায় *ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল* থেকে শাহজাদপুরের লতিফুন্নেসা L.M.F (Licentiate of Medical Faculty) পরীক্ষায় ৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। আধুনিক কালে বাংলায় মুসলিম মেয়েদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা ডাক্তার।[৩০৭] অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি ডাক্তারি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি।

উনিশ শতকের শেষ দশকে সাধারণ স্কুল কলেজের পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষায়ও মেয়েদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। উল্লেখ্য এসময় ১৫টি কোরান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮৮ জন ছাত্রী ছিল।[৩০৮] আবার মুসলমান

---

[৩০৩] মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩৭

[৩০৪] *The Moslem Chronicle*, 16 may, 1896, p. 122; *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ৩৪ বর্ষ, ৩৮৫ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭, পৃ. ২৯৮

[৩০৫] *পূর্বোক্ত*, ১৮২ সংখ্যা, মার্চ ১৮৮০, পৃ. ১৪৯

[৩০৬] *ঐ*, ২০৬ সংখ্যা, মার্চ ১৮৮২, পৃ. ৩৪৪; ২৬৭ সংখ্যা, এপ্রিল ১৮৮৭, পৃ. ৩৫৪

[৩০৭] *ঐ*, ৩৮ বর্ষ, ৩৭৬ সংখ্যা, মে ১৮৯৬, পৃ. ৩, ২ ; Shahanara Hussain, *op.cit.*, p. 21

[৩০৮] Usha Chakravarty, *Condition of Bengali Women Around the 2nd Half of the Nineteenth Century*, The University of Virginia, 1963, p. 39

মেয়েরা অন্তঃপুরে আরবি, উর্দু ও বাংলার সাথে সাথে ইংরেজি শিখতে থাকে। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, সে সময় পর্যন্ত ৪০০ জন মুসলিম মেয়ে ইংরেজি জানতো। *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গৃহেই যদি এমন শিক্ষা লাভ সম্ভব তবে স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অসীম।[৩০৯] মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ শতকের শুরুতে বাংলার মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটে। দেলোয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৩), সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২-১৯১২), সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০-১৯৩৪) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ১৯০৩ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠন করেন। মুসলিম সমাজে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা ছিল এ সমিতির অন্যতম লক্ষ্য।[৩১০] ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মুসলিম নারীর শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৫-০৬ সালে পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষা সম্পর্কিত এক বার্ষিক রিপোর্টে মহিলা স্কুল পরিদর্শক মিস ব্রুক (Miss Brock) এ অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন,

> I have this year seen more of Muhammadan schools and come more into touch with Muhammadan zanana life... In the former this is undoubtedly due to the early age at which girls are withdrawn, not for marriage, but within the pardah : in the latter it is owing to the almost utter lack of training and education in the teachers. From what I have observed I consider that in the case of Muhammadans the work has not yet been attempted on the right lines for success … Muhammadan schools must be altogether pardah, and all the local male officials entirely withdrawn from the schools. A conveyance grant for the schools is necessary if high class Muhammadan girls are to be secured. Women of good family must be obtained as teachers for the schools … I am convinced that if we could obtain teachers capable of giving an acceptable course of instruction, a large number of zananas would be at once available.[৩১১]

---

[৩০৯] "মুসলিম নারী সমাজে ইংরেজি শিক্ষা", *মিহির ও সুধাকর*, মাঘ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ; উদ্ধৃত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ১৯০১-১৯৩০*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২২

[৩১০] *ইসলাম প্রচারক*, (মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমেদ), অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯৮; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫০

[৩১১] *General Report on Public Instruction in Bengal 1905-06*, Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1906, p. 35 (National Library of India, Kolkata); Sufia Ahmed, *op.cit.*, p. 321(Appendix D)

অন্যদিকে *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির* ১৯০৬ সালে কলকাতা সম্মেলনে মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) বাংলার মুসলিম মেয়েদের আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থা ও শিক্ষার অন্তরায়গুলি তুলে ধরে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি নারীশিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক অবরোধপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেন এবং মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন।[৩১২] এ সম্মেলনে মুসলিম নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য পর্যাপ্ত অনুদানসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়।

বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশে জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষার উপরও গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এলক্ষ্যে ১৯০৭ সালে ২১ জানুয়ারি ঢাকায় জনশিক্ষা পরিচালক ও মহিলা পরিদর্শকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, যেখানে মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম সেখানে পারিবারিক পরিবেশে জেনানা শিক্ষা সাধারণ মেয়েদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। এসময় দু'জন মুসলিম নারী শুধু মুসলিম মেয়েদের অন্তঃপুরে শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব নেন। দেখা যায়, ১৯০৬-০৭ সালে ঢাকার জেনানা কেন্দ্রগুলিতে ২১ জন হিন্দু ও ১৭ জন মুসলমান শিক্ষার্থী ছিল। ধীরে ধীরে এ শিক্ষাব্যবস্থা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯১১-১২ সালের সরকারি এক রিপোর্টে জানা যায়, ১২৬ জন হিন্দু নারী এবং ১৪৫ জন মুসলিম নারী জেনানা শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৩১৩] *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি* ১৯০৮ সালে ময়মনসিংহ ও ১৯১০ সালে বগুড়া অধিবেশনে স্থানীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে মুসলিম বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানায়।[৩১৪] ফলে সরকার মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এসময় পূর্ববাংলার মেয়েদের জন্য উপযোগী পাঠ্যক্রম চালু করা হয় যার অন্তর্ভুক্ত ছিল- পঠন, লিখন, ভূগোল ও ইতিহাস। এসময় এ প্রদেশে বেশ কিছু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং *ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে* শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ময়মনসিংহের *আলেকজান্ডার বালিকা বিদ্যালয়কে* সরকারিকরণ করা হয় এবং এখানে একটি ছাত্রীনিবাস স্থাপন করা

---

[৩১২] শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহ্‌মিনা আখতার ও জাহানআরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫

[৩১৩] *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1907-08 to 1911-12,* Vol. I, Calcutta, 1913, p.101

[৩১৪] *Report of the Second Session of the Provincial Muhammadan Education Conference, Held at Mymensingh on the 18th and 19th April, 1908,* Calcutta, p. 79, *Report of the Third Session of the Provincial Muhammadan Education Conference, Held at Bogra on the 26th and 27th March,* 1910, p. 122

হয়। ফলে মেয়েরা পড়াশুনায় আরো বেশি অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ করে। অন্যদিকে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে ১১৪টি বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য এসব বৃত্তির মধ্যে মুসলিম ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ৭টি বৃত্তি।[৩১৫]

বিশ শতকের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলায় মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা পালন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতা খুজিস্তা আকতার বানু (১৮৭৮-১৯১৯)। তিনি ১৯০৯ সালে 'সোহরাওয়ার্দী বালিকা বিদ্যালয়' নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্কুলটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন ভাইসরয়ের পত্নী লেডি মিন্টো। উল্লেখ্য খুজিস্তা আকতার বানু তৎকালীন বাংলার মুসলিম মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম সিনিয়র কেমব্রিজ (মেট্রিকুলেশন সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৩১৬] ১৯১০ সালে নারায়ণগঞ্জ শহরে বেশ বড় এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় *মর্গান গার্লস স্কুল*। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, এ স্কুলে নারায়ণগঞ্জ শহর ছাড়াও সন্নিকট মোফস্বল এলাকার মুসলিম মেয়েরা প্রাথমিক পর্যায় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়।[৩১৭] ২০১২ সালের মে মাসের ৪ তারিখে এ বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তী উৎসব উদযাপন করা হয়। তাতে দেখা যায়, মর্গান স্কুলের অনেক শিক্ষার্থী সমাজের নানা জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূঁইয়া এ স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তার তথা নারী জাগরণে *মর্গান গার্লস স্কুলটি* গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

বাঙালি মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা পালন করেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। তিনি অনুধাবন করেন শিক্ষার অভাবই নারী জাতির অবনতি ও অধঃপতনের মুল কারণ এবং কঠোর অবরোধপ্রথা মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে বাধাগ্রস্থ করছে। তিনি ১৯০৯

---

[৩১৫] মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪৫

[৩১৬] Anowar Hossain, *Muslim Women's Struggle for Freedom in Colonial Bengal (1873-1940),* Progressive Publishers, Kolkata, 2003, p. 134

[৩১৭] *মর্গান গার্লস স্কুলটি* ১৯১০ সালে তৎকালীন নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান মি. মর্গান এর বিদুষী পত্নী মিসেস প্যাট্রিসিয়া মর্গান এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিধায় স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, পৌরসভার গণ্যমান্য ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ *মর্গান গার্লস স্কুল* করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত স্কুলের প্রথম মুসলিম ছাত্রী মরিয়ম বেগম পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর প্রথম মুসলিম শিক্ষয়িত্রী হিসেবে যোগদান করে কৃতিত্বের সাথে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে *মর্গান গার্লস স্কুলের* ছাত্রীরা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে ভাষা সংগ্রামীদের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদ করে এবং প্রধান শিক্ষয়িত্রী কারাবরণ করেন। (আব্দুল মান্নান কর্তৃক সম্পাদিত, *নারায়ণগঞ্জের কৃতী সন্তানদের জীবন কোষ*, মশগুল মাহফিল প্রকাশনী, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৮৪)

সালের ১ অক্টোবর মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ভাগলপুরে রোকেয়ার বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। ১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর তিনি কলকাতার ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি ছোট কক্ষে আটজন ছাত্রী নিয়ে পুনরায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলকাতার ন্যায় এতবড় শহরে একজন মুসলিম নারী অল্প সঞ্চয় এবং সামান্যতর অভিজ্ঞতা নিয়ে বালিকা বিদ্যালয় চালু করে প্রথমাবস্থায় খুব অসুবিধায় পড়েন। কেননা তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের নিকট হতে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পেয়েছিলেন। এই টাকার অধিকাংশই ভাগলপুরে ব্যয় করেন। কলকাতায় যাঁরা রোকেয়াকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সমসাময়িক মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আবদুর রসুল (১৮৭০-১৯৭১)। তাঁর বাসভবনে ১৯১১ সালের ২ এপ্রিল রোকেয়ার স্কুল সংক্রান্ত প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সভায় মৌলভী সৈয়দ আহমদ আলীকে সম্পাদক করে স্কুল পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়।[৩১৮]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নানা সুযোগ সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ শুরু করেন। ১৯১২ সালে স্কুলটি সরকারি অনুদান পায় প্রতি মাসে ১০০ টাকা। কিন্তু স্কুলের মাসিক খরচ ৬০০ টাকা হওয়ায় অনেক আবেদনের পর সরকার ১৯১৪ সালে ৪৪৮ টাকা পর্যন্ত অনুদান বৃদ্ধি করে।[৩১৯] সরকারি সাহায্যের অতিরিক্ত ১৫২ টাকা প্রতিমাসে সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। এসময় *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের* আর্থিক সহায়তা দান ও সরকারি অনুদান সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নওয়াব সৈয়দ সামসুল হক, কলকাতা জজ কোর্টের বিচারক আমিন আহমদ ও জনৈক অবাঙালি জি.এম কাসেমী।[৩২০] এছাড়া রোকেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠায় যে সকল নারী পরামর্শক ও উদ্দীপনা দানকারী ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তদানীন্তন বড়লাটপত্নী লেডি চেমসফোর্ড ও লেডি কারমাইকেল। দেশীয়দের মধ্যে ভূপালের বেগম সুলতান জাহান, মিসেস পি.কে. রায়, মিসেস হাকাম, মিসেস সাকিনা চৌধুরী এবং সরোজিনী নাইডু অন্যতম। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্কুলে প্রথম দিকে ছাত্রীদের অনেকেই পড়ালেখা করতো বিনা বেতনে, কেউ কেউ পড়তো নামমাত্র বেতনে এবং ছাত্রীদের

---

[৩১৮] মুহাম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৯১

[৩১৯] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যে সাওগাত যুগ*, স্পেশাল ভলিউম, ৩৮ শরৎগুপ্ত রোড, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৩৯; *Report on the Progress of Female Education in the Presidency and Burdwan Divisions*, 1917, Calcutta, 1918, p. 8

[৩২০] শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫

যাতায়াতের গাড়ীভাড়া মওকুফ করা হতো অনেক সময়। এসমস্ত সুযোগ দান করে এবং পর্দার নিশ্চয়তা দিয়ে ছাত্রী সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন মুসলিম পরিবারে গিয়ে তিনি অনুরোধ জানাতেন।[৩২১]

স্কুলটির শিক্ষার মাধ্যম ও প্রশাসনিক কাজের ভাষা ছিল উর্দু। সম্ভবত এ বিশেষ কারণেই তিনি প্রথমে বাঙালি এবং বাংলাভাষী অভিভাবক মহলে তেমন সাড়া ফেলতে পারেননি। তারপরও ১৯১৫ সালে পাঁচটি ক্লাস নিয়ে স্কুলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে পৌঁছে এবং দু'বছর পর মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ১৯২৭ সালে রোকেয়ার ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত চালু হয়। এরপর নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি প্রতি বছর বিদ্যালয়ে একটি করে শ্রেণি বাড়াতে থাকেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৩১ সালে উচ্চতর শ্রেণিসমূহ থেকে জোবেদা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, কায়সারী বেগম, খুরশিদী বেগম, হানিফা খাতুন ও আবেদা খাতুন প্রমুখ ছাত্রী *বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদের* (BSP) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৩২২] ১৯৩১ সালেই *সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের* ছাত্রীরা প্রথমবারের মতো *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের* প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এ স্কুলে উচ্চতর শ্রেণি চালু করায় কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল মুসলিম মহিলা শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়। কারণ, প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছর স্কুলের প্রতিবেদনে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া রোকেয়া স্কুলটিতে পাঠদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহের জন্য বাংলার যে কোন স্থানে ছুটে যেতেন। উল্লেখ্য ১৯২৬ সালে তিনি ঢাকা থেকে শিক্ষিক সংগ্রহ করেন বলে জানা যায়।[৩২৩] স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছাত্রী সংগ্রহ, ছাত্রীদের পরিবহনের জন্য ঘোড়া ও গাড়ীর সংস্থান এবং নিয়মিত তত্ত্বাবধান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা সবকিছুর গুরুভার রোকেয়া একাই বহন করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এসময় বাংলায় মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। রোকেয়ার স্কুল থেকে বহু মহীয়সী নারী জন্ম নিয়েছিলেন যারা পরবর্তী সময়ে বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণে ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক অধ্যাপক লতিফা আকন্দ (১৯২৫-২০১৬) *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের* ছাত্রী ছিলেন।

বিশ শতকে পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন লীলাবতী রায় বা লীলানাগ (১৯০০-১৯৭০)। বাংলার মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিকিরণের উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে বারোজন

---

[৩২১] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, 'রোকেয়া পরিচিতি', *সওগাত*, বৈশাখ, ১৩৮৫, পৃ. ৯৭

[৩২২] *The Mussalman,* February, 16, 1932; উদ্ধৃত, মুহাম্মদ শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৭-৯৮

[৩২৩] এম ফাতেমা খানম, *সপ্তর্ষি*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৬

বন্ধু সহকর্মী নিয়ে লীলানাগ "দীপালি সংঘ" গঠন করে। দীপালি সংঘের কার্যক্রম ঢাকা শহরের সর্বত্র নবজাগরণের সূচনা করে। এবছরই তিনি নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে 'দীপালি হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে তিন বছর শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে স্কুলটি *কামরুন্নেসা হাই স্কুল* নামে পরিচিত এবং টীকাটুলিতে (ঢাকায়) অবস্থিত।[৩২৪] ১৯২৪ সালে তিনি ঢাকায় আরও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে লীলানাগ উল্লেখ করেন, "বর্তমান যুগে নারীশিক্ষার প্রয়োজন আছে; কিন্তু সুযোগ ও ব্যবস্থার অভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে স্থানাভাবহেতু বহু বালিকাকে শিক্ষালাভে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে। এই অভাব দূর করার আকাঙ্খায় ১৯২৪ সালে আর একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই কার্যে বহু অর্থ ও অবৈতনিক সাহায্য দানে *দীপালি সংঘ* বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।"[৩২৫] ১৯২৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি লীলানাগ স্থাপন করেন *নারীশিক্ষা মন্দির*। এখানে তিনি মেয়েদের 'বয়স্ক শিক্ষা' ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। বয়স্কদের শিক্ষা সহায়তাদানের জন্য এটিতে ছিল সংস্কৃতি বিভাগ, কোচিং বিভাগ, শিল্প বিভাগ, আশ্রয় বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি *শের-এ-বাংলা মহিলা মহাবিদ্যালয়* নামে পরিচিত। তৎকালে পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে লীলানাগ ঢাকা শহরে আরো কয়েকটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঢাকার বিদ্যালয়গুলি হলো : (১) *নিউ হাইস্কুল* (অভয়দাস লেন) (২) *নারী শিক্ষা মন্দির* (টিকাটুলী) (৩) *শিক্ষা ভবন হাইস্কুল* (বকশীবাজার) (৪) *শিক্ষায়তন হাইস্কুল* (কয়েতটুলী) (৫) *শিক্ষালয়* (হেয়ারস্ট্রিট) (৬) *বাংলা বাজার বালিকা বিদ্যালয়* (বাহাদুর শাহ পার্ক সংলগ্ন)। এছাড়া ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[৩২৬] ১৯৩৮ সালে সিলেটে নিজ গ্রাম পাঁচগাঁয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যা এখন *কুঞ্জলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়* হিসেবে টিকে আছে। লীলানাগ ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান জেলা) অন্তর্গত বায়রা গ্রামের দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের মধ্যে ১৯৩৮ সালে অনিল রায়ের সাহায্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি হাইস্কুল ও মেয়েদের জন্য ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি পূর্ব বাংলার যাতে সহজে বই পড়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে এজন্য পাঠাগার নির্মাণ করেন। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় লীলানাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ শতকে মুসলিম নারীশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

[৩২৪] মালেকা বেগম, "লীলানাগ ও তাঁর জীবন সাধনা", *নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা-২৬*, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬, পৃ. ২৬

[৩২৫] দীপাঙ্কর মোহান্ত, *লীলারায় ও বাংলার নারীজাগরণ*, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩০-৩১

[৩২৬] পলাশ মণ্ডল, "ঢাকার 'দীপালি সংঘ' থেকে 'শ্রীসংঘ' : লীলারায়ের(১৯০০-৭০ খ্রিস্টাব্দ) চিন্তা ও কর্মের বিবর্তন", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, সংখ্যা ৩৫-৩৬, ১৪১৯-১৪২১, মে ২০১৫, পৃ. ১২৮-১২৯

এছাড়া বিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকায় *পোস্তা বালিকা বিদ্যালয়* প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন স্কুল ইন্সপেক্টর মৃণালিনী সেন এবং ফাতেমা খানম স্কুলটিকে কার্যকর রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি টিকে ছিল। ১৯৩২ সালে ফরিদুদ্দীন সিদ্দিকী নামক একজন ব্যক্তি ঢাকার বেচারাম দেউরীতে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে স্কুলটির নাম *আনোয়ারা বেগম বালিকা বিদ্যালয়*।[৩২৭] ওস্তাদ আম্মা ওরফে সুফিয়া খাতুন নামের একজন নারী ঘরে ঘরে গিয়ে এ স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। অন্যদিকে ১৯৩৯ সালে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার অধীনে কলকাতায় *লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ* স্থাপিত হয়। প্রথমে কলেজটি মুসলমান মেয়েদের জন্য নির্মিত হলেও পরে অমুসলিমদের পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া হয়। তবে কলেজটির হোস্টেলে শুধু মুসলিম মেয়েরাই থাকতে পারতো। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব মুহূর্তে এ প্রতিষ্ঠানে ১৫২ জন ছাত্রী ছিল, এর মধ্যে ১২০ জন ছিল মুসলমান।[৩২৮] উল্লেখ্য পূর্ব বাংলার শামসুন নাহার মাহমুদ এ কলেজের বাংলার শিক্ষক ছিলেন। বাংলায় মুসলিম মেয়েদের উচ্চশিক্ষা বিস্তারে *লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের* অবদান অবিস্মরণীয়। যদিও কলেজটি কলকাতায় অবস্থিত ছিল তথাপি পূর্ব বাংলার বহুসংখ্যক মুসলিম ছাত্রী এ প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

পূর্ব বাংলায় এসময় দ্রুত নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫১ সালে ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় হলিক্রস (পবিত্র ক্রুশ সংঘ) সিস্টার মারী, ফ্রান্সলিয়া ও রোজ বানার্ড মাত্র ২ জন ছাত্রী নিয়ে একটি কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছর নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। এ বিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়কে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত রেখে অন্যান্য বিষয়াবলী ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হতো। উল্লেখ্য ১৯৭২ সাল থেকে বিদ্যালয়টিতে বাংলা মাধ্যমে পাঠদান করা শুরু হয় এবং ১৯৭৯ সালে ছেলেদের ভর্তি করা বাতিলপূর্বক এটিকে সম্পূর্ণরূপে বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। এসময় প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় *হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়*। স্কুলটির বর্তমান প্রধান শিক্ষক রাণী ক্যাথরিন গোমেজ। অন্যদিকে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পূর্বের বছর (১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে) একই স্থানে মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে *হলিক্রস কলেজ* যাত্রা শুরু করে। বিদ্যালয়ের ন্যায় পবিত্র ক্রুশ সংঘের সন্ন্যাসী নারী দ্বারা কলেজটিও পরিচালিত হয়, যার বর্তমান অধ্যক্ষ শিখা গোমেজ। বর্তমানে *হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়* ও *হলিক্রস কলেজ* বাংলাদেশের নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান। আবার ১৯৫২ সালে ঢাকার বেইলি রোডে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের গভর্ণর ফিরোজ খান নুনের

---

[৩২৭] Sonia Nishat Amin, *op.cit.*, p. 126

[৩২৮] *Ibid*

সহধর্মিনী ভিকার উন নিসা নূন মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজসেবী এ মহীয়সী নারীর নামানুসারে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় *ভিকারুননিসা নূন স্কুল* । পরবর্তীতে এ বিদ্যালয়ে কলেজ শাখা (ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণি) সংযোজিত হয়ে নামকরণ হয় *ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ*। বর্তমানে বাংলাদেশে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানে এ প্রতিষ্ঠানটি শ্রেষ্ঠ স্থানে রয়েছে।

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় সমসাময়িক সময়ে মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকে। এরমধ্যে অন্যতম যশোর জেলায় *মধুসূদন তারাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুল*, খুলনায় *করোনেশানস গার্লস হাইস্কুল*, ময়মনসিংহে *এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউট* (মহিলা বিভাগ) ও *রাধাসুন্দরী গার্লস স্কুল*, মুন্সীগঞ্জে *এ.ভি গার্লস হাইস্কুল*, ফরিদপুরে *ঈষাণ ইনস্টিটিউট* (মহিলা বিভাগ), মাদারীপুরে *ডোনাভান গার্লস স্কুল*, বরিশালে *সদর গার্লস স্কুল* ও *জগদীশ সারস্বত গার্লস স্কুল*, চট্টগ্রামে *অপর্ণাচরণ গার্লস হাইস্কুল* প্রভৃতি।[৩২৯] এভাবে দেখা যায় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিশ শতকের প্রথমার্ধে অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে সিলেটে *এম.সি কলেজ*, বরিশালে *বি.এম কলেজ*, পাবনায় *এডওয়ার্ড কলেজ*, কুমিল্লায় *ভিক্টোরিয়া কলেজ*, ময়মনসিংহে *আনন্দমোহন কলেজ*, ফরিদপুরে *রাজেন্দ্র কলেজ* প্রভৃতি পূর্ব-বাংলার ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলি ১৯৪০ সালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলিতে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের শিক্ষা নীতিমালায় ব্রিটিশ সরকার প্রথম বারের মতো নারীশিক্ষার বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার ফলে নারীশিক্ষায় সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১-৭২ সালের আগস্ট মাসে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় ছাপানো একটি নিবন্ধে দেখানো হয় সেসময় কলকাতায় ১১০টি সরকারি সাহায্যপুষ্ট এবং ১৪টি বেসরকারি মহিলা স্কুল ছিল। মোট ছাত্রী ছিল ৭৩২, তাদের মধ্যে ৫৮ জন ছিল মুসলমান।[৩৩০] এ পত্রিকা ১৮৮০ সালে মার্চ সংখ্যায় উল্লেখ করে ঢাকার *ইডেন স্কুলে* ১৫৩ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন ছিল মুসলমান। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন বাংলায় নারীশিক্ষা বিষয়ে নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়। এসময় মেয়েদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি এবং সিলেবাসে প্রয়োজনীয় সংস্কার, পর্দানশীন মেয়েদের জন্য অন্দরমহলে পড়িয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার ব্যবস্থা, নারী শিক্ষক নিয়োগ, অধিক সংখ্যক স্কুল ইন্সপেক্টর নিয়োগ ইত্যাদি প্রস্তাব সরকারের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয় যার অধিকাংশই

[৩২৯] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬

[৩৩০] *বামাবোধিনী পত্রিকা*, মাঘ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯৬ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা)

তখন বাস্তবায়ন হয়। আবার ১৯০১ সালে দেখা যায় মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার শতকরা ১ থেকে শতকরা ৩ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯০৫ সালের পর থেকে *ইডেন স্কুলে* ১২৫ জন এবং ময়মনসিংহের *আলেকজান্ডার স্কুলে (বিদ্যাময়ী স্কুলে)* ১০০ জন ছাত্রী পড়ালেখা করতো, যাদের অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ১৯১১ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া জাগে। ফলে এবছর (১৯১১) ইডেনে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৮ জন, যার মধ্যে মুসলমান ছিল ২৫ জন। উল্লেখ্য মুসলমান ছাত্রী সংখ্যা ১৯০৬ সালে ৩ শতাংশ ছিল এবং ১৯১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০ শতাংশ।[৩৩১] তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এসময় পূর্ব বাংলায় মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথা রক্ষা করে মফস্বল এলাকার স্কুলে পাঠদান করার মতো দক্ষ শিক্ষককের অভাব ছিল। আবার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ছিল না এবং তাদের আবাসিক ব্যবস্থার সুযোগও অপ্রতুল ছিল। একটি সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায়।

সারণি-৪ : Results of the Matriculation Examination of East Bengal[৩৩২]

(*Eden High School, Vidyamoyee High School & Dr. Khastagir's High School*)

Year	Number of Appeared	Number Passed				Remarks
		1st Division	2nd Division	3rd Division	Total	
1913	6	5	-	-	5	Four Secured Scholarships , One obtained a Special Scholarship of Rs.10
1914	4	2	-	-	2	Two Secured Scholarships
1915	6	6	-	-	6	Three Secured Scholarships, obtained a Special Scholarship of Rs.10
1916	8	6	1	-	7	Two Secured Scholarships, One obtained a Special Scholarship
1917	Result Not Yet Published					

Source : *Quinquennial Report on the Progress of female Education(1912-13 to 1916-17)*

[৩৩১] সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০

[৩৩২] *Quinquennial Report on the Progress of Female Education in the Dacca, Rajshahi and Chittagong Divisions for 1912-13 to 1916-17*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1918, p. 5 (National Library of India, Kolkata)

মূলত ঢাকার *ইডেন স্কুলকে* কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় মুসলমান মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া বৃদ্ধি পায়। এ স্কুল থেকে ১৯২১ সালে ফজিলতুন্নেসা (১৯০৫-১৯৭৬) তৎকালীন সকল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯২৫ সালে তিনি *বেথুন কলেজ* থেকে বি এ পাশ করেন। তবে দেখা যায়, উচ্চ শিক্ষায় হিন্দু মুসলিম মেয়েদের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিলেন অর্থাৎ ১৮৮২ সালে কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী বি.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এর চার দশক পর ১৯২২-২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুলতানা বেগম মুইদজাদা বাংলার প্রথম মুসলমান নারী যিনি বি.এ ডিগ্রি (সম্মানসহ) অর্জন করেন।[৩৩৩] অন্যদিকে সাকিনা মুইদজাদা (সুলতানা বেগম মুইদজাদার বোন) প্রাইভেট পরিক্ষার্থী হিসেবে ১৯২০ এর দশকে *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে আইনে এম.এ পরীক্ষায় সমগ্র বাংলায় প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলমান এম.এ ডিগ্রিধারী নারী এবং ১৯৩৫ সালে তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একমাত্র নারী আইনজীবী।[৩৩৪] তবে উল্লিখিত এ দু'জন নারী ছিলেন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করা। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় দেখা যায় *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে লীলানাগ ১৯২৩ সালে এম.এ পাশ করেন এবং মুসলমান মেয়েদের মধ্যে সর্ব প্রথম ফজিলতুননেসা *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে অংক শাস্ত্রে ১৯২৭ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। উল্লেখ্য সে যুগে মালেকুন্নেসা, সারাতৈফুর, মামলুকুল ফাতেমা, নুরুন্নেসা খাতুন, জোবেদা খাতুন, শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল সহ যে সকল লেখাপড়া শিখেন, তাদের অধিকাংশই আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে শিখেছিলেন।[৩৩৫] এসকল মেয়েদের অনেকেই শিক্ষকতার কাজে এগিয়ে আসার পর মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে পূর্ব বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে মেয়েদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নারীশিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক প্রসার লাভ করায় এসময় উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের সরব উপস্থিতি লক্ষণীয়। শুধু কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ১৯৩৬ সালে ১০৯৫ জন ছাত্রী পড়তো যার মধ্যে ৮৬৭ জন হিন্দু এবং ৩৭ জন মুসলমান।[৩৩৬] অন্যদিকে দেখা যায় ১৯৩৮ সালে ২৬ জন বাঙালি মেয়ে এম.এ পাশ করেন। যা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে নারীশিক্ষা বৃদ্ধির ইতিবাচক ফল।

---

[৩৩৩] তপতী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৮

[৩৩৪] S. M. H. Zaidi, *Position of Women Under Islam*, Book Tower, Calcutta, 1935, p. 126

[৩৩৫] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৫

[৩৩৬] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬

১৯২১ সালে পূর্ব বাংলায় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার অন্যতম পাদপীঠ *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার দ্বার খুলে যায়। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলিম মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় দেখা যায় বাংলায় ১৯৪০ সালে ৪৬ জন ছাত্রী এম.এ এবং ৩ জন মেয়ে এম.এস.সি পাশ করেন। ১৯৪১ সালে আরবি ভাষায় এম.এ শ্রেণিতে সৈয়দা ফাতিমা খাতুন প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন এবং ১৯৪২ সালে উর্দু ভাষায় এম.এ শ্রেণিতে প্রথম হন সৈয়দা ফাতিমা বেগম। ১৯৪৪ সালে এম.এ. পাশ করেন ৬৪ জন ছাত্রী ও এম.এস.সি ১৬ জন। ১৯৪৫ সালে এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৭ ও ১২ জন। ১৯৪৫ সালে আরবি ভাষায় এম.এ শ্রেণিতে প্রথম হন লতিফা খাতুন এবং ২য় হন হালিমা খাতুন। ১৯৪৭ সালে ৮১ জন এম.এ এবং ১ জন এমএসসি পাশ করেন।[৩৩৭] এর পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে নানারকম নেতিবাচক ধারণা ও রক্ষণশীলদের বাধা প্রচলিত থাকলেও মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল কলেজ তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং কো-এডুকেশনের মাধ্যমে নারীশিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলতে থাকে।

সার্বিক আলোচনার শেষে বলা যায়, পূর্ব বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে নারীশিক্ষা কার্যক্রম প্রথমে শুরু করে খ্রিষ্টান মিশনারিরা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তারা বাংলার নানা জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে প্রগতিশীল বাঙালিরা তাদের মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এক্ষেত্রে প্রথমাবস্থায় মুসলিম সমাজের মেয়েরা পিছিয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে এ অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মুসলিম মহীয়সী নারী নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী কর্তৃক কুমিল্লায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ঢাকায় *ইডেন গার্লস স্কুল* প্রতিষ্ঠা বাংলায় মুসলিম নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। ক্রমে মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষানুরাগীদের মানসিকতার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। সরকারও মুসলমান নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আগ্রহান্বিত করে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলিম মেয়েদের উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরি, বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়ের সাথে বোর্ডিং (ছাত্রী ও শিক্ষকের আবাসন ব্যবস্থা), গরীব ও মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার দেওয়া প্রভৃতি কারণে মুসলিম মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়। এসময় বাংলার বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে এসকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১১ সালে বাঙালি মুসলিম নারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটি* মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলো। এর পরবর্তী

[৩৩৭] *ঐ*, পৃ. ১৮৫

সময়ে বাংলার মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাধাহীনভাবে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলায় মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করে। এ ধারায় পূর্ব বাংলায় ক্রমান্বয়ে অসংখ্য স্কুল কলেজ এবং *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* প্রতিষ্ঠার ফলে নারীশিক্ষার হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ-বিশ শতকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন : স্বরূপ সন্ধান

পূর্ব বাংলায় নারীজাগরণ ও আন্দোলন দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল। এর বীজতলা প্রস্তুত হতে অনেক সময় লেগেছিল। উনিশ শতক ছিল এক্ষেত্রে যুগসন্ধিক্ষণ। এ শতকে বাংলায় রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধোগতির বিরুদ্ধে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ দেখা দেয়। রেনেসাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সামাজিকভাবে অনগ্রসরমান মেয়েদের শিক্ষাসহ সার্বিক উন্নতির বিষয়ে ভাবনা। নারীকে শিক্ষিত করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়। মূলত রেনেসাঁর মাধ্যমে বাংলায় নারীজাগরণ ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) প্রমুখ ব্যক্তিগণ সামগ্রিকভাবে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করেছেন। এক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

উনিশ ও বিশ শতকে বাংলায় নারীজাগরণ ও আন্দোলনের পটভূমি রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল অপরিসীম। এক্ষেত্রে অগ্রদূত ছিলেন ব্রিটিশ লেখক, দার্শনিক ও নারী অধিকার কর্মী Mary Wollstonecraft (1759-1799)। এ মহীয়সী নারী মেয়েদের অধিকার ও স্বাধীনতার কথা অকপটে তুলে ধরেন। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *A Vindication of the Rights of Woman* প্রকাশিত হয় ১৭৯০ সালে। এ সময় হতেই পাশ্চাত্যে নারীজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু হয় বলে জানা যায়। মূলত আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপে তথা ইংল্যান্ডে মেয়েদের অবস্থা ভারতবর্ষের নারীর মতই অনেকটা অবহেলিত ছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের একক কর্তৃত্ব ছিল নারীর উপর। শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা অধিকার থাকলেও নারী পুরুষ সমান অধিকারের বিষয়টি মেয়েরা ভাবতে পারেনি।[৩৩৮] ১৮৬৫ সালের পূর্বে ইংল্যান্ডে মেয়েদের ভোটাধিকার বা অন্যকোন রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আন্দোলনের কথা চিন্তা করা হয়নি। ১৮৭০ সালে বিবাহিত মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক বিল পার্লামেন্টে প্রথম আলোচিত হয় এবং তা আইনে পরিণত হতে সময় লাগে আরো আঠারো বছর।[৩৩৯]

---

[৩৩৮] Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman*, J. Johnson, London, 1796, p. 29

[৩৩৯] মুহাম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮

অন্যদিকে উলস্টোনক্রাফটের গ্রন্থ প্রকাশনার বেশ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীর অধিকার আদায়ে আন্দোলন শুরু হয়। Margaret Brent (1601-1671), Abigail Adams (1744-1818), Judith Sargent Murray (1751-1820) প্রমুখ মনীষী এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৭৭৬) সময় জুডিথ সার্জেন্ট মুরেই সমসাময়িক মেয়েদের শিক্ষা লাভে পুরুষের সাথে তুলনামূলকভাবে সুযোগ-সুবিধার অভাব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটিতে তিনি মেয়েদের সম্পর্কে নানা উচ্চ ধারণা প্রদান করেন। এমনকি তিনি উল্লেখ করেন পুরুষের চাইতে নারীর মানসিক উৎকর্ষতা বেশি। তাঁর এ প্রবন্ধ বেশ কয়েক বছর পর ১৭৯০ সালে প্রকাশিত হয়।[৩৪০]

ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় নারীমুক্তি বা নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা মেরি উলস্টোনক্রাফট এবং জুডিথ মুরের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় সামন্তবাদ তথা মানুষে মানুষে জন্মগত শ্রেণিভিত্তিক বিভেদ দূরীভূত হয়। বলা হয় সকল দেশের সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান এবং সকলের মানবাধিকারও সমান। ফলে এসময় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের মনে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের আকাঙ্খা প্রবলতর হয়ে ওঠে। এ বছরই (১৭৮৯) ৪ থেকে ৬ অক্টোবরের মধ্যে কতিপয় উৎসাহী বিপ্লবীর প্রচেষ্টায় প্যারিস থেকে ভার্সাই পর্যন্ত 'March of Women' অনুষ্ঠিত হয়। নারী জাতির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত তিনদিনের এ ঐতিহাসিক মিছিল নারীর অধিকার বিষয়ে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি করে।[৩৪১]

এছাড়া ফরাসি সমাজ সংস্কারক ও লেখক Olympe de Gouges (1748-1793) নারীর অধিকার সম্বন্ধে একটি ঘোষণা প্রচার করেন (১৭৯১)। এখানে ১৭টি ধারায় নারীর অখণ্ডনীয়, স্বাভাবিক এবং পবিত্র অধিকার নির্দিষ্ট হয়। এ ঘোষণার প্রথম ধারাতেই বলা হয়েছে নারী স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, মানুষের ও নাগরিকের অধিকারে সে পুরুষের সমান। তবে তাঁর এ নারীবাদী বক্তব্য ফরাসী বিপ্লবের গতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। অল্পকালের মধ্যেই তাকে গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।[৩৪২] এ বিষয় দুটি পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বে নারী অধিকার আদায়ে বা নারীমুক্তি আন্দোলনে মাইলফলক হিসেবে কাজ করে।

---

[৩৪০] শাহানারা হোসেন, "নারীমুক্তি আন্দোলন", *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী রোকেয়ার নারীবাদ ও তাঁর ধারাবাহিকতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৮

[৩৪১] D. M Ketelbey, *A History of Modern Times From 1789,* George G. Harrap & Co. Ltd., London, 1932, pp. 55-56; উদ্ধৃত, মুহাম্মদ শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯

[৩৪২] মালেকা বেগম, *নারীমুক্তি আন্দোলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৩

অন্যদিকে ফরাসি পণ্ডিত ভলতেয়ার (Voltaire 1694-1778) এর বিভিন্ন রচনায় নারীর প্রতি সমর্থন ও গভীর সহানুভূতি প্রতিফলিত হয়। তৎকালে নারী অধিকার নিয়ে নানা আলোচনায় ফরাসী সরকার ১৭৯৩ সালে মেয়েদের রাজনৈতিক সংগঠন ও কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে বলে জানা যায়। তারপরও নারী অধিকার আদায়ের নানা কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। বলা যায় বিপ্লবের দেশ ফ্রান্সেই সর্বপ্রথম নারীমুক্তির জন্ম হয়েছিল।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি থেকেই মূলত মেরি উলস্টোনক্রাফট অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। মেরি উলস্টোনক্রাফট ১৭৯০ সালে *A Vindication of the Rights of Men* (মানুষের অধিকারের ন্যায্যতার দাবি) নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থটি রচিত হয় আইরিশ দার্শনিক এডমান্ড বার্ক (Edmund Burke 1929-1797) এর *Reflections on the Revolution in France* (১৭৯০) গ্রন্থটির বক্তব্যের প্রতিবাদস্বরূপ। বার্ক তাঁর গ্রন্থে ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯-১৭৯৫) মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রাপ্তির বিরোধিতা করেন।[৩৪৩] তাই রাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ বিরোধী মেরি উলস্টোনক্রাফটের প্রতিবাদে ব্যক্ত করেন, নাগরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার; এবং কেবলমাত্র অজ্ঞতাই কোন ব্যক্তিকে কলুষিত করতে পারে আর স্বৈরাচারিতাই মানুষের ঈশ্বর প্রদত্ত এ বিশেষ অধিকার অর্জনের পথে বাধা হতে পারে।[৩৪৪] উলস্টোনক্রাফট তাঁর নিজের বইয়ে মানবাধিকারের সপক্ষেই যুক্তি প্রদান করেন। এ থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করে তিনি রচনা করেন *A Vindication of the Rights of Woman* (১৭৯২)। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীর অধস্তনতার ব্যাপকতা নিরীক্ষণ করায় তিনি পৃথকভাবে নারীর মানবাধিকারের স্বপক্ষে যুক্তিসহকারে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন।[৩৪৫] মানুষের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি নারী পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলেছেন। উল্লেখ্য *A Vindication of the Rights of Woman* গ্রন্থটি অনুদিত হয়ে ফ্রান্সে পাঠক ও লেখক সমাজে জনপ্রিয়তা পায়। ফ্রান্সের সাহিত্য ও রাজনীতির লেখক যেমন- Thomas Paine (1737-1809), Joel Barlow (1754-1812), Helen Maria Williams (1761-1827) এবং সর্বোপরি ফরাসী বিপ্লবের নেতা Pierre Francois Trissot (1768-1854) প্রমুখ ব্যক্তিরা মেরি উলস্টোনক্রাফটকে অভিনন্দন জানান।[৩৪৬] মেরি উলস্টোনক্রাফট এমন একটা সময়ে গ্রন্থটি রচনা করেন যখন ইউরোপ ও

---

[৩৪৩] হাসনা বেগম, *নারীমুক্তি বেগম রোকেয়া ও অন্যান্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৯

[৩৪৪] Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Men*, J. Johnson, London, 1790, p. 26

[৩৪৫] হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩

[৩৪৬] *ঐ*, পৃ. ৪৪

আমেরিকায় মানুষের অধিকার ও ন্যায়নীতি প্রসঙ্গে নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন ঘটে। ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এসকল চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। নারীর মানবাধিকার বিষয়ে তখন পর্যন্ত সচেতনতার প্রকাশ ঘটেনি। তিনি এ গ্রন্থে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি এবং একই মানদণ্ড দাবি করেন। নারীও যে মানুষ এবং পুরুষের সমমানেরই মানুষ সে সত্যটি যৌক্তিকতার সাথে বিবৃত করেন।[৩৪৭]

আঠারো শতকে নারীর অধস্তনতার পক্ষে অন্যতম মত ছিল ঈশ্বর শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে মেয়েদের নিম্নমানের করে সৃষ্টি করেছেন। আর এ ধর্মীয় ধারণাকে পুঁজি করে পুরুষ নারীকে পদানত করেছে যুগে যুগে। এর প্রতিবাদ স্বরূপ উলস্টোনক্রাফট তাঁর গ্রন্থে মত প্রকাশ করেন, যে সকল মনোভাব বা প্রবণতা এবং রীতিনীতি নারীকে অধস্তন করে রাখার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছে, সেগুলিকে পরিত্যাগ করে নারী-বান্ধব এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেই নারীমুক্তির পক্ষে একটি স্থায়ী অবস্থান নেওয়া সম্ভব। তিনি আরো উল্লেখ করেন, পুরুষের মনোরঞ্জন ও সেবা করে তার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীলতাই নারীর একান্ত কাম্য না হয়ে বরং মানুষ হিসেবে মেধা ও কর্মক্ষমতার উন্নতিসাধন করার প্রতি যত্নশীল হওয়াই নারীর কর্তব্য।[৩৪৮] তাঁর মতে, নারীকে অধস্তন অবস্থা থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনে একটি সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমাজকাঠামো সৃষ্টি করতে হবে। এ নতুন সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হবে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, যে চর্চার মাধ্যমে সকল সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে নির্বিঘ্নে পথ চলা সম্ভব হবে। কেবল এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীর মানবাধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

উলস্টোনক্রাফট তাঁর গ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ঐশ্বরিক গুণাবলিকে গুরুত্ব দিয়ে নারীর মানবাধিকারের পক্ষে যুক্তি প্রদান করে বলেন-

> To Conceive… of a Just God who could create a woman and deny her rational capacity [which is a *differentia* between human and other creations] to seek the knowledge that would make her virtuous- is impossible.[৩৪৯]

---

[৩৪৭] *ঐ*, পৃ. ৪৫

[৩৪৮] Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman, op.cit.*, p. 42

[৩৪৯] *Ibid*, p. 113

মেরি উলস্টোনক্রাফট বলেন যে, নারীও পুরুষের মত ধীশক্তি, বিবেক, আবেগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরিবেশের প্রতিকূলতা ও শিক্ষার অভাবে তারা পুরুষের তুলনায় নানাদিক থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন,

> Asserting the rights which women in common with men ought to contend for, I have not attempted to extenuate their faults; but to prove them to be the natural *consequence of their education and station in society*. If so, it is reasonable to suppose that they will change their vices and follies, when they are allowed to be free in a physical, moral and civic sense.[৩৫০]

তাই পুরুষের মতো সমান সুযোগ সুবিধা নারীকে দিতে হবে। উল্লেখ্য নারীবাদের সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক বক্তব্যের কারণে পরবর্তীতে (*A Vindication of the Rights of Woman* রচনার দুই দশক পর) মেরি উলস্টোনক্রাফটকে 'The founding mother of feminism' (নারীবাদের প্রতিষ্ঠাতা জননী) হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৩৫১]

উলস্টোনক্রাফট তাঁর গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেন শিক্ষা দ্বারা নারীকে যদি পুরুষের উপযুক্ত সাথী হিসেবে গড়ে তোলা না হয় তাহলে নারীর এ অনগ্রসরতা মানবজাতির জ্ঞান ও গুণের উন্নতি এবং বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মেয়েরা পুরুষের জন্য সুবিধাজনক দাসী হতে পারে, কিন্তু নারীর এ দাসত্ব তার নিজের সাথে সাথে প্রভুকেও (পুরুষ) অধঃপতিত করে।[৩৫২] তাই নারীর অগ্রগতি প্রয়োজন। পুরুষের ন্যায় অধিকার নারীর প্রাপ্য এবং এভাবেই সমাজের তথা দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব বলে মনে করেন মেরি উলস্টোনক্রাফট। অন্যদিকে শিল্প বিপ্লবের (১৭৬০-১৮২০/৪০) ফলে ইউরোপ ও আমেরিকায় কর্মক্ষেত্রে খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ দ্রুত শিল্প কারখানা স্থাপিত হতে থাকে। এসব কারখানায় মেয়েদেরকে সীমিত পরিসরে স্বল্প বেতনে নিয়োগ করা হতো। কাজের ক্ষেত্রে মেয়েরা সৎ ও আন্তরিক ছিল বলে কারখানা মালিকরাও এর সুফল ভোগ করে। অর্থাৎ তারা স্বল্প বেতন

---

[৩৫০] *Ibid*, p. 119

[৩৫১] হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১

[৩৫২] শাহানারা হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮

দিয়ে অধিক উৎপাদনের সুযোগ পায়। অপরদিকে মেয়েরাও কাজ করে অর্থ উপার্জন করে নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের একটা সুযোগ লাভ করে। পাশাপাশি এসময় বিভিন্ন অভিজাত পরিবারে গৃহপরিচারিকার কাজেও মেয়েদের দেখা যায়। এভাবে নারী স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে অর্থ উপার্জন এবং নৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে শুরু করে।

আঠারো শতকের শেষদিক হতে ইংল্যান্ডে বেশ কয়েকজন প্রগতিশীল দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন William Thompson (1775-1833), Jeremy Bentham (1784-1832) ও Caroline Norton (1808-1877) প্রমুখ। যাঁরা রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে উদারনৈতিক মতবাদ প্রচার করে সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রের দায়িত্ব কর্তব্য, নাগরিকের স্বাধীনতা ও সুখশান্তি লাভের অধিকার ইত্যাদি বিষয় তাদের রচনাবলীর মধ্যে প্রকাশ পায়। দার্শনিক জেরেমী বেনথাম তাঁর বিখ্যাত মতবাদ 'উপযোগবাদ' (Utilitarianism) প্রকাশ করেন। যার মূলকথা ছিল, সর্বাধিক লোকের সবচেয়ে বেশি সুখ লাভই হচ্ছে সমাজের ও রাষ্ট্রের সকল কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। বেনথামের অনুসারিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন James Mill (1773-1836) এর পুত্র John Stuart Mill (1806-1873), যিনি ইতিহাসে একজন উগ্র প্রগতিশীল দার্শনিক বলে বিবেচিত।

উনিশ শতকের একজন বিখ্যাত মার্কিন চিন্তাবিদ ও সংস্কারক Theodore Parker (1810-1860)। তিনি জীবনব্যাপী ধর্মতত্ত্বের চর্চা করেন। তিনি যে ধর্মের কথা প্রচার করেন সেখানে নারীর মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। তাঁর মতে, "স্ত্রীকে পুরুষের তুল্য জ্ঞান করা কর্তব্য- অর্থাৎ উভয়েই তুল্যমূল্য। নারী পুরুষ হইতে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও কোন কোন বিষয়ে ন্যুন; নিকৃষ্ট গুণে-শরীর ও মস্তিস্কের পরিমাণে ন্যুন; কিন্তু উৎকৃষ্ট গুণে অর্থাৎ নৈতিক জ্ঞানে, স্নেহগুণে ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ; অতএব সমুদয় বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে নারীকে পুরুষের তুল্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সুতরাং তিনি সকল প্রকার স্বত্বের তুল্য অধিকারী। মন, শরীর এবং সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার যেমন অধিকার, পরিবার, সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজ্যশাসন বিষয়েও তদ্রুপ; কিন্তু নারী জাতি এই সকল স্বত্ব হইতে বঞ্চিত আছেন, তাহা কেবল পুরুষের বলের কার্যত ন্যায়ের নহে; ফলত: ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে তাঁহারা ঐ সকল স্বত্ব একদিন নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবেন।"[৩৫৩] অন্যদিকে পারকারের জীবনবৃত্তান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তাঁর স্নেহাস্পদ প্রিয় বন্ধুদের অধিকাংশই নারী। সহৃদয় কুলবালাদের কোমলকর-বিরচিত সস্নেহ

[৩৫৩] শিবচন্দ্র দেব, "থিওডোর পার্কারের ধর্ম বিষয়ক মত"; উদ্ধৃত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, *নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব*, অনিন্দিতা বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ৯-১০

পত্রাবলীতেই তাঁর জীবনচরিতে অনেকস্থল পূর্ণ। অর্থাৎ নারীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন পারকার।[৩৫৪]

পারকারের চেয়ে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর চিন্তাধারা অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। ১৮৬৯ সালে স্টুয়ার্ট মিল প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Subjection of Women*। এ গ্রন্থে তিনি নারী ও পুরুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমান অধিকারের বিষয়গুলি অত্যন্ত যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করেন। বলা যায় মেরি উলস্টোনক্রাফট যে নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু করেন তা সার্থক ও সফল করার কাজে স্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থটি শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। উলস্টোনক্রাফট *A Vindication of the Rights of Woman* গ্রন্থে ভাব প্রকাশের ভঙ্গীতে ঘনীভূত ক্রোধ ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পায়, যেখানে স্টুয়ার্ট মিল অত্যন্ত শান্ত ও পরিশীলিত ভঙ্গীতে একই বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মিল বলেন সমাজের অর্ধাংশ এ নারী সমাজ অবহেলিত ও অধস্তন। নারী বুদ্ধিবৃত্তিক ও অন্যান্য ক্ষমতা প্রকাশে বাধাগ্রস্ত হলে সমগ্র সমাজের মঙ্গল ও উন্নতিসাধন হতে পারে না। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর গ্রন্থে নারীর অধস্তনতার স্বপক্ষের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করেন এবং উলস্টোনক্রাফটের ন্যায় বলেন,

> ... no one safely pronounce that if women's nature were left to choose its direction as freely as men's, and if no artificial bent were attempted to be given to it except that required by the human society and given to both sexes alike, there would be any material difference, or perhaps any difference at all, in the character and capacities which would unfold themselves.[৩৫৫]

স্টুয়ার্ট মিল অভিমত প্রকাশ করেন যে, পুরুষের মত সমসুযোগ ও সমপরিবেশ নেই বলেই নারীর অধস্তন অবস্থা এবং মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হয় সেটা 'an education of the sentiments rather than of the understanding'।[৩৫৬] এভাবে দেখা যায় *The Subjection of Women* গ্রন্থের সাথে উলস্টোনক্রাফটের বইয়ের বক্তব্যের অনেক মিল রয়েছে। তাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা। তাঁরা জোর দাবি করেন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে মেয়েদের পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া

---

[৩৫৪] *ঐ*, পৃ. ১১

[৩৫৫] John Stuart Mill, *The Subjection of Women*, Longman, London, 1869, p. 105

[৩৫৬] *Ibid*, p. 163; উদ্ধৃত, হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১

আবশ্যক এবং আইনগত ভাবে নারীকে পুরুষের অধীন রাখা ঘোরতর অন্যায়। পাশাপাশি নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।[৩৫৭]

উলস্টোনক্রাফটের পর আইরিশ সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক William Thompson সমাজে নর-নারীর অসম অবস্থান, অধিকারের তারতম্য ও পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। নারীর জাগরণ ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। এ প্রসঙ্গে Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) এর নারীমুক্তির ঘোষণা সম্বলিত প্রস্তাবের কথাও বলা যায়।[৩৫৮] অন্যদিকে ইউরোপে ডাচ দার্শনিক Desiderius Erasmus (1466-1536) এর নারীমুক্তি সমর্থনে প্রচারিত মতামত শুনে সারাবিশ্ব চমকে উঠে। তিনি বলেন, 'অভিজাত ও জনসাধারণ, মাতা ও স্ত্রী, বিধবা ও কুমারী এক কথায় সকল শ্রেণির ও সকল পদবীর নারীকে নিয়ে একটি মিশ্রিত রাষ্ট্রসভা গঠন করতে হবে। প্রত্যেক নারীকে ভোটাধিকার দিতে হবে, প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা দিতে হবে'।[৩৫৯] ইরেসমাস ইউরোপীয় দার্শনিকদের মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, উপযোগবাদ বা হিতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আবার রোমান্টিক যুগের কবি P.B Shelly (1792-1822)'র *The Revolt of Islam* কাব্যেও নারীর প্রতি পুরুষ প্রধান্য সমাজের নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।[৩৬০]

ফরাসি বিপ্লবের পর ইউরোপের ইতিহাসে বেশকিছু ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে আরো দুটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এরপর ইতালি ও জার্মানীর একত্রীকরণ লক্ষ্যণীয়। ১৮৭০ সালে ফ্রান্স-প্রুশিয়ার যুদ্ধে (সেডান যুদ্ধ) ফ্রান্স পরাজিত হয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে বিভিন্ন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইউরোপে বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে আলোড়ন চলতে থাকে। বিশ শতকের প্রথমদিকে (১৯১৭ খ্রি.) রাশিয়ায় বলশেভিক বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নারীমুক্তি আন্দোলনের বিস্তার ও সফলতার পথকে অনেকটা এগিয়ে দেয়। আবার দেখা যায়, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যখন পুরুষ যুদ্ধে বা আন্দোলনের কাজে ব্যস্ত থাকে তখন দেশের অভ্যন্তরীণ কাজের বহু গুরু দায়িত্ব মেয়েরা সফলতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে। এ ঘটনার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ফল হিসেবে প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরেই যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের উনত্রিশতম

---

[৩৫৭] Hasina Joarder and Safiuddin Joarder, *Begum Rokeya : The Emancipator*, Nari Kalyan Sangstha, Dhaka, 1980, p. 3

[৩৫৮] কালীপ্রসন্ন ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

[৩৫৯] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, (স্পেশাল ভলিউম), ৩৮ শরৎগুপ্ত রোড, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫২৪-৫২৫

[৩৬০] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯২০ সালে মেয়েদের ভোটাধিকার প্রদান করে। ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডেও নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৬১] এভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যার ঢেউ এসে লেগেছিল ভারতবর্ষে তথা বাংলায়। সুতরাং বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের কোনো ইতিবাচক দিক যদি থেকে থাকে তাহলে এটি অবশ্যই এদেশের নারীমুক্তি আন্দোলন এবং এর সাফল্য।

বাংলার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় ইউরোপীয় প্রভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকে একটি জাগরণ পরিলক্ষিত হয়, যাকে আমরা বাংলার রেনেসাঁ[৩৬২] নামে অভিহিত করি। মূলত রেনেসাঁর উদ্ভব ও বিকাশ ইউরোপে। চৌদ্দ শতকে ইতালির জেনোয়া, ভেনিস ও ফ্লোরেন্সে এর সূচনা হয়ে পনেরো, ষোলো ও সতের শতক পর্যন্ত সারা ইউরোপে বিকাশ ও বিস্তার লাভ করে। এসময় জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। যার প্রবল প্রকাশ ঘটে মানবতাবাদ, ভাষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে প্রথমবারের মত একটা নাম দিয়েছিলেন Giorgio Vasari (1511-1574)। ভাসারি ছিলেন একজন ইতালিয় চিত্রশিল্পী, স্থপতি এবং শিল্পকলার ইতিহাসের রূপকার। তিনি তাঁর বিখ্যাত *Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects* (1550) গ্রন্থে এ পরিবর্তনের নাম দেন 'রিনাসীতা' (rinascita),[৩৬৩] ইংরেজিতে বলে Renaissance। ফরাসি ঐতিহাসিক Jules Michelet (1798-1874) ১৮৮৫ সালে তাঁর *The History of France* (1833) গ্রন্থে এ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের নাম দেন 'রেনেসন্স' বা পুনঃজন্ম। মিশেলের মতে রেনেসন্স আসার ফলে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্তি পেয়ে ইউরোপ একেবারে এক নতুন যুগে উপনীত হয়েছে।[৩৬৪]

---

[৩৬১] শাহানারা হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

[৩৬২] ফরাসী শব্দ renaissance এর অর্থ পুনঃজন্ম (rebirth) বা পুনর্জাগরণ (revival)। পুনঃজন্ম বা পুনর্জাগরণ বলতে বুঝায় আগে জন্ম ও জাগরণ হয়েছিল, মাঝে পতন হয়, তারপর আবারও জন্ম ও জাগরণ হয়। এ জন্ম ও জাগরণ পূর্বের চিত্র ও চরিত্র নিয়ে নয়, অনেক নতুন মাত্রা, শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়। এ পুনর্জাগরণ- rebirth or revival, Specially in learning culture and arts or the rival of art and letters in Europe from 14th to 16th century [Oxford Advanced Learner's Dictionary]. পুনঃজন্ম বা পুনর্জাগরণ হলো শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে এবং আরো অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে রেনেসাঁর অর্থ অনেক প্রসারিত ও ব্যঞ্জনাবহ। (ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার রেনেসাঁ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১১)

[৩৬৩] *ঐ*, পৃ. ১৩

[৩৬৪] গোলাম মুরশিদ, *রেনেসন্স বাংলার রেনেসন্স*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৫

মূলত ইতালির ফ্লোরেন্সে সর্বপ্রথম রেনেসাঁর উৎপত্তি ঘটে। এছাড়া ভেনিস, মিলান, জেনোয়া, সিয়েনা এবং রোমে এর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে রোমান সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ার পূর্বে প্রতিবেশী দেশ গ্রীসে অনেক উন্নত ধরণের নগররাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠে। গ্রীস ধীরে ধীরে পরিণত হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে, প্রযুক্তি-দর্শনে, স্থাপত্য-শিল্পকলায় উন্নত ও পরিপূর্ণ একটি দেশে। এখানে জন্ম নেন প্লেটো, হোমার, সফোক্লিস (খ্রি. পূর্ব ৪৯৬-৪০৬), সক্রেটিস (খ্রি. পূর্ব ৪৭০-৩৯৯), পীথাগোরাস (আনু. খ্রি. পূর্ব ৪২৭-৩৪৭), প্লেটো (খ্রি. পূর্ব ৪২৭-৩৪৭), এরিস্টটল (খ্রি. পূর্ব ৩৮৪-৩২২), ইউক্লিড (খ্রি. পূর্ব ৩০০), আর্কিমিডিস (খ্রি. পূর্ব পঞ্চম শতক) প্রমুখ মনীষী। যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রেখেছেন। দেখা যায় ধীরে ধীরে রোমের আধিপত্যের কাছে গ্রীস ম্লান হতে থাকে (খ্রি. পূর্ব ১৪৬)।

প্রকৃতপক্ষে পুনর্জাগরণ-এর অর্থ বুঝাতে 'রেনেসাঁ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।[৩৬৫] রেনেসাঁ হলো একটি বৌদ্ধিক আন্দোলন যার মাধ্যমে মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়। এ সময় মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভাবন (পনেরো শতক) ও ভৌগলিক আবিষ্কার নতুন চেতনার জন্ম দেয়। ফলে বলা যায় রেনেসাঁ কেবল একটি জাতির শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির উপর নয় বরং সার্বিক বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে যুক্তিবাদ, বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান অর্জনের চেতনাকে জাগ্রত করে। উল্লেখ্য বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগ ছিল অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, একনায়কতন্ত্র ও সামন্তবাদ ইত্যাদি অনাচার ও অব্যবস্থাপনার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজার শাসন ও শোষণ ছিল, কিন্তু জনকল্যাণমূলক কাজ খুব একটা ছিল না। আবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক বাংলা শাসন করেছে। বাংলার অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটলেও রাজকার্যে হিন্দুদের অংশগ্রহণও থেকে যায়। শিক্ষাব্যবস্থা টোল, মক্তব, মাদ্রাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ সময় নারীশিক্ষা অবহেলিত ছিল। মধ্যযুগে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশ ইউরোপের ন্যায় উন্নত ছিল না। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ পরিবর্তন জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবন-পিপাসা, আত্মজিজ্ঞাসা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিবাদ ও দেশপ্রেম প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের বাঙালি সমাজ, সাহিত্য, মনন, দর্শন, জীবনবোধ ও শিল্পচর্চায় পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখতে পাই। আর এ পরিবর্তনের আলোর প্রতিফলনকে আমরা বাংলার রেনেসাঁ বলে অভিহিত করি।

[৩৬৫] রেনেসাঁর কয়েকজন শিল্পী, লেখক, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইতালির ম্যাকিয়াভেলি (রাজনীতিবিদ), এ্যারিওস্টো ও তাসো (কবি), ব্রুনো (দার্শনিক), গ্যালিলিও (বিজ্ঞানী), মাইকেল এঞ্জেলো ও র‍্যাফায়েল (চিত্র শিল্পী), ফ্রান্সের র‍্যাবলেও মঁত্যে (লেখক), পোল্যাণ্ডের কপারনিকাস (জ্যোতিষী), ইংল্যাণ্ডের মুর ও বেকন (রাজনীতিবিদ), শেক্সপিয়ার (নাট্যকার-কবি) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। (ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২)

উল্লেখ্য উনিশ শতকে বাংলায় যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ হয়েছে তা ইউরোপীয় রেনেসাঁর মত বৈশ্বিক চিন্তা নিয়ে আসেনি। মূলত ইউরোপীয় রেনেসাঁ ছিল বিশাল এবং ব্যাপক বিস্তৃত। মুক্তচিন্তা ও আত্মমুক্তির উদারতা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন এবং বিজ্ঞান, মনন ও মানব সম্প্রীতির বৈশ্বিক প্রসারতা যা সমগ্র পৃথিবীকে আন্দোলিত করেছে, শুধু তাই নয় সমগ্র পৃথিবীকে পাল্টেও দিয়েছে।[৩৬৬] অন্যদিকে বাংলার রেনেসাঁ বৈশ্বিক চেতনা নিয়ে আসেনি। ইউরোপের রেনেসাঁর মত বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাবে নতুন নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার, ভৌগলিক আবিষ্কার, শিল্প বিপ্লবের ফলে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা এর কোনটিই এখানে ঘটেনি। এজন্য অনেক মনীষী বাংলার জাগরণকে রেনেসাঁ বলে অভিহিত করতে রাজি নন। গোলাম মুরশিদ উল্লেখ করেন যে, "ইতালি আর বাংলার রেনেসন্স এর মধ্যে যে পার্থক্য তা মূলগত আর এ কথা স্বীকার করে নিলে বঙ্গদেশে পুনর্জাগরণ ঘটেনি, তার (বাংলার) ঘুম ভেঙ্গেছিল মাত্র"।[৩৬৭] নানা সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও এ কথা বলা যায় যে, উনিশ শতকে বাংলার সমাজে চিন্তার জগৎ ও মননে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষের তথা বাংলার অতীত গৌরবের ইতিহাস আছে। বাংলার ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ও মানবিকতাবোধ ইউরোপীয়দের থেকে আলাদা। তাই উনিশ শতকে বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও দর্শনে, প্রতিবাদী ও বিবেকি চেতনায় এবং বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক মননে, সর্বোপরি আধুনিকতার দিক দিয়ে এ সময়টি ছিল যথার্থই বাঙালির চিত্তজাগরণ ও আত্মজাগরণের যুগ। এ যুগ বাঙালির নবজাগরণের যুগ এবং যথার্থই বাংলা ও বাঙালির রেনেসাঁর যুগ।[৩৬৮] রেনেসাঁর মাধ্যমে বাংলায় মধ্যযুগ হতে বিদায় নিয়ে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ও নিপীড়িত মেয়েদের অবস্থার উন্নয়নে নারী জাগরণ ও আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচনায় বাংলার রেনেসাঁ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গবেষণা প্রথম শুরু করেন ইংরেজ পণ্ডিতরা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে কয়েকজন জ্ঞান পিপাসু কর্মকর্তা ১৭৮৪ সালে কলকাতায় *এশিয়াটিক সোসাইটি* প্রতিষ্ঠা করেন। William Jones (1746-1794) সহ আরো অনেক ব্রিটিশ পণ্ডিতরা এখানে ভারতবর্ষের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।[৩৬৯] বিশেষভাবে উল্লেখ্য, উনিশ শতকের শুরুতে বাংলায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এ

[৩৬৬] সফিউদ্দিন আহমদ, *ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট ও ডিরোজিও*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪

[৩৬৭] গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫

[৩৬৮] সফিউদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪-৫

[৩৬৯] গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৬

ধারায় ১৮০০ সালে *ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ* স্থাপিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের জন্য কলেজটি ব্রিটিশরা প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রতিষ্ঠানে অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকজন পণ্ডিত বাংলা গদ্যে কিছু মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি সমসাময়িক কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন কাগজের কারখানায় নতুন নতুন কাগজ তৈরি করে মুদ্রণযন্ত্রে লেখা ছাপানোর কাজও শুরু হয়। অন্যদিকে ১৮১৭ সালে কলকাতায় *হিন্দু কলেজ* প্রতিষ্ঠিত হলে দেশীয় সন্তানরা ইংরেজি ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার প্রথম সুযোগ লাভ করে।[৩৭০] এভাবে উনিশ শতকের শুরুতে বাংলায় রেনেসাঁর প্রভাবে সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চা আরম্ভ হয়।

বাংলার মানস-সংগঠন, আত্মজাগরণ এবং বাংলার ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার উৎস ছিল *হিন্দু কলেজ*। মাত্র ১৭ বছর বয়সে Henry Louis Vivian Derozio (1809-1831) এ কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ডিরোজিওর ছাত্ররা 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল যারা উনিশ শতকে বাংলায় রেনেসাঁর অগ্রদূত ছিলেন।[৩৭১] পাশ্চাত্য প্রভাবিত *ইয়ংবেঙ্গল*রা বিশ্বাস করতেন যা কিছু প্রাচীন তাকে প্রবল আঘাতে চূর্ণ করে নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারা সোচ্চার কণ্ঠে নারীর জন্য পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানান। *ইয়ংবেঙ্গল*দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র, যাদব ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, প্যারিচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ। ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্ররা 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য এ এসোসিয়েশনটি বাংলার প্রথম ছাত্র সংগঠন।[৩৭২] ডিরোজিও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানব মহিমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও উদার মন মানসিকতার অধিকারী এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোয় আলোকিত ছিল। তাঁরা *একাডেমিক এসোসিয়েশনের* ব্যানারে থেকে ধর্মান্ধতা, মিথ্যা, কুসংস্কার এবং সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেন। উল্লেখ্য *ইয়ংবেঙ্গল* গোষ্ঠী Thomas Paine (1737-1809) এর মত দার্শনিকদের চিন্তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। মেরি উলস্টোনক্রাফটের সাথে থমাস পেইনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তিনি যুক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আবার *ইয়ংবেঙ্গল*রা Richard Carlile (1790-1843) এর রচনার সাথেও পরিচিত ছিলেন। কার্লাইল তাঁর *Every Women's Book* (1828) এ নারীমুক্তির সমর্থন জানিয়েছেন। অন্যদিকে William Thompson, Anna Wheeler, Richard

---

[৩৭০] ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩-১৪

[৩৭১] গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ২৮

[৩৭২] সফিউদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬

Taylor & John Stuart Mill এর *Appeal of one Half of the Human Race, Women, Against the Pretensions of the other Half, Men* (1825) গ্রন্থটি নারীমুক্তি আন্দোলনে পথিকৃৎ এর ভূমিকা পালন করে।[৩৭৩] পরবর্তীকালে নারী জাগরণ ও আন্দোলনের উপর এ সকল বইয়ের প্রভাব ছিল ব্যাপক এবং গভীর।

অন্যদিকে ডিরোজিও ছিলেন জেরেমী বেন্থামের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই তিনি বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সহজেই অনুমান করা যায়। তৎকালে ডিরোজিওর শিষ্য *ইয়ংবেঙ্গল* গোষ্ঠী ভারতবর্ষের নারীসমাজের নানা দুর্গতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে। *একাডেমিক এসোসিয়েশনের* এক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, বাংলার মেয়েদের অবশ্যই পড়ালেখা শেখাতে হবে। সভায় সভ্যদের আশ্বস্ত করা হয় যে, এ এসোসিয়েশনের জনৈক নেতৃত্বস্থানীয় সদস্যের স্ত্রী অতিশয় সুশিক্ষিত নারী; তিনি নানা শাস্ত্রে পরাঙ্গম, বিশেষ করে নীতিদর্শন ও গণিতে।[৩৭৪] *ইয়ংবেঙ্গল* গোষ্ঠী রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে 'এপিস্টোলারি এসোসিয়েশন' গড়ে তোলে। এখানে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় আলোচনা করা হতো। পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হতো এবং এগুলি সুন্দর করে রেজিস্টার খাতায় লিখে রাখা হতো। তাদের আধা রাজনৈতিক ও স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ আরেকটি সংগঠন ছিল, যার নাম 'দেশহিতৈষিণী সভা'। সারদা প্রসাদ ঘোষ (স্কুল শিক্ষক) ছিলেন এসভার প্রধান উদ্যোক্তা। জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা প্রসার বিশেষ করে নারীশিক্ষা প্রসারে *ইয়ংবেঙ্গল* তথা ডিরোজিওর অনুসারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা নারীশিক্ষার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করেন। এ আলোচনায় হিন্দু কলেজের তৎকালীন অন্তত পঞ্চাশ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করতেন। সেদিনের তেজস্বী ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই মেনে নিয়েছিল।[৩৭৫]

ইয়ংবেঙ্গলরা কেবল যে নারী শিক্ষার বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছিলেন তা নয়, তৎকালীন বাংলায় বিধবা বিবাহ প্রবর্তন সম্পর্কেও তাঁরা সীমিত পরিসরে চিন্তাভাবনা শুরু করেন বলে জানা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

---

[৩৭৩] Constance Rover, *Love, Morals and the Feminists,* Routledge & Kegan Paul Books, 1970, pp. 12-23, 27; William Thompson ও তাঁর বন্ধুদের লেখা বইটির পুরো শিরোনাম হলো- *Appeal of one Half of the Human Race, Women, against the Pretensions of the other Half, Men, to Retain them in Political and thence in Civil and Domestic Slavery : in reply to a paragraph of Mr. Mill's Celebrated "Article on Government"*, Longman, London, 1825, p. 27; উদ্ধৃত, গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

[৩৭৪] সফিউদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

[৩৭৫] *ঐ*, পৃ. ১৯

অনেক আগেই ডিরোজিওর শিষ্য মহেশচন্দ্র 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সাধারণ অধিবেশনে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বর্ধমানের মহারাজা তেজেশাচন্দ্র বাহাদুরের তরুণী বিধবাপত্নী রানী বসন্তকুমরীকে বিয়ে করেন। বিধবা বিবাহ আইন পাশের আগে এটিই প্রথম বিধবা বিবাহের ঘটনা।[৩৭৬] উল্লেখ করা যায়, *জ্ঞানোপার্জিকা সভার* সদস্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাই মহেশচন্দ্রের প্রবন্ধ দ্বারা তিনি পরবর্তীতে প্রভাবিত হতে পারেন।

উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁর মানবকল্যাণমুখী জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নারী জাগরণ। তৎকালে বাংলার মেয়েদেরকে আর্থ–সামাজিকভাবে এতটাই অধিকারহীন, অসহায়, দুর্বল ও অক্ষম করে রাখা হয়েছিল যে, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের মুক্তির কথা ভাবতে পারেনি। কিন্তু সমাজের সার্বিক অগ্রগতির জন্য যারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনন, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনের জন্য চর্চা শুরু করেন তাঁরা তৎকালীন রেনেসাঁর মানবিক আবেদন থেকে মেয়েদের সামাজিক অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আগ্রহী হন। নানা ধরণের অনাচারের প্রতিবাদ জানান এবং নারীপীড়ন বন্ধের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় আইন তৈরির জন্য আন্দোলন করেন। এ আন্দোলন সমাজ সংস্কারমূলক হলেও বাংলার রেনেসাঁ তথা নবজাগরণের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজা রামমোহন রায় বাংলার রেনেসাঁ পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, হিন্দি, ইংরেজি ও হিব্রু ভাষা জানতেন। রামমোহন রায় জেরেমী বেনথাম ও রবার্ট ওয়েনের বন্ধু ছিলেন। যাদের রচনায় বা গ্রন্থে নারীর দুর্দশা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া David Hume (1711-1776), John Locke (1632-1704), Voltaire ও Paine এর যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও সমাজহিতৈষী চিন্তাচেতনা দ্বারা রাজা রামমোহন রায় প্রভাবিত হন। তিনি James Mill এর *The History of British India, Vol. II* (1818) এবং Mary Wollstonecraft এর *A Vindication of the Rights of Woman* গ্রন্থ দু'টি গভীরভাবে পড়ে বাংলার মেয়েদের বিষয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হন।[৩৭৭] এসব রচনা হতে তিনি নারীমুক্তির ধারণা লাভ করেন। উনিশ শতকের নবজাগরণের সাথে বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রামমোহন রায় চিন্তা-চেতনা ও মননে নিজ

---

[৩৭৬] *ঐ*, পৃ. ২৩

[৩৭৭] গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহবলতা আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া (লেখকের Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905* গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৬

যুগের চাইতেও অগ্রসরমান ছিলেন। তিনি নারীর অধিকার আদায়ে এবং অত্যাচার হতে মুক্ত করার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। সমাজে বিদ্যমান সনাতন ধ্যান-ধারণা ও নারী নিপীড়নের জন্য চলতি সমস্ত রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি নারী সমাজের বন্ধু ও রক্ষাকর্তা হয়েছেন।[৩৭৮]

তৎকালে বাংলায় 'ইউনিটারিয়ান' আন্দোলনের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। কলকারখানার শ্রমিক ও নারীর সার্বিক অবস্থার উন্নতির জন্য ইংল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রে তখনকার ইউনিটারিয়ানরা যে জোরালো আন্দোলন করে, তা দ্বারা প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতায় একটি *ইউনিটারিয়ান সভা* স্থাপন করেন। এ সভায় মেয়েদের উন্নতির প্রসঙ্গটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩৭৯] উল্লেখ্য পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দূর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষী ইউনিটারিয়ানদের দ্বারা প্রভাবিত হন। এছাড়া উইলিয়াম অ্যাডাম এবং কয়েকদশক পর মেরি কার্পেন্টার এবং অ্যানেট অ্যাক্রয়েডের মত ইউনিটারিয়ানরা বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখেন। এভাবে বাংলায় সভ্যতা সম্পর্কে একটি নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় এবং মেয়েদের সম্পর্কে একটি নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। রাজা রামমোহন রায় উপলব্ধি করেন উনিশ শতক পর্যন্ত নারীশিক্ষায় অগ্রগতির অভাবহেতু বাঙালি নারী স্বাধীনতা এবং সমস্ত রকমের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। জন্মই ছিল তাদের আজন্ম পাপ, অর্থাৎ জন্ম থেকেই অভিশাপের বোঝা তাদের মাথার উপর নেমে আসতে থাকে। তিনি পুরুষ শাসিত হিন্দু সমাজের তীব্র সমালোচনা করে বলেন এ সমাজ স্বার্থপর এবং ভণ্ড। সেকারণে এ সমাজ মেয়েদের প্রকৃতি প্রদত্ত প্রশংসনীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলিকে অস্বীকার করেছে। রামমোহন রায় ইংল্যান্ডে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের গুণাবলির উৎকর্ষতা দেখে মুগ্ধ হন।[৩৮০] এ সময় তিনি চিন্তা করেন আমাদের দেশের মেয়েদেরও প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিলে তারা উৎকৃষ্ট গুণাবলি প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে।

---

[৩৭৮] Mary Carpenter, *The Last Days in England of The Rajah Rammohun Roy*, Trubner & Co., London, 1866, pp. 101-102; উদ্ধৃত, ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৩

[৩৭৯] David Kopf, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind*, Princeton University Press, New Jersey, 1979, p. 112; উদ্ধৃত, গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯

[৩৮০] J. C Ghose (ed.), *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Creative Media Partners, Kolkata, 2018, p. 9

রাজা রামমোহন রায় বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকে ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'আত্মীয় সভা'। এ সভায় বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হতো। সে সময় হিন্দু সমাজের ব্যভিচার, দুর্নীতি ও বহিরাগত খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের হিন্দু ধর্ম বিরোধী প্রচারণা আলোড়িত করে রামমোহনকে। এজন্যই তিনি ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রকৃতস্বরূপ উদঘাটন ও সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করেন।[৩৮১] তিনি হিন্দুধর্মের নানা অনুশাসনে বিরক্ত হয়ে 'একেশ্বরবাদকে' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদী চিন্তাধারার সাথে ব্রাহ্মধর্মের মূল বিশ্বাসের খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায় সামাজিক আন্দোলন বেগবান করার জন্য 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৮২] তাঁর নেতৃত্বে ব্রাহ্ম পুরুষ নারীশিক্ষা বিস্তার, নারীর আইনগত মর্যাদার উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি উচ্ছেদের জন্য হিন্দু সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর তৎকালে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। আবার হিন্দুদের অন্যতম নেতা রাধাকান্ত দেবও আলোচ্য সময়ে নারীশিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। উল্লেখ্য গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের *স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক* পুস্তক রামমোহন রায়ের সহমরণ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। রাধাকান্ত দেব রামমোহনকে পুস্তকটি রচনার জন্য উৎসাহ দেন।[৩৮৩] এভাবে মূলত মেয়েদের শিক্ষা যে প্রয়োজন এবং নারী শিক্ষিত হলে তাদের সার্বিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং তারা নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হবে- নারীমুক্তি সম্পর্কিত এ সচেতনতা বাঙালি সমাজে প্রথমবারের মতো পরিলক্ষিত হয়।

রাজা রামমোহন রায় বাংলার নারী জাগরণে যেসকল ভূমিকা পালন করেন তার মধ্যে অন্যতম সতীদাহ প্রথা রোধের বিরুদ্ধে আন্দোলন। মধ্যযুগের *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল*, *অন্নদামঙ্গল* প্রভৃতি প্রধান মঙ্গল কাব্যসহ কৃত্তিবাসী রামায়ণেও সতীদাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৮৪] সতীদাহ ভারতবর্ষের সব

---

[৩৮১] বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫)*, দ্বিতীয় খণ্ড, বীক্ষণ গ্রন্থন ভবন (বীমান কুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত), কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১২

[৩৮২] ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট রামমোহন রায় কলকাতায় ভাড়া করা একটি বাড়িতে *ব্রাহ্মসমাজ* প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৮৩০ সালে ব্রাহ্মসমাজ ভবন নির্মিত হয়। (মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন*, অনন্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৭)

[৩৮৩] গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭

[৩৮৪] দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়*, *প্রথম খণ্ড*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯১৪, পৃ. ৪১-৪৫

প্রদেশেই প্রচলিত ছিল। এটি ছিল হিন্দুদের মধ্যে একটি সার্বজনীন প্রথা।[৩৮৫] তবে ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলের লোকদের এ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হতো।[৩৮৬] উল্লেখ্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশেই সতীদাহের ঘটনা বেশি ঘটত।[৩৮৭] বাংলায় সতীদাহ প্রথা অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে রাজপরিবার, অভিজাত ও ব্রাহ্মণ সমাজে এর প্রচলন বেশি ছিল।[৩৮৮]

ভারতে মুসলিম শাসনামলে সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৫৬৯-১৬২৭) শাসনামলে এ প্রথা বন্ধ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মুসলিম শাসকরা ব্যর্থ হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি লাভের আশায় বিধবার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা তাকে ‘সতী’ হওয়ার জন্য প্ররোচিত করতো। কারণ ‘the family of the deceased husband save by the immolation of the widow the third of the defunct’s property, which would otherwise go to her’.[৩৮৯] ১৭৯৮ সালে উইলিয়াম কেরী একটি সতীদাহ প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতায় বলেন, বিধবা নিজেই সহমরণে যেতে ইচ্ছুক জেনে তিনি তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।[৩৯০] বিধবাদের দুঃখ-কষ্ট ও প্রাত্যাহিক জীবনে প্রতিনিয়ত অপমান দেখে মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের নিজেদের জীবনের উপর যাবতীয় আসক্তি হারিয়ে ফেলতো। পার্থিব জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য এবং ‘সতী’ হলে ভবিষ্যৎ জীবনে শান্তির সম্ভাবনা এ দু’টি কারণে মেয়েরা সহমরণ চাইত।[৩৯১]

---

[৩৮৫] Q. Craufurd, *Researches Concerning the Laws, Theology, Learning, Commerce Etc. of Ancient and Modern India*, Vol. II, Forgotten Books, London, 1817, p. 132

[৩৮৬] Q. Craufurd, *Sketches Chiefly Relating to the History, Religion, Learning and Manners of the Hindoos*, Vol. I, T. Cadell, London, 1792, p. 14

[৩৮৭] *Parliamentary Papers* (House of Commons), 1825, Vol. XXIV, p. 25; উদ্ধৃত সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬

[৩৮৮] শীলাবসাক, “রামমোহন ও নারীর স্বাধিকার”, ড. তাহা ইয়াসিন (সম্পাদিত ও সংকলিত), *নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায়*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৬৯

[৩৮৯] Marchioness of Bute (ed.), The Private Journal of the Marquess of Hestings, Saunders and Otley, London, 1907, p. 380

[৩৯০] H. H. Dodwell (ed.), *The Cambridge History of India*, Vol. 6, University Press, Cambridge, 1932, p. 134

[৩৯১] Rammohun Roy, *Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females : According to the Hindoo Law of Inheritance,* The Unitarian Press, Calcutta, 1822, p. 6

পরবর্তীতে ইংরেজ শাসনামলে নানামুখী প্রচেষ্টার পর উইলিয়াম বেন্টিংক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার পূর্বেই রাজা রামমোহন রায় এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরির সূত্রে রাজা রামমোহন রায় উনিশ শতকের শুরুতেই পূর্ব বাংলার ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর এবং রংপুরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করেছেন। ১৮১১ সালে রংপুরে অবস্থানকালে তাঁর বড় ভাই জগমোহন রায় পরলোকগমন করেন। এ সময় তাঁর (জগমোহন রায়ের) স্ত্রীকে সহমরণের জন্য জীবন্ত দাহ করা হয়।[৩৯২] এ ঘটনা রামমোহন রায়কে ভীষণভাবে ব্যথিত করেছিল। ১৮১৫ সালের শুরুতে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে ইংরেজ সরকারকে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। ইংরেজ সরকারেরও এ বিষয়ে সদিচ্ছা ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তৎকালে সতীদাহের সমর্থনদানকারী হিন্দুদের সংখ্যাও ছিল বেশ কয়েকজন। এ সকল রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে রাধাকান্তদেব, রামকমল সেন এবং ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সতীদাহের পক্ষে শক্ত অবস্থানকারী এসকল হিন্দুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা চিরতরে বন্ধ করার জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তখন ব্রিটিশ সরকার সতীদাহ বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রবিদদের মতামত জানার চেষ্টা করেন। একদিকে সরকারি প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে রামমোহন রায়ের আন্দোলনের প্রচেষ্টায় ১৮১৩ সালে লর্ড মায়রা সতীদাহ প্রথা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ জারী করেন এবং ১৮১৭ সালে তা চূড়ান্ত রাজবিধি হিসেবে প্রচারিত হয়।[৩৯৩]

সতীদাহ প্রথা নিয়ন্ত্রণে সরকারি নিয়ম প্রচলনের সাথে সাথে সনাতন ধর্মীরা সরকারের কাছে প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেন। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগী ব্যক্তিরা ১৮১৮ সালের আগস্ট মাসে সরকারের কাছে পাল্টা আবেদন করেন যে, প্রতিটি শাস্ত্র অনুসারে এবং যেকোন দেশের মানুষের বুদ্ধি অনুসারে সতীদাহের ঘটনা নরহত্যা ছাড়া আর কিছুই না।[৩৯৪] সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি *সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ* (১৮১৮) এবং *সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ* (১৮১৯) নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া রামমোহন রায় *সম্বাদ কৌমুদী* সহ বেশ কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লিখেছেন। উল্লেখ্য ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, কাশী, বেরেলী প্রভৃতি অঞ্চলে

[৩৯২] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৪-১৫

[৩৯৩] *ঐ*, পৃ. ১৫

[৩৯৪] নির্মল সেন, *রাজর্ষি রামমোহন*, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা, পৃ. ৫১

৮,১৩৪টি সতীদাহের ঘটনা ঘটে।[৩৯৫] মূলত মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার ছিল এজন্য বাংলায় সতীদাহ বা স্ত্রী হত্যার প্রচলন ছিল, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজা রামমোহন রায় সতীদাহের ঘটনাকে প্রতিহত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির কাজ ছিল ঘটনাস্থলে হাজির হওয়া, সতীদাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া, দাহ থেকে বিধবাদের রক্ষা করা এবং সরকারি আইনের বাস্তবায়ন করা। এসময় রামমোহন রায় নিজেও বিভিন্ন শশ্মানে চিতায় চিতায় যেয়ে জীবন্ত বিধবাদের উদ্ধার করে আনেন।[৩৯৬] ১৮২৫ সালে ব্রিটিশ শাসক লর্ড আর্মহাস্ট সতীদাহের বিরুদ্ধে আরো কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করেন। এ ঘটনার আরো কয়েক বছর পর ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে এক আদেশ জারী করেন। এ আদেশে উল্লেখ করা হয়-

> The Practice of Suttee or of burning alive the widows of Hindoos, is revolting to the feelings of human nature…and the Governor General is Council in deeply impressed with the conviction that the abuse in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether.[৩৯৭]

সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় রাজা রামমোহন রায় উইলিয়াম বেন্টিংককে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। উল্লেখ্য তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিরা সতীদাহ চালু রাখার চেষ্টায় ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করে ব্যর্থ হয়। কেননা ১৮৩২ সালের ১২ জুলাই প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে সতীদাহ বন্ধের আইন চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হয়।[৩৯৮]

শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মসহ সর্বক্ষেত্রেই রাজা রামমোহন রায়ের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে নারীর সার্বিক অগ্রগতি ও হীন অবস্থা হতে উত্তোরণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক

---

[৩৯৫] শীলা বসাক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৫

[৩৯৬] নির্মল সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪

[৩৯৭] J. K. Majumder, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India*, The Author, Calcutta, 1941, pp. 153-154

[৩৯৮] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬

আন্দোলন করে তিনি ইতিহাসে অমর হয়েছেন। তিনি মনে করতেন নারী শিক্ষিত হলে তারা নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে। অন্যায় অবিচার মুখ বুজে সহ্য করবে না। এজন্য তিনি নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদানও করেছেন। রাজা রামমোহনের যুগের শেষের দিকে *ইয়ংবেঙ্গল* গোষ্ঠীর নারীঅধিকার রক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। তাদের অবস্থান ছিল দেশীয় ঐতিহ্য হতে খানিকটা দূরে। *ইয়ংবেঙ্গল*রা কেবল নারীর অধীনতা ও দাসত্ব নিয়ে কথা বলেন। তারা বলেন পুরুষ ও মেয়েদের ঈশ্বর সমান করে সৃষ্টি করেছেন, তাই সব বিষয়ে নারী পুরুষের সমান বলে বিবেচনা করা উচিত।[৩৯৯] তাদের মতে প্রাচীন ধর্ম প্রচারকদের অবহেলার কারণে নারী অগ্রগতি তখন সম্ভব হয়নি। তবে বাংলায় স্বল্প সংখ্যক *ইয়ংবেঙ্গল* সদস্য বিশাল বাঙালির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এছাড়া তাদের জীবনাচারণ অত্যন্ত পাশ্চাত্য প্রভাবিত হওয়ায় বাঙালিরা তা পছন্দ করেনি। সময়ের তুলনায় *ইয়ংবেঙ্গল*রা অতিরিক্ত প্রগতিশীল হওয়ার কারণে তাদের আন্দোলন সমাজের কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।[৪০০]

রাজা রামমোহন রায়ের পরপরই ঠাকুর পরিবারের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার নারী জাগরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রাখেন। রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শকে কিছুটা রদবদল করে তিনি সমাজ পূর্ণগঠনে প্রয়াসী হন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে *বেদ* এর আলোকে বাস্তবতা ও যুক্তি দিয়ে প্রয়োজনমত সংস্কার করেন। ফলে ব্রাহ্মধর্ম উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুদের কাছে উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যতটা ধর্ম নিয়ে কাজ করেছেন ততটা সামাজিক সংস্কার নিয়ে কাজ করতে পারেননি। তবে তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের নানা কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে পরিত্রাণ দেওয়ায় তাঁর সমর্থন ছিল। উল্লেখ্য ব্রাহ্মধর্ম পরবর্তীতে (১৮৬৬) ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিতি লাভ করে।[৪০১] ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্রম সম্পর্কে পরবর্তী অংশে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। সমকালীন বাংলায় নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় যারা ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯০)। হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। বাংলায় তৎকালে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। এমন কি ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলেও সমাজে অভিজাত পরিবারে এবং সাধারণ পরিবারে বাল্যবিবাহ চালু ছিল। তবে মুসলিম নারীর তুলনায় হিন্দু মেয়েদের বেশি কম বয়সে

---

[৩৯৯] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৬২-২৬৩

[৪০০] S. N Ray, "From Derozio to Nazrul : Radicalism and the Bengal Intelligentsia", New quest, No. 5 , Dec. 1977, p. 6; উদ্ধৃত, গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২

[৪০১] গোলাম মুরশিদ, *রেনেসান্স বাংলার রেনেসান্স*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০

বিয়ে হতো।[৪০২] বিয়েতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ছেলে-মেয়েদের সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজনও মনে করা হতো না। অভিভাবকরা তাদের পছন্দ সই ছেলের সাথে মেয়ে এবং মেয়ের সাথে ছেলে বিয়ে দিতেন।

অন্যদিকে উনিশ শতকে বাংলায় বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে সতীদাহ প্রথা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় খুব দ্রুত হিন্দু বিধবাদের সংখ্যা বেড়ে যায়।[৪০৩] প্রসন্নকুমার ঠাকুরের *The Reformer* (1838, 25 November) এবং *ইয়ংবেঙ্গল* গোষ্ঠীর রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত *Bengal Specteror* (1842, July) পত্রিকা দুটিতে হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিয়ের সমর্থনে শাস্ত্রীয় বিধান উল্লেখসহ প্রবন্ধ প্রকাশ হয়।[৪০৪] ১৮৪৫ সালের ১১ মার্চ *বেঙ্গল হরকরা* এবং *ইন্ডিয়া গেজেটে* প্রকাশিত এক তথ্য থেকে জানা যায় ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বিধবা বিয়ের সমর্থনে ব্যবস্থা নিলে এর পক্ষে বিপক্ষে বহু তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়।[৪০৫]

১৮৫০ সালে *সর্বশুভকরী পত্রিকায়* বাল্যবিবাহের দোষ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এ সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালংকার, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষী 'সর্বশুভকরী সভা' গঠন করেন। ১৮৫৪ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমিতির কাজ ছিল হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইন সম্বন্ধীয় অসমতা দূর করার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করা।[৪০৬] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম অক্ষয় কুমার দত্ত। তাঁর সম্পাদিত *বিদ্যাদর্শন* পত্রিকায় তিনি মেয়েদের সম্পর্কে যে ধরণের বক্তব্য প্রকাশ করেন তা অতুলনীয়। তিনি অল্প বয়সী বিধবাদের পুনরায় বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, বাল্যবিবাহের অসুবিধা, নারীশিক্ষার গুরুত্ব এবং মেয়েদের সীমিত পরিমাণ স্বাধীনতা প্রদানের কথা লিখেছেন। 'স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা' কথাটা তিনিই সবার আগে ব্যবহার

---

[৪০২] এম. এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (লেখকের *Social and Cultural History of Bengal 1576-1757* গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৮০-১৮১

[৪০৩] বাংলায় সতীদাহ প্রথা সরকারিভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয় ১৮২৯ সালে। এ আইন প্রবর্তনের পূর্বে বিধবাদের তাদের নিজ নিজ স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মেরে ফেলা হতো, তাই উক্ত আইন প্রণীত হওয়া পর্যন্ত সময়ে বিধবাদের সংখ্যা কিছুটা কম পরিলক্ষিত হয়। (প্রদীপ রায়, *বিদ্যাসাগর সামাজিক ব্যক্তিত্ব*, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৭২)

[৪০৪] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

[৪০৫] *ঐ*

[৪০৬] তপস্যা ঘোষ, "বাঙালি মেয়ে-উনিশ থেকে একুশ", স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত), *অধ্যাপক বিজিত কুমার দত্ত স্মারক গ্রন্থ, উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২০৫

করেন।[৪০৭] অক্ষয় কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী'র মত একটি ধর্মীয় পত্রিকাও পরিচালনা করতেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য *বিদ্যাদর্শন* পত্রিকায় ১৮৪২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে কঠোর ভূমিকা রাখেন। ১৮৫৫ সালে তিনি *বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* নামক গ্রন্থ রচনা করেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় ত্রিশজন পণ্ডিত বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে পুস্তক প্রকাশ করেন।[৪০৮] এ বিষয়ে নানা তর্ক বির্তকের সূত্রপাত হলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একই শিরোনামে দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের পক্ষে আইন প্রণয়নে তৎকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহের আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হয়ে গভর্ণর জেনারেল দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়।[৪০৯] বিশেষভাবে উল্লেখ্য ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত ১১ বছর সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬০ জন বিধবা নারীর বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন[৪১০] এবং এসব বিয়ের খরচ বাবদ ৮২,০০০ টাকা নিজে বহন করেন। এজন্য তাকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করতে হয় এবং তিনি নিজে এসকল ঋণ পরিশোধ করেন।[৪১১] দেখা যায়, তৎকালে পূর্ব বাংলার ঢাকার সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে প্রতিজ্ঞা করে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় নাম স্বাক্ষর করেন।[৪১২]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ বন্ধের জন্যও আন্দোলন গড়ে তোলেন। এসময় কৌলীন্য প্রথা ছিল গুরুতর সামাজিক সমস্যা। বরো শতকে বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথা ধীরে ধীরে তার সামাজিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এক ধরণের বিবাহ ব্যবসায়ে পরিণত হয়। আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ

---

[৪০৭] গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৩

[৪০৮] *The Calcutta Review*, July-December, Vol. XXV, 1855, p. 360

[৪০৯] আইন পাশ হওয়ার পর ৭ ডিসেম্বর প্রথম বিধবা বিবাহ হয় কালীমতী নামক একটি মেয়ের। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ বিয়ের ব্যবস্থা করেন। চার বছর বয়সে কালীমতীয় বিয়ে হয় এবং দশ বছর বয়সে বিধবা হন। তার পুনরায় বিয়ে হয় মুর্শিদাবাদের পণ্ডিত বিচারক ও সংস্কৃত কলেজের গুণী ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বিদ্যারত্নের সাথে। উল্লেখ্য বিয়েটির সমুদয় ব্যয়ভার (১০,০০০ টাকা) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাই বহন করেন। আবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর নিজ পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বিধবা মেয়ের সাথে বিবাহে সমর্থন দেন। (মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১)

[৪১০] স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৫

[৪১১] প্রদীপ রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯১

[৪১২] *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ ভাগ ৬ সংখ্যা, ২৩ এপ্রিল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১ (রিপ্রোগ্রাফী শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার)

শতকের শুরুতে এ প্রথা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কুলীন ঘরের মেয়েরা বিয়ের পর পিতৃগৃহে দিন কাটাতে বাধ্য হত, স্বামীর সাথে তাদের দীর্ঘদিন দেখা সাক্ষাতও হতো না। কৌলীন্য প্রথার ফলে মেয়েরা অবৈধ সম্পর্কের প্রতি প্রলুব্ধ হতো।[৪১৩] এ প্রথার জন্য সমাজে পুরুষের বহু বিবাহও বৃদ্ধি পায়। ১৮৪২ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরেন। তিনি বহুবিবাহকারী কুলীন পুরুষের সম্বোধন করে লিখেন, "অবশেষে আপনাদিগকে এক অনুরোধ করিয়া নিরস্ত হই, অর্থাৎ শুভকর্মে যাত্রকালীন সম্মুখ দ্বারে উপস্থিত হইয়া পশ্চাৎভাগে একবার ঈষৎ কটাক্ষপূর্বক দৃষ্টি করিবেন যে, অপর দ্বারে কি আশ্চর্য্য পাপের নৃত্য হইতেছে"।[৪১৪] এরপর থেকে কৌলীন্য প্রথা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। অন্যদিকে বহুবিবাহের কুফল সমাজে বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরা হয় এবং এর নেতিবাচক দিকগুলি নিয়েও আলোচনা করা হয়। *সুহৃদ সমিতি* গঠনের মাধ্যমে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার কারণে ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়ন করেনি। অন্যদিকে বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য বহু আন্দোলনের পর ১৮৬০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সহবাস সম্মতি আইন জারী হয়। এ আইনে মেয়েদের সর্বনিম্ন বিয়ের বয়স ছিল ১০ বছর। যে সব মেয়ের বয়স ১০ বছর হয়নি তাদের সাথে সহবাসকে পাশবিক অত্যাচার হিসেবে গণ্য করা হতো।[৪১৫] বাল্যবিবাহের কারণে তৎকালে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বালিকা বধূর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যেত। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকাতেও বালিকা বধূর মৃত্যুর খবর বেশ কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে। অবশেষে ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন পাশ হয়।[৪১৬] এখানে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১০ থেকে ১২তে উন্নীত করা হয়।[৪১৭] এ আইনের দ্বারা তৎকালে সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব না হলেও, প্রকারান্তে বাল্যবিবাহ যে একটি সামাজিক ব্যাধি এবং এতে সমাজের লোকেরা যাতে নিরুৎসাহিত হয় সে ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছিল।

---

[৪১৩] K. K. Datta, *Survey of India's Social Life and Economic Condition in the Eighteenth Century (1707-1813),* Firma K. L Mukhopadhya, Calcutta, 1961, p. 35

[৪১৪] বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮

[৪১৫] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২

[৪১৬] Tanika Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion and Cultural Nationalism,* Indiana University Press, Delhi, 2001, p. 210

[৪১৭] মূলত এ আইনটি ১৮৭২ সালের ব্রাহ্ম বিবাহ আইনের সম্প্রসারণ। ১৮৯১ সালে আইনটি প্রবর্তিত হলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় প্রতিবাদ সভা করে। কেননা বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের বয়স নিয়ে আপত্তি ছিল। মাহমুদা ইসলাম ও বিলকিস রহমান, "পরিবার : সনাতন থেকে আধুনিক", সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পাদিত), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৬

অন্যদিকে বাংলায় নারী জাগরণে সিস্টার নিবেদিতা[৪১৮] গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৮৯৮ সালে কলকাতায় মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার রেনেসাঁর অগ্রদূতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর অন্যতম প্রধান মতাদর্শ ছিল, ভারতে মেয়েদের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করা।[৪১৯] বিবেকানন্দ আদর্শ হিন্দু পত্নীর স্বাধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। সমাজ সংস্কারের সাথে সাথে তিনি মেয়েদের আত্মউন্নয়নে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। আবার উনিশ শতকে নারীর কোন জ্ঞানবুদ্ধি বা মেধা আছে বলে সাধারণ লোকেরা মনে করতো না। তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করার জন্য সমাজে তাচ্ছিল্য স্বরে বলা হতো 'স্ত্রীবুদ্ধি'। অর্থাৎ যে বুদ্ধির কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু বাংলার রেনেসাঁ বা নবজাগরণের মাধ্যমে সমাজে যেসকল পরিবর্তন আসতে থাকে, সেখানে ধীরে ধীরে মেয়েদের মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া শুরু হয়। এসময় নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজ উপলব্ধি করা শুরু করে। মত প্রকাশ করা হয়, অশিক্ষিত নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা, কথাবার্তা ও চিন্তাভাবনা কোনটাই বাঙালি তরুণদের মনের মত নয়। আর এজন্য মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো উচিত।

বাংলায় নারীজাগরণ ও আন্দোলনের পটভূমিকায় নানা সভা সমিতির অবদান অতুলনীয়। পর্দা ও অবরোধপ্রথার কঠোরতার জন্য প্রথমদিকে মেয়েদের সভা সমিতি গঠন করা ও নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হতো না। তাই এসময় নারী প্রগতি সংক্রান্ত নানা সমিতি গঠনে কাজ করতে হয়েছে পুরুষের। রামতনু লাহিড়ী, দুর্গামোহন দাস, রাখালচন্দ্র রায়, ব্রজকিশোর বসু ও অভয়চরণ মল্লিকসহ প্রমুখ প্রগতিশীল পুরুষ ১৮৬৩ সালে 'ভাগলপুর মহিলা সমিতি' গঠন করেন।[৪২০] বাংলার মেয়েদের জন্য পুরুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে নারীকে মুক্ত করা। উল্লেখ্য *ভাগলপুর মহিলা সমিতির*

---

[৪১৮] সিস্টার নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১) একজন সমাজকর্মী ও মানবতাবাদী। তিনি আইরিশ গির্জার প্রধান পুরোহিত স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেলের জ্যেষ্ঠ কন্যা। তাঁর প্রকৃত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। খুব অল্প বয়সেই আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভাবধারার প্রতি তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। নিবেদিতা হ্যালিফ্যাক্স কলেজে পড়াশুনা করার পর ১৮৯২ সালে উইম্বলডনে 'রাসকিন স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সক্রিয়ভাবে সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। বেদান্ত দর্শনের উন্নত চিন্তাভাবনার প্রতি আস্থাশীল হয়ে নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় চলে আসেন। এ বছরই তিনি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমাজসেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত হন। (রামাকান্ত চক্রবর্তী, "তিন সংস্কারক", স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮০-১৮১)

[৪১৯] *ঐ*, পৃ. ১৮৩

[৪২০] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১

উদ্যোগে বেশ কয়েকটি বিধবা বিবাহ সংঘটিত হয়।

বাংলায় নারী জাগরণে ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। সমাজ সংস্কারের জন্য একদল যুবককে নিয়ে তিনি ১৮৬১ সালে 'সঙ্গত সভা' নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এ সমিতি নারীশিক্ষার বিষয়ে উৎসাহী ছিল। ১৮৬৩ সালে তাঁরা *বামাবোধিনী সভা* নামে আরেকটি সমিতি স্থাপন করেন। ১৮৬৩ খ্রি. কৈলাসবাসিনী দেবীর "হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা" নামক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ পুস্তক আকারে প্রকাশ করে *বামাবোধিনী সভা*। এটি ভারতীয় মেয়েদের রচিত প্রথম সাহিত্যকর্ম। এ সমিতি *বামাবোধিনী পত্রিকা* নামে মেয়েদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে।[৪২১] মেয়েরা স্কুলে না গিয়েও ঘরে বসে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এমনভাবে পত্রিকাটি সাজানো হয়। বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, সন্তান পালন, গৃহকর্ম, ধর্মীয় জ্ঞান প্রভৃতি শেখার ব্যবস্থা ছিল *বামাবোধিনী পত্রিকা* পাঠ করে। নানা কুসংস্কার এবং রক্ষণশীল মূল্যবোধ থেকে নারীকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা ছিল এখানে। *বামাবোধিনী সভা* এ পত্রিকার মাধ্যমে একটি নারীশিক্ষা পাঠ্যক্রমও চালু করে, যার নাম ছিল 'অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী'। উল্লেখ্য ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত এ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন বসন্তকুমার দত্ত ও ক্ষেত্রমোহন দত্ত।[৪২২] তৎকালে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় নিস্তারিণীদেবী (১৮৪০-১৮৬৫), কুমুদিনী খাস্তগীর (আনুমানিক ১৮৪০-১৮৬৫), ব্রহ্মময়ী (১৮৪৫-১৮৭৬), মনেরমা মজুমদার (১৮৪৮-১৯৩৬), জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১), তাহেরন নেসা, সৌদামিনী দেবী (মৃত্যু ১৮৭৪ খ্রি.), স্বর্ণলতা ঘোষ, কৃষ্ণকামিনী, মধুমতী গাঙ্গুলী প্রমুখ মহীয়সী নারী নিয়মিত লিখতেন। তাঁরা লেখনীর মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষা ও নারীমুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।[৪২৩] এসকল ব্যক্তিরা বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

---

[৪২১] গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১-৪৩

[৪২২] উমেশচন্দ্র দত্ত ছেলেবেলায় পিতাকে হারিয়ে প্রচণ্ড অর্থকষ্টের মধ্যে পড়াশুনা শুরু করেন। ১৮৫৯ সালে *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সাথে *বামাবোধিনী সভা* গঠন করেন। তৎকালীন বাংলার নারী সমাজের মুক্তবুদ্ধির চর্চায় এবং জাগরণে সংস্কারবাদী উমেশচন্দ্র দত্ত ও *বামাবোধিনী পত্রিকা* অসাধারণ ভূমিকা রাখে। (যোগেশচন্দ্র বাগল, *উমেশচন্দ্র দত্ত, ইত্যাদি*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৭-৯)

[৪২৩] ভারতী রায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ)*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২

বামাবোধিনী পত্রিকা অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যদিও পত্রিকাটি প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মদের জন্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু অচিরেই হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা পত্রিকাটি সাদরে গ্রহণ করেন। কেননা এখানে প্রতিটি লেখায় ধর্মীয় উদারতার পরিচয় দেয়া হয়। *বামাবোধিনী* পত্রিকার দ্বারা পরিচালিত অন্তঃপুর শিক্ষা কার্যক্রমের সহায়তায় বিবাহিত নারীসহ বেশ কিছু নারী শিক্ষা লাভ করেন।[৪২৪] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো অনেক নারী পাঠকরা এ পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁরা জীবন ও জগত সম্পর্কে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। আবার সামাজিক নানা অনাচার সম্পর্কেও তাঁরা অকপটে লিখেছেন। বিশেষ করে তৎকালীন প্রচলিত পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে নারী মত প্রকাশ করেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে বাংলায় ধীরে ধীরে নারী জাগরণের সূত্রপাত ঘটে। ১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র সেন মেয়েদের মধ্যে আলাপ, আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ ও তর্ক-বিতর্কের জন্য 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।[৪২৫] তখন বাংলায় বিভিন্ন সভা-সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। উল্লেখ্য ১৮৬০ এবং ১৮৭০ দশকে সর্বপ্রথম যে কয়েকটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হয় সেগুলি *বামাবোধিনী পত্রিকা* পাঠক মেয়েদের উদ্যোগে হয়েছিল।[৪২৬] *বামাবোধিনী পত্রিকা* বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, পণ প্রথা এবং যৌতুক প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে। নিয়মিত সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে দেয় এ পত্রিকা।[৪২৭] আবার মেয়েরা কবিতাও লিখেছেন *বামাবোধিনী* পত্রিকায়। এসময় মেয়েদের সভা-সমিতি করা সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পায় এবং নারী পুরুষের সাথে সভায় অংশগ্রহণ করা শুরু করে।[৪২৮] অবশ্য

---

[৪২৪] গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১০

[৪২৫] আয়শা খানম, "সুফিয়া কামাল ও বাংলাদেশে নারী আন্দোলন", সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনীতি ও আন্দোলন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭; প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলার নারী জাগরণ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ*, কলকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯

[৪২৬] গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০

[৪২৭] *বামাবোধিনী পত্রিকার* চতুর্থ সংখ্যা থেকে মেয়েদের রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এ পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ থেকে 'বামারচনা' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সংযোজিত হয়। বিভাগটি খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়, ফলে *অবোধবন্ধু*, *অবলাবান্ধব* এবং *বঙ্গমহিলা* পত্রিকায় অনুরূপ বামারচনা বিভাগ খোলা হয়। তৎকালে *অন্তঃপুর* নামে আরো একটি পত্রিকা ছিল। এটি সম্পূর্ণরূপে মেয়েদের রচিত ও সম্পাদিত। তবে *বামাবোধিনী পত্রিকা* সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল। এ পত্রিকার মাধ্যমে কামিনী রায়, মানকুমারী বসু এবং রাধারানী লাহিড়ীর মতো কয়েকজন লেখক আত্মপ্রকাশ করেন, যাঁরা পরবর্তীকালে সাহিত্যিক হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেন। উল্লেখ্য *বামাবোধিনী*র প্রথম পঁচিশ বছরের ৫৪ জন প্রধান প্রধান লেখকের মধ্যে ১৬ জনই ছিলেন নারী। (গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২-২১৩; ভারতী রায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২-১৩)

[৪২৮] তপস্যা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৭

নারী পুরুষের সাথে সভায় অংশগ্রহণের সময় একত্রে বসবেন না পর্দার অন্তরালে বসবেন এ নিয়ে আবার ব্রাহ্মসমাজ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

পূর্ববাংলার ঢাকায় জন্মগ্রহণ করা ব্রাহ্মসমাজের অন্য একজন সদস্য কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) নারী জাগরণে ভূমিকা রাখেন। ১৮৬৯ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব* প্রকাশিত হয়। জন স্টুয়ার্ট মিলের *The Subjection of Women* গ্রন্থের সাথে এ বইয়ের খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় যদিও তিনি মিলের বইটি সম্পর্কে আগে (নিজ গ্রন্থ রচনার) জানতেন না। কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদেশি চিন্তাবিদ যারা নারীমুক্তি নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা যায়। তিনি যৌবনকালে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা প্রভাবিত হন। কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে ছিলেন নারী প্রগতির উগ্র সমর্থক। নারী শিক্ষায় শুধু তাঁর উৎসাহই ছিল না, স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বাইরে বেরোনোর দুঃসাহসও দেখিয়েছেন। কেশবচন্দ্রের এ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ববাংলার কিছু মানুষ তাঁর পথ অনুসরণ করতে শুরু করেন।[৪২৯] কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর বইয়ে নারী জাতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মত প্রকাশ করেন, মানসিক শক্তিতে নারী পুরুষ উভয় সমান। মেয়েরা যে পুরুষের তুলনায় বেশি ধর্মপরায়ণ ও ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং স্নেহ-মমতা-সহিষ্ণুতা-পরোপকার মেয়েদের মধ্যে বেশি তা কালীপ্রসন্ন উল্লেখ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, শিক্ষা পেলে নারীও পৃথিবীতে প্রাপ্য মর্যাদার অধিকারী হবেন। তিনি বলেন শিক্ষা পুরুষের পক্ষে যতখানি প্রয়োজন, নারীর পক্ষেও ঠিক ততখানি দরকার। শিক্ষা থেকে মেয়েদের বঞ্চিত রাখাকে পাপ বলে মনে করেন তিনি। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কেশবচন্দ্র সেন দ্বারা প্রভাবিত হন। কেশবচন্দ্র সেন 'স্ত্রী জনোচিত শিক্ষা'র যে কথা প্রচার করেন তারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায় কালীপ্রসন্নের রচনায়। এখানে মেয়েদের ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি, ঘর গৃহস্থালির কাজ, সন্তান পালনের বিষয়, কবিতা পাঠ, উপন্যাস পাঠ, সংগীত এবং চিত্রবিদ্যা নারীর জন্য শিক্ষণীয় বলে মনে করেন।[৪৩০] এককথায় জ্ঞানের সমস্ত ভাণ্ডারই মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন,

> যে শিক্ষায় নারী জাতির স্বভাব সুন্দর মধুময়, হৃদয় নবরাগরঞ্জিত কুসুম কলিকার ন্যায় পরিশোভিত হইয়া আমাদিগের চক্ষু শীতল করিতে পারে। অথচ তাহাদিগের মানসক্ষেত্র জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে আলোকিত এবং তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জিত হইয়া তাহাদিগকে

---

[৪২৯] কালীপ্রসন্ন ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

[৪৩০] *ঐ*, পৃ. ১৪-১৫

আত্মরক্ষনের সামর্থ্য প্রদান করে, আমাদিগের বিবেচনায় তাহাই নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষা। সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শিক্ষা লাভ করিলেই নারীজাতির ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলের সম্ভাবনা।[৪৩১]

কালীপ্রসন্ন ঘোষ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নারীর যথার্থ স্বাধীনতা সমাজের মঙ্গলের কারণ। তিনি বলেন স্বাধীনতায় পুরুষের যতখানি অধিকার, নারীরও ঠিক ততখানি। অন্যদিকে স্বাধীনতা না পেলে নারী শিক্ষাক্ষেত্রে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারবে না এমনকি তাদের হৃদয়-মন কোনোদিন প্রসারিত হবে না। নারীর সামাজিক একটি অবস্থান থাকার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।[৪৩২] কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর গ্রন্থে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং তাদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন।[৪৩৩] উনিশ শতকে বাংলায় নারী জাগরণে *নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব* বইটি এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের অন্যান্য রচনাবলী ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলার মেয়েদের পর্দাপ্রথার কঠোরতা হতে বের হয়ে আসার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। পর্দা ও অবরোধ এক নয়। ইসলাম পর্দাকে সমর্থন করে, অবরোধকে নয়। ইসলামের স্বর্ণযুগে মহিলারা ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকতেন না, বা মুসলমান পুরুষও তাদেরকে কাপড়ের বস্তায় পরিণত করে রাখতেন না। হেজাব বা পর্দার অর্থ এক হলে বলা যায়, বেগম মোহাম্মদ আলী বিলেত গমন করে, বেগম শাহ-নেওয়াজ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বক্তৃতা করে এবং সরোজিনী নাইডু মার্কিন যুক্তরাস্ট্রে যেয়ে পর্দা ভাঙ্গেননি। বরং অবরোধ যা অনৈসলামিক, তাইই ভেঙ্গেছেন; এতে মুসলমান সমাজের অথবা ধর্মমতের কোন ক্ষতি হয়নি।[৪৩৪] *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় এ সম্পর্কে আরো বলা হয়, 'স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা উঠলেই দেখা যায় এটি হরণের জন্যও দায়ী করা হয় পর্দা ও পর্দাপ্রথাকে। এ বিষয় নিয়ে ইউরোপে আলোচনার দিন বহু আগে চলে গেছে। কারণ ইউরোপ অবরোধ কাটিয়ে, পর্দাকে ডিঙ্গিয়ে নতুনতর কিছু একটায় পৌঁছিয়েছে- যার অনুকরণের জন্য সারা সভ্যজগত লালায়িত হয়ে উঠেছে এবং এর ঢেউ ভারতেও এসে লেগেছে'।[৪৩৫]

---

[৪৩১] *ঐ*, পৃ. ১৬

[৪৩২] *ঐ*, পৃ. ২১-২২

[৪৩৩] *ঐ*, পৃ. ৭

[৪৩৪] *মাসিক মোহাম্মদী*, ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃ. ৭৫০ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা)

[৪৩৫] *ঐ*, পৃ. ৭৫০

এ সময় দু'একজন নারী তাদের স্বামীদের সহায়তায় অবরোধপ্রথা ভেঙ্গে ঘরের বাইরে বের হওয়া শুরু করেন। প্রচলিত সংস্কারের তোয়াক্কা না করে পাশ্চাত্য ভাবধারায় উজ্জীবিত তরুণদের কেউ কেউ বাড়ির মেয়েদের নিয়ে বাইরে বেরোতে শুরু করেন। ১৮৬২ সালে পরিবারের সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করে কেশবচন্দ্র সেন নিজ স্ত্রী জগন্মোহিনীকে নিয়ে মহর্ষিভবনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ১৮৬৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গভর্ণর হাউসের একটি অনুষ্ঠানে তাঁর সস্ত্রীক যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে পরিবারে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শুধু কলকাতায় নয়, পূর্ব বাংলার লাখোটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় ও ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর বাড়ির মেয়েদের নিয়ে নানা জায়গায়, এমনকি সভা-সমিতিতেও যেতে শুরু করেন। এতে করে রক্ষণশীল সমাজপতিরা শংকিত হয়ে নারী স্বাধীনতা কত বিপদজনক তা নিয়ে *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়*, *বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা*, *সংবাদ প্রভাকর*, *সোম প্রকাশ*, *ঢাকা দর্পন*, *বামাবোধিনী* প্রভৃতি পত্রিকায় পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা করতে থাকে। এসময় শুধু পুরুষ নয়, শিক্ষিত মেয়েরাও অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেন।[৪৩৬] এক্ষেত্রে প্রথম দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে ১৮৬৪ সালে সাথে করে বোম্বাইয়ে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থানকালে জ্ঞানদানন্দিনী বিভিন্ন প্রগতিশীল মেয়েদের সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন। ফলে তিনি নিজের মধ্যে ব্যাপক একটা পরিবর্তন আনার সুযোগ পান। ১৮৬৮ সালে জ্ঞানদানন্দিনী যখন কলকাতায় ফিরে আসেন তখন তিনি রীতিমত একজন পর্দামুক্ত নারী।[৪৩৭] সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পর্দাপ্রথা উপেক্ষা করার সাহস দেখান পূর্ববাংলার বরিশালের দুই জমিদার ভাই রাখালচন্দ্র রায় ও বিহারীলাল রায়। তাঁরা নিজ স্ত্রীদের নিয়ে বিনা পর্দায় ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বরিশাল শহর ভ্রমণ করেন। এ ঘটনায় সারা পূর্ববাংলা সাড়া পড়ে যায়। শুধু তাই নয়, সমসাময়িক *বামাবোধিনী পত্রিকার* এক খবরে জানা যায় তাঁরা (জমিদার ভ্রাতৃদ্বয়) স্থানীয় ইউরোপীয়ান সাহেবদেরকে নিজেদের বাড়ীতে ভোজের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। এ ভোজ অনুষ্ঠানে রায় গিন্নীরাও অংশগ্রহণ করেন।[৪৩৮] অবশ্য এঘটনায় বাংলার ছোট লাট সিসিল বীডন মুগ্ধ হয়ে জমিদার ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশংসা করে বরিশালের কালেক্টরের কাছে একটি চিঠি লিখেন।[৪৩৯]

---

[৪৩৬] কালীপ্রসন্ন ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০-২১

[৪৩৭] জ্ঞানদানন্দিনী পর্দা ছাড়াই জাহাজ হতে নেমে গাড়িতে করে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরেন। তৎকালে ঘটনাটি পত্রিকার খবর হয়েছিল। এ বছরই তিনি গভর্ণর জেনারেলের নিমন্ত্রণে একটি পার্টিতে একাই অংশগ্রহণ করেন। তবে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রগতিশীল তাঁর পরিবারের সদস্যরা ছিলেন না। উল্লেখ্য পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্দাভাঙ্গার জন্য পুত্রবধূর সাথে অনেকদিন পর্যন্ত কথা বলেননি। (গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৭)

[৪৩৮] *বামাবোধিনী পত্রিকা*, কার্তিক ১২৭৩, পৃ. ৪৭; উদ্ধৃত, গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

[৪৩৯] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

আবার ১৮৬৬ সালে কলকাতায় তরুণ ব্রাহ্মরা মেরি কার্পেন্টারকে একটি সংবর্ধনা দেন। এ অনুষ্ঠানে যেসকল নারী ও পুরুষ একত্রিত হন তারা অবরোধ ও পর্দার তোয়াক্কা না করে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হন। অন্যদিকে মেরি কার্পেন্টার ডিসেম্বর মাসে নিজের বাসভবনে এক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের নিমন্ত্রণ জানান। এখানেও নারী-পুরুষ পর্দা না মেনে পরস্পর কথা বলেন। একই বছর গোবিন্দচন্দ্র দত্তের দুই কন্যা তরুদত্ত এবং অরুদত্ত উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে গমন করেন। শশীপদ বন্দোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ এবং উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের স্ত্রীরাও কয়েক বছরের মধ্যে বিলেতে যান। তাদের মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্বামী ছাড়া একাই বিলেত গিয়েছিলেন। এছাড়া তৎকালে দুর্গামোহন দাস, জগদীশ চন্দ্র বসুর তিন বোন, রাখালচন্দ্র রায়ের স্ত্রী কুসুম কুমারী, রাজকুমারী বন্দোপাধ্যায়, রাধারানী লাহিড়ী প্রমুখ নারী পর্দা ভাঙ্গার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[৪৪০] এভাবে উনিশ শতকের শেষভাবে এসে পর্দার কড়াকড়ি হ্রাস পেতে থাকে। তবে এটি হিন্দু সমাজে পরিদৃষ্ট হয়, অন্যদিকে মুসলিম সমাজে পর্দা বাধ্যতামূলক ছিল বহুদিন।[৪৪১]

উনিশ শতকের শেষের দিকে যে সকল মুসলিম সমিতি নারী জাগরণে ভূমিকা রেখেছে তার মধ্যে *Central National Muhammadan Association* (১৮৭৮), *ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী* (১৮৮৩) এবং *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি* (১৯০৩) উল্লেখযোগ্য। *Central National Muhammadan Association* সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ক যে সকল কাজ ও আন্দোলনের সূচনা করে তার মধ্যে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও নারী প্রগতির বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। তবে নারীশিক্ষার পক্ষে এ সংগঠন প্রস্তাব দিলে তা প্রায় স্থগিত হয়। আর এ বিষয়ে সুচিন্তিত সমাধানের লক্ষ্যে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয় এবং নারীশিক্ষার পক্ষে প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বিষয়ের মত নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল ছিল। তিনি মনে করতেন পুরুষ নারী একসাথে সমান উন্নতি করতে না পারলে প্রকৃত

---

৪৪০ *ঐ*, পৃ. ২৩৮

৪৪১ বাংলার সমাজে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথার কঠোরতা বেশি ছিল। কেননা ইসলাম ধর্মে মেয়েদের পর্দা ফরজ ছিল। মুসলিম নারী পর্দা থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ পায় বিশ শতকে। ১৯১৯ সালে তুরস্কে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের স্ত্রী লতিফা খানুম কাস্তামানুতে এক সভায় প্রকাশ্যে অবগুন্ঠন হতে নিজেকে উন্মুক্ত করেন। এ ঘটনা হতে খুব সম্ভবত বাংলার মুসলিম নারী পর্দা হতে নিজেদের মুক্ত করতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কিন্তু এরপরও অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়। তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির প্রেক্ষাপটে বিদেশি সংস্কৃতি গ্রহণ করা বাংলার মেয়েদের জন্য কঠিন ছিল। তাই বাংলার মুসলিম নারীর পর্দা থেকে বের হওয়ার সময়টা সঠিক করে বলা মুশকিল। উল্লেখ করা যায় ১৯২৭ সালে কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকায় এলে বিদুষী নারী ফজিলতুননেসা তাঁর সাথে সাক্ষাত করে কথা বলেন। এরপর হতে ধীরে ধীরে মুসলিম মেয়েরা পর্দা বর্জন করে। (*ঐ*, পৃ. ২৩৯)

সুফল আসবে না।[৪৪২] তবে এসময় নারীশিক্ষার খুব বেশি উন্নয়ন ঘটেনি। অন্যদিকে এ এসোসিয়েশন রক্ষণশীলদের নানা প্রকারের বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে কাজী বিল, বিয়ে ও বিয়ে বিচ্ছেদের রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বিষয়ে অভিমত জানায়। এ সময় কাজী বিল পাশ হলেও বিয়ে এবং বিয়ে বিচ্ছেদ রেজিস্ট্রেশন বিলটি পাশ হয়নি।[৪৪৩]

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে *ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী* প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৩ সালে। বাংলার মেয়েদের দুরাবস্থা ঘুচিয়ে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। বিদ্যালয়ে যেয়ে তখন মেয়েদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা কঠিন ছিল বিধায় *সুহৃদ সম্মিলনী* 'অন্তঃপুর শিক্ষা' কার্যক্রম চালু করে।[৪৪৪] মুসলিম নারী জাগরণের ইতিহাসে *মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর* ভূমিকা অসীম। উল্লেখ্য এ সম্মিলনী সম্পর্কে বিস্তারিত ২য় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন ও অন্যান্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে ১৯০৩ সালে *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি* গঠন করেন। এ সমিতির একটি পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার প্রসার এবং তার জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।[৪৪৫] *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির* প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৩১০ সনের ২০ ও ২১ চৈত্র রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া শহরে।[৪৪৬] এ সম্মেলনে ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে পঞ্চম প্রস্তাব ছিল- 'অধুনা মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এই সমিতির মতে পর্দার সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক'।[৪৪৭] অর্থাৎ নারীর হীন অবস্থা হতে মুক্তির জন্য শিক্ষা প্রয়োজন তা উপলব্ধি করে নারীশিক্ষার উপর জোর গুরুত্ব প্রদান এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করে এ সমিতি। এসময় নারীশিক্ষা বিস্তারের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সমিতির মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রগতিশীল সদস্যরা বাংলার গ্রাম ও জেলাগুলিতে প্রচারণা চালায়। উল্লেখ্য তখন বাংলায় ইসলাম প্রচারকরাও মেয়েদের শিক্ষার সমর্থনে বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লিখিত সমিতিগুলির কার্যক্রম, নারীশিক্ষা

---

[৪৪২] *The Moslem Chronicle*, 21 March 1895, p. 125; উদ্ধৃত, মো. আব্দুল্লাহ আল মাসুম, *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯২১)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮০

[৪৪৩] ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৩৪-১৩৫

[৪৪৪] *ঐ*, পৃ. ১৫১

[৪৪৫] *ঐ*, পৃ. ১৮১

[৪৪৬] *ঐ*, পৃ. ১৮২

[৪৪৭] *ইসলাম প্রচারক*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১; Khawar Mumtaz and Farida Shaheed, *Women of Pakistan*, Zed Books, London, 1987, p. 40

বিস্তারের প্রচেষ্টা ও নারীপ্রগতি সম্পর্কীয় চিন্তাভাবনা পূর্ব বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলনের ইতিহাস সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে।

পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করে সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্য। এসময় বিভিন্ন লেখায় নারী চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। সেখানে মেয়েদের সুখ-দুঃখ ও সামাজিক অবস্থানের কথা উঠে এসেছে। নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষা বিষয়ে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার প্রকাশ ঘটতো তখনকার সাহিত্যে।[৪৪৮] এছাড়া সমসাময়িক কবি, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে *আল এসলাম*, *মিহির ও সুধাকর*, *মাসিক মোহাম্মদী*, *নবনূর*, *কোহিনূর*, *ইসলাম প্রচারক*, *মোয়াজ্জিন*, *সওগাত* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন *বামাবোধিনী পত্রিকায়* মেয়েদের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়,

> ... নারী জাতির শৈশবস্থায় অনাদার, বৈধব্যের দরুণ কষ্টভোগ, বধূ অবস্থায় যন্ত্রণা এবং বার্ধক্যের হতাদর এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহাদিগের জীবিতকাল অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়া আছে। আজীবন তাহাদিগের নয়নে কেবল অশ্রুবারি বর্ষিত হয়। শৈশবে তাহারা জনক জননীর বিশেষ ভাবনার কারণ, যৌবনে স্বামীর নিরতিশয় সতর্কতার বস্তু এবং বার্দ্ধক্যে সন্তাগণের গলগ্রহস্বরূপ হইয়া কালাতিপাত করে। এই জন্যই তাহারা সময়ে সময়ে সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকে "কি বর্ত্ত করালি সই কাঁদতে জনম গেল"।[৪৪৯]

উল্লেখ্য সমসাময়িক মুসলমান নারীসমাজ *বামাবোধিনী পত্রিকাতে* প্রায় অনুপস্থিত ছিল। তবে বিবি তাহেরুননেছা নামক মুসলিম নারী *বামাবোধিনী*র ফাল্গুন ১২৭১ সংখ্যায় লিখেছিলেন। পত্রিকাটি মাঝে মাঝে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করতো। বলা হয় *বামাবোধিনী* প্রকাশকালে মুসলিম সমাজে জাগরণ ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আনিসুজ্জামান ও ওয়াকিল আহমেদের মতে ১৮৭০ এর দশক থেকে মুসলিম সমাজে আধুনিকীকরণ শুরু হয়।[৪৫০] উল্লেখ্য মুসলমান মেয়েদের

---

[৪৪৮] "আমাদিগের নারীজাতির অবস্থা", ভারতী রায়, (সংকলিত ও সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬

[৪৪৯] মালেকা বেগম, *সাক্ষাতকার*, ৩০.১০.২০১৭

[৪৫০] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, *১৭৫৭-১৯১৮*, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৩৮৪; ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩-৮৪; Zoya Hasan (ed.), *Forging Identities : Gender, Communities, And The State in India*, Kali for Women, New Delhi, 1994, p. 44

সামাজিক অবস্থান ও হীনদশা নিয়ে আলোচনা চলে *মিহির ও সুধাকর* (১৮৮৯), *কোহিনূর* (১৮৯৮) এবং *নবনূর* (১৯০৩) সহ নানা পত্র-পত্রিকায়।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখক দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকের নারী চরিত্ররা শিক্ষিত এবং শিল্প অনুরাগী ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) নাটকে বিধবাদের জীবনের কঠোরতার ছবি জীবন্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৫১] আবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের অনেক নারী চরিত্র শিক্ষিত এবং প্রখর ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গদর্শনের* এক প্রবন্ধে লিখেন, "... পূর্ব বঙ্গবাসী কোনো বর, কলিকাতা নিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কন্যাটি পরমাসুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, কর্ম্মিষ্ঠা এবং সুশীলা।"[৪৫২] উল্লেখ্য বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শনে* মেয়েদের লেখা অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এসকল মহিলা লেখকদের অনেকেরই নাম উল্লেখ করা হয়নি। তৎকালে তরু দত্ত ইংরেজিতে কবিতা লিখেছেন। ১৮৫৬ সালে কৃষ্ণকামিনী দাসী রচিত একটি নাতিদীর্ঘ কাব্য 'চিত্তবিলাসিনী' প্রকাশিত হয়। সম্ভবত বাঙালি নারীর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম পুস্তক এটি। এ গ্রন্থ প্রকাশকালে (১৮৫৬ সাল) *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় লেখা হয়- "অঙ্গনাগণের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যে সুপ্রণালী এদেশে প্রচলিত হইতেছে, তাহার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ, ... অবলাগণ বিদ্যানুশীলন পূর্বক অবণীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠাতা হয়েন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।" শুধু কবিতা নয় গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি সবরকম লেখাই এসময়কার মেয়েরা শুরু করে দেয়।[৪৫৩] আবার এসকল লেখায় নারীজাগরণ ও নারীমুক্তির কথা প্রকাশ পেয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। উল্লেখ্য ১৮৭৬ সালে ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *রূপজালাল* প্রকাশিত হয়। এটি গদ্য এবং পদ্য দুই রীতিতেই লিখিত হয়েছে। এসময় কবিয়াল যজ্ঞেশ্বরীকে পাওয়া যায়, যদিও অনেক সময় তিনি যথাযথ স্বীকৃতি পাননি। তৎকালে যে সকল সাহিত্যিকরা সমাজে নারীর প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, বৈষম্য, নিপীড়ন এবং কঠোর অবরোধের বিরুদ্ধে লিখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নদীয়ার শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)। নারী প্রগতির বিষয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মোজাম্মেল হক দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী ও সুফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি 'পদ্যশিক্ষা' নামক বালক বালিকাদের জন্য পাঠোপযোগী একটি বই প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে বাংলার মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন। মোজাম্মেল হকের

---

[৪৫১] দীনবন্ধু মিত্র, *দীনবন্ধু রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১০৮-১০৯

[৪৫২] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৯০, পৃ. ৮৮৮-৮৯৩

[৪৫৩] তপস্যা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৭

'জোহরা' ও 'রঙ্গিলাবাঈ' উপন্যাস দু'টি পারিবারিক উপন্যাস।[৪৫৪] জোহরা উপন্যাসে তিনি নারী শিক্ষার উপর জোর প্রদান করেন এবং এখানে নারীসমাজের অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে।

উনিশ শতকে বাংলার আরেকজন সাহিত্যিক নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩)। প্রগতিশীল সাহিত্যিক নজিবর রহমান রচিত 'আনোয়ারা' ও 'গরিবের মেয়ে' উপন্যাস দু'টিতে তিনি নারী শিক্ষার উপর জোর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও সমর্থন দান করেন। নজিবর রহমান রাজশাহীর জুনিয়র একটি মাদ্রাসায় বাংলা বিষয়ে শিক্ষকতা করেন এবং নিজ গ্রামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন (১৮৯২) করেন। যা পরবর্তীকালে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।[৪৫৫] এ বিদ্যালয়টি নারীশিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখে। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) অন্যতম, যিনি যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন বাঙালি সমাজে নারীনিগ্রহ বিশেষ করে বিধবাদের জীবনের করুণ চিত্র তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি *বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভাণ্ডার* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সে সময় সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন শুরু হলেও অনেক মুসলমান পরিবারে তা অনুসরণ করা হয়নি।[৪৫৬] উপরন্তু বিধবাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও সামাজিক নিপীড়নের স্বীকার হতে হয়। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা প্রদান ও নারীশিক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন।

টাঙ্গাইলের চারান গ্রামে জন্মগ্রহণকারী এবং পরবর্তীতে ময়মনসিংহ জেলার সাব-ডেপুটি রেজিষ্টার নওশের আলী খান ইউসফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪) নারী জাগরণে ভূমিকা রাখেন। তিনি *বঙ্গীয় মুসলমান* (১৮৯০) গ্রন্থে মুসলিম মেয়েদের দৈন্য দুর্দশার বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁর বই থেকে জানা যায় যে, সেসময় প্রতি ১০ হাজার মুসলিম মেয়ের মধ্যে মাত্র ১০ জন মেয়ে সামান্য শিক্ষিত এবং সাতজন শিক্ষারত ছিলেন।[৪৫৭] নওশের আলী বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। তিনি বলেন, "সমাজে স্ত্রী শিক্ষা এত প্রয়োজন রহিয়াছে যে, সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে না হইলেও স্ত্রীজাতির হৃদয় শিক্ষালোকে আলোকিত, সাংসারিক জ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন করিতে নাই- ইহা মনে করা বিষম ভ্রান্তি"।[৪৫৮] তিনি আরো বলেন, "যদিও আমি আজকালের নব্য ধরণের স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী নই, তথাপি স্ত্রীজাতি

---

[৪৫৪] ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬১-২৬৬; মো. আব্দুল্লাহ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮১

[৪৫৫] গোলাম সাকলায়েন, "মোহাম্মদ নজিবর রহমান", *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪, পৃ. ২১-২২

[৪৫৬] শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, *মেহের চরিত*, কলকাতা, ১৯০৭, পৃ. ৫২

[৪৫৭] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৬

[৪৫৮] নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, *বঙ্গীয় মুসলমান*, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯১, পৃ. ৪৪

যাহাতে তাহাদের প্রকৃত অধিকারসকল লাভ করিতে পারেন, তাহা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি"।[৪৫৯] উল্লেখ্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাথে নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর বাদানুবাদ হয় *নবনূর পত্রিকায়*।[৪৬০]

এছাড়া মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০), সিরাজগঞ্জের মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ছানী (দ্বিতীয় মেহেরুল্লাহ নামে সমধিক খ্যাত), রংপুরের শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), কাজী ইমদাদুল হক ও লুৎফর রহমান প্রমুখ সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সংস্কারক মেয়েদের নিগ্রহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং নারী প্রগতির বিষয়ে লেখনীর মাধ্যমে সামাজিক জাগরণ ও আন্দোলন সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বাল্যবিবাহ, বিবাহে অতিরিক্ত মোহরানা ধার্য, বাদ্য-বাজনা, নাচ-গান ইত্যাদি বন্ধ করার আহ্বান জানান।[৪৬১] অন্যদিকে ইসমাইল হোসেন সিরাজী তুর্কি নারীর জাগরণ দেখে উৎসাহিত হয়ে বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার উপর জোর প্রদান করেন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধিতা করেন। এভাবে সমাজ সংস্কার এবং প্রগতির লক্ষ্যে উদার মানবিক ও প্রগতিশীল ভাবধারার অধিকারী বিভিন্ন লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নারী জাগরণের পক্ষে আকাঙ্খা জাগ্রত হয়।

এভাবে দেখা যায় উনিশ ও বিশ শতকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনের পটভূমি রচনা বেশ আগে শুরু হয়েছিল। দেশ বিদেশের নানা ঘটনা ও বিভিন্ন সংস্কৃতিমনা, প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারক নারী-পুরুষ এর পিছনে কাজ করেছেন। পাশ্চাত্য দেশগুলির নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা আন্দোলন-সংগ্রাম এবং এসব আন্দোলনের সফলতা দ্বারা বাঙালিরা অনুপ্রাণিত হন। অন্যদিকে উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁ বা নবজাগরণ সমাজ সংস্কারে যে ইতিবাচক প্রভাব রাখে সেখানে নারী উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। এরপর ধীরে ধীরে বাংলার মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ, আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি এবং সামাজিক মর্যাদার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমাবস্থায় বাঙালি হিন্দু সংস্কারপন্থীরা কাজ শুরু করলেও ধীরে ধীরে মুসলিম মনীষীরা এগিয়ে আসেন। সর্বোপরি সকল শ্রেণির ব্যক্তিদের সহায়তায় এবং নারী নিজেদের আগ্রহে তারা অত্যাচারিত এবং নিগৃহীত দশা হতে বের হয়ে আসতে শুরু করে। আর এভাবেই বিশ শতকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

---

[৪৫৯] ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৫

[৪৬০] *ঐ*, পৃ. ২৮৬

[৪৬১] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন : মুক্তির মন্দির সোপান তলে (১৯০১-১৯৪৬)

বাঙালি নারী শিক্ষালাভের সাথে সাথে নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতার আকাংখার উন্মেষ ঘটে। তারা নিজ উদ্যোগে সভা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এভাবে তাদের প্রতি সমগ্র সমাজের অবহেলো ও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে নারীসমাজ প্রতিবাদ শুরু করেন। বিশ শতকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা *নবনূর (১৯০৩)*, *মাসিক মোহাম্মদী (১৯০৩)*, *আল এসলাম (১৯১৫)*, *সওগাত (১৯১৮)*, *বুলবুল (১৯৩৩)* প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় বাঙালি প্রগতিশীল ও সচেতন ব্যক্তিবর্গ এ শতকের প্রথম হতেই মুসলিম নারীমুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তাদের লেখনী ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চালান। বিশ শতকের শুরুতে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের গতি সঞ্চার হয় এবং ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এসময় অবিভক্ত ভারতবর্ষে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে বাঙালি নারীর সক্রিয় এবং তেজোদীপ্ত ভূমিকা লক্ষণীয়।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত। রক্ষণশীল সামাজিক পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেও তিনি মুক্তমনের অধিকারী ছিলেন এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে পর্দাপ্রথা ও অবরোধপ্রথার কঠোরতা থেকে বাঙালি মুসলিম নারীকে মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে আসতে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন[৪৬২] ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের এক অভিজাত পড়ন্ত জমিদার

---

[৪৬২] বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'বেগম রোকেয়া' নামে পরিচিত হলেও তাঁর প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন। ইংরেজিতে তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করেন 'ROQUIAH KHATUN' এবং বিবাহ পরবর্তী নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বা মিসেস আর. এস হোসেন (Mrs. R.S. Hossein)। মোশফেকা মাহমুদ রচিত *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি* (ঢাকা, ১৯৬৫) এবং শামসুন নাহার মাহমুদ লিখিত *রোকেয়া জীবনী*তে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক লিখিত যে ২১টি পত্র ও পত্রাংশ উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলির সর্বত্রই 'রোকেয়া' নামই প্রধানত পাওয়া যায়। নিতান্তই ব্যক্তিগত কাজে কোথাও তিনি নিজের নাম সংক্ষেপে 'রকু' লিখেছেন। এছাড়া সকল রচনাতে তিনি রোকেয়া খাতুন এবং বিবাহ পরবর্তীতে নাম মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বা সংক্ষেপে মিসেস আর. এস হোসেন নামে তিনি সুপরিচিত।

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জহিরউদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের (মৃত্যু ১৯১৩) ছিলেন উর্দুভাষী, বিলাসী ও রক্ষণশীল ব্যক্তি। রোকেয়ার মা ছিলেন রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরী (মৃত্যু ১৯১২)। এ দম্পতির দুই পুত্র- আবুল আসাদ মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাবের ও খলিলুর রহমান আবু জায়গাম সাবের এবং তিন কন্যা করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হোমায়রা। শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহী আবু আলী সাবের দুই পুত্রকে ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত করার জন্য কলকাতার *সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে* পাঠালেও, সামাজিক চাপে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিতে পারেননি। রোকেয়া বড়বোন করিমুন্নেসার[৪৬৩] কাছে বাংলা ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখেন। পরবর্তীকালে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি বাংলা সাহিত্যে যে অবদান রেখে গেছেন তার পশ্চাতে এই মহিয়সী নারীর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন।[৪৬৪] অন্যদিকে রোকেয়া তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা প্রভাবিত ভাই ইব্রাহীম সাবেরের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ইংরেজি শিখেন। তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটি তিনি ভাই ইব্রাহিম সাবেরকে উৎসর্গ করেন।[৪৬৫]

প্রায় তিনশত একর জমির উপর নির্মিত রংপুরে রোকেয়ার পিতার জমিদার প্রাসাদগৃহে মেয়েদের জন্য কঠোর পর্দা ও অবরোধপ্রথা পালন করা হতো। তাঁদের বাড়ির গৃহের অভ্যন্তরে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ

---

[৪৬৩] করিমুন্নেসার জন্ম ১৮৬৫ সালে। শৈশবে তাঁকে কোরআন শরীফ মুখস্ত করা ব্যতিত অন্যকিছু শিখতে দেওয়া হয়নি। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে করিমুন্নেসাকে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারবাসী বিখ্যাত গজনবী পরিবারের আবুল হাকিম খানের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। শ্বশুরবাড়িতে তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখেন। দুর্ভাগ্যবশত মাত্র ৯ বছরের বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করার পর তাঁর স্বামী মারা যান। করিমুন্নেসা সমাজের নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে পিতাহীন দুই পুত্র সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দানে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রচারবিমুখ করিমুন্নেসার কয়েকটি কবিতা 'সাবের বংশের জনৈকা কন্যা' নামে সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

[৪৬৪] রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন *মতিচূর*, দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গপত্রে জৈষ্ঠভগ্নি করিমুন্নেসা সম্পর্কে লিখেন, 'আপাজান! আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণপরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দ্দু ও পারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গালা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গালা পড়ার অনুকূলে ছিলে। ... কলিকাতায় আসিয়া ১১ বৎসর যাবত এই উর্দ্দু স্কুল পরিচালনা করিতেছি; এখানেও পরিচারিকা, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দ্দুভাষিণী। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত উর্দ্দু ভাষাতেই কথা কহিতে হয়। এতখানি অত্যাচারেও যে বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই, তাহা বোধ হয় কেবল তোমারই আর্শীব্বাদের কল্যাণে। (উৎসর্গপত্র, *মতিচূর*, দ্বিতীয় খণ্ড, আবদুল কাদির কর্তৃক সম্পাদিত, *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৭)

[৪৬৫] দাদা! আমি আশৈশব তোমার স্নেহ-সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না-পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক কেমন হয়। আমি কেবল তোমাকেই জানি। জননী সময়ে সময়ে শাসন করিয়াছেন, তুমি কখনও শাসন কর নাই। তাই মাতৃস্নেহের কোমলতাও তোমাতেই অনুভব করিয়াছি। "পুরস্কার তিরস্কার হিত-ইচ্ছা থেকে", সেরূপ হিতকাঙ্খী শিক্ষকও তুমিই আমার। (উৎসর্গপত্র, *পদ্মরাগ*, আবদুল কাদির কর্তৃক সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬১)

ছিল, এমনকি কোন নারী প্রবেশ করলেও বালিকাদের লুকিয়ে পর্দারক্ষা করতে হতো। এরূপ কঠোর রক্ষণশীল পরিবেশে পর্দার মধ্যে পিতৃগৃহে জীবন অতিবাহিত করার পর ষোলো বছর বয়সে রোকেয়ার ভাগলপুর নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের (জন্ম ১৮৫৮) সাথে বিবাহ হয়। স্বামীর কর্মস্থল মালদহ, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করার সুযোগে বাইরের জগতের সাথে তাঁর পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সাখাওয়াত হোসেন প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন। স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় রোকেয়া পড়ালেখায় নিজেকে আরো বেশি মনোযোগী করেন এবং বিভিন্ন সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় নিজের লেখা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চায় অত্যন্ত সাবলীলভাবে কাজ শুরু করেন। উল্লেখ্য সাখাওয়াত হোসেনের জীবনকালেই রোকেয়া তাঁর অধিকাংশ সৃজনশীল, মুক্ত ও নির্ভীক ভাবদীপ্ত রচনাবলী লিখেছেন।[৪৬৬]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন দুই সন্তানের জননী ছিলেন। তবে খুব অল্পবয়সে তিনি সন্তানদের হারান। উল্লেখ্য স্বামীর সাথে তাঁর বয়সের ব্যবধান ছিল ২৬ বছর। বিবাহের ৯ বছর পর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ (১৯০৯) করেন। এরপর থেকে বাকী ২৩টি বছর রোকেয়াকে একাকী জীবনযাপন করতে হয়।[৪৬৭] বস্তুত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আভিজাত্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও ব্যক্তি জীবনে সুখী হতে পারেননি বলেই মনে করা হয়। বৈরি পরিবেশে বেদনাজর্জরিত নিঃসঙ্গ জীবন যে কষ্টের তা বলার অপেক্ষা রাখে না, তবে কর্তব্যের পথ থেকে তিনি কখনও সরে দাঁড়াননি। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার দ্বারা তিনি অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সচেষ্ট ছিলেন। সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক হিসেবে রোকেয়া নিজেকে সকলের নিকট হাজির করেন। তাঁর সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোমল আর কঠিনের সংমিশ্রণ, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সাহিত্যকর্মে মুক্তবুদ্ধির ও নারীমুক্তির নানাবিধ যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। এসকল যুক্তি উপস্থাপন করে তিনি নারীসমাজকে এবং সমগ্র বাঙালি সমাজকে বুদ্ধিমুক্তির অভিযানে যাত্রা শুরু করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্যের মূল কথাই ছিল বুদ্ধিকে মুক্ত করতে অক্ষম হলে সত্যিকারের মুক্তি আনয়ন একেবারেই অসম্ভব।[৪৬৮]

---

[৪৬৬] শাহানারা হোসেন, *উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৮৯

[৪৬৭] যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বঙ্গের মহিলা কবি*, অলক রায় (সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ৩৮৯

[৪৬৮] হাসনা বেগম, "মুক্তবুদ্ধি, বেগম রোকেয়া ও নারী অধিকার", *নৈতিকতা নারী ও সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১২

রোকেয়া তাঁর সাহিত্যকর্ম শুরু করেন ১৯০১ সালে *নবপ্রভা* পত্রিকায় *পিপাসা* নামক প্রবন্ধটি প্রকাশের মাধ্যমে।[৪৬৯] এ প্রবন্ধে তিনি বহুল আলোচিত মহর্‌রম তথা মর্মান্তিক কারবালার শোকাবহ ঘটনা উল্লেখ করে এতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। তবে এ লেখাটি খুব সাধারণ কোন রচনা নয়। মাত্র চারমাস বয়সী রোকেয়ার প্রথম শিশু কন্যার অকাল মৃত্যুজনিত ব্যক্তিগত শোকের হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা রচনাটির অন্যতম বিষয়বস্তু বলে মনে করা যায়। *পিপাসা* প্রবন্ধে ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণু জীবাণুজীবের মধ্যে খোদা প্রাপ্তির পিপাসা বিদ্যমান দেখতে পেয়ে তিনি অসীমের জন্য স্বীয় তৃষ্ণার পরিচয় দিয়েছেন।[৪৭০] বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রথম রচনা হলেও প্রবন্ধটি ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করে। রোকেয়ার লেখনীর এই প্রথম উদ্যমকে বিপুল সম্ভাবনাময়, সুমিষ্ট ও সুললিত বলে অভিহিত করে বিভিন্ন ভাষায় লেখিকার গৌরবপূর্ণ দক্ষতার প্রশংসা করেন *নবপ্রভা* পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়।[৪৭১]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যকর্ম তথা লেখনীতে এবং নানামুখী কার্যক্রমে নারীবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে রোকেয়ার প্রথম রচনা *মতিচূর*, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এ রচনাতে তৎকালীন নারীসুলভ বিষয় যেমন- নারীশিক্ষা, শিশু পালন, গৃহকর্ম ইত্যাদি নয় বরং তিনি ধারালো বিদ্রুপের ভাষায় তীব্রভাবে আক্রমণ করেন বাঙালি পুরুষ চরিত্রকে।[৪৭২] রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন *মতিচূর*, প্রথম খণ্ডে বাংলার সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং পরিবারে নারী-পুরুষের পরিপূরক ভূমিকা সম্পর্কে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এবং অকাট্য যুক্তি দিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। নারীর ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীনতা যে পুরুষেরই মতো সে কথাও তিনি সোচ্চারভাবে প্রকাশ করেছেন।[৪৭৩] উল্লেখ্য *মতিচূর*, প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধগুলি রোকেয়া রচনা করেন ১৯০৪ সালের বিভিন্ন সময়ে এবং এর কয়েকটি সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। এরূপ একটি প্রবন্ধ 'অলংকার না badges of slavery?' বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কলকাতার গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত *মহিলা* পত্রিকায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। দীর্ঘতর আকারের এই প্রবন্ধটি পরিবর্তিত আকারে পরে 'আমাদের অবনতি'

---

[৪৬৯] সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* (লেখকের *The World of Muslim Women in Colonial Bengal 1876-1939* গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন পাপড়ীন নাহার), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৬২

[৪৭০] আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *আবুল হুসেনের রচনাবলী*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৩০৩

[৪৭১] সম্পাদকীয়, *নবপ্রভা*, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩০৮; উদ্ধৃত, মুহম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, জীবন ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৩৮

[৪৭২] গোলাম মুরশিদ, *নারী প্রগতির একশো বছর রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৮১

[৪৭৩] গোলাম মুরশিদ, *রেনেসন্স বাংলার রেনেসন্স*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৪

শিরোনামে ১৩১১ বঙ্গাব্দে *নবনূর* পত্রিকায় ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৪৭৪] বিশেষভাবে উল্লেখ্য উক্ত প্রবন্ধটি তৃতীয়বারের মত রূপান্তরিত ও সংশোধিত হয়ে 'স্ত্রী জাতির অবনতি' শিরোনামে *মতিচূর*, প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৭৫] বিশ শতকের শুরুতে (১৯০৪ খ্রি.) রোকেয়া রচিত 'আমাদের অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে সূচিত করে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী জাগরণ ও আন্দোলন। প্রবন্ধটির মাধ্যমে রোকেয়া সর্বপ্রথম পুরুষের সাথে নারীর সমঅধিকারের দাবি উত্থাপন করে সমাজে নারীর অসম অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, "পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোনদিন আপনাদের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে, শুনিতে পাই। কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? না।"[৪৭৬]

পুরুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ইসলাম উন্নত ধর্ম, কতিপয় পুরুষ ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে সমাজে নারীকে অবনত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত। তাই ধর্মের অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় এবং পুরুষের অন্যায় কর্তৃত্ব ও দুঃশাসন অগ্রাহ্য করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। ধর্মের নামে পুরুষ, নারীর উপর প্রভুত্ব করছে এবং নারীর তা সহ্য করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে তিনি নারীকে বিদ্রোহী হতে পরামর্শ দিয়েছেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "এখন আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহ্য করা উচিত নহে। যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। ... যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন"।[৪৭৭]

রোকেয়া উল্লেখ করেন আদিমকালের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন মেয়েরা দাসী ছিল না। মানুষ যেমন ক্রমে সভ্য হয়েছে, তেমনি পুরুষও বাহুবলে এবং বুদ্ধিকৌশলে নারীর উপর আধিপত্য আরম্ভ করেছে। অন্যদিকে নারী, পুরুষের ন্যায় উন্নতি করতে না পেরে পুরুষের সহচরী তথা সহধর্মিনী না হয়ে দাসী হয়ে পড়েছে। মূলত সুযোগের অভাবে

---

[৪৭৪] Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal*, E.J Brill, Lieden, New York, 1996, p. 222

[৪৭৫] *Ibid*, p. 223

[৪৭৬] মিসেস আর. এস. হোসেন, "আমাদের অবনতি", *নবনূর*, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১১ (১৯০৪), কলকাতা, পৃ. ২০৭ (বাংলা একাডেমি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা)

[৪৭৭] *ঐ*, পৃ. ২১৬-২১৭

নারী প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই নারী অক্ষম ও অকর্মণ্যরূপে সমাজে পরিগণিত হয়ে প্রকারান্তে পুরুষের দাসীরূপে পরিগণিত হয়েছে। রোকেয়া আক্ষেপ করে বলেন,

> আমাদের অতি প্রিয় অলংকারগুলি- badges of slavery! ঐ দেখ কারাগারে বন্দিগণ লৌহনির্মিত বেড়ি পায়ে পরিয়াছে। আমরা (আদরের জিনিষ বলে) স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ি পরিয়া বলি "মল পরিয়াছি"! বা রৌপ্য নির্মিত "চুড়ি"! বলাবাহুল্য অনেকে এক হাতে লোহার 'বালা'ও পরেন! কুকুরের গলে যে dogcollar দেখি, উহারই অনুকরণে আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে। অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণশৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া বলি "হার পরিয়াছি"! গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকা দড়ী" পরায়, আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন!! অতএব দেখিলে ভগিনি, আমাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি badges of slavery ব্যতিত আর কিছুই নহে![৪৭৮]

অর্থাৎ তিনি মেয়েদের অলংকার পরাকে পছন্দ করেননি। তিনি এগুলিকে দাসত্বের প্রতীক বলে তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। অথচ এই অলঙ্কারের জন্য নারী সমাজের প্রচণ্ড আগ্রহ। মনে হয় জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি-আভিজাত্য নির্ভর করে কে কত বেশি অলংকার পরতে পারে তার উপর। এ প্রবন্ধটি নারীপাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এসময় কতিপয় নারী রোকেয়াকে বিদ্রুপ করলেও অনেক নারী রোকেয়ার লেখনীর প্রশংসা করে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাস্তব অর্থে অলংকার দাসত্বের নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। এটি সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নয় এবং অলংকার দিয়েই নারীকে পুরুষের তুলনায় সমাজে নীচু বা ছোট করা হয়েছে । রোকেয়া আরো বলেন, পুরুষ এটি পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁরা কোন বিষয় তর্ক করতে গেলে বলেন, "আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব" ।[৪৭৯] প্রকৃতপক্ষে এ কথা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, চুড়ি নারীর অলংকার এবং এটি অত্যন্ত দুর্বলতার প্রতীক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কবি শেখ সাদী পুরুষকে উৎসাহিত করার জন্য বলেছেন- 'আয় মরদাঁ বকুশিদ্, জামা-এ-জানাঁ ন পুষিদ।' (অর্থাৎ 'হে বীরগণ! জয়ী হইতে চেষ্টা কর, রমণীর পোশাক পরিও না')। নারীর পোশাক পরতে কবি বীর পুরুষকে নিষেধ করেছেন। এখানে মেয়েদের পোশাক অর্থে

---

[৪৭৮] রোকেয়া, "অলঙ্কার না Badges of Slavery?", আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *মতিচূর*, প্রথম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০৫-৬০৬; *মহিলা*, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১০, পৃ. ২৭৩-২৭৭, ১১শ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ. ৩১১-৩১৪ এবং ১২শ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১০, কলকাতা, পৃ. ৩৩৯-৩৪৪

[৪৭৯] মিসেস আর. এস হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১১

প্রকারান্তে নারীসুলভ দুর্বলতার কথা বোঝানো হয়েছে। যা নারীর জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর। অন্যদিকে পুরুষ জাতির অধিক যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নারীর সর্বনাশ হচ্ছে বলে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মনে করেন। তিনি এ প্রবন্ধের অন্য এক জায়গায় মেয়েদের রক্ষাকারী হিসেবে পুরুষের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। এ সমালোচনার মধ্যে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অন্তরের মুক্তির আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন-

> পুরুষজাতি বলেন যে, তাহারা আমাদিগকে 'বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া' রাখিয়াছেন এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া-চলিয়া বাইর যাইতেছি! ফলত; তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সুর্য্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন। তাহাতেই আমরা ক্রমশ: মরিতেছি। ... তাই এখন মিনতি করিয়া বলিতে চাই- "অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কর না মোদের"।[৪৮০]

তিনি আরো বলেন,

> 'বাস্তবিক অত্যাধিক যত্নে অনেক জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা উইয়ের ভোগ্য হয়।' পুরুষ কবিই তো বলিয়াছেন-
>
> "কেন নিবে গেল বাতি?
> অধিক যতনে আমি ঢেকেছিনু তারে
> জাগিয়া বাসর রাতি,
> তাই নিবে গেল বাতি।"
>
> সুতরাং দেখা যায় তাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ।[৪৮১]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন পুরুষকে অনুগ্রহ করতে নিষেধ করেন। কারণ তাদের দয়া ও অনুগ্রহের কারণে নারীর সর্বনাশ হচ্ছে। ফলে নারী আত্মনির্ভরশীল না হয়ে স্বামী তথা পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে

---

[৪৮০] *ঐ*, পৃ. ২১২

[৪৮১] রোকেয়া, "অলঙ্কার না Badges of Slavery?", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০৭-৬০৮

পড়ছে। এভাবে মেয়েরা শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা হারিয়ে দুর্বল ব্যক্তিত্বে পরিণত হচ্ছে। তাই এসব থেকে মেয়েদের মুক্ত করতে হবে। তৎকালীন সমাজে নারীশিক্ষার অপ্রতুলতার বিষয়ে রোকেয়া উদ্বিগ্ন ছিলেন। স্কুল কলেজের অভাবে নারীশিক্ষা বাধাগ্রস্থ হয়েছে। সমাজে পুরুষের পড়ালেখার সুযোগ উন্মুক্ত, কিন্তু মেয়েদের সুযোগ সংকীর্ণ। তাই সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আবার নারীশিক্ষার বিরুদ্ধেই অধিকাংশ লোকের অবস্থান। এ প্রসঙ্গে তিনি হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যের আলো প্রবেশ করে না, তদ্রুপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলো প্রবেশ করতে পারে না। কারণ আমাদের প্রয়োজনীয় স্কুল কলেজের অভাব রয়েছে। আবার একজন উদার ভ্রাতা দয়া করে আমাদের হাত ধরে অগ্রসর করতে চাইলে, তাতে সহস্রজনে বাধা দেয়।[৪৮২] অবশ্য এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তি পুরুষের উপকারের কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

ধর্মের দোহাই দিয়ে পুরুষ নারীকে দমিয়ে রেখেছে। কারণ ধর্ম এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যার নাম উঠলে মানুষ আর কোন তর্ক-বিতর্কে যায় না। এ সুযোগটি পুরুষ নিয়েছে বলে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন "আমাদের অবনতি" প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ধর্মীয় শাস্ত্রগুলি নারীকে অন্ধকারে রাখার জন্য পুরুষ কর্তৃক ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ সমাজে ধর্মের নামে নারীর সরলতা ও দুর্বলতার উপর প্রভুত্ব করছে। এক্ষেত্রে তিনি বলেন-

> "শিশুকে মাতা বল পূর্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে, তখনই মাতা বলেন 'ঘুমা শিগ্‌গির ঘুমা! ঐ দেখ জুজু! ঘুম না পাইলেও শিশু অন্ততঃ চোক বুজিয়া পড়িয়া থাকে! সেইরূপ আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই সমাজ বলে "ঘুমাও, ঘুমাও, ঐ দেখ নরক!" মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।... এই ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে! মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী-মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে মুনি ঋষি হইতে পারিতেন?"[৪৮৩]

রোকেয়া বলতে চেয়েছেন, ধর্মীয় বিধান দ্বারা মেয়েদেরকে ঘরে বন্দি করা হয়েছে এবং জ্ঞানালোক থেকে দূরে রাখা হয়েছে। ধর্মগুরুরা পুরুষ হওয়ার কারণে নিজেদের সুবিধামত ধর্মীয় বিধান তৈরি করেছে। যা

---

[৪৮২] ঐ, পৃ. ২১৭

[৪৮৩] ঐ, পৃ. ২১৮

দ্বারা নারীকে কোণঠাসা করে অধিকার খর্ব করা হয়েছে। যদি ধর্ম গুরুদের মধ্যে কেউ কেউ নারী জাতির হতেন তবে নিশ্চয় ধর্মীয় কিছু বিধান নারীবান্ধব হতো বলে রোকেয়া অভিমত প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য ধর্মীয় বিষয়ে আঘাত করে তিনি তৎকালীন সমাজপতিদের অদূরদর্শিতার দিকটি তুলে ধরেছেন।

বাংলার নারীসমাজ অকর্মন্য এবং তাদের আত্মসম্মানবোধের প্রবল অভাব পরিলক্ষিত হয়। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী অশিক্ষিত থাকায় নারী, পুরুষের তুলনায় নিজেকে নিকৃষ্ট ভাবতে থাকে। তাই রোকেয়া মনে করেন, বিবেক-বিবেচনা দ্বারা মেয়েদের উচিত নিজেদের অবস্থান কতটা অবনত তা পরীক্ষা করে দেখা। একই সাথে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করা দরকার। নারীকে সকল বাধাবিঘ্ন ও ভয় উপেক্ষা করে নিজের সার্বিক উন্নতির জন্য এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিবেক আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখিয়ে দিচ্ছে, এজন্য এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের উচিত স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করা। কেননা ঈশ্বর তাকেই সাহায্য করেন যে নিজে নিজের সাহায্য করে। তাই আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করলে আর কেউ আমাদের জন্য ভাববে না। ভাবলেও তাতে আমাদের ষোলো আনা উপকার হবে না।[৪৮৪]

নারীকে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি অর্থ উপার্জন করতে হবে। অর্থাৎ রোকেয়া নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হলে তাদের মুক্তি আদৌ ঘটবে না বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়ার কারণে নারীসমাজ নিগ্রহের স্বীকার হয়েছে। অন্যদিকে সমাজে পুরুষতন্ত্র প্রচলিত থাকায় সীমিত পরিসরে কিছু নারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলেও সেখানে পুরুষ কর্তৃত্ব চালায়। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন- অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলে নারী তার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। সম্ভবত নারীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হয়ে পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয়। কিন্তু এখন নারীজাতি মানসিকভাবে দাস হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করে পতি প্রতিপালন করে সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষই 'স্বামী' থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করে প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নারীকে বিয়ে করেন। তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন! এবং স্ত্রী তার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না।[৪৮৫]

---

[৪৮৪] রোকেয়া, "স্ত্রী জাতির অবনতি", আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

[৪৮৫] *ঐ*, পৃ. ২০

রোকেয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাংলার কোনো কোনো সমাজের স্ত্রীলোক যে স্বাধীনতার দাবি করে থাকেন, তা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। মেয়েরা অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবেই পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নিতে পছন্দ করে। দীর্ঘদিন ধরে নারী, পুরুষের প্রভুত্ব দেখতে দেখতে নিজেদের অধিকারের কথা ভুলে বসে আছে। মেয়েরাও যে মানুষ, তাদের মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার আছে, সমাজে ও অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা রাখা দরকার সে বিষয়টি তাদের ধারণায় নেই। দীর্ঘকাল ধরে অধিকার বঞ্চিত থাকায় তাঁর হৃদয় মস্তিষ্ক সবকিছু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এর ফলে তাঁরা মানসিকভাবে নিজেদেরকে দাস ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না। তাই নারীকে জাগিয়ে তোলার জন্য রোকেয়া উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। সমাজের শত সহস্র বাধা অতিক্রম করেই তবে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের স্বাধীনতার পথে নারীকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন,

> ... বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিস্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ঔজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই- এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না। তাই বলিতে চাই-
>
> "অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনী।"
>
> প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহাগোলযোগ বাধাইবে ... কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতেই হইবে।[৪৮৬]

এভাবেই রোকেয়া তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে দৃঢ়কণ্ঠে নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন, তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে যা ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ। পুরুষসমাজ শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীর উপর দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃত্ব করেছে- তাঁর এই সাহসী উচ্চারণ বাংলার মুসলমান শিক্ষিত সমাজে সেদিন তীব্র ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য *নবনূর* পত্রিকায় "আমাদের অবনতি" প্রকাশ হওয়ার পর এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী। তিনি **১৩১১** বঙ্গাব্দে *নবনূর* পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় রোকেয়ার বক্তব্যকে অবাঞ্চিত বলে মত প্রকাশ করে "একেই কি বলে অবনতি?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এখানে তিনি মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেন- "আপনারা যে পরিশ্রম স্বামীর (বা স্বামী নামক ব্যক্তির) গৃহকার্য্যে ব্যয়" করেন, সেই পরিশ্রম দ্বারা স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারেন, বটে কিন্তু স্বামী বেচারার আপনাদের দাসত্বের নিদর্শন অলঙ্কার জোগাইতে "জামায়ে জাঁনা" পরাইতে, উদরান্ন সংস্থান করিতে যে

---

[৪৮৬] মিসেস আর. এস. হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৯

পরিশ্রম করেন তাহা না করিলে আপনাদের যে কি দশা ঘটিবে তাহা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।[৪৮৭]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উক্ত বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন লেখনীর মাধ্যমে। তিনি মনে করেন, নারী স্বাধীনতার অর্থ হলো পুরুষের ন্যায় সর্ববিষয়ে উন্নত অবস্থা। পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনই নারীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্য যদি কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় এবং নানারকম পেশা অবলম্বন করে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হয়, তবে নারী সে কাজটি করবে। নারী যে পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয় তার প্রমাণ দিতে হবে বলে রোকেয়া গভীর আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাই সকল নারীকে সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জাগরিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন-

> একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও, সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে, এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমাদের দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত: সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক। আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। ... যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জজ সবই হইব! পঞ্চাশ বছর পরে লেডী Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে 'রাণী' করিয়া ফেলিব!![৪৮৮]

নারীকে যেকোন ধরণের বৃত্তি অবলম্বন করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। মেয়েকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বাধীন করে দিতে হবে, তাহলে তারা কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ দক্ষতা প্রদর্শন করে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। ফলে মেয়ে আর সমাজের বোঝা হবে না। অন্যদিকে নারী সমাজের অর্ধেক অংশ। তাই নারী পিছিয়ে থাকলে সমাজের সম্পূর্ণ অগ্রগতি অসম্ভব। এজন্য পুরুষের সাথে নারীকেও সুশিক্ষিত করে কর্মমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। রোকেয়া বলেন, জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁরা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হতে চলেছেন। আমাদের উচিত যে তাদের (পুরুষের) সংসারের এক

[৪৮৭] নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী, "একেই কি বলে অবনতি?", *নবনূর*, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩১১, কলকাতা, পৃ. ৩২৭-৩৩৩ (বাংলা একাডেমি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা)

[৪৮৮] মিসেস আর. এস. হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২১-২২২

গুরুতর বোঝা বিশেষ না হয়ে আমরা সহচরী, সহকর্ম্মিনী, সহধর্ম্মিনী ইত্যাদি হয়ে তাঁদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করার জন্য সৃষ্ট হইনি, একথা নিশ্চিত।[৪৮৯]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর নারীবাদী লেখনীর মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার সমাজে নারীকে কোণঠাসা করে রাখার একটি তীব্র প্রতিবাদ তাঁর রচনার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাই তিনি মেয়েদের জেগে উঠার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের মানসিক শক্তি ও সাহস সঞ্চার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। কঠোর যুক্তির স্বচ্ছতায়, শাণিত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ও বক্তব্যের দ্বিধাহীন স্পষ্টতায় "আমাদের অবনতি" তথা "স্ত্রীজাতির অবনতি" রোকেয়ার একটি বিশিষ্ট রচনা। এমনকি এ দীর্ঘ রচনায় তিনি শিখাগোষ্ঠীর অনেক আগেই মুক্তবুদ্ধির চর্চার নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।[৪৯০]

নবনূর পত্রিকায় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তৎকালীন সমাজে নারীর করুণ হৃদয়ের বেদনাবিধূর কথোপকথন নিয়ে একটি কবিতা রচনা করেন। এখানে দু'জন নারীর দুঃখ দুর্দশার এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে ওঠে। যার মাধ্যমে সে সময়ে নারীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে-

নলিনী। দুর্ব্বল হৃদয় পারে না বহিতে
দারুণ যন্ত্রণা হেন;
জীবন সর্ব্বস্ব হারা' য়েছি যদি
পরাণ যায় না কেন?
শরীর পিঞ্জরে এ প্রাণ-বিহগ
থাকিতে চাহে না আর।
এস মৃত্যু! ত্বরা কর বিদুরিত
দুঃসহ জীবন-ভার।

---

৪৮৯ *ঐ*, পৃ. ২২১-২২২

৪৯০ Sibnarayan Ray, "The Shikha (1927-32) Movement : A Note on the Bangali Muslim Intellizentsia in Search of Modernity, The Radical Humanist", Delhi, December, 1977, pp. 10-15; উদ্ধৃত, মুহম্মদ শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬

কুমুদ। সখি! কি অপুর্ব্ব শোভা স্বভাবের

দেখ দেখি-খোল আঁখি।

নলিনী। দেখেছি অনেক কি দেখিব আর-

এখন মরণ বাকি। ...[৪৯১]

রোকেয়ার নারী জাগরণী সুতীক্ষ্ম বক্তব্য উপস্থাপন *মতিচূর*, প্রথম খণ্ডের "অর্ধাঙ্গী" প্রবন্ধেও লক্ষণীয় নারী অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি মেয়েদের সংকীর্ণ মনোভাব ও গোঁড়ামির কথাও তিনি প্রসন্নচিত্তে উল্লেখ করেছেন। এককথায় রোকেয়া পুরুষ সমাজের চিত্র অংকনে যেমন তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি তিনি নারীসমাজের নিরপেক্ষ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি "অর্ধাঙ্গী"তে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এবং যুক্তিসম্মতভাবে মানবজীবনকে দ্বিচক্র শকটের (দুই চাকার গাড়ি) সাথে তুলনা করে বলেন, দ্বিচক্র শকটের একচক্র (পতি) বড় এবং অন্যচক্র (পত্নী) ছোট হলে সে শকট বেশিদূরে অগ্রসর হতে পারে না। তাই উভয় চাকা (নারী-পুরুষ) সমান হওয়া জরুরি। এই সমতা থাকলেই শকট যেমন সুন্দরভাবে দ্রুত চলতে পারে তেমনি নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা থাকলে সমাজও সুন্দরভাবে চলতে পারে। কিন্তু সমাজে নারী-পুরুষ সমতার বড় অভাব পরিদৃষ্ট হয়। তাই নারী পুরুষের কর্মকাণ্ডের ব্যবধানকে কটাক্ষ করে তিনি উল্লেখ করেন,

> স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনার সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন। সূর্য্যমণ্ডলের ঘনফল, তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন। বলি! জ্যেতির্বেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে আপনার সহধর্ম্মিণী কই? বোধ হয়, গৃহিনী যদি আপনার সঙ্গে সূর্য্যমণ্ডলে যান, তবে তথায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবেন! তবে সেখানে গৃহিণী না যাওয়ায় ভাল!![৪৯২]

---

[৪৯১] মিসেস আর. এস. হোসেন, 'নলিনী ও কুমুদ', *নবনূর*, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১১, পৃ. ১২৬-১২৭

[৪৯২] রোকেয়া, "অর্দ্ধাঙ্গী", আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

ধর্মের নামে তৎকালীন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জগতের ধারণা ও চিন্তা-চেতনা রোকেয়াকে প্রভাবিত করেছিল- পুরুষ যে নারীর উপর প্রভুত্ব করছে এবং নারীর তা সহ্য করা উচিত নয় সে সম্পর্কে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। আবার মুসলিম উত্তরাধিকার আইনকে কার্যত ফাঁকি দিয়ে পুরুষসমাজ নারীকে তার নায্য প্রাপ্য পিতৃ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছে এ সত্যটিও তিনি "অর্ধাঙ্গী"তে তুলে ধরেছেন। ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকারসমূহ তিনি স্পষ্টভাবে আলোচনা করে অভিযোগ করেন যে, মুসলমান সমাজ ধর্মীয় অনুশাসন ভঙ্গ করে নারীকে পার্থিব ও অপার্থিব সকল অধিকার ও সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করে রেখেছে। রোকেয়া বলেন, মুসলমানদের মতে আমরা পুরুষের 'অর্ধেক' অর্থাৎ দু'জন নারী একজন পুরুষের সমতুল্য। অথবা দু'টি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হলে আমরা 'আড়াইজন' হই! আপনারা 'মুহম্মদীয় আইনে' দেখতে পাবেন যে বিধান আছে, পিতার সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা কোন ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি ভাগ করা দেখেন, কিংবা জমিদারি পরিদর্শন করতে যান, তবে দেখবেন কার্যতঃ কন্যার ভাগে শূণ্য কিংবা যৎসামান্য জমির অংশ পড়ছে। অন্যদিকে অপার্থিব সম্পত্তি যেমন- পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি। এখানেও পক্ষপাতিত্বের মাত্রা বেশি। অর্থাৎ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্ধেক মেয়েরা পায় না। যে পিতা পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দু'জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন না। আবার ছেলেদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও, মেয়েদের বিদ্যালয় খুঁজে পাওয়াই যায় না।[৪৯৩]

রোকেয়া মেয়েদের কল্যাণ কামনা করেন। তিনি অন্যায়ভাবে ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করে নারীকে বাইরের জগতে বের করতে চান না। মানসিক উন্নতি করতে হলে নিজ নিজ ধর্ম ও সমাজ রক্ষা করেও মনকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। নারী যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হয়েছে, তা বুঝতে হবে। অন্যদিকে পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য প্রয়োজন ছেলেদের ন্যায় মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বিশ্বাস করেন বাংলার মেয়েরা শিক্ষার অভাবে পিছিয়ে পড়ছে। কারণ সমাজই মেয়েদেরকে পুরুষের ন্যায় সমান সুযোগ সুবিধা দেয়নি বলে তিনি আক্ষেপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন-

> আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি। তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি এবং নিজেকে অতিতুচ্ছ

---

[৪৯৩] ঐ, পৃ. ২৯-৩০

> মনে করি। অনেক সময় "হাজার হোক ব্যাটা ছেলে!" বলিয়া ব্যাটা ছেলেদের দোষ ক্ষমা করিয়া অন্যায় প্রশংসা করি।[৪৯৪]

রোকেয়া মেয়েদের কল্যাণ কামনা করেন। তিনি মেয়েদের ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করে তাঁদেরকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বের করতে চাননি। কেননা মানসিক উন্নতি করতে হলে হিন্দু বা খ্রিস্টানকে ধর্ম ছাড়তে হবে এমন কোন কথা নেই। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করেও মনকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হয়েছি, তাই তিনি বুঝাতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে পুরুষগণ আমাদেকে সুশিক্ষা হতে পশ্চাৎপদ রেখেছে বলে আমরা অকর্মন্য হয়ে গেছি।[৪৯৫] রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মানবজাতির অর্ধেক অঙ্গ নারীসমাজকে 'অচেতন' না হয়ে জ্ঞানের আলোকে সচেতন এবং আপনবুদ্ধিতে বলীয়ান হয়ে স্বাধীন হতে আহবান করেছেন। সে আহবানকে নারীসমাজের অন্ধকার মনের আবদ্ধ কুঠুরিতে প্রবেশ করানোর সাধনায় তিনি সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন। শুধু আচ্ছন্ন বুদ্ধি নিয়ে পুরুষের হাতের পুতুলের মতো হয়ে বাঁচার মধ্যে নারী জীবনের যে অর্থহীনতা এবং অসারতা নিহিত রয়েছে সে সত্যটি সমাজের নারী-পুরুষ উভয়কে অবহিত করানোর চেষ্টা করেছেন।

শিক্ষার মাধ্যমে মানব আত্মার বিকাশ ঘটে, নারীআত্মার বিকাশে শিক্ষা জরুরি। "সুগৃহিণী" প্রবন্ধে রোকেয়া মেয়েদের সুগৃহিনী হওয়ার জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে তিনি নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, নারীসমাজের বর্তমান অনুন্নত ও অনগ্রসর অবস্থার কারণ সুশিক্ষা লাভে পুরুষের ন্যায় সমান সুযোগ সুবিধার অভাব। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অসীম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

> আজি আমি জিজ্ঞাসা করি আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? বোধ হয় আপনারা সমস্বরে বলিবেন "সুগৃহিণী হওয়া।" ... আপনারা সুগৃহিণী হইতে হইলে যে গুণের আবশ্যক, তাহা শিক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনাদের অনেকেই প্রকৃত সুগৃহিণী হইতে পারেন নাই। কারণ আমাদের যে বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা আমরা লাভ করিতে পারি নাই। সমাজ আমাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করা অনাবশ্যক মনে করে। পুরুষ

---

[৪৯৪] ঐ, পৃ. ৩১

[৪৯৫] ঐ, পৃ. ৩২

> বিদ্যালাভ করেন অন্ন উপার্জ্জনের আশায় ... যেহেতু আমাদিগকে অন্নচিন্তা করিতে হয় না, সম্পত্তি রক্ষার্থে মোকাদ্দমা করিতে হয় না, চাকরিলাভের জন্য সার্টিফিকেট ভিক্ষা করিতে হয় না। "নবাব", "রাজা" উপাধি লাভের জন্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খোসামোদ করিতে হয় না, কিংবা কোন সময়ে দেশ রক্ষার্থে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে না। তবে আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ (অথবা mental culture) করিব কিসের জন্য? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (mental culture) আবশ্যক।[৪৯৬]

রোকেয়া নারীর জন্য এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যাশা করেন যেখানে নারীসুলভ সীমাবদ্ধতা থাকবে না। তৎকালে অনেকের ধারণা ছিল, সব ধরণের বিদ্যা মেয়েদের প্রয়োজন নেই। রোকেয়া মনে করেন সকল শিক্ষাতেই মেয়েদের সমান অধিকার রয়েছে। তিনি বিজ্ঞান, সংগীত, চিত্রকলা, কবিতা রচনা- সকল বিষয়কেই নারীশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। গৃহ পরিচালনার জন্যই কেবল শিক্ষার প্রয়োজন তা নয়, সন্তানের লালন-পালন সুষ্ঠু হওয়ার জন্যও মাকে শিক্ষিত হতে হয়- এ সত্যটি রোকেয়া সমাজের কাছে তুলে ধরেন। কেননা শিশু মাতার রোগ, দোষ, গুণ, সংস্কার সকল বিষয়েরই উত্তরাধিকারী হয়। ইতিহাসে যত মহৎ লোকের নাম শোনা যায় তাঁরা প্রায় সকলেই সুমাতার পুত্র ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, মাতা ইচ্ছা করলে শিশু হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করে তাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করতে পারেন। সন্তান পালনের জন্য বিদ্যা বুদ্ধি চাই, যেহেতু মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী।[৪৯৭] রোকেয়া মনে করেন, নারীকে সুগৃহিণী হতে হলে নিজের ঘরের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য স্বামীর আয় অনুযায়ী ঘর সাজাতে হয়। স্বামীর পরিবারের সকলকে নিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী পরিবার গড়ে তোলার জন্য নারীর ভূমিকা অপরিসীম। আর এজন্য নারীকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা উচিত। তাই সুগৃহিণী হওয়া যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রীলোকের জন্য সুশিক্ষার আয়োজন করা উচিত।

মতিচূর, প্রথম খণ্ডের "বোরকা" প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন পর্দা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, পর্দা অর্থে আমরা বুঝি গোপন করা বা হওয়া, শরীর ঢাকা ইত্যাদি। কেবল অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে থাকা নয়। অন্যদিকে ভালমত শরীর আবৃত না করাকেই 'বেপর্দা' বলে। যাঁরা ঘরের মধ্যে চাকরদের সম্মুখে অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তারা অপেক্ষা

[৪৯৬] রোকেয়া, "সুগৃহিণী", আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩

[৪৯৭] *ঐ*, পৃ. ৩৮-৩৯

যারা ভালমত পোশাক পরে মাঠে বা বাজারে বের হন, তাঁদের পর্দা বেশি রক্ষা পায়।[৪৯৮] রোকেয়া পর্দা এবং অবরোধকে সমার্থক মনে করেননি। তাঁর মতে, পর্দার দোহাই দিয়ে আমাদের দেশে অবরোধপ্রথা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর দ্বারা মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়ছে। এ প্রবন্ধে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রোকেয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন, প্রয়োজনীয় পর্দা রক্ষা করে মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারে। সেক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহিলা পরীক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন,

> এদেশে আমাদের অবরোধপ্রথাটা বেশি কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকদের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন। যখন কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবম বর্ষয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এইভাবে সর্ব্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। যেহেতু খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ব্যতীত তাহারা অন্য কাহাকেও দেখিতে পায় না। তবে শিখিবে কাহার নিকট?[৪৯৯]

"বোরকা" প্রবন্ধেও তিনি বাংলার মেয়েদের পরাধীনতার জন্য অশিক্ষাকে দায়ী করেছেন। একইভাবে এক্ষেত্রে তিনি পুরুষের অবহেলা ও অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার জন্য পুরুষ সমাজকে দায়ী করেন। পাশাপাশি পুরুষসমাজ নারীশিক্ষার গুরুত্ব একটু একটু করে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে বলেও তিনি স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন, শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হয়ে, অযোগ্য হয়েছি বলে স্বাধীনতা হারিয়েছি। অদূরদর্শী পুরুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদেরকে শিক্ষা হতে বঞ্চিত রাখতেন। অবশ্য এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝতে পারছেন যে, এতে তাদের ক্ষতি ও অবনতি হচ্ছে। তাই তাঁরা জেগে উঠতে ও উঠাতে ব্যস্ত হয়েছেন।[৫০০]

তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য সমাজের পুরুষের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন। মেয়েরা যেসব দামী দামী স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত অলংকার পরে, সে অর্থ তারা নারীশিক্ষার প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে। মানসিক সুখের জন্য অলংকার নয় বরং বিদ্যা জরুরি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভ্রাতাদের কাছে নিবেদন- তাঁরা যে টাকা খরচ করে কন্যাকে জড়োয়া স্বর্ণ মুক্তার অলংকারে সজ্জিত করেন ঐ টাকা দ্বারা তাদেরকে

---

[৪৯৮] মিসেস আর. এস. হোসেন, "বোরকা", *নবনূর*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১১, পৃ. ১৬

[৪৯৯] *ঐ*, পৃ. ১৯

[৫০০] *ঐ*, পৃ. ২০

জ্ঞান-ভূষণে অলংকৃত করার চেষ্টা করবেন। একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশটি অলংকার পরলে তার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএব শরীর শোভন অলংকার ছেড়ে জ্ঞান-ভূষণ লাভের জন্য মেয়েদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্চনীয়।[৫০১] কারণ বিদ্যা অমূল্য অলংকার যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। নষ্ট হয়ে নিঃশেষ হয়েও যায় না। বিদ্যা অক্ষয় অমূল্য মহাধন যা টাকা দিয়েও কেনা যায় না, শুধু অর্জন করতে হয়। বিদ্যা প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন,

> চোরে নাহি নিতে পারে করিয়া হরণ-
>
> জ্ঞাতি নাহি নিতে পারে করিয়া বন্টন,
>
> দান কৈলে ক্ষয় নাহি হয় কদাচন,
>
> এ কারণে বলে লোকে বিদ্যা মহাধন।
>
> ...
>
> অনলে না পারে ইহা করিতে দহন,
>
> সলিলে না পারে ইহা করিতে মগন,
>
> অনন্ত অক্ষয় ইহা অমূল্য রতন,
>
> এই ভুষা সঙ্গে থাকে যাবত জীবন।
>
> তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা "জেনানা স্কুলের" আয়োজন করা হউক।[৫০২]

এ প্রবন্ধের শেষের দিকে রোকেয়া নারীশিক্ষার অপ্রতুলতার জন্য শুধু পর্দা নয় বরং শিক্ষয়িত্রীর অভাব ও মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘাটতির কথা উল্লেখ করেন। তাই তিনি বলেন, পর্দা কিন্তু শিক্ষার পথে কাটা হয়ে দাঁড়ায়নি। এখন আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব আছে। এ অভাবটি পূরণ হলে এবং স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে যথাযথ পর্দা রক্ষা করেও মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারবে।[৫০৩] এভাবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন "বোরকা" প্রবন্ধে মেয়েদের পর্দার আবশ্যকতা স্বীকার করলেও অবরোধপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি ইসলাম ধর্মের নামে পর্দার দোহাই দিয়ে মেয়েদের ঘরের

---

[৫০১] ঐ

[৫০২] ঐ, পৃ. ২১

[৫০৩] ঐ, পৃ. ২৩

কোণে বন্দি করে রাখার বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন শিক্ষার অভাবই নারী জাতির দুর্দশাগ্রস্থতার জন্য দায়ী। এজন্য তিনি মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান এবং এ বিষয়ে পুরুষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা কামনা করেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে রোকেয়ার এসকল চিন্তাভাবনা ছিল নির্ভীক এবং সুদূরপ্রসারী।

মতিচূর, প্রথম খণ্ডের সপ্তম এবং সর্বশেষ প্রবন্ধ "গৃহ"। এ প্রবন্ধে রোকেয়া গৃহসুখ বঞ্চিত এবং পুরুষ অভিভাবকদের ছত্রছায়ায় অসহায় নারীর দুঃখ ও অবমাননাকর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। বাংলার পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গৃহকে শুধু পুরুষের সম্পদ বলে মনে করা হয়, যেখানে বাহ্যত নারীর কোন অধিকার নেই, তিনি সেকথাই তুলে ধরেছেন। অথচ নারী সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই গৃহে শ্রম দেয়। এমনকি পিতার গৃহেও যে নারীর অধিকার থাকে না। সে কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,

> "মহম্মদীয় আইন" অনুসারে আমরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হই- "আমাদের বাড়ি"ও হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, বাড়ীর প্রকৃত কর্ত্তা স্বামী, পুত্র, জামাতা, দেবর ইত্যাদি হন। তাঁহাদের অভাবে বড় আমলা বা নায়েবটি বাড়ির মালিক! গৃহ কর্ত্রীটি ঐ নায়েবের ক্রীড়া পুতুলমাত্র। নায়েব কর্ত্রীকে যাহা বুঝায়, অবোধ নিরক্ষর কর্ত্রী তাহাই বুঝেন।[৫০৪]

'মহম্মদীয় আইন' এ প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ থেকে কিভাবে নানারকম অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে কন্যাকে বঞ্চিত করা হয় তা "গৃহ" প্রবন্ধে রোকেয়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং দেখা যায় পুরুষ শাসিত সমাজে নারী অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হচ্ছে এবং কোন না কোনভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে অতি মানবেতর জীবনযাপন করছে। এ অবস্থা থেকে নারীকে উদ্ধার করে আলোর পথ তথা সুন্দর জীবনের পথ প্রদর্শনের জন্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মেয়েদের জাগরিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির অধিকারী একজন যুক্তিবাদী নারী, তাই নিছক শারীরিক শক্তির দোহাই দিয়ে পুরুষজাতি কর্তৃক নারীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন তিনি মেনে নিতে পারেননি।

মতিচূর, প্রথম খণ্ডে রোকেয়ার রচনাবলী যখন প্রথম *নবনূর* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রচণ্ড ক্রোধ ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। তবে অল্প সময়ের মধ্যে উত্তেজনা ও ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হয় এবং এর পরিবর্তে দেখা দেয় দুই পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া। *নবনূর*, ১৩১২ সনের ভাদ্র

---

[৫০৪] রোকেয়া, "গৃহ", আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১

সংখ্যায় *মতিচূর* সম্পর্কে সমালোচনা করে বলা হয়,

> *মতিচূরের* প্রবন্ধগুলি যখন প্রথম *নবনূরে* প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল। এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর গ্রন্থখানি পুনরায় পাঠ করি এবং সেই সময় *মতিচূর* সম্বন্ধে হৃদয়ে একটু অনুকূল ধারণা জন্মে। লেখিকার সকল কথা না হইলেও অনেক কথাই নিরেট সত্য এবং *মতিচূর* প্রকৃত মতিচূরই বটে, ... তাহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। সমাজ সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ দেহে ক্ষত হইতে পারে কিন্তু তদ্দারা সমাজের কোনো ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না, *মতিচূর* রচয়িতী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন ইহাতে যেকোনো সুফল ফলিবে আমরা এমত আশা করিতে পারি না।[৫০৫]

১৯০৫ সালে রোকেয়া রচনা করেন *Sultana's Dream* যা Indian Lady Magazine পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৫০৬] উল্লেখ্য ১৯০৮ সালে *Sultana's Dream* পুস্তকারে প্রকাশিত হয়, এ রচনায় রোকেয়ার স্বপ্নের আদর্শ নারীর চিত্র ফুটে উঠেছে। স্বামী সাখাওয়াত হোসেন দুই দিনের জন্য ভাগলপুরের বাইরে কাজে গেলে এ সময় *Sultana's Dream* রচনা করেন। স্বামী ফিরে এলে রোকেয়া লেখাটি তাকে পড়তে দেন। সাখাওয়াত হোসেন স্ত্রীর রচনাটি পড়ে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করেন, "A Terrible Revenge" (ভয়ংকর প্রতিশোধ)।[৫০৭] ভারত উপমহাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি যে অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা হয়, রোকেয়া সেই অল্প বয়সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে *Sultana's Dream* রচনায় এমন একটি রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন যা যথার্থ অর্থেই নারীর অবদমনের বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর প্রতিশোধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। উল্লেখ্য ভাগলপুরের তদানীন্তন কমিশনার মি. ম্যাকফারসনের নিকট ইংরেজি সংশোধনের জন্য সাখাওয়াত হোসেন স্ত্রীর লেখাটি পাঠালে-এ রচনা দেখে বিস্মিত হয়ে কোন রকম সংশোধন ছাড়াই মন্তব্য করে তিনি বলেন-

---

[৫০৫] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৯৮; উদ্ধৃত, শাহনারা হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

[৫০৬] তাহ্‌মিনা আলম, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তাচেতনার ধারা ও সমাজকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৬৬

[৫০৭] মুহম্মদ শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৫; হাসনা বেগম, *নারীমুক্তি বেগম রোকেয়া এবং অন্যান্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩২

> The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality and they are written in perfect English ... I wonder if she has foretold there the manner in which we may be able to move about in the air at some future time. Her suggestions on this point are most ingenious.[৫০৮]

প্রাঞ্জল ইংরেজিতে রচিত কল্পকাহিনী *Sultana's Dream* এ অবাধ কল্পনাশক্তি দিয়ে রোকেয়া চিত্রিত করেছেন 'নারীস্তান' (নারী রাজ্য) যেখানে লিঙ্গীয় ভূমিকা বাস্তবের বিপরীত।[৫০৯] রোকেয়ার মানসকন্যার একটি স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, নারীস্তানের প্রধান চালিকাশক্তি মহারাণীর (নারী চরিত্র) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ডের বিবরণে। এই মহারাণী শিক্ষিত, সংস্কারমুক্ত, বুদ্ধিমতি, প্রাজ্ঞ, আত্মবিশ্বাসী, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দেশপ্রেমী ও দূরদর্শী। অন্যদিকে কৌশলী, কল্পনাশক্তিতে পরিপূর্ণ ও প্রতিহিংসা বিবর্জিত একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাঁর ধর্ম হলো সত্য ও প্রেমের সাধনা। মানুষের ধর্মের মূল উপাদান সত্যনিষ্ঠ ও কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রতি প্রেম না হয়ে, সকল মানুষের প্রতি প্রেম হলে এ ধরিত্রী যে মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে পারে। সেই বাস্তবতাটিকে নারীস্তানের মহারাণী অন্তর দিয়ে অনুভব করেন।[৫১০]

Sultana's Dream এ রোকেয়া দেখিয়েছেন নারীস্তানে তথাকথিত শারীরিক শক্তিতে দুর্বল নারী, পুরুষের উপর তার মস্তিস্ক বলে, বুদ্ধি দিয়ে প্রভুত্ব করছে এবং পুরুষগণ সেখানে অন্তঃপুরে বন্দি বা আবদ্ধ। এ রাজত্বে কোন অশান্তি নেই। নারীস্তানে দেখা যায় 'মর্দানা'র ('জেনানা'র বিপরীত শব্দ) মধ্যে বাস করে যেসব কাজে দৈহিক শক্তি প্রয়োজন সেসব কাজও নারী সম্পন্ন করে। ভগিনি সারা (কল্পিত নারী চরিত্র) বলেন, 'পুরুষেরাও বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশিক্ষায় নারী অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়। মেয়েরা যে সকল যন্ত্র উদ্ভাবন করে, পুরুষ সেগুলি নির্মাণ করে'।[৫১১] নারীস্তান একটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকবান্ধব রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় নারী সরকার প্রধান, নারী কর্মকর্তা ও নারী কর্মচারিদের নিবিষ্ট পরিচর্যার মাধ্যমে। এখানে তিনি কল্পনা করেছেন- নারীস্তানের নারীবিজ্ঞানীরা মহারাণীর অনুপ্রেরণায় নানা ধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করছে ও বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করছে। নারী বিজ্ঞানীরা সৌরশক্তি প্রয়োগ করে

---

[৫০৮] রোকেয়া, 'সুলতানার স্বপ্ন', আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫০

[৫০৯] Sonia Nishat Amin, *op.cit.*, p. 223

[৫১০] হাসনা হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২

[৫১১] Roquia Sakhawat Hussain, *Sultana's Dream,* S.K. Lahiri & Co, Calcutta, 1908, p. 8

খাদ্য প্রস্তুত করছে, বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরাচ্ছে এবং আলো তৈরি করছে। ঔষধ প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে মহামারী থেকে মানুষকে রক্ষা করছে। প্রবন্ধের একটি জায়গায় রোকেয়া বলেন-

> Womens brains are somewhat quicker than men's. Ten years ago, when the Military Officers called our scientific discoveries 'a sentimental night mare,' Some of the young ladies wanted to say something in reply to those remarks. But both the lady-principals restrained them and said, they should reply, not by word, but by deed, if ever they got the opportunity. And they had not long to wait for the opportunity.[৫১২]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ভারতবর্ষের তথা বাংলার নারীর পশ্চাতপদতা নিয়ে অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন। তাঁর চিন্তা-চেতনার জগতে ঘিরে ছিল বাঙালি সমাজের নারীমুক্তি। তাই তিনি *Sultana's Dream* প্রবন্ধটি শুরু করেছিলেন ঠিক এমন একটি লেখা দিয়ে যা নিম্নরূপ-

> One evening I was lounging in an easy chair in my bed-room and thinking lazily of the condition of Indian womanhood. I am not sure whether I dozed off or not. But, as far as I remember, I was wide awake. I saw the moonlit sky sparking with thousands of diamond-like stars, very distinctly.[৫১৩]

উল্লেখ্য *Sultana's Dream* পরবর্তীকালে রোকেয়া স্বয়ং 'সুলতানার স্বপ্ন' শিরোনামে অনুবাদ করেন। এখানে তিনি বিজ্ঞানের অবিস্মরণীয় উদ্ভাবনের সম্ভাবনার মৌলিক বিষয়গুলি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে কল্পনা করেছেন। অথচ তখন ভারতবর্ষে উড়োজাহাজ তো দূরের কথা[৫১৪], মোটর গাড়িও চালু হয়নি। আবার

---

[৫১২] *Ibid*

[৫১৩] *Ibid*, p. 10

[৫১৪] ১৯০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বিমান উদ্ভাবন করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ সালের ২ ডিসেম্বর রোকেয়া জীবনে প্রথম মুসলমান পাইলটের সাথে তাঁর স্বপ্নের আকাশযানে ভ্রমণ করেন। আকাশ ভ্রমণের এই চাঞ্চল্যকর কাহিনী পরবর্তীতে 'বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল' (সফল স্বপ্ন) নামক রচনায় তিনি বর্ণনা করেন। (মুহাম্মদ শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৫)

সৌরশক্তিরও আবিষ্কার হয়নি। রচনাটিতে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কার নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করার পাশাপাশি বাঙালি সমাজের প্রচলিত অনাচার সম্বন্ধেও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন-

> ... জানেন ভগিনী সারা! সামাজিক বিধি ব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু, তাহারা সমুদয় সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। উড়িতে শিখিবার পূর্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়- তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।[৫১৫]

ফলে দেখা যায় *Sultana's Dream* এ রোকেয়া একদিকে যেমন মেয়েদের রাজ্য পরিচালনাসহ বিভিন্ন গুণাগুণ, এমনকি মেয়েদের দ্বারা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথা কল্পনা করেছেন, পাশাপাশি বাংলার সমাজে নারী অগ্রগতিতে পুরুষতান্ত্রিক প্রথার বিরোধিতার বিষয়টিও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' সম্পর্কে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* পত্রিকায় বলা হয়, "এই ছোট গল্পটি ইংরেজিতে লিখিত। 'মতিচূর' রচয়িত্রীকে আমরা বাংলা সাহিত্যের একজন সুনিপুণ লেখিকা বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু এমন সরল সুন্দর ইংরেজিও যে তিনি লিখিতে পারেন, তাহা জানা ছিল না। গল্পটি খুবই কৌতুকাবহ। সংসারে নারী যে পুরুষের প্রাধান্য না মানিয়াও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, এমনকি বিদেশির আক্রমণ হইতে স্বদেশের গৌরব রক্ষা করিতে পারে, তাহাই লেখিকা সুনিপুণভাবে দেখাইয়াছেন"।[৫১৬]

রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'র বিষয়ে বিরোধী মন্তব্যও পাওয়া যায়। মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪) তাঁর *বঙ্গ বীরঙ্গণা* কাব্যে (১৯০৬) রোকেয়ার স্বপ্নের নারীস্তানে, নারী কর্তৃক মানসিক শক্তি দিয়ে পুরুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের বিষয়টিকে বিদ্রুপ করেছেন।[৫১৭] সীমিত অর্থে এমন সমালোচনা থাকলেও *Sultana's Dream* ছিল রোকেয়ার অতুলনীয় সৃষ্টি। এখানে তিনি মেয়েদের নিয়ে যে অকল্পনীয় স্বপ্ন দেখেছেন তার বাস্তব প্রতিফলন কয়েক দশক পরেই লক্ষণীয় তাই 'সুলতানার স্বপ্ন' সম্পর্কে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের দিশারী আবুল হুসেন যথার্থভাবেই বলতে পেরেছিলেন যে, "এই রচনা নারীকে

---

[৫১৫] রোকেয়া, 'সুলতানার স্বপ্ন', আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫

[৫১৬] 'গ্রন্থ পরিচয়' *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, মাঘ, ১৩২৮; উদ্ধৃত, মুহম্মদ শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭০

[৫১৭] মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ. ১৩৭-১৩৮

তার অপরিসীম ক্ষমতা সম্পর্কে আস্থাবান করে তুলবে”।[৫১৮] বিশ শতকে বাঙালি নারী জাগরণে *Sultana's Dream* নিঃসন্দেহে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে।

১৯১২ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের একমাত্র উপন্যাস *পদ্মরাগ* রচিত হয় যা **১৯২৪** সালে প্রকাশিত হয়। এখানে নারীজাতির মুক্তির অন্যতম পন্থা অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা একজন ব্যক্তিত্বশীল, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও বলিষ্ঠ নারী চরিত্র। সাহসী নারী সিদ্দিকা পুরুষশাসিত সমাজের কাছে ন্যায় বিচার লাভে ব্যর্থ হয়ে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলে, “আমি আজীবন নারীজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিব। ... আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে, সংসার ধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে”।[৫১৯] সিদ্দিকা নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজ চেষ্টায় ও যোগ্যতায় মুক্তিকামী সকল নারীর এক আদর্শ পথ প্রদর্শক হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসে রোকেয়া ‘তারিণীভবন’ নামক এক আশ্রমের বর্ণনা দেন। রোকেয়া নিজ আত্মীয়দের প্রতারণা, স্বার্থান্বেষীদের প্রতিরোধ ও স্বজনদের অনিচ্ছার মুখে ‘তারিণীভবন’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা একাধারে একটি বিদ্যালয়, নারী ক্লেশ নিবারণী সমিতি ও বিধবা আশ্রম। এটি সকল ধর্মের অসহায় নারীর আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

সিদ্দিকার বিয়ে ঠিক হয় লতিফ আলমাসের সাথে। কিন্তু লতিফের পরিবার অর্থের লোভে অন্য মেয়ের সাথে তাকে বিয়ে দিলে সিদ্দিকা আশাহত হয়ে চলে যায় তারিণীভবনে। এখানে সিদ্দিকা নানা ধরণের সেবামূলক কাজ করে এবং ইংরেজি টাইপ শিখে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে একটি চাকুরী করে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়। বেশ অনেকদিন পর লতিফের সঙ্গে সিদ্দিকার দেখা হয়। ইতোমধ্যে লতিফ এর স্ত্রী সালেহা একটি পুত্রসন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। লতিফ আত্মপ্রত্যয়ী সিদ্দিকাকে স্ত্রীর মর্যাদায় ফিরিয়ে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলে সে এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। সিদ্দিকা আত্মমর্যাদাবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বলে, “আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করবে, আর যখন ইচ্ছা গ্রহণ করবে। পুরুষ পদাঘাত করবে আর নারী তাদের পদলেহন করবে, সেদিন আর নেই”।[৫২০] দৃঢ়চেতা সিদ্দিকা অন্যের করুণার পাত্র হয়ে জীবন কাটাতে চায়নি। সিদ্দিকাকে পদ্মরাগ মানিক্যের মতো মনে হওয়ায় তারিণীভবন নির্মাতা ব্যারিস্টার তারিণীচরণ সেনের

[৫১৮] মফিদুল হক, *নারী মুক্তির পথিকৃৎ*, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১২

[৫১৯] মিসেস আর. এস হোসেন, *পদ্মরাগ*, আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫২-৪৫৩

[৫২০] ঐ, পৃ. ৩৬৬

বিধবাপত্নী দীন তারিণী তাকে ‘পদ্মরাগ’ নামকরণ করেন।[৫২১] সিদ্দিকার আত্মপ্রত্যয়ের ভিত হলো শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং তারিণীভবনের অভিজ্ঞতা। সিদ্দিকা নিঃসন্দেহে রোকেয়ার মানসকন্যা, যার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্মপ্রত্যয়ের প্রভাব বলিষ্ঠ হয়ে ফুঠে উঠেছে। পুরুষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বনির্ভর ও স্বাধীন জীবনই নারী জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সংবাদটি সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন রোকেয়া *পদ্মরাগ* এর মাধ্যমে। তাই বলা যায়, বাংলায় নারী জাগরণে রোকেয়ার *পদ্মরাগ* এক অনন্য সৃষ্টি।

রোকেয়ার নারীবাদী রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম *অবরোধবাসিনী*। এ গ্রন্থে ৪৭টি অবরোধ সম্পর্কিত দুর্ঘটনার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তিনি গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন- “কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্যঘটনার হাসি-কান্না লইয়া ‘অবরোধবাসিনী’ রচিত হইল”।[৫২২] দীর্ঘদিন ধরে বাংলার সমাজে প্রচলিত নারীর জন্য বাধ্যতামূলক অবরোধপ্রথার বিষয়ে রোকেয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। এজন্য তিনি উল্লেখ করেন, আমরা বহুকাল হতে অবরোধে থেকে থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলার আমাদের বিশেষতঃ আমার কিছু নেই। মেছোনীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, পচা মাছের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ? সে কি উত্তর দিবে?[৫২৩] রোকেয়া *অবরোধবাসিনী গ্রন্থে*র শুরুতে গোটা ভারতবর্ষের মেয়েদের অবরোধের অবস্থা বর্ণনায় বলেন,

> ... বলিয়া রাখা আবশ্যক যে গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষের বিরুদ্ধে নহে, মেয়ে মানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিত বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বাড়ীর চাকরাণী ব্যতিত অপর কোন স্ত্রীলোকে দেখিতে পায় না। ... যিনি যত বেশি পর্দ্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশি পেঁচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই ততবেশি শরীফ।[৫২৪]

ঠিক এরূপ একটা পরিবেশের বিপরীতে রোকেয়া বলতে চেয়েছেন, অবরোধপ্রথার সংস্কারটি এমন গভীরভাবে সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে যে নারী ভুলেই বসে আছে তারা কিরূপ অমানবিক অবস্থার মধ্যে অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় পরিপূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় মতে পর্দার অনুসরণ করেন রোকেয়া।

---

[৫২১] ঐ, পৃ. ৪৫২

[৫২২] রোকেয়া, *অবরোধবাসিনী*, আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮১

[৫২৩] ঐ, পৃ. ৩৮৫

[৫২৪] ঐ, পৃ. ৩৮৬

তিনি "ভারতীয় পর্দার প্রকারান্তে 'সামাজিক পর্দার' কঠোরতার অবসান চেয়েছেন"।[৫২৫] কেননা নারীকে গৃহে আবদ্ধ করে রেখে কোনো সমাজপ্রগতির বার্তা সূচিত হতে পারে না। সমাজ নারী পুরুষের যৌথ ব্যবস্থায় চলে। পুরুষ তার পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতায় এ ব্যবস্থাকে অনেক বেশি আধিপত্যের জায়গা থেকে দেখে নারীকে দমন করেছে নানাভাবে। এতে সমাজের অগ্রগতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই অবরোধপ্রথা থেকে নারীর মুক্তি ছিলো অপরিহার্য।[৫২৬]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উল্লেখ করেন তাঁর নিজের মা অবরোধপ্রথার একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। যিনি পাঁচ বছর বয়স হলে কন্যা রোকেয়ার জন্যও কঠোর অবরোধের ব্যবস্থা করেন। শুধু পুরুষের নয়, নারীর দৃষ্টি থেকেও তিনি অবরুদ্ধ থাকতেন। নিজের ছেলেবেলার সেই করুণ কাহিনীও বর্ণনা করেছেন *অবরোধবাসিনীতে*। সত্যিকারঅর্থে *অবরোধবাসিনী*র ঘটনাবলী তৎকালীন ভারতবর্ষ তথা বাংলার সমাজে প্রচলিত নারীর করুণ অবস্থার বাস্তবচিত্র। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ *অবরোধবাসিনী*র ভূমিকায় উল্লেখ করেন, "*অবরোধবাসিনী* লিখিয়া লেখিকা আমাদের সমাজের চিন্তাধারার আর একটা দিক খুলিয়া দিয়াছেন। অনেকে বিভিন্ন প্রকার ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু ভারতের অবরোধবাসিনীদের লাঞ্চনার ইতিহাস ইতিপূর্বে আর কেহ লিখেন নাই"।[৫২৭] আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ আরও মন্তব্য করেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'অবরোধবাসিনী' পাঠে ঘুমন্ত জাতির চিন্তা-চক্ষু উন্মীলিত হইবে"।[৫২৮] রোকেয়া অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধে সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রোকেয়ার পূর্বে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে অবরোধকে সাধারণ স্ত্রীলোকের নির্বুদ্ধিতা এবং মূর্খতার কারণ বলে নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু এ গ্রন্থে তিনি নারী স্বাধীনতার ও নারী শিক্ষার বিরোধিতাও করেছেন।[৫২৯] মুক্তবুদ্ধি ও নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রোকেয়া মনে করেন অবরোধপ্রথা থেকে নারীকে মুক্ত করে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে পারলেই সমাজের সার্বিক উন্নতি সম্ভব। তাই *অবরোধবাসিনীকে* এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মহার্ঘ সংযোজন বলে গ্রহণ করা চলে।[৫৩০] এ রচনা বিশ শতকে বাংলার নারীজাগরণকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

---

[৫২৫] মুহম্মদ শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৩-১৮৪

[৫২৬] সেলিনা হোসেন, *সাক্ষাতকার*, ০৪.১২.২০১৭

[৫২৭] Shaista S. Ikramullah, *From Purdah to Parliament,* Oxford University Press, 1963, p. 39

[৫২৮] মুহম্মদ শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৭

[৫২৯] শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদিত), *জানানা মাহ্ফিল বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা ১৯০৪-১৯৩৮*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮, পৃ. ২৫

[৫৩০] আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া*, ঢাকা, ১৮৯৩, পৃ. ৭০; শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৭

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নারী জাগরণী অনেক লেখা ছিল যা পুস্তকাকারে ছাপা হয়নি। এমন একটি প্রবন্ধ "লুকানো রতন"- যেখানে তিনি নিজের বড় বোন করিমুন্নেসা খানমের অপ্রকাশিত প্রতিভা সম্পর্কে লিখেছেন। রোকেয়া বলেন, করিমুন্নেসা খুব ছোটবেলা থেকে বিদ্যানুরাগী ছিলেন। কিন্তু সমাজের চাপে তিনি পড়াশুনা শিখতে পারেননি। করিমুন্নেসা অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছিলেন যার কিছু অংশ বেনামে তৎকালীন নানা পত্রিকায় ছাপা হয়। রোকেয়া উল্লেখ করেন, "সমাজ তাঁহাকে গলাটেপা করিয়া না রাখিলে করিমুন্নেসা সাহেবা দেশের একটি উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন"।[৫৩১]

"নারীর অধিকার" রোকেয়ার সর্বশেষ প্রবন্ধ (অপ্রকাশিত)। ১৯৩২ সালের ৮ ডিসেম্বর রাতে এটি লিখেছিলেন। সমসাময়িককালে নিগৃহীত নারী সমাজের অজ্ঞানতা ও নির্জীবতার বেদনা রোকেয়াকে অস্থির করেছিল। তাঁর লেখার প্রতিটি শব্দে সঞ্চারিত হয়েছে নারীর অধঃপতিত অবস্থার নিদারুণ মর্মবেদনা, তীব্রদাহ ও অস্থিরতা এবং সে সাথে পুরুষ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ। সমাজে পুরুষের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন, আমাদের ধর্মমতে বিয়ে সম্পন্ন হয় পাত্র-পাত্রীর সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুন, বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় এক তরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা? অন্ততঃ এ বিষয়টি তো প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যায়।[৫৩২] অন্যদিকে পুরুষ কর্তৃক নারীর জন্য সুন্দর জীবন ও অধিকার না দেওয়ার দিকে মনোযোগ না থাকলেও বিয়ের কথা শুনলে তারা যে পুলকিত হয়ে ওঠে এ ব্যাপারে রোকেয়া সরস ভাষায় লিখেন-

> বৃদ্ধ পুরুষের বালিকা বিবাহে কত আগ্রহ ও সাধ। সেই সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গে একটি ছড়াও প্রচলিত রয়েছে-
>
> হুকুর হুকুর কাশে বুড়া
> হুকুর হুকুর কাশে।
> নিকার নামে হাসে বুড়া
> ফুকুর ফুকুর হাসে॥[৫৩৩]

---

[৫৩১] রোকেয়া, "লুকানো রতন", আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৩; করিমুন্নেসা সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- Shahanara Hussain, "Karimunnesa Khanam Choudhury-A Notable Bengali Muslim Lady of the 19th century", *The Rajshahi University Studies*, Vol. IX & X, Rajshahi, 1978 and 1979, pp. 63

[৫৩২] রোকেয়া, "নারীর অধিকার", আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৭

[৫৩৩] *ঐ*, পৃ. ২৫৭

উল্লেখ্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উত্তরবঙ্গের রংপুরের সন্তান ছিলেন, তাই অনেক সময় তাঁর লেখনির মধ্যে উত্তরবঙ্গের সমাজের উদাহরণ দিয়েছেন। প্রকৃত অর্থে যা ছিল সমগ্র বাংলার সমাজচিত্র।

১৯১৮ সালে *সওগাত* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় একটি কবিতার মাধ্যমে রোকেয়া মুমূর্ষু জাতিকে জাগরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর কবিতার নাম ছিল 'সওগাত'। এ কবিতায় রোকেয়া বলেন-

জাগো বঙ্গবাসী!
দেখ, কে দুয়ারে
অতি ধীরে ধীরে করে করাঘাত!
ঐ শুন শুন!
. . .
অলস রজনী
এযে পোহাইল
আশার আলোক হাসে দিননাথ।
শিশির সিক্ত
কুসুম তুলিরে
ডালা ভরে নিয়ে এসেছে "সওগাত"।[৫৩৪]

উল্লেখ্য বাংলায় নারীর অধিকার অর্জনের আন্দোলন বিশ শতকের আগেই ব্রাহ্ম এবং হিন্দু মহিলা সমাজে শুরু হয়েছিল। রোকেয়ার সমসাময়িক হিন্দু ও ব্রাহ্ম নারী সাহিত্যিকরা সকল সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের সমালোচনা করেছেন এবং তাঁরা নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেছেন। হিন্দু সমাজে তৎকালে যারা নারীমুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম কামিনী রায় (১৮৩৩-১৯৪৩), স্বর্ণ কুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), মান কুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) এবং সরলাদেবী চৌধুরাণীর (১৮৭২-১৯৪৫) নাম উল্লেখযোগ্য।[৫৩৫] এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে সর্বভারতীর ভিত্তিতে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। ভূপালের নবাব বেগম সুলতান জাহানের নেতৃত্বে ১৯১৩ সালে ভূপালে একটি সর্বভারতীয় মুসলিম মহিলা

---

[৫৩৪] রোকেয়া, 'সওগাত', আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭২

[৫৩৫] এ সকল মহীয়সী নারীর জীবনী ও কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়, *সাহিত্য সাধকচরিতমালা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ২য় খণ্ড (২০১৭), ৫ম খণ্ড (২০১৯) ও ১০ম খণ্ড (২০১৯)

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বাল্যবিবাহ, নারীর উত্তরাধিকার, নারীশিক্ষা, পর্দাপ্রথা প্রভৃতি প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং নানা উপায়ে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। উল্লেখ্য তৎকালে সর্বভারতীর ভিত্তিতে আয়োজিত সকল সমাজ সংস্কার আন্দোলনে রোকেয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম মহিলাগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

রোকেয়া লেখনীর মাধ্যমে যেমন নারী জাগরণ ও আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন তেমনি সমাজকর্মী হিসেবেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সামাজিক নানারকম সমস্যা সমাধানে সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারী জাগরণে সংগঠনের ভূমিকা প্রসঙ্গে রোকেয়ার বক্তব্য নিম্নরূপ-

> শিক্ষিত বোনদের আপন আপন গণ্ডিতে মহিলা সমিতি গঠন দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালবাসা স্থাপন ও মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিশু মঙ্গল, গৃহশিল্পের মূল্য, নারীর মূল্য ও রাষ্ট্রে নারীর সম্বন্ধ প্রভৃতি যদি আলোচনা করা হয়, তাতে নারীর মঙ্গল হবে, আপন অধিকার সম্বন্ধে সে জাগ্রত হবে এবং প্রাপ্ত অধিকারের সদ্ব্যবহার শিখবে।[৫৩৬]

প্রকৃতঅর্থে নারী জাগরণে মেয়েদের একত্রিত করার জন্য সংগঠনের ভূমিকা অপরিসীম। তাই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৯১৬ সালে *আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম* নামে একটি মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, যা *Calcutta Mohamedan Ladies Association* নামেও পরিচিত। এ সমিতির কার্যক্রম ছিল দরিদ্র মেয়েদের শিক্ষা প্রদান, আশ্রয়হীন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কুটির শিল্প স্থাপন, দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মেয়েদের শিশুপালন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞানদান। মুসলমান নারীসমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনই এ সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। *The Mussalman* পত্রিকায় এ সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়,

> Its objects are to promote unity, social intercourse and friendly felling among Mohamedan ladies resident in calcutta by providing them with a common meeting ground, to better the condition of moslem women is general by eradicating pernicious social customs and by diffusing proper and useful knowledge, and to

[৫৩৬] মিসেস এ. আর. নিজাম, "পল্লী নারীজাগরণ", *মাসিক মোহাম্মদী*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ (১৯৩৩), কলকাতা, পৃ. ৫৬০

establish and conduct an industrial school for poor and needy Mohamedan women with a view to qualify them to earn their own livelihood.[৫৩৭]

দীর্ঘকালের সামাজিক কুসংস্কার পরিত্যাগ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে, সমাজে, পারিবারিক জীবনে সকল দিক দিয়ে তাঁরা আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবে- সুগৃহিণী, সুজননী ও সুনাগরিক হয়ে সর্বত্র নিজের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে এটাই *আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের* একমাত্র লক্ষ।[৫৩৮] উল্লেখ্য ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত *বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির* সম্মেলনে রোকেয়া সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এ সম্মেলনে তিনি বাংলার নারীর বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন,

> নারী ও পুরুষ বিরাট সমাজদেহের দুইটি বিভিন্ন অংশ। বহুকাল হইতে পুরুষ নারীকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে। আর নারী কেবল নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। ... সুখের বিষয় এতকাল পরে 'শ্রীকৃষ্ণ' স্বয়ং আমার কিছু ভগিনীদের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাই চারিদিকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবরোধে বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিশেষতঃ মাদ্রাজের মহিলাবৃন্দ সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির পক্ষে অগ্রসর হইয়াছেন। এবার মাদ্রাজের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদে একজন মহিলা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রেঙ্গুনে একজন মহিলা ব্যরিস্টার হইয়াছেন। লেডী ব্যারিস্টার মিস সেরাবজীর নামও সুপরিচিত; কিন্তু মুসলিম নারীর কথা আর কি বলিব?- তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে।[৫৩৯]

ইসলাম ধর্মে কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া ফরজ কিন্তু এ ব্যাপারে মুসলমানরা কেন উদাসীন তা রোকেয়ার বোধগম্য নয়। তাই সমাজে নারীশিক্ষা বিরোধী প্রচলিত ধারণা, অবরোধপ্রথা ও পর্দাপ্রথার বিষয় নিয়ে তিনি উক্ত সম্মেলনের অভিভাষণে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে আলোচনা করেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক উচ্চারণ তৎকালে নারী জাগরণ ও আন্দোলনে সুদূর প্রসারী প্রভাব রেখেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

---

[৫৩৭] *The Mussalman*, Vol. XII, June, 14, 1918, No. 28, p. 7; উদ্ধৃত, তাহ্‌মিনা আলম, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ (১৯০০-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১১২

[৫৩৮] তাহ্‌মিনা আলম, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তাচেতনার ধারা ও সমাজকর্ম, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২

[৫৩৯] 'সভানেত্রী মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অভিভাষণ', *বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি*, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* (স্পেশাল ভলিউম), ৩৮ শরৎ গুপ্ত রোড, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১৭২

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নারী জাগরণী চিন্তা চেতনার অনুপ্রেরণার পশ্চাতে ছিল প্রগতিশীল স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের উৎসাহ। উল্লেখ্য কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সাখাওয়াত হোসেন বিলেতে গমন করেন। ঠিক এসময় সেখানে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন, উচ্চশিক্ষার অধিকার এবং স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার রক্ষার আন্দোলন চলছিল।[৫৪০] পাশ্চাত্য সমাজের নারীমুক্তির ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে ফিরে তিনি স্ত্রী রোকেয়াকে উদ্বুদ্ধ করেন একাজে। তাই স্বামীর অকুণ্ঠ সমর্থনে রোকেয়া যুক্তিসম্মতভাবে ও জোরালোভাবে নারী স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষে সমতার দাবি প্রকাশ করতে পেরেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। অন্যদিকে স্বামীর কর্মসূত্রে নানা জায়গায় ভ্রমণ এবং অবস্থানের সুযোগ পাওয়ায় রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়েছে। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে (কৃষিবিদ্যার পাশাপাশি পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান) *সুলতানার স্বপ্নে* যে অকল্পনীয় দূরদৃষ্টি প্রদর্শন করেছেন সেখানেও কিছুটা স্বামীর প্রভাব থাকতে পারে। রোকেয়া সমসাময়িক নানা পত্র-পত্রিকা (বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু) এবং গ্রন্থ পড়েছেন যা তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। তিনি প্রধান প্রধান ইংরেজি সাহিত্যিক ছাড়াও John Howard Payne (1791-1852), Ellen Hooper (1812-1848) প্রমুখ কবি সাহিত্যিকের রচনার উদ্ধৃতি নিজ রচনায় ব্যবহার করেছেন।[৫৪১] এছাড়া বাঙালি কবি কামিনী রায়, মান কুমারী বসু সহ আরো অনেকের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। তৎকালে Marie Corelli (1855-1924) (মেরি ম্যাকয় নামেও সুপরিচিত) নারীবাদী লেখক ছিলেন। চিরকুমারী মেরি নারীমুক্তি সম্পর্কে তাঁর রচনায় পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহকে জাগিয়ে তোলেন। মেরি রচিত 'The Murder' এর কাহিনী অবলম্বনে রোকেয়া 'ডেলিশিয়া হত্যা' রচনা করেন। এ রচনায় বাঙালি নারীর আত্মসম্মানবোধের চরম অভাবের কথা উঠে এসেছে যা তাদের দুর্গতির কারণ। রোকেয়া বলেন, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ডেলিশিয়া স্বামীকে পরিত্যাগ করে, কিন্তু বাঙালি নারী বার বার পদাঘাত পেয়েও স্বামীর ছত্রছায়ায় অসহায়ের মত থাকতে পছন্দ করে- আর এটাই বাঙালি নারী চরিত্রের দুর্বল দিক।[৫৪২]

সমসাময়িক মেয়েদের তুলনার রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সচেতনতা ছিল অত্যন্ত বেশি। তিনি নারীকে রাজা রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেননি, বরং নারীজাতিকে তিনি আপন শক্তিতে দাঁড়ানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।[৫৪৩] মাত্র ২৩/২৪ বছর বয়সে তিনি

---

[৫৪০] গোলাম মুরশিদ, *নারী প্রগতির একশো বছর রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৪-১৭৫

[৫৪১] *ঐ*, পৃ. ১৭৬

[৫৪২] *ঐ*, পৃ. ১৮৮

[৫৪৩] *ঐ*, পৃ. ১৮৯

১৯০৪ সালে যখন পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের দাবি জানান, তখন এ বিষয়টি ছিল অত্যন্ত অভিনব। কেননা ইতোপূর্বে কতিপয় নারী (জ্ঞান নন্দিনী দেবী, কামিনী সেন, কৃষ্ণাভাবিনী দাস, সরলা দেবী প্রমুখ) বাংলায় নারী জাগরণের কথা বলেছেন এবং নারীশিক্ষার দাবি করেছেন, কিন্তু পুরুষের সাথে সমকক্ষতার দাবি তাঁরা তোলেননি। রোকেয়া প্রথমবারের মত পুরুষের সাথে সমঅধিকার দাবি করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি নারীকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শি করে সুমার্জিত এবং পুর্ণবিকশিত একটি ব্যক্তিতে রূপায়িত করার দাবি তোলেন। উল্লেখ্য এ লক্ষ্যে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে তিনি কোন কোন সময় স্ববিরোধী বক্তব্যও দিয়েছেন। যেমন "বোরকা" প্রবন্ধে পর্দার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, আবার 'অবরোধবাসিনী'তে পর্দার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে রোকেয়া পর্দাপ্রথা এবং অবরোধপ্রথার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান আছে বলে বিশ্বাস করেন। তিনি নারীর মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি নারীর জন্য শুধু ঘরের কাজ, রান্না-বান্না, সন্তান পালন, স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য অলংকার পরে বসে থাকার পক্ষপাতি ছিলেন না, বরং নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করেন। রোকেয়ার মৃত্যুর পর তৎকালীন এলিট শ্রেণি যেভাবে তাঁর প্রশংসা করেছেন তা অবিস্মরণীয়।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বিশ শতকের প্রথম দশক হতে আমৃত্যু মুক্ত মন নিয়ে ইসলামি অনুশাসন ও ঐতিহ্যকে ব্যাখ্যা করে মুসলিম সমাজ যে প্রকৃতপক্ষে নারীকে ইসলাম প্রদত্ত সকল অধিকার হতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে চলেছে এ অমোঘ সত্য নির্ভীকভাবে প্রকাশ করে মুসলিম মেয়েদের নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তিনি অত্যন্ত যুক্তিসহকারে ও বাস্তব চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অনুশাসনের অপব্যাখ্যার প্রভাবে নারীশিক্ষা বিরোধী অবস্থান এবং নারী জাতির সার্বিক অসহায়ত্বের কারণে পুরুষ প্রাধান্যের তীব্র নিন্দা করেছেন। জীবনব্যাপী বিভিন্ন রকম নারীবান্ধব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি নারীমুক্তি ও নারী প্রগতির জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং মুক্ত সমাজের নারী কেমন হবে সে সবের উত্তর তার রচনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনই প্রথম বাঙালি মুসলিম নারী, যিনি নারীর জন্য পুরুষের ন্যায় সমঅধিকার ও সমমর্যাদা লাভের প্রশ্নটি তার লেখনির মাধ্যমে সর্বসমক্ষে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন, যা বাঙালি মুসলমান সমাজের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। প্রখ্যাত উপন্যাসিক E. M. Forster (১৮৭৯-১৯৭০) রোকেয়ার সমসাময়িক উপন্যাসিক Virginia Woolf (১৮৮২-১৯৪১) এর সাহিত্যকর্ম নিয়ে মন্তব্য করেন, "ভার্জিনিয়ার

লেখার সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে নারীমুক্তির চিন্তাভাবনা, তাঁর অন্তরে সর্বদাই ঐ চিন্তা জুড়ে ছিল"।[৫৪৪] ভার্জিনিয়া উলফের চিন্তাভাবনার সাথে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ধ্যান-ধারণার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই বলা যায় কেবল রোকেয়ার সাহিত্যকর্মে নয়, তাঁর অস্তিত্বের সবটুকু জুড়েই ছিল নারীমুক্তির চিন্তাভাবনা। এ কারণেই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে একসঙ্গে নারীমুক্তির প্রতীক এবং নারী জাগরণ ও আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

বিশ শতকের শুরুতে বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সমসাময়িক যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে একজন আজিজুন্নেসা খাতুন (মৃত্যু ১৯৪০)। *ইসলাম প্রচারক* পত্রিকায় ১৯০২ সালে প্রথম তিনি *হাম্‌দ* নামক একটি কবিতা প্রকাশ করেন। এ কবিতাটি সম্ভবত কোন মুসলমান সম্পাদিত (*ইসলাম প্রচারক* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ) সাময়িকীতে প্রকাশিত একজন বাঙালি মুসলমান নারীর প্রথম রচনা। একই বছর *ইসলাম প্রচারক* পত্রিকার মে-জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় আজিজুন্নেসার *না'আত* নামক আরেকটি পদ্য। উল্লেখ্য মুসলমান মহিলা লেখকদের প্রথম পর্যায়ে ব্যাপক উপস্থিতি মাসিক *নবনূর* পত্রিকায় লক্ষণীয় এছাড়া *মাসিক মোহাম্মদী* ও *সওগাত* পত্রিকাও মেয়েদের লেখালেখিতে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়।

আজিজুন্নেসা খাতুন ১৮৮৪ সালে গোল্ড স্মিথ এর *দ্য হারমিট* কাব্য 'উদাসীন' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি *নবনূর* পত্রিকায় তৎকালীন কুলীন মেয়েদের দুরাবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতার মাধ্যমে। যা নিম্নরূপ-

এই কি বঙ্গের হিন্দু- কুলাঙ্গনাগণ?

---

[৫৪৪] ভার্জিনিয়া ১৮৮২ সালে জানুয়ারি মাসে লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্যার লেসলি স্টিফেন (Leslie Stephen) ইংল্যান্ডের একজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ছিলেন। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বড় হওয়া ভার্জিনিয়ার নারীমুক্তি বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম *A Room of One's Own*. তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন- নারীসমাজের পশ্চাৎপদতা এবং অক্ষমতার জন্য দায়ী- সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা। মহিলাদের লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে তাকে অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শক্তিশালী পুরুষের শোষণ এবং কুসংস্কার ও অর্থনৈতিক সমস্যার মত দুর্বার প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে হবে। এ অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপায় হলো: ন্যুনতমপক্ষে একান্ত একটি নিজস্ব কক্ষ- এ কক্ষের চাবিটি তাঁর হাতেই থাকবে এবং কক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে তার স্বাধীনতা থাকবে। অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা নারীকে করে তোলে আত্মপ্রত্যয়হীন তিক্ত ব্যক্তিত্বে; কিংবা পুরুষের হাতের খেলার পুতুলে। তাই মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল হওয়া জরুরি। (E. M Forster, *Virginia Woolf; The Rede Lecture*, Cambridge, 1943; হাসনা বেগম, "ভার্জিনিয়া উলফ ও নারীমুক্তি", *নৈতিকতা নারী ও সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৯০-১০৬)

কুলীনের পত্মী এরা,

জীবনে যৌবনে মরা,

শাস্ত্রে বুঝি ইহাদের শাস্তির বিধান?

...

সুখ-সাধ চিরতরে করি বিসজ্জন,

চিরবাস পিত্রালয়ে

অপার গঞ্জনা স'য়ে

পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে রয়েছে জীবন!

...

অসার জগতে হিন্দু-রমণী জীবন

অবিচার শত শত,

অত্যাচার অবিরত,

রমণী নিগ্রহে কেবা হিন্দুর মতন?

হে ভগ্নি, সকলে মিলি কর অভিযোগ

যথা সে করুণাধার,

সূক্ষ্মতম সুবিচার

অবশ্য পাইবে, যাবে এই দুঃখ-ভোগ;

উদিবে ভারতে পুনঃ সুখ-শান্তি-যুগ।[৫৪৫]

মুক্তবুদ্ধির অধিকারী আজিজুন্নেসা তাঁর কবিতার মাধ্যমে ভারতে তথা বাংলায় প্রচলিত কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন এবং এ প্রথার মাধ্যমে নারী সামাজিকভাবে অত্যাচারিত ও অত্যন্ত গঞ্জনার স্বীকার হতো তার স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। পরিশেষে তিনি নারীকে জাগরিত হয়ে প্রতিবাদ করার আহ্বানও

[৫৪৫] আজিজন্নেসা, *নবনূর*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১১, পৃ. ৪৬

জানিয়েছেন, যেন সমাজ তাদের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। উল্লেখ্য আজিজুন্নেসা বাংলা ভাষার চেয়ে উর্দুতে লিখতে বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন।[৫৪৬] স্বামী মোকাদ্দেসুল হকের মৃত্যুর পর কিশোরী বিধবা আজিজুন্নেসার খুলনার তেতুরিয়ার জমিদার হামিদুল্লাহ খানের সাথে বিবাহ হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য এই স্বামীও তাঁর মারা যায়। ফলে তৃতীয়বারের মত সাতক্ষীরার লুৎফর রহমানের সাথে তাঁর বিয়ে হওয়ার পর আবারও তিনি বিধবা হন। এরপর তিনি নিজ ভাইয়ের গৃহে আশ্রয় নিয়ে বাকী জীবন সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সাহিত্য সাধনায় অতিবাহিত করেন।[৫৪৭]

রোকেয়ার সমসাময়িক আরও কয়েকজন নারী বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নারীজাগরণে ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে অন্যতম খায়রুন্নেসা খাতুন (১৮৭০-১৯১২)। খায়রুন্নেসা পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের (বর্তমান জেলা) অধিবাসী ছিলেন এবং সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন হোসেনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পিতা মুন্সী মেহেরুল্লাহ উনিশ শতকের একজন প্রখ্যাত সমাজ ও ইসলাম সংস্কারক ছিলেন যিনি দ্বিতীয় মেহেরুল্লাহ নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। খায়রুন্নেসা শিক্ষকতার পাশাপাশি সামাজিক সংস্কারের কাজ ও সাহিত্য রচনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি স্বামী আমিরউদ্দিনের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন। উল্লেখ্য তাঁর স্বামী ছিলেন সরকারি চাকুরীজীবী, সাব-রেজিষ্ট্রার। তৎকালীন বাংলার নারী সমাজ যখন অশিক্ষা, অজ্ঞতা, সামাজিক রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছিল, ঠিক এমন সময় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে খায়রুন্নেসা শিক্ষকতার মাধমে নারীশিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখেন, যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। তিনি সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বাঙালি নারীর দুঃখ-দুর্দশার কথা লিখেছেন এবং মেয়েদের জাগরিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। শুধু নারী স্বাধিকার বা সমাজ প্রগতি নয়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও খায়রুন্নেসা অংশ নেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি *নবনূর* পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন, যার মধ্যে অন্যতম "আমাদের শিক্ষার অন্তরায়"। এ প্রবন্ধে তিনি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন,

> বিদ্যাহীন জীবন আর সূর্য্যহীন জগৎ উভয়ই তুল্য। মূর্খ্য ব্যক্তি পশুর সঙ্গেই তুলনীয় হইতে পারে। যে বিদ্যা পুরুষকে সৌন্দর্য্যশালী ও গুণবান করে সে বিদ্যারূপ অলঙ্কারে স্বভাবসুন্দরী নারীজাতির রূপ ও গুণগরিমা বর্দ্ধিত হইবে না; ইহা কোন কথা? চরিত্রবতী রমণী বিদ্যাবতী

---

[৫৪৬] সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১

[৫৪৭] *ঐ*, পৃ. ১৬১

> হইলে মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় আরও সৌন্দর্য্যশালিনী হওয়ার কথাই হবে। ... সুশীলা নারী বিদূষী হইলে সংসারকে অধিকতর সুখময় করিয়া তুলিতে পারেন। পুরুষ ও নারী উভয় জাতিই বিদ্যা শিক্ষা করা যে একান্ত কর্তব্য (ফরজ) তাহা আমাদের হাদিস শরীফেও দেখা যায়; অতএব যেদিক দিয়াই দেখুন না কেন, আমাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করা যে একান্ত কর্তব্য ও আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহের অবসর মাত্র নাই।[৫৪৮]

বিশ শতকের শুরুতে এসে ধনী দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্র সকল শ্রেণির লোকের মধ্যে নারীশিক্ষার যে প্রসার হওয়া দরকার তা নারী পুরুষ উভয়ে চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। তারপরও নারীশিক্ষা কেন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং কি উপায় অবলম্বন করলে সে বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন খায়রুন্নেসা তাঁর প্রবন্ধে। তিনি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখিয়েছেন অবরোধপ্রথা এবং উপযুক্ত স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অভাবকে। দ্বিতীয় কারণ অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। তিনি বলেন, আমাদের বাংলার মুসলমান সমাজ বড়ই দরিদ্র। অনেকে স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করতে অক্ষম। তারা ছেলেদেরই শিক্ষার্থে সামান্য ব্যয় করতে অপারগ; মেয়েদের কথা ত বহু দূরের! একদিকে স্কুলের অভাব, অন্যদিকে আবার অর্থের অভাব। অর্থ যতই অনর্থের মূল হোক না কেন, আজকাল বিনা পয়সায় শিক্ষালাভ করা অসম্ভব। পুস্তক চাই, শ্লেট চাই, কাগজ কলম চাই; এর উপর স্কুলের বেতনতো আছেই।[৫৪৯] খায়রুন্নেসা এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> ... নগরের বিদ্যালয়গুলিতে সচ্চরিত্রা মুসলমান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা চাই; এবং সেই স্কুলগুলি এমন স্থানে ও এমনভাবে স্থাপিত করিতে হইবে যে, তথায় অধ্যয়ন করিতে যাইয়া রমণীগণকে যেন অবরোধ প্রথার মর্যাদা হানি করিতে না হয়, এবং পুরুষ মাত্রেরই স্কুল সীমার মধ্যে প্রবেশাধিকার না থাকে। যে সকল বালিকাদের বাড়ি বা বাসাবাড়ি স্কুলের নিকট হইবে, তাহারা দাসী বা চাকরাণীর সমভিব্যাবহারে অথবা ৪/৫ জন একত্র হইয়া স্কুলে যাইতে পারিবে। যুবতীদিগের পক্ষে প্রকাশ্য স্থান দিয়া পদব্রজে যাতায়াত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া

[৫৪৮] খায়রুন্নেসা খাতুন, "আমাদের শিক্ষার অন্তরায়", *নবনূর*, দ্বিতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১১, পৃ. ৩৬৮ (বাংলা একাডেমি পত্রিকা শাখা)। উল্লেখ্য খায়রুন্নেসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, মো. মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ২০৫-২০৬; মোহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৫; মজিরুদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান মহিলা*, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ১৩১-১৩৩; সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রুন্নেসা খাতুন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩০

[৫৪৯] খায়রুন্নেসা খাতুন, *নবনূর*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৯

> তাহাদের জন্য কোনরূপ যানের বন্দোবস্ত করা চাই। ... বালিকাদিগের উপরেই আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; সুতরাং এখন তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে পারিলেই আমাদের পরম শ্রেয়োলাভ হইতে পারে।[৫৫০]

এরূপ স্কুলের পরিচালনার ব্যয়ভার বহনের জন্য তিনি সমাজের সম্পদশালী লোকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রয়োজনে কয়েকজন মিলে চাঁদা প্রদানের কথাও বলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দেশের ধনাঢ্য ও জমিদার শ্রেণির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং *প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি*র মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন সুসন্তান পেতে চাইলে সুমাতা তৈরি করতে হবে আর সুমাতা সৃষ্টিতে নারীশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খায়রুন্নেসার এ সকল চিন্তাধারা অত্যন্ত উঁচুমানের ছিল যা বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে খায়রুন্নেসার *সতির পতিভক্তি* পুস্তকটি নারী জাগরণে ভূমিকা রাখে, যা ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে অধ্যাপক সোনিয়া নিশাত আমিন বলেন, 'সতীর পতিভক্তি' ছিল ভাল স্ত্রী হওয়ায় উপদেশমূলক নির্দেশিকা।[৫৫১] *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান খায়রুন্নেসার গ্রন্থের যে চরিত্র বিচার করেছেন তাতে লেখিকার অগ্রসর সমাজ চেতনার পরিচয় মেলে। তাঁরা উল্লেখ করেন, এ গ্রন্থে খায়রুন্নেসা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক আনুগত্য ছাড়াও আরো কয়েকটি সামাজিক সূত্র তুলে ধরেন। আর তা হলো- ১. মেয়েদের হীনাবস্থাই সমাজে অধঃপতনের মূল। ২. যে পরিবারের নারী দুঃখ পায় সে পরিবার অতি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ৩. নারী কেবল সন্তানের প্রসূতি নন, সকল সৎকার্যের প্রসূতি ইত্যাদি।[৫৫২]

উল্লিখিত এসব আলোচনা থেকেই খায়রুন্নেসার নারী বিষয়ক ভাবনা এবং সমাজ সচেতনতা প্রকাশ পায়। *সতীর পতিভক্তি* গ্রন্থে তিনি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, নারীর গৌরব তার স্বামীকে মহৎকার্যে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমেই নিহীত।[৫৫৩] ১৯২৩ সালে *সওগাত* পত্রিকায় আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী মুসলমান মেয়েদের লেখালেখির বিষয়ে পর্যালোচনায় খায়রুন্নেসার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রয়াত খায়রুন্নেসা খাতুন *সতীর পতিভক্তি* নামে একটি

---

[৫৫০] *ঐ*, পৃ. ৩৭১

[৫৫১] সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১

[৫৫২] আহমদ রফিক, *নারী প্রগতির চার অনন্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩৩

[৫৫৩] শাহনারা হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯

বই লিখেন, বইটির চতুর্থ সংস্করণ- এর জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।[৫৫৪] সোনিয়া নিশাত আমিন উল্লেখ করেন, খায়রুন্নেসা সম্ভবত প্রথম প্রজন্মের মহিলা লেখকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তার চিন্তার একটি লিখিতরূপ দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে সামান্য যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, আরো বেশকিছু মহিলা এ ধরণের শিক্ষামূলক নির্দেশিকা লিখেছেন। যেমন- এম. কে খাতুনের *স্বামী সোহাগিনী* মুসলমান মহিলাদের জন্য একটি উপদেশমূলক লেখা, ১৯১৪ সালে এটি নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয়।[৫৫৫] প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ না পেলেও খায়রুন্নেসা কালের মানদণ্ডে আধুনিক ছিলেন। তাঁর লেখনী সম্পর্কে খুব বেশি উদ্ধার করা সম্ভব না হলেও যতখানি পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায়, মননশীল লেখার প্রতি খায়রুন্নেসার আগ্রহ ছিল। বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত সকল সমস্যা ছিল তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। তাঁর লেখনীর মধ্যে মেয়েদের জাগরিত করার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। খায়রুন্নেসা যদি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার সুযোগ পেতেন তাহলে বাংলার নারী জাগরণে ও আন্দোলনে আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতেন।

বিশ শতকের প্রথমভাগে আরেকজন নারীর কথা জানা যায়, যার লেখনী বাংলার সমাজকে আন্দোলিত করে। তিনি সিলেট জেলার কুয়ার পাড়ের বাসিন্দা সহিফা বানু (১৮৫০-১৯২৬)। দার্শনিক কবি হাসন রাজার বৈমাত্রেয় ছোট বোন সহিফা বানুর বিয়ে হয় সিলেটের 'আলী আমজাদ এস্টেটের' ম্যানেজার আবদুল ওয়াহেদের সাথে। তিনি স্বামীর বৈষয়িক কাজে সহযোগিতা করতেন, তবে নিঃসন্তান সহিফা বানুর সংসার ও সম্পদের প্রতি মোহ ছিল না। রোকেয়ার সমসাময়িক ছিলেন সহিফা বানু। ফলে স্বভাবিকভাবেই তিনি রোকেয়ার নারী জাগরণী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন। বাংলা, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় পারদর্শী সহিফা বানু সংগীত রচনায় ভূমিকা রাখেন এবং বাউল মরমিবাদের অনুরাগী ছিলেন। তিনি সব সময় ন্যায়ের জন্য ব্যাকুল থাকতেন,

> সহিফায় বলে মন তোর অসার জীবন
>
> প্রাণ থাকিতে ন্যায়ের সঙ্গে না হইল দরশন।[৫৫৬]

---

[৫৫৪] মো. আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, "বঙ্গ সাহিত্যে মুসলিম মহিলা", *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৩, পৃ. ১৭৩; উদ্ধৃত, সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১

[৫৫৫] সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২

[৫৫৬] সালমা হোসেন (সম্পাদিত), *সাহিত্যে মুসলিম নারীদের অবদান*, মেলা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৬৮

অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন বলেন, সহিফা বানু- ১. *ছহিফা সঙ্গীত*, ২. *ইয়াদগারে ছহিফা* ও ৩. *ছাহেবানের জারি* নামক তিনখানি কাব্য রচনা করেন। বর্তমানে এগুলি দুষ্প্রাপ্য। একমাত্র 'ছহিফা সঙ্গীত' *সিলেট সাহিত্য সংসদে* রক্ষিত। বাউল গান রচনায় অনুরাগী সহিফা বানু মারফতি গান রচনা করেন। তাঁর গান ও কবিতায় বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্যণীয়, অন্যদিকে তিনি পীরমুর্শিদে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে আধ্যাত্মিক চিন্তায় মশগুল থাকলেও সহিফা বানু নানা প্রকার সামাজিক সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর দুঃখ বেদনা তাঁকে আলোড়িত করে। তাঁর লেখায় রামায়নের জনমদুঃখিনী সীতাদেবীর জীবনের দুর্দশা চিত্রণের মাধ্যমে পুরুষের দ্বারা নারী নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর সময়ে ঘরে ঘরে অসংখ্য সীতামূর্তি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ধরণীর কোলে আশ্রয় নিয়েছে, নারীর দুঃখে মুনি ঋষি কাঁদলেও পুরুষের দয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে সহিফা বলেন,

> ছহিফায় বলে শুন পুরুষের পাষাণ মন
>
> জন্মের সতি সীতা ছিল, রামে সীতা না চিনিল।[৫৫৭]

নারীর প্রতি সহিফার এ সহানুভূতি নারী জাগরণের নামান্তর বলা যায়। আধুনিক গবেষকরা মনে করেন যে, সহিফা বানু যদি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন না হয়ে তাঁর সকল ধ্যান-জ্ঞান সাহিত্য রচনা ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করতেন তবে তিনি হতেন রোকেয়ার সার্থক উত্তরসূরী। তারপরও সিলেটের মত একটি মফস্বল এলাকায় বসবাস করে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার ক্রান্তিকালীন সময়ে সহিফা বানুর সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও কাব্য রচনা বাংলায় নারী জাগরণে দৃঢ় ভূমিকা রেখেছে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে যাদের তেজোদীপ্ত লেখনী আমাদের গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজকে বিচলিত করে তাদের মধ্যে একজন মিসেস এম. রহমান পারিবারিক নাম মাসুদা খাতুন (১৮৮৫-১৯২৬)। রোকেয়ার সমসাময়িক মিসেস এম. রহমান মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি হুগলীর একটি রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী পিতা খান বাহাদুর মজহারুল আনোয়ার কন্যার উচ্চশিক্ষা বিরোধী ছিলেন। মিসেস এম. রহমান বাল্যকালে লুকিয়ে লুকিয়ে বাংলা, উর্দু এবং আরবি ভাষা শিখেন। মাত্র ১১ বছর বয়সে কলকাতার সাব-রেজিস্ট্রার কাজী মহম্মদুর রহমানের সাথে বিয়ে হয়। শশুরবাড়িতে তিনি লুকিয়ে জ্ঞানচর্চা করতেন, কেননা শশুরবাড়ির পরিবেশও ছিল রক্ষণশীল। মিসেস এম. রহমানের যে সকল রচনা বাংলায় নারী জাগরণে ও আন্দোলনে

---

[৫৫৭] *ঐ*, পৃ. ৬৯

বলিষ্ঠ ভূমিক রাখে তার মধ্যে অন্যতম "পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা"। এটি ছিল তাঁর প্রথম প্রবন্ধ। মুসলমান সমাজে প্রচলিত পর্দাপ্রথা ও নারী অধিকার সম্পর্কে তিনি যুক্তিসম্মতভাবে আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি বলেন,

> ইসলাম আমাদিগকে কারা প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ থাকতে, জড় পুত্তলিকার মত গৃহ-সজ্জার উপকরণ হয়ে থাকতে বলেনি; জ্ঞান লাভ আবশ্য কর্তব্য বলে নির্দ্দেশ করেছে।... আমরা ইসলামের সহযোগিনী, রণাঙ্গনে সঙ্গিনী। খাঁটি মোসলেম যুগে আমরা কবি সাহিত্যিক এমনকি ধর্ম্মোপদেষ্টার পবিত্র আসন পর্য্যন্ত অলঙ্কৃত করেছিলাম, আর আজ আমাদের স্থান অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতালপুরিতে।[৫৫৮]

পর্দা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনা ছিল যে, পর্দা মানে স্ত্রীলোকের হাতের কনুই, পায়ের পাতার উপর চার আঙ্গুল পরিমাণ স্থান ও কপালে চুলের নীচ হতে থুতনি পর্যন্ত খোলা থাকলে বেপর্দা হয় না। এছাড়া সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখতে হবে। হজরত (স.) এর সময় বোরকার প্রচলন ছিল না। একখানা মোটা চাদরও নারী ব্যবহার করতো না। প্রচলিত সাধারণ বেশেই নারীগণ প্রয়োজন মত সকল স্থানে যাতায়াত করতেন। মহানবী (স.) এর সময়ের অনেক পরে বাইরে যাওয়ার সময় ভদ্র মহিলারা চাদর ব্যবহার করতেন। পরবর্তীতে হজরত ওমর ফারুক (রা.) বোরকার প্রচলন করেন।[৫৫৯] মিসেস এম. রহমান প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পর্দা ও সমাজে প্রচলিত থাকা অবরোধপ্রথার পার্থক্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। উল্লেখ্য এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল দৃঢ় এবং সাহসী। সমাজ সমালোচনার ব্যাপারে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল মৌলিক এবং উচ্চকণ্ঠ। তিনি দীপ্ত কন্ঠে উচ্চারণ করেন,

> আমরা চাই আমাদের ইসলাম প্রদত্ত সম্মান স্বাধীনতা, চাই ইসলাম প্রদত্ত অধিকার, চাই আমাদের মধ্যে বিরাট মাতৃত্ব জাগাতে, চাই মঙ্গলসাধিকারূপে পবিত্র ইসলাম ও খেলাফাতের সেবা করতে। কে আমাদের পথরোধ করবে, সমাজরূপী শয়তান? কখনই পারবে না। যুগ-ভেরী-নিনাদে আমাদের ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠেছে। আমাদের সত্য সাড়া দিয়েছে। ... এসো আমার অবহেলিতা উপেক্ষিতা ভগিনীগণ! গর্জ্জে ওঠো ইসলাম সূতা সিংহিনীগণ, জল্লাদি, চণ্ডালী শক্তির মুলোচ্ছেদ করতে প্রতিহিংসারূপে শানিত তরবারি হস্তে এসো! ... শক্তিরূপিণীগণ, শক্তি সঞ্চার কর, মহিমময়ী, বীর্য্যবতী মোসলেম নন্দিনীরূপে জেগে ওঠো,

---

[৫৫৮] মিসেস এম. রহমান, "পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা", *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ. ৬৮

[৫৫৯] *ঐ*, পৃ. ৬৯

> সেবাশীলা দেবীরূপে অভয়বাণী ঘোষণা কর, তপস্বিনী রাবেয়ারূপে ধর্মোপদেশ দান কর। ধীরে ধীরে ফিরে আসবে আমাদের লুপ্ত গৌরব। মহীয়সী জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে বিরাজ করবো সমাজ মন্দিরের শীর্ষ স্থানে।[৫৬০]

মিসেস এম. রহমান এভাবে মেয়েদের জেগে উঠার আহ্বান জানিয়েছেন। দেখা যায় সমাজসংস্কার ও নারীর অধিকার রক্ষায় তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল রোকেয়ার সমতুল্য। তিনি *সহচর* পত্রিকায় নারী জাগরণের লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির নারীর বহুমুখী ভূমিকা উল্লেখ করে আহ্বান করেন,

> নেত্রী স্থানীয়া মাহিলাদের প্রতি সবিনয় নিবেদন, তারা আমাদের হাত ধরে পথ প্রদর্শন করুন। আর্থিক স্বাধীনতা প্রাপ্তা ভাগ্যবতীদের প্রতি সানুনয় মিনতি তাঁরা অর্থব্যয়ে পথ প্রস্তুত করুণ, আর আমাদের অধিকার বঞ্চিতা ভগ্নিদিগকে করজোড়ে অনুরোধ করছি, তোমরা জাগো গো জাগো। জাগিয়ে তোল তোমাদের সুপ্ত শক্তিকে, আজ মহাবিশ্ব মহাজাগরণ, জাগরণী সঙ্গীতের সুর লহরী জাতির মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করছে, এ সুখাদ সময়ে সুদিনের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে না জাগা মহাপাপ। নাগপাশ খুলে, লৌহ নিগড় ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াও সুপ্তা সিংহীগণ; একবার চেয়ে দেখ- কোথায় তোমাদের আসন আর এসে পড়েছ কোথায়? মঙ্গলসাধিকা রূপে জাগো, অভয়দাত্রীদেবী রূপে জাগো, মূর্ত্তিমতী কর্মী রূপে জাগো। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা কর আমরা ছোট নই, দাসী নই, তুচ্ছ নই, পশু নই আমরা মানুষ, মানুষের প্রাপ্য অধিকার আমাদের পেতেই হবে।[৫৬১]

তৎকালে মিসেস এম. রহমানের নারী জাগরণী বা নারীমুক্তির স্বপক্ষে বক্তব্য ও লেখা নিয়ে মুসলিম গোঁড়াপন্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ সকল রক্ষণশীল ব্যক্তিরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কেননা এম. রহমান শুধু পর্দা ও অবরোধপ্রথার বিরুদ্ধেই নয় বরং তিনি *ধূমকেতু* পত্রিকার নারী বিষয়ক কলামে পিতৃতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, বর্তমান সময়ে নারী যতখানি অবমাননাকর অবস্থায় আছে তার জন্য অন্যতম দায়ী সমাজে প্রচলিত পিতৃতন্ত্র। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মিসেস এম. রহমানের বিদ্রোহ ঘোষণা এমনকি তাঁর মানসগঠনেও কাজী নজরুল ইসলাম ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রোকেয়ার সংস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এমনকি তিনি

---

[৫৬০] *ঐ*, পৃ. ৭১

[৫৬১] মিসেস এম. রহমান, "নারীর কথা", *সহচর*, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩০ (১৯২৩), পৃ. ২২৩

রোকেয়ার সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করেছেন।[৫৬২] উল্লেখ্য মিসেস এম. রহমান কাজী নজরুলের *ধুমকেতু* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। কবি তাকে 'মা' সম্বোধন করতেন। সমসাময়িককালে তিনি 'অগ্নিকন্যা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[৫৬৩] এভাবে দেখা যায়, যারা যুগ যুগ ধরে নারীকে তাদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে শিক্ষা দীক্ষায় বঞ্চিত করে রেখে দুর্বল করে তুলেছে, ধর্মের নামে যারা প্রতারণা করেছে, সে সব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মিসেস এম. রহমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকে নারী জাগরণের যে আলোক শিখা তিনি জ্বালিয়েছেন তা বিস্ময়কর।

বিশ শতকে বাংলায় নারী জাগরণে ও নারীমুক্তি আন্দোলনে যেসকল পুরুষ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪)। তিনি ছিলেন নারীমুক্তির একজন বলিষ্ঠ সমর্থক। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও সমসাময়িক নারী যখন মুসলিম নারী জাগরণ ও আন্দোলনের কাজে যুক্ত হয়ে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তখন নাসিরউদ্দীনের উদ্যোগে মুসলিম নারী জাগরণের কাজ পরিচালিত হয় *সওগাত* গোষ্ঠীর মাধ্যমে। ১৯১৮ সালের ২ ডিসেম্বর কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে সর্বপ্রথম মাসিক *সওগাত* প্রকাশ করে মুসলিম গোঁড়াপন্থীদের কাছে তাঁকে যথেষ্ট নাজেহাল হতে হয়েছিল। উল্লেখ্য প্রথম সংখ্যা সওগাতে প্রথম লেখাটি ছিল রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'সওগাত' শীর্ষক একটি কবিতা, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তৎকালীন সমাজের সমালোচনার তোয়াক্কা না করে তাঁর দৃঢ়চেতা মনোবলের পরিচয় দেন 'মহিলা সওগাত' (১৩৩৬, প্রথম সংখ্যা) প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বলা বাহুল্য তৎকালে ভারত তথা এশিয়ার কোন সাময়িকপত্রের ইতিহাসে বিশেষ মহিলা সংখ্যা ছাপা হয়েছে বলে জানা যায়নি। আমি নিজের অন্তর থেকে অনুভব করেছিলাম এরূপ প্রকাশনার দ্বারা আমাদের মহিলারা বিশেষ উৎসাহিত হবেন এবং ক্রমে তাদের চিন্তাধারাও বিকাশ লাভ করবে।"[৫৬৪] শুধু নারী লেখকদের (৩০ জন) লেখা নিয়ে *সওগাত* মহিলা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এর ফলে নারীর মধ্যে সচেতনতা ও

---

[৫৬২] মিসেস এম. রহমান, 'সদানুষ্ঠান', *বিজলী*, চৈত্র, ১৩২৯; উদ্ধৃত, মোবাররা সিদ্দিকা, "নারীবাদী মিসেস এম. রহমান", *আই বি এস জার্নাল*, ৮ম সংখ্যা ১৪০৭, আষাঢ় ১৪২৮, জুন ২০০১, রাজশাহী, পৃ. ৬১-৬৪

[৫৬৩] বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর *বিষের বাঁশী* কাব্যগ্রন্থটি মিসেস এম. রহমানের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গের কবিতায় তিনি তাঁকে 'নাগমাতা' সম্বোধন করেছেন। (কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫২)

[৫৬৪] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *সওগাত*, পৌষ-মাঘ ১৩৮৭, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৫০

আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ সালে এ পত্রিকার মহিলা সংখ্যায় 'জানানা মাহফিল' এ নারী লেখকদের ছবি ছাপিয়ে সম্পাদক নাসিরউদ্দীন প্রতিক্রিয়াশীল সমাজপতিদের আক্রমণের স্বীকার হন। *সওগাত* পত্রিকার স্লোগান ছিল 'নারী না জাগলে জাতি জাগবে না'। প্রকৃতপক্ষে বাংলার মেয়েদের নানা সমস্যার কথা উঠে আসে এ পত্রিকায়। নারী জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে *সওগাতে* কয়েকটি কবিতাও ছাপা হয়। এরকম একটি কবিতা নিম্নরূপ-

জাগো নারী, জাগো তুমি বাজাইয়া ভয়াল বিষাণ,
অত্যাচারী মাতিয়াছে গাহ তারি সর্বনাশা গান।
অত্যাচার অপমানে তোর বুকে যে দিয়েছে দাগা
চিত্তের সকল দাহ তারি তরে জাগা, তুই জাগা।
দু'হাতে বিষের পাত্র তুলে নিতে হবে তোরে নারী
বিলাতে হবে না আর করুণার সুধা-স্নিগ্ধ বারি।[৫৬৫]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে *সওগাত* পত্রিকা বাংলার মেয়েদের মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্র রচনা করে দেয়। এ পত্রিকায় তৎকালীন নারী তাদের নানা অভাব অভিযোগ ও বঞ্চনার কথা এবং সামাজিক অনাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করার প্রয়াসের নানাদিক তুলে ধরেন। স্বাধীনভাবে মনের ভাব প্রকাশের সুযোগ পাওয়ায় এসময় বাঙালি নারীর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। তাদেরও যে লেখার ক্ষমতা আছে এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে তারা শক্ত অবস্থান পেতে পারে সে বিষয়ে দৃঢ়চেতা মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। *সওগাত* মহিলা সংখ্যা প্রকাশের ফলে বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে মেয়েদের সাহিত্য চর্চার পরিধি আরো বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য ১৩৪৮ সনে অগ্রহায়ণ মাসে *সওগাত* মহিলা সংখ্যার ৫৬টি রচনার মধ্যে ৪৮টি ছিল মুসলিম নারীর লেখা। ধীরে ধীরে এ সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়।[৫৬৬] ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত *সওগাত* মহিলা সংখ্যাকে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে নারী জাগরণ ও আন্দোলনে *সওগাত* একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কেননা এ পত্রিকা বাঙালি নারীর মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্র রচনা করে দেয়। এক্ষেত্রে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন একজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি মেয়েদের প্রতি

---

[৫৬৫] মিস ফজিলতুননেসা, "মুসলিম নারীর জাগরণ", *জাগরণ*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৫ (১৯২৮), পৃ. ২২

[৫৬৬] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০

সহানুভূতিশীল এবং শ্রদ্ধাশীল থেকে নারী জাগরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। আর এ কাজে তাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁর বন্ধু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)।

বিশ শতকে কাজী নজরুল ইসলাম কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে নয় বরং তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা এবং অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে। তিনি *সওগাত* সম্পাদক নাসিরউদ্দীনের সাথে অত্যন্ত সুসম্পর্ক রেখেছেন এবং নারী জাগরণে তাঁরা উভয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা করতেন এবং তা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতেন। কাজী নজরুল ইসলাম *সওগাত* পত্রিকায় বাঙালি নারী সম্পর্কে লিখেন,

> কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ তাহা মনেও করতে পারি না। আমাদের কন্যা জায়া জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি যে দুঃখ, কিসের অভাব তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উড়িয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না- সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে- নারী। ... এখন আমাদের তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চিরবন্দিনী মাতা ভগ্নিদের উদ্ধার সাধন।[৫৬৭]

কাজী নজরুল ইসলাম স্বদেশপ্রেম ও মানবতাবাদের জয়গান করেছেন এবং তিনি ছিলেন নারীমুক্তির একজন বলিষ্ঠ সমর্থক। নারী-পুরুষে সমতা প্রত্যাশী ছিলেন। তাই তিনি 'নারী' শীর্ষক কবিতায় উচ্চারণ করেন,

> সাম্যের গান গাই
>
> আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
>
> বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
>
> অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
>
> ...

[৫৬৭] কাজী নজরুল ইসলাম, "অবরোধ ও স্ত্রীশিক্ষা", *সওগাত*, ১৩৩৯; উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান ও মালেকা বেগম (সম্পাদিত), *নারীর কথা বাঙালি নারীর অধিকার সম্পর্কিত ভাবনা*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৮৬-১৮৭

কোন কালে একা হয়নি'ক জয়ী পুরুষের তরবারী

প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষ্মী নারী।

...

হাতে রুলি, পায়ে মল

মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল, ভেঙ্গে ফেল ও শিকল।

যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু, ওড়াও সে আবরণ,

দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ![৫৬৮]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন নূরুন্নেসা খাতুন (১৮৯৪-১৯৭৫)। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ন্যায় নূরুন্নেসার জন্ম হয়েছিল অভিজাত রক্ষণশীল পরিবারে। নিজেদের পারিবারিক পরিবেশে অবরোধপ্রথার কঠোরতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন,

> প্রাচীন ভদ্র বংশীয় মুসলমান আয়মাদার কন্যা বিধায় এবং কঠিন পর্দাবগুণ্ঠনের খাতিরে আমার সামাজিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতা- worldly experience খুবই কম। বলিতে কি, পিত্রালয়ে অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হইবার পর চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত অন্দর ও মস্তোকপরি চন্দ্র তারকাখচিত নীল চন্দ্রাতপ ভিন্ন কোনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়ন পথের পথিক হয় নাই।[৫৬৯]

নূরুন্নেসা খাতুন ১৮৯৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় ভরতপুর থানার অন্তর্গত শাহাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খোন্দকার হাবিবুস সোবহান সম্ভ্রান্ত বংশের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। এ বংশের পূর্ব পুরুষ পীর হওয়ায় মেয়েদের কঠোর পর্দা ও অবরোধপ্রথা মেনে চলতে হতো। তাই নূরুন্নেসার পক্ষে বাইরে গিয়ে বিদ্যার্জন করা অসম্ভব ছিল। অন্তঃপুরে খুব সামান্য পড়ালেখা শিখেন তিনি। হুগলি নিবাসী কাজী গোলাম মোহাম্মদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্র, আইন ব্যবসায়ী ও সংস্কৃতিমনা উদার ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন কাজী গোলাম মোহাম্মদ। তাই স্বামীর সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় নূরুন্নেসা বাংলা এবং ফার্সি ভাষা রপ্ত করেন এবং সাহিত্য জগতে অনুপ্রেবেশের সুযোগ লাভ করেন।

---

[৫৬৮] কাজী নজরুল ইসলাম, *সঞ্চিতা*, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ. ৮৪-৮৬

[৫৬৯] সালমা হোসেন (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯

স্বামীর কর্মসূত্রে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করার সুযোগ হয় নূরুন্নেসার। ফলে তাঁর পর্দাপ্রথার শিথিলতার সুযোগ ঘটে, একই সাথে অন্তর্দৃষ্টি সুপ্রসারিত হয়। তিনি ৫টি গার্হস্থ্য উপন্যাস, ১টি ঐতিহাসিক উপন্যাস, ৩টি অন্যান্য উপন্যাস এবং অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন।[৫৭০] নূরুন্নেসা নিজ সমাজের মেয়েদের অনুন্নত ও করুণ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *স্বপ্নদ্রষ্টা* (১৯১৩) একটি সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। এখানে সমাজের নানা অসঙ্গতির কথা বিশেষ করে মেয়েদের কথা উঠে এসেছে। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত 'জানকী বাঈ' বা 'ভারতের মোসলেম বীরত্ব' তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস। এখানে সুলতানি শাসক আলাউদ্দীন খলজীর (১২৯৬-১৩১৬) রাজ্য বিজয়ের নানা দিক আলোচনা করেন। উল্লেখ্য বাংলা সাহিত্যে মুসলিম নারী রচিত এটিই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *আত্মদান* উপন্যাস। এ উপন্যাসে তিনি পিতার মৃত্যুতে তাঁর মায়ের জীবনের করুণ অবস্থা তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারীর অসহায় অবস্থার বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। উল্লেখ্য নূরুন্নেসার প্রতিভা, সাহিত্যানুরাগ ও সৃষ্টিশীলতার পুরস্কার স্বরূপ *নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সমিতি* তাঁকে 'বিদ্যা বিনোদিনী' এবং 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করে।

নূরুন্নেসা *বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সংঘের* সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। *সওগাত* সম্পাদক নাসিরউদ্দীনের উদ্যোগে আয়োজিত *বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সংঘের* বার্ষিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। উল্লেখ্য এটি ছিল দ্বিতীয় মুসলিম মহিলা সম্মেলন এবং তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বাঙালি মহিলা সভাপতি।[৫৭১] তবে নূরুন্নেসা নারীশিক্ষাকে অপরিহার্য মনে করলেও তিনি কিন্তু মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন,

> আমি এখন আমার স্বজাতীয়া ভগ্নিদের লেখাপড়া শিখে ডিগ্রি নেবার জন্য আহ্বান করছি না। আমার বলবার উদ্দেশ্য এইটুকু যে, তাঁরা যেন একেবারে মূর্খ না হয়ে থাকেন। সংসারের কাজকর্মের ও পর্দার ভিতর থেকে যতটুকু শিক্ষা করতে পারেন সেই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। তাহলে তাঁরা তখন আপনা আপনিই নিজেদের সন্তানগুলো যাতে শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে পারে সেদিকে সর্ব্বদা নজর রাখবেন।[৫৭২]

---

[৫৭০] সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৯

[৫৭১] *দি মুসলমান*, কলিকাতা, ১ আগস্ট, ১৯৩১, পৃ. ২

[৫৭২] *বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সংঘে* সভাপতির অভিভাষণ। তৎকালীন মুসলিম মেয়েদের সংগঠন ছিল 'বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সংঘ'। ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত এ সমিতির সম্মেলনে নূরুন্নেসা সভাপতির ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণ প্রকাশিত হয় *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃ. ৫৪১-৫৪৪

নূরুন্নেসা খাতুন মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় খুব একটা বিশ্বাসী ছিলেন না যেখানে নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। নূরুন্নেসা এ সম্পর্কে বলেন, অনেকে হয়ত মনে করবেন- তবে কি আমরা লেখাপড়া শিখে এখন থেকে সমাজের উন্নতির জন্য রাস্তায় ঘুরে বেড়াব, নাকি অধুনাতর বিশেষ নারী অধিকারের আলো পেয়ে অর্থোপার্জনের উপায় উদ্ভাবনে পুরুষ সেজে অফিসের দ্বারে গিয়ে হাজির হবো। আসলে এ ধরণের কোনো উপদেশ তিনি দিতে চাননি। বরং তিনি মনে করেন শিক্ষা অর্থের জন্য নয়। এ কথাই আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস করে নিয়ে কাজে নামতে হবে; আর সে নামাটাই সফল হবে।[৫৭৩]

অধ্যাপক শাহনারা হোসেন মন্তব্য করেন, নূরুন্নেসা তাঁর সমকালের ও পরিবেশের প্রভাব ও ধ্যান ধারণার বেশি উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। নারীশিক্ষা ও নারী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতবাদ আমাদের কাছে প্রগতিশীল মনে হয় না।[৫৭৪] প্রকৃতপক্ষে নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার ব্যাপারে আগ্রহ না দেখলেও নারীশিক্ষা যে প্রয়োজন তা স্বীকার করেছেন। শিক্ষা ছাড়া নারীর হৃদয় আলোকিত হতে পারে না সে উপলব্ধি তাঁর ছিল। অন্যদিকে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে নূরুন্নেসার রচনাবলী নারী সমাজের জাগরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তিনি *সওগাত* পত্রিকায় উল্লেখ করেন,

> ... আমাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই এখন জেগে উঠে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, ... জাতীয় জীবনকে গ'ড়ে তুলবার একমাত্র উপায় হচ্ছে জ্ঞানচর্চা। আমাদেরকে এই পথ অবলম্বন করতেই হবে। তার সঙ্গে মোসলেম ঐতিহাসিক যুগের লোমহর্ষক কীর্ত্তি নিয়ে পাঠ ক'রে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দেহ মনের জড়তা ও আড়ষ্ঠতা দুর করতে হবে। ... আশেপাশের লোকের আর্থিক, দৈহিক ও শিক্ষার উন্নতি দেখে- "কপালে নেই কি ক'রব" বলে পঙ্গু হয়ে বসে থাকবার সময় আর নেই। এখন অপরে যা পেয়েছে আমিও নিশ্চয় পারব বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে লাগতে হবে। স্বকীয় চেষ্টার এখন একটু ত্রুটি হলে পতঙ্গের মত পদদলিত ও নিষ্পেষিত হয়ে মরতে হবে।[৫৭৫]

---

[৫৭৩] *ঐ*, পৃ. ৫৪১-৫৪৪

[৫৭৪] শাহানারা হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮

[৫৭৫] নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, "আমাদের কাজ", *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ. ১৯

এভাবে দেখা যায় নানা সমালোচনা থাকলেও নূরুন্নেসা খাতুন পূর্ব বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

ফাতেমা খানম (১৮৯৪-১৯৫৭) বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তিনি মামলুকুল ফাতেমা খানম নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি অন্তঃপুরে শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং উর্দু ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। ফাতেমা খানম পরবর্তীতে কলকাতার *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল* এবং আরো পরে ঢাকায় *পোস্তা গার্লস স্কুলে* শিক্ষকতা করেন।[৫৭৬] তাঁর রক্ষণশীল পরিবারে বিয়ে হয়। কিন্তু তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামী পছন্দ না করায় স্বামীকে পরিত্যাগ করে মানিকগঞ্জ হতে ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। ফাতেমা খানম প্রচুর বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করেন। সমসাময়িক নারী সমাজের নানা সমস্যার কথা তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। ফাতেমা খানম তৎকালীন সমাজে প্রচলিত পর্দাপ্রথার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এ প্রথা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। তিনি নারীশিক্ষার আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় নারীর সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তিনি মনে করেন নারী-পুরুষ সমভাবে শিক্ষা গ্রহণ না করলে সমাজের সার্বিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। তৎকালে মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে তিনি দায়ী করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন,

> কোন পথে কী পন্থা অবলম্বন করিয়া মুসলমান বালিকার শিক্ষারম্ভ হইবে তাহা আজো আবিষ্কৃত হয় নাই। শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত স্ত্রীও যে সমান অধিকার পাইতে পারে এবং পুরুষের সাহায্য ব্যতীত আপনার শক্তিতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে এই সত্যটিকে স্বীকার করার মত উদারতা বোধ হয় মুসলমান সমাজে লক্ষের মধ্যে একটি পুরুষেরও নাই। সুতরাং বলিতে হইবে গোটা সমাজটিই আজো নারীর অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না, স্বাধীন সত্ত্বা তো দূরের কথা।[৫৭৭]

ফাতেমা খানম নারীর উচ্চ শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। কেননা বহু প্রাচীন যুগ হতেই মুসলিম মেয়েরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাই পুনরায় মেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুললে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্বের ন্যায় অবদান রাখবে

---

[৫৭৬] সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭০

[৫৭৭] ফাতেমা খানম, "প্রাথমিক শিক্ষা ও মুসলমান সমাজ", *জাগরণ*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৫; হাবিব রহমান (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *নির্বাচিত সংকলন মাসিক জাগরণ পত্রিকা*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১০৩

বলে তিনি বিশ্বাস করেন। উল্লেখ্য ফাতেমা খানমের সমসাময়িককালে সমাজে ধীরে ধীরে নারীশিক্ষা বৃদ্ধি পায়। কেননা এ সময় অনেক অভিভাবক বিদেশে চাকুরীজীবী ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে পছন্দ করেন, তাই মেয়েরা যেন তার স্বামীর সাথে পত্র রচনার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এজন্য মেয়েদের শিক্ষার প্রতি সমাজের কিছুটা ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়টিকে ফাতেমা খানম ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাইমারী শিক্ষার প্রতি সমাজের আগ্রহ যুগের প্রয়োজনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সুযোগে এ পথ দিয়ে যতটুকু সম্ভব আলো প্রবেশ করিয়ে দিলে ভবিষ্যতে সে আলোতেই ঘর ভরে উঠবে। মেয়েরা দেশীয় ভাষায় সংবাদ ও মাসিকপত্রসমূহ পড়তে পারলেই বর্হিজগতের সথে অনেকটা পরিচিত হবে। এভাবে যুগ পরিবর্তনের প্রভাব তাদের মনে সাড়া জাগিয়ে তুলবে। ফলে তাদের পুত্র কন্যার উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে অদূর ভবিষ্যতে তারা আর কুণ্ঠিত হবে না।[৫৭৮]

ফাতেমা খানম "মুসলিম সাহিত্যের গতি নির্দ্দেশ" শিরোনামে আরেকটি প্রবন্ধ লিখেন *মাসিক জাগরণ* পত্রিকায়। মুসলিম সাহিত্যে তৎকালীন বাংলার সামাজিক সমস্যা, মেয়েদের হীনাবস্থা প্রভৃতি দিক তুলে ধরেছেন। ফাতেমা খানম মুসলিম সমাজে প্রচলিত পর্দাপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে পুরুষ নারীকে পর্দার অন্তরালে বন্দি করে রেখেছে। বংশ যত উঁচু সেখানে পর্দার বন্ধন তত বেশি, আবার নীচু তথা কৃষক সমাজে কোন পর্দা নেই। তিনি পুরুষতান্ত্রিকতারও তীব্র সমালোচনা করেন। তাই দীর্ঘদিন ধরে দুরবস্থায় পতিত মেয়েদেরকে মুক্ত করার জন্য তরুণ সমাজকে আহ্বান করে বলেন,

> ... নবীন যুগের নূতন জ্ঞানালোক দিয়ে তরুণ মুসলিম তাদের নারী সমাজকে সঞ্জীবিত করে তুলুন। নারীর বন্ধন, নারীর অজ্ঞতা, আজ তরুণ মুসলিম দলের বলিষ্ঠ বাহুর দৃঢ় আকর্ষণে ছিন্ন হয়ে যাক। নারী বুঝুক, তারা শুধু সচল মাংসপিণ্ড নয়। দুর্গম জীবন পথে তারা পুরুষের সহকর্ম্মী। স্বামী-পুত্রের আনন্দদাত্রী, জাতির শক্তিময় কল্যাণময়ী জননী।[৫৭৯]

তাঁর এই লেখনী বাঙালি নারীকে উজ্জীবিত করে। সত্যিকার অর্থে নারীর সাহায্য ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। ফাতেমা খানম উল্লেখ করেন Sickman আখ্যাপ্রাপ্ত দুর্বল তুরস্ক আজ নীরোগ, পুষ্ট এবং বলে বলীয়ান হয়েছে। তার মূলে রয়েছে পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত প্রয়াস। এছাড়া

[৫৭৮] *ঐ*, পৃ. ১০৩-১০৪

[৫৭৯] ফাতেমা খানম, "তরুণের দায়িত্ব", *শিখা*, চতুর্থ বর্ষ, ১৩৩৭, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *শিখা সমগ্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৯৫

প্রতিবেশী ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায়, তারা পর্দাপ্রথা ছিন্ন করে মুসলমান নারীর চেয়ে অনেকগুণ এগিয়ে গেছে। তাই পর্দাপ্রথার কঠোর বেড়াজাল থেকে আমাদের মুসলিম মেয়েদেরকে মুক্ত করে এনে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হবে। আর এ বিষয়ে তরুণদের দায়িত্ব নিতে হবে। এ ব্যাপারে তাঁর আহ্বান-

> ... আমাদের মুসলমান নারীও যে জগতের কোন সভ্য জাতির নারীর চেয়ে শক্তি সামর্থ্যে ছোট নয়, এককালে সাম্রাজ্য শাসন করা থেকে জগতের প্রত্যেক গৌরবান্বিত কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার শক্তি যে প্রচুর পরিমাণে তাদেরও ছিল, সে শক্তি পর্দ্দার চাপে চেপে না রাখলে তাদের মধ্যেও আজ হিন্দুদের মতই অসংখ্য কর্ম্মী মহিলার আবির্ভাব হওয়া বিন্দুমাত্র অসম্ভব ছিল না। এ শ্বাসত সত্যটিকে প্রচার করার ভার তরুণ মুসলিম গ্রহণ করুণ।[৫৮০]

মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ফাতেমা খানম সমাজ সংস্কারে বিশেষ করে নারীর অবস্থার উন্নয়নে তরুণদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। বলা হয় তাঁর বাড়িটি ছিল তৎকালীন ঢাকার উঠতি তরুণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্মের 'আড্ডাখানা'।[৫৮১] ফাতেমা খানম পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তাঁকে বাদ দিয়ে পূর্ব বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নারী জাগরণে ভূমিকা রাখেন সফিয়া খাতুন। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সফিয়া খাতুনের জন্ম পরিচয় সম্পর্কে খুব একটা জানা যায় না। শুধু তাঁর রচিত কিছু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ পাওয়া যায়, যা সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সফিয়া খাতুনের নিজের লেখনীর মাধ্যমে জানা যায় তিনি আফগান বংশোদ্ভূত ছিলেন, তবে বেড়ে উঠেন বাংলার মাটিতে। তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল জাতীয় জীবনের নানাদিকে প্রসারিত। ভারতবর্ষের স্বদেশিকতা থেকে বাঙালিয়ানা, নারীশিক্ষা থেকে নারী স্বাধীনতা, ইতিহাসে নারীর অবস্থান, অসাম্প্রদায়িকতা থেকে সামাজিক আধুনিকতা এবং সার্বজনীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো বিষয়াদি নিয়ে স্বচ্ছ, প্রগতিবাদী (কোথাও প্রতিবাদী) ধারণা সফিয়ার রচনায় প্রস্ফুটিত হয়।[৫৮২]

---

[৫৮০] *ঐ*, পৃ. ৪৯৮

[৫৮১] সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭২

[৫৮২] আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮

সফিয়া খাতুন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মতই নারীর সর্বাধিক সামাজিক অধিকার ও স্বাধীনতা চেয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিগড় থেকে নারীকে মুক্ত করে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠার জন্য জোর দাবি জানান। তিনি মনে করেন আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে নারীর অবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রকৃতিগতভাবে নারী পুরুষের দৈহিক পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, তাঁর বিচারে পুরুষের তুলনায় নারী জ্ঞান বিষয়ে যে সমান বা কোনো কোনো স্থলে বেশিও হতে পারে, তার যথেষ্ট প্রমাণ দেশেই আছে।[৫৮৩] সফিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, নারীর আত্মউন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। সুশিক্ষা দ্বারা নারী আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তাদের স্বাধীন একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সমাজে নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক, তাই সমাজ গঠনে উভয়ের সমভাবে অবদান থাকা দরকার। এক্ষেত্রে রোকেয়ার সাথে সফিয়ার চিন্তাচেতনার মিল পাওয়া যায়। তাঁরা উভয়ে নারীর অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। বহ্নিশিখা নারী সফিয়া খাতুন *ভারতবর্ষ*, *নবযুগ*, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, *মহিলা* প্রভৃতি পত্রিকায় লেখালেখি করেন। তিনি একদিকে যেমন নারী জাগরণে মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করেন, তেমনি বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার নারীকে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সফিয়া খাতুনের নারী বিষয়ক তথা নারী জাগরণী প্রবন্ধের মধ্যে- "সভ্যতার পূর্ব্বে নারী", "প্রাচীন মিশরে নারীর স্থান", "প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় নারী", "উনবিংশ শতাব্দীর নারী বিপ্লব", "নারীর ব্যাথা" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিশ শতকের প্রথমদিকে মুসলমান মেয়েদের বাংলা পড়া এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল। সে অধঃপতিত সময়ে নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে কোনো কোনো অভিজাত পরিবারে দু'চারজন মহিলা অসীম সাহস ও অদম্য আকাংখা নিয়ে বাংলা শিখতে চেষ্টা করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম আখতার মহল সৈয়দা (সাঈদা) খাতুন (১৯০১-১৯২১)। ফরিদপুর জেলার উকীল মৌলভী আবদুর রহমান (এম.এ বি.এল) সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যা আখতার মহল গৃহশিক্ষকের কাছে আরবী, উর্দু ও সামান্য বাংলা পড়তে শিখেন। ১৯১৩ সালে নোয়াখালীর এক রক্ষণশীল পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়। শশুর বাড়িতে গোপনে তিনি বই পড়তেন এবং লেখালেখি শুরু করেন। আখতার মহলের লেখায় নারীর অবরোধের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। তিনি নারীমুক্তির জন্য মেয়েদেরকেই আন্দোলনে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।[৫৮৪] আখতার মহলের অধিকাংশ লেখা *নওরোজ*, *সওগাত* ও *মাতৃমন্দির* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য তিনি নওরোজ পত্রিকায় সেলিমা বেগম ছদ্মনামে লিখতেন। আখতার মহল নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

---

[৫৮৩] *ঐ*, পৃ. ৮০

[৫৮৪] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ৭৬

সমাজের সর্বস্তরের প্রতিটি নারীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ধর্মের দোহাই দিয়ে ভণ্ড মৌলভী শ্রেণির উপর তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। কেননা এসব ধার্মিক শ্রেণির মানুষের কারণে সমাজের মেয়েদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> "এলম শিক্ষা মোসলেম নারীর তুল্য ফরজ"; কিন্তু কয়টি মহিলা এই অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারিণী? সত্য বটে, কোন কোন ভদ্রলোক স্ত্রী কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিতেছেন; কিন্তু সে কয়টি? হাজার করা একটিও কি? বোধ হয় না
>
> হাজার হাজার মাতা যেখানে অজ্ঞান-আঁধারে পথহারা, সেখানে ৫/৭টি শিক্ষিতা যে বিশাল সাগর-তরঙ্গে দুই চারিটি নীহার বিন্দু বই কি?[৫৮৫]

অনুমান করা যায় আখতার মহলের সমসাময়িক শিক্ষিত নারী বলতে এ পাঁচ-সাত জনের বেশি ছিল না, যাঁদের নাম সকলেই জানতেন। তিনি তৎকালীন মোল্লাশ্রেণির লোকদের সম্পর্কে বলেন,

> মৌলভী নামধারী 'মহাপুরুষ' ঘরে ঘরে বিরাজিত। এই মহাত্মগণ স্বার্থের খাতিরে না করিতে পারে, এমন পাপ বোধ হয় আর নাই। অবশ্য যিনি মৌলভী নামের যোগ্য, তাঁর উদ্দেশ্যে আমি হাজার সালাম দেই। কিন্তু যে সব স্বার্থপর লম্পট কাঠ মোল্লাদের হাতে পড়িয়া পবিত্র সাম্যবাদী ইসলামের এই অধঃপতন, তাহাদের বিচার করবে কে?
>
> অশিক্ষিত মোসলমানের উক্তি ইহাই-শুধু অশিক্ষিত নহে অনেক মৌলভীরও- "নারী পায়ের জুতা মাত্র, ইচ্ছা হয় পায় দিলাম। না হয় নাই দিলাম। একজোড়া যাইবে, অন্য জোড়া আসিবে।"[৫৮৬]

তাঁর এ বক্তব্য সেদিন সত্যিই সাহসী উক্তি। মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন আখতার মহল নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। সন্তান লালন পালনের জন্য এবং সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য মাতাকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এদেশে শিশু মৃত্যু ও প্রসূতিমৃত্যু এত প্রবল, তার কারণ শুধু দারিদ্রতা নয়। এর সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে মায়ের অজ্ঞতা ও অলসতা। কিন্তু বিষয়টি বড়ই মর্মান্তিক। মায়ের দোষে সন্তান মারা যাচ্ছে, মায়ের কাছে এর চেয়ে কঠোর কথা আর কিছুই হতে পারে

---

[৫৮৫] আখতার মহল সৈয়দা খাতুন, "নারীর অভিযোগ", *সওগাত*, *(জানানা মাহফিল)*, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ. ৫২৮

[৫৮৬] *ঐ*, পৃ. ৫২৯

না। কিন্তু কঠোর হলেও এ কথা অতি সত্য, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। সন্তানের অসুখ হয় মায়ের অসাবধানতার জন্য। মায়ের অযত্নে সন্তান কষ্ট পায়। কেননা সন্তানের জীবন-মরণের সমস্ত দায়িত্ব বিধাতা মায়ের হাতেই দিয়ে রেখেছেন।[৫৮৭] আখতার মহলের এ বক্তব্যে একটি সুস্থ-সবল প্রজন্মের ইঙ্গিত রয়েছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে। আখতার মহলের প্রথম উপন্যাস *নিয়ন্ত্রিতা*। কয়েকজন নর-নারীর বেদনাদগ্ধ অন্তরের প্রতিচ্ছবি সাবলীলভাবে এখানে ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় উপন্যাস *মরণ বরণ*। উপন্যাস দুটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। মাত্র ২৮ বছর জীবন লাভকারী আখতার মহল তাঁর লেখনীর মধ্যে যে তেজোদীপ্ত বক্তব্য রেখেছেন তা যে তৎকালে নারী জাগরণে সুদৃঢ় ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সমসাময়িক কালে ঢাকায় কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) প্রমুখ মনীষী ১৯২৬ সালে *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে*র পরিমণ্ডলে গড়ে তোলেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। সংগঠনটি মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলে। এ সংগঠনটি ১৯২৭ সালে *শিখা* পত্রিকা প্রকাশ করে, যার মটো ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ঠ, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। ১৯২৭-১৯৩১ সাল পর্যন্ত সময়ে বার্ষিক ভিত্তিতে *শিখা* পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সত্যিকার অর্থে বাঙালি মুসলমানদের মননে স্বাধীন ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা জাগ্রত করার অঙ্গীকার নিয়ে *শিখা* পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে।[৫৮৮] এ পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় তৎকালীন মুসলিম নারীর বাস্তব অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত পর্দাপ্রথা তথা অবরোধপ্রথার তীব্র সমালোচনা করে শিখাগোষ্ঠী। *শিখা* পত্রিকায় প্রচলিত পর্দার ভয়াবহতা উল্লেখ করে বলা হয়,

> ... একটু বয়স হইলেও মেয়েরা পর্দ্দার খাতিরে পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করে। দরিদ্র মুসলমান তো আর প্রত্যেক বাড়িতে মাস্টার বা মিস্ট্রেস রাখিয়া পড়াইতে পারে না। তাই মেয়েদের পড়াটা ৭/৮ বছর বয়সেই শেষ হয়। পর্দ্দা মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য অতএব জাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্যেরও সর্ব্বনাশ করিতেছে। ... যদিও অনেকেই মনে করেন যে, তথাকথিত পর্দা যতই কড়াভাবে বজায় রাখা যায় ততই আভিজাত্যের পরিচায়ক, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ততোধিক বর্ব্বরতা ও অসভ্যতার নিদর্শন।[৫৮৯]

---

[৫৮৭] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০৩

[৫৮৮] তাহ্‌মিনা আলম, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ ১৯০০-১৯৪৭*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

[৫৮৯] মমতাজ উদ্দিন আহমদ, "শিক্ষা-সমস্যা", *শিখা*, ১ম বর্ষ, ১৯২৭, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩

মুসলিম সাহিত্য সমাজের সদস্যরা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত অবরোধপ্রথার বিলুপ্তি দাবি করে শাস্ত্রানুমোদিত পর্দা প্রথার সমর্থন করেন এবং ন্যায় নীতির বিচারে নারীর প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা স্পষ্ট করে বলেন, "ইসলামে অবরোধ নাই। আছে ইসলামি শরিয়তে হেজাব ও তদানুমোদিত 'হারেম' অর্থাৎ নারীর আবরণ ও অন্তঃপুর"।[৫৯০] *মুসলিম সাহিত্য সমাজের* সদস্যরা নারীমুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা উল্লেখ করেন ইসলামের প্রাথমিক যুগে এতটা পর্দার কঠোরতা ছিল না এবং সে সময় মুসলিম নারী অত্যন্ত মুক্তভাবে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, যে সমস্ত প্রাচীন প্রাণহীন আচার ও অন্ধ সংস্কার আমাদের শিক্ষা তথা সাহিত্য প্রসারের পথে বাধার সৃষ্টি করছে, তার মধ্যে পর্দাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। বলাবাহুল্য, আমাদের ধর্মগুরুর জীবদ্দশায় পর্দাপ্রথার এত কড়াকড়ি আদৌ ছিল না। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে মহিলাগণ অবাধে বাইরে চলাফেরা করতেন- এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে ও জনসাধারণের মজলিসে মুক্তকণ্ঠে বক্তৃতা দিতেন।[৫৯১]

পর্দাপ্রথার কঠোরতা থেকে নারীকে মুক্তি দিতে পারলেই নারীসমাজের সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নতি সম্ভবপর হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়, আধুনিক মিসর, তুরস্ক, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ দ্রুত পর্দাপ্রথা ত্যাগ করছেন। তুরস্ক একেবারেই ত্যাগ করেছে। তার ফলে তুর্কী নারী আজ সর্বত্র স্বচ্ছন্দ গতিতে নিজ ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি করছেন। তুরস্কের নারী সকল জাতীয় আন্দোলনে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে তাঁর শক্তি প্রয়োগ করছেন। ব্যবসায়, বাণিজ্য, অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ, ইউনির্ভাসিটি সর্বত্রই তুর্কী নারীর অবাধ গতি।[৫৯২] অন্যদিকে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে শিখাগোষ্ঠী উল্লেখ করেন, যতদিন মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হবে ততদিন পর্যন্ত তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে অপরাপর সম্প্রদায়ের পিছনে পড়ে থাকবে। তাঁরা মনে করেন ভালভাবে গৃহ ব্যবস্থাপনার জন্য এবং সন্তান প্রতিপালনের জন্যও নারী শিক্ষা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে *শিখা* পত্রিকায় বলা হয়-

> ... মাতৃজাতি জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন। মাতৃক্রোড়ে শিশুর জীবনের লক্ষ্য নিরূপিত হয়, তাহার উচ্চাকাঙ্খা অংকুরিত হয়। মাতার সম্মুখে জাতীয় জীবনের যে আদর্শ স্থাপিত হয় শিশু ঠিক সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। জাতীয় জীবনের আদর্শ যদি মার্তৃগণ

[৫৯০] শামস্উদ্দিন আহমদ, "মুসলিম নারীর কথা", *শিখা*, ৫ম বর্ষ, ১৯৩১, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫

[৫৯১] আবুল মুজাফফর আহমদ, *সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ*, *শিখা*, ৩য় বর্ষ, ১৯২৯, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৬

[৫৯২] *ঐ*, পৃ. ২৮৬

> আপন প্রাণে অনুভব করিতে না পারেন, তবে তাহারা কখনও উহা তাহাদের সন্তানগণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে পারেন না। এই হেতু যে জাতির মাতৃগণের মধ্যে শিক্ষার যত অভাব সে জাতির উন্নতির পথ তত দুর্গম। মুসলমানগণ যদি সমাজ হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাদিগকে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগ দিতে হইবে।[৫৯৩]

নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে শিখাগোষ্ঠী আরো বলেন যে,

> ... মায়েদের অজ্ঞতার দরুণ অনেক শিশুই যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তা বোধ হয় আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হতে সাক্ষ্য দিতে পারবো। ... বৃহত্তর জাতীয় জীবনে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের উচ্চশিক্ষা পেতে হবে। স্বামীর সহধর্ম্মিনী, সহকর্ম্মিনী হবার জন্য স্বামীর উপযুক্তা তাকে হতে হবে। পণ্ডিত স্বামীর স্ত্রী মূর্খ হলে সে সংসার সুখের হতে পারে না। মূর্খ স্ত্রী পণ্ডিতের কিরূপভাবে সহকর্ম্মিনী হতে পারে।[৫৯৪]

এভাবে *মুসলিম সাহিত্য সমাজের* সদস্যগণ তাদের লেখনীর মাধ্যমে নারীশিক্ষার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। যা তৎকালীন নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনকে অনেকটা দূর এগিয়ে দেয়। *শিখা* পত্রিকায় আলোচনা করা হয়, ইসলামের গৌরবের যুগে মুসলিম নারী শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত ছিলেন। উল্লেখ করা হয় আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০-১২৫৮) শুধু পুরুষের মধ্যেই জ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল না; মেয়েরাও সমানভাবে সাহিত্য-বিজ্ঞানের আলোচনা করতেন। এসময় মেয়েদের মধ্যে অনেকে চিকিৎসাবিদ্যা এবং ফিকাহ শাস্ত্রে অধ্যয়ন করতেন। কেউ কেউ সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ ইত্যাদি শিখতেন। মেয়েরা কাব্যচর্চা, সংগীত, টেনিসখেলা এবং নৃত্যকলারও চর্চা করতেন।[৫৯৫] আবার ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে (সুলতানি ও মুঘল আমল) মেয়েরা গৃহে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁরা সাহিত্য চর্চা করতেন।

মুসলিম নারীর অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল বিশ শতকের মেয়েদের মধ্যে জাগরণ ঘটানো। অতীতের সমুজ্জ্বল ইতিহাসের কথা স্মরণ করে বাংলার নারী দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেদেরকে আলোর পথে পরিচালিত করতে উৎসাহিত হবেন, পড়াশুনা শেখার প্রতি আগ্রহী হবেন। সর্বোপরি অর্থনৈতিকভাবে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করবেন- এমনটি প্রত্যাশা ছিল শিখাগোষ্ঠীর। তৎকালীন

---

[৫৯৩] আবদুর রহমান খাঁ, *সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ*, *শিখা*, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৯২৮, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯

[৫৯৪] নাসিরউদ্দিন আহমদ, *সভাপতির অভিভাষণ*, *শিখা*, ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭০

[৫৯৫] কাজী আকরম হোসেন, “আব্বাসীয় যুগ”, *শিখা*, ৩য় বর্ষ, ১৯২৯, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৭

সময়ে শিখাগোষ্ঠী বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে এবং এক্ষেত্রে *শিখা* পত্রিকা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ পত্রিকায় তিনজন মুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন নারী প্রবন্ধ রচনা করেন। (ফজিলতুননেসা, ফাতেমা খানম ও করুণাকণা গুপ্তা)। এ সকল লেখকদের প্রবন্ধাবলীতে সমসাময়িক নারীর সমস্যাবলী এবং সেটি থেকে পরিত্রাণের দিক নির্দেশনা বর্ণিত হয়।

বিশ শতকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন ফজিলতুননেসা (১৮৯৯-১৯৭৭)। তিনি টাঙ্গাইলের কুমুল্লী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্কুল শিক্ষক ওয়াজেদ আলী এবং মাতা হালিমা খাতুন। প্রগতিশীল পিতা পারিবারিক অসচ্ছলতা ও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মেয়েকে শিক্ষার পথে এগিয়ে দেন। ফজিলতুননেসা করটিয়ার প্রাইমারি স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি ১৯২১ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক এবং ১৯২৩ সালে প্রথম বিভাগে *ইডেন কলেজ* থেকে আই এ পাশ করেন। ফজিলতুননেসা ১৯২৫ সালে বেথুন কলেজ থেকে বি এ পাশ করে বাঙালি প্রথম মুসলিম নারী গ্রাজুয়েট হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি পূর্ব বাংলার প্রথম মুসলিম নারী যিনি ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফলিত গণিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। উল্লেখ্য ফজিলতুননেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী। *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তিনি বিলেতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। উপমহাদেশের মুসলিম মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলেত থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। ফজিলতুননেসা কলকাতার *বেথুন কলেজে* শিক্ষকতা করেন এবং পরে ঢাকার *ইডেন মহিলা কলেজে* দীর্ঘ নয় বছর (১৯৪৮-১৯৫৭) অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য তিনি পূর্ব বাংলার প্রথম মুসলিম নারী অধ্যক্ষ।

নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বাংলার মেয়েদের উদ্বুদ্ধকরণে ফজিলতুননেসা সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে নারীসমাজে ব্যাপক সাড়া জাগে। সমাজে পুরুষ যে দীর্ঘদিন ধরে নারীকে পদানত করে রেখেছে ফজিলতুননেসা তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি অভিমত জ্ঞাপন করেন, পর্দাপ্রথার দ্বারা নারীকে সবচেয়ে বেশি কোণঠাসা করে অধিকারহীন করে রাখা হয়েছে। অথচ মেয়েরা সমাজের গুরুত্ব পূর্ণ অঙ্গ। তিনি বলেন, মানবদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজনীয়তা যেমন সমান, সমাজ দেহের ঠিক সেরূপ। নারী ও পুরুষ সমাজ দেহের দুটি অঙ্গ, উভয়েরই প্রয়োজন সমান। কিন্তু আমাদের সমাজ এ প্রয়োজনীয় অর্দ্ধাংশকে উপেক্ষা করে উন্নত হতে, অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা করছে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় বা নিরাশার বিষয় আর কিছু হতে পারে না। অন্যদিকে নারীকে পর্দার অন্তরালে রেখে দেওয়া হয়েছে। বাইরের কোন সাড়া তার মনকে জাগিয়ে তুলতে পারছে না। তাই তিনি উল্লেখ করেন,

> আমাদের মেয়েদের হয়ে তাদের অন্তরের শ্রেষ্ঠ দাবিটিকে আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জানাতে চাই-
>
> দেবী নহি, নহি আমি
>
> সামান্য রমণী! পূজা করি রাখিবে মাথায়,
>
> সেও আমি নই! অবহেলা করি পুষিয়া
>
> রাখিবে পিছে, সেও আমি নাই।
>
> যদি পার্শ্বে রাখ
>
> মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার যদি
>
> অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
>
> কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
>
> যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
>
> আমার পাইবে তবে পরিচয়।
>
> এখন এই দাবি সার্থক করবার, এই জড়তা ঘুচিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে দেশের এবং সমাজের কাজে প্রাণমন সঁপে দিতে সমর্থ হবার জন্য নারীর প্রয়োজন- শিক্ষা।[৫৯৬]

ফজিলতুননেসা মেয়েদের জন্য এমন শিক্ষার কথা বলেন- যা দ্বারা হয়, The harmonious development of all our faculties- mental, physical and moral.[৫৯৭] নারীর দুর্দশাগ্রস্থতার জন্য তাঁরা নিজেরা দায়ী বলে তিনি মনে করেন। তবে আশার বিষয় যে, তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নারী নিজের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হয়েছে। এখন তাঁরা জাগরিত হওয়ার ইচ্ছাপোষণ করছে। কিন্তু জাগরণের প্রধান হাতিয়ার 'শিক্ষা', যার প্রচণ্ড একটা অভাব তাদের মধ্যে থেকে গেছে। তিনি বলেন, নারী এতকাল মোহ আবরণে ঢেকে রেখে এই বিচিত্র পৃথিবীর সৌন্দর্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে- কিন্তু আজ অনুতপ্ত নারী প্রাণ সেই কুৎসিত বিলাসের ফাঁসি ছিন্ন করে বাইরের জগতের সাথে পরিচয়

---

[৫৯৬] ফজিলতুননেসা, "মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা", *সওগাত*, *জানানা মাহফিল*, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ. ৫২৫

[৫৯৭] *ঐ*, পৃ. ৫২৬

স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। সমস্ত নারীমন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু যুদ্ধ করার যে প্রধান অস্ত্র- শিক্ষা ও জ্ঞান, তাই তাদের নেই। তাদের আছে কেবল দারুণ একটি আত্মগ্লানি, মর্মভেদী অনুশোচনা; আর সর্বোপরি মুক্তির জন্য দুর্দমনীয় আকাঙ্খা। পাপীর অনুতাপই যেরূপ তার পাপকে আগুনে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ ও খাঁটি করে তোলে, সেরূপ নারীর এ আত্মগ্লানিই তাকে মনুষ্য-পদ-বাচ্য করে তুলবে। এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা বলতে কেবল কয়েকটি ডিগ্রির ছাপ নয়, যে শিক্ষা মনকে উন্নত ও প্রশস্ত করে। বিবেক বুদ্ধিকে সুমার্জিত ও সুচালিত করে, সে শিক্ষা। যে শিক্ষা ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান বজায় রাখার উপযোগী শক্তি দেয়, সে শিক্ষা।[৫৯৮]

মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য মেয়েদের সুশিক্ষিত করে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা জরুরি। এ ব্যাপারে মেয়েদের পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সাহস সঞ্চার করে মেয়েদের উচিত নিজেকে শিক্ষিত করা এবং নিজের অধিকার সমাজের কাছ থেকে আদায় করে নেয়া। এ প্রসঙ্গে ফজিলতুননেসা দৃঢ়কন্ঠে বলেন,

> মুসলিম মেয়েদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে না পারলে এ সমাজের উন্নতি কোন জন্মেও হবে না। তাই পুরুষের উপর সব কর্ত্তৃত্বের ভার দিয়ে বসে থাকলে আর মেয়েদের চলবে না। এবার নিজেদের হাতেই শিক্ষার ভার নিতে হবে। নিজেকে মানুষ বলে সভ্য সমাজে পরিচিত করতে হবে। ভিক্ষুকের মত কেঁদে পায়ে ধরে চেয়ে, প্রত্যাখ্যান অপমানের পশরা না বয়ে বীরের মত নিজের ন্যায্য অধিকার জো'র করে আদায় ক'রে নারীত্বের বন্ধনমুক্ত করতে হবে। শিক্ষা নেই, তাই সাহসও নেই- কিন্তু সে শিক্ষা অর্জ্জন করতে হবে।[৫৯৯]

দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত পর্দা ও অবরোধপ্রথার দোহাই দিয়ে নারীকে গৃহে বন্দি করে রাখার তীব্র সমালোচনা করেন ফজিলতুননেসা। তৎকালে যে যত বেশি ঘরে বন্দি থাকে সে তত বেশি সতী- এমন একটা ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিল। অথচ ইসলাম ধর্মে মেয়েদের গৃহকোণে বন্দি করে রাখার কোন বিধান নেই। এ প্রসঙ্গে ফজিলতুননেসা বলেন, সতীত্ব যে নারীর একটা মহামূল্যবান সম্পদ, তা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু সমস্ত দরজা জানালায় খিল এঁটে দিয়ে ঘরের ভিতরে অসূর্য্যস্পশ্যা হয়ে যে নারী সকলের কাছে সতী বলে পরিচিত হয়, তার সে নামের মূল্য নেই। জগতের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এবং নানা প্রলোভনের মধ্যে থেকেও, যে নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারে- সে প্রকৃত সতী। মুসলমান

[৫৯৮] ফজিলতুননেসা, "মুসলিম নারীর মুক্তি", *সওগাত*, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৬, পৃ. ১

[৫৯৯] *ঐ*, পৃ. ২

ধর্মশাস্ত্রে নারীকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখার অধিকার দেওয়া হয়নি; বরং তাকে তার ন্যায্য অধিকার দেওয়ার কথা আছে। প্রত্যেককে নিজের কর্মফল ভোগ করতে হবে, এ কথাও ধর্মে আছে। তাহলে নারীর উচিত সুশিক্ষিত হয়ে তার অধিকার বুঝে নেওয়া এবং ভালমন্দ বিচার করে সে অনুসারে চলার স্বাধীনতা আদায় করে নেওয়া ।[৬০০]

ফজিলতুননেসা নিজে পর্দা প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি বোরকা ছাড়া *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে* ক্লাস করতে যেতেন এবং এ কারণে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন। কিন্তু অত্যন্ত সাহসী মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল নারী ফজিলতুননেসা এসব সমালোচনা তোয়াক্কা করেননি। তিনি মনে করেন যে, পর্দাপ্রথা নারী প্রগতির প্রধান অন্তরায়। অথচ ইসলাম নারীকে ঘরের কোণে বন্দি থাকতে বলেনি। প্রচলিত অবরোধপ্রথার সমালোচনা করে তিনি বলেন, "ইসলাম নারীকে অবরোধে আবদ্ধ থাকতে বলেনি, জ্ঞানার্জন করবার আদেশ দিয়েছে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পর্দার নামে যে অবরোধপ্রথা চলছে সেটা নারী হত্যার জন্য সব অস্ত্রের সেরা অস্ত্র। ওই অস্ত্রটি নারীর শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের অবস্থাবিশেষে জীবিকার্জনেও অন্তরায়।"[৬০১]

তাই নারীকে বিদ্রোহী হতে হবে এবং ইসলাম ধর্মে যে অবরোধ নেই, সে বিষয়ে পুরুষকে ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। নইলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বুঝবে না যে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তারা নারীর সর্বনাশ তথা সমাজের সর্বনাশ করছে। আর এ ব্যাপারে আজ নারীকে জেগে উঠতে হবে, বিদ্রোহী হতে হবে। ফজিলতুননেসা দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন,

> জ্ঞান হতেই শুনে এসেছি যে পুরুষের সাহায্য ছাড়া নারীর চলে না। নারী ছাড়া পুরুষ অচল, একথা তাদের বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, নারী কেবল গৃহের উপকরণের মতো জড় পদার্থ নয়। তাদেরও স্বাধীন সত্তা আছে। তারাও দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারে, ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করতে পারে, কবিতা লিখতে পারে এবং বিচার করতেও পারে। নারী 'বজ্রদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি', সে প্রমাণ দেখাতে হবে বলেই আমি সর্বাগ্রে নারীর জাগরণ কামনা করি-
>
> জাগতে হবে উঠতে হবে

---

[৬০০] *ঐ*, পৃ. ৩

[৬০১] মিস ফজিলতুননেসা, "মুসলিম নারীর জাগরণ", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

লাগতে হবে কাজে

মোদের লাগতে হবে কাজে।[৬০২]

শিখা পত্রিকায় যে তিনজন নারী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে ফজিলতুননেসা অন্যতম। এ পত্রিকায় তিনি "নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষায় আস্বাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রবন্ধে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষা একজন নারীর জীবনে মধুরতার স্বাদই এনে দিতে পারে এবং সার্বজনীনভাবে নারীকে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে। নারীকে আত্মনির্ভরশীল করে, নারীর জড়তা ঘুচিয়ে শিক্ষা তাঁর মনে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি নারীকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে শেখাতে পারে। বিশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে এসে লক্ষ্য করা যায় জীবনের আদর্শকে উপলব্ধি করার একটি প্রচেষ্টা নারীর মধ্যে জেগে উঠেছে। পূর্বে স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিনী ছিল, আর এখন সহকর্মিনীও হয়ে উঠেছে। তাই আধুনিক শিক্ষা মেয়েদের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে উচ্চারণ করেন,

> ... আধুনিক শিক্ষা ... নারীকে আজ প্রাণ খুলে বলতে শিখিয়েছে 'স্বাধীনতা চাই, আত্মার মুক্তি চাই' নারীকে আজ বলতে শিখিয়েছে 'আমরা অজ্ঞতার কালো আবরণে আর ঢাকা থাকব না, আমরা অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী পুরুষের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করব। আমরা জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত হয়ে সেই আলোকে বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করব, প্রতি গৃহে মঙ্গলদ্বীপ জ্বালিয়ে জগতের মহৎ কল্যাণ সাধন করব। আমরা স্নেহে মমতায়, দয়ায় সেবায় ঘরে ঘরে শান্তিবারি সিঞ্চন করব। আমরা কুসংস্কার পদদলিত করে জগতের মঙ্গলার্থে অগ্রসর হব।[৬০৩]

ফজিলতুন নেসা দেশের তরুণ সমাজকে মেয়েদের শিক্ষাসহ সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করে এ জন্য দরকার শুধু সাহস এবং উৎসাহ- নবীনের মধ্যে এর একটিরও অভাব নেই। নারী না জাগলে, তাঁর উন্নতি হবে না। আবার নারীর অগ্রগতি না হলে দেশের তথা জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। সার্বিকভাবে পুরুষের অগ্রগতির জন্য নারীর অগ্রগতি প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি Lord Tennyson এর উক্তি উল্লেখ করেছেন,

---

[৬০২] *ঐ*, পৃ. ২৫-২৬

[৬০৩] মিস ফজিলতুননেসা, "নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ", মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৩-২৬৬

The woman's cause is man's; they rise or sink Together; dwarfed or God-like bond or free; If she be small, slight natured, miserable

How shall man grow?[৬০৪]

বিশ শতকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে বহুমুখী ভূমিকা রাখেন লীলনাগ বা লীলারায় (১৯০০-১৯৭০)। তাঁর পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং আদর্শ দেশপ্রেমিক। মাতা কুঞ্জলতা ছিলেন প্রগতিশীল ব্রাহ্মিকা। শৈশবে লীলানাগ স্বামী বিবেকানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা ও অরবিন্দ ঘোষের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি ছিলেন *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের* প্রথম ছাত্রী। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত লড়াই করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। এটি ছিলো শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় জাগরণ।[৬০৫] লীলানাগের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে বাংলার নারীমুক্তির প্রয়াস। তিনি বাংলার নারীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে জ্ঞানের আলো বিকিরণের উদ্দেশ্যে বারোজন বন্ধু সহকর্মী নিয়ে ১৯২৩ সালে গড়ে তোলেন 'দীপালি সংঘ'। এটি ছিল সে সময়কার পূর্ববাংলার তথা ঢাকার একমাত্র মহিলা সমিতি। ১৯২৫ সালে *দীপালি সংঘের* সদস্য সংখ্যা ছিল ১০০ নারীর বেশি। লীলানাগ উপলব্ধি করেন পিছিয়ে পড়া বাংলার নারীসমাজের বন্ধনমুক্তি ছাড়া রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন মুক্তি সম্ভব নয়।[৬০৬] উল্লেখ্য *দীপালি সংঘের* প্রতিষ্ঠা ঢাকা শহরের সর্বত্র তথা পূর্ববাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

ঢাকা শহরের কতিপয় এলাকায় যথা- বকশী বাজার, রাজার দেউরী, তাঁতিবাজার, নারিন্দা ও উয়ারী এলাকার মেয়েদের পড়াশোনা, শিল্প, বেতের ব্যাগ তৈরি এবং চরকায় সুতা কাটা শেখানো হতো *দীপালি সংঘের* উদ্যোগে। আবার মহিলা ডাক্তার, রোগীর পরিচর্যা, সন্তান পালন ইত্যাদি যেমন অতি প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচি বলে পরিগণিত ছিল তেমনি সংস্কৃতি চর্চা, নারীর সমঅধিকার বিষয়ে জাগরণমূলক কর্মসূচিও ছিল পাঠ্যক্রমে।[৬০৭] অন্যদিকে *দীপালি সংঘের* মাধ্যমে বেশ কয়েকটি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব স্কুলের কয়েকটিতে আবাসিক ব্যবস্থা থাকায় মেয়েরা পড়াশুনা করতে

---

[৬০৪] ফজিলতুননেসা, "মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২৭

[৬০৫] মালেকা বেগম, *সাক্ষাতকার*, ৩০.১০.২০১৭

[৬০৬] পলাশ মণ্ডল, "ঢাকার 'দীপালি সংঘ' থেকে 'শ্রীসংঘ' : লীলা রায়ের (১৯০০-৭০ খ্রিষ্টাব্দে) চিন্তা ও কর্মের বিবর্তন", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৫-৩৬, ২০১২-২০১৪, পৃ. ১২৭

[৬০৭] মালেকা বেগম, "লীলারায় ও তাঁর জীবন সাধনা", *নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা-২৬*, *আধুনিক ভাষা ইনিস্টিটিউট*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬, পৃ. ১৪

স্বাচ্ছন্দবোধ করে। যা পূর্বেই সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এ সংঘের একটি সাংস্কৃতিক শাখাও ছিল। এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঢাকার মানুষকে শুধু আনন্দই দেয়নি উপরন্তু মেয়েদের মুক্তি ও আনন্দের পথেও চালিত করে।[৬০৮] প্রকৃতপক্ষে লীলারায় বঞ্চিত নারী সমাজকে সার্বিক উন্নতির মাধ্যমে যোগ্য করে তুলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সম্ভ্রান্ত, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দীন-দরিদ্র, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এককথায় সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মনের তমসা দূর করে দ্বীপ জালাতে চেয়েছিল 'দীপালি সংঘ'।[৬০৯] উল্লেখ্য ১৯২৬ সালের পর 'দীপালি সংঘ' রাজনৈতিক বৈপ্লবিক সংঘে পরিণত হয়।

১৯৩১ সালে 'দীপালি সংঘের' মুখপত্র হিসেবে লীলারায় *জয়শ্রী* পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩১-১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ঢাকায় এবং ১৯৩৮-১৯৪২ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলায় নারী জাগরণে ও নারীমুক্তি আন্দোলনে *জয়শ্রী* পত্রিকার অবদান অতুলনীয়। উল্লেখ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পত্রিকার নামকরণ করেন। তিনি লীলানাগের জন্য একটি কবিতাও লিখেছিলেন। যা নিম্নরূপ-

বিজয়িণী নাই তব ভয়

দুঃখে ও বাধায় তব জয়।

অন্যায়ের অপমান

সম্মান করিবে দান

*জয়শ্রী*র এই পরিচয়॥[৬১০]

জয়শ্রী পত্রিকা মেয়েদের দ্বারা ও মেয়েদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হলেও এটি নিছক মেয়েলি পত্রিকা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে লীলারায় মেয়েদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। তিনি মনে করেন শুধু গৃহ পরিচালনার জন্যই মেয়েদের জন্ম হয়নি। তবে দীর্ঘদিনের সামাজিক অবস্থার কারণে মেয়েদের পক্ষে

---

[৬০৮] চিত্তব্রত পালিত, "বিপ্লবী লীলারায় ১৯০০-১৯৭০", *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল*, প্রথম খণ্ড (রাজনীতি সমাজ প্রশাসন), আবদুল মমিন চৌধুরী ও শরীফউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৪৯

[৬০৯] ঈশানী মুখোপাধ্যায়, "লীলারায়ের যুগে নারীমুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম", *লীলানাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৫১

[৬১০] *জয়শ্রী*, বৈশাখ, ১৩৩৯, পৃ. ১৫২

অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরের জগতে আসাটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। তাই তিনি যেমন অগ্রণী হিসেবে পথ চলা শুরু করেন তেমনি পশ্চাৎপদ নারী সমাজকেও এ আলোকিত পথে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়েছেন। লীলারায় বাংলার মানুষকে ভালোবেসেছেন। তিনি জীবনব্যাপী স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং চির বিপ্লবী জীবন পছন্দ করেন।

বিশ শতকে পূর্ববাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা পালনকারী নারীর মধ্যে অন্যতম মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৯)। মাহমুদা খাতুন ১৯০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস ছিলো কুষ্টিয়া জেলার নেয়ামত বাড়ি গ্রামে। পিতা খান বাহাদুর মোহাম্মদ সোলায়মান ডিভিশনাল স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন। মাহমুদা খাতুন রাজশাহী মিশন স্কুল, বরিশাল ও পাবনা জেলায় বিভিন্ন স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত *আনোয়ারা* উপন্যাসের লেখক নজিবর রহমান। এ গৃহশিক্ষকের শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণা তাকে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল। সরকারি চাকুরে পিতার সাথে বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণের সুযোগ পাওয়ায় মাহমুদা খাতুন নানা অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা পড়াশুনার চাইতে কাব্যচর্চায় বেশি আত্মনিয়োগ করেন। তাই তিনি কবি হিসেবে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। এক্ষেত্রে তিনি পারিবারিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা যায়। তাঁর মা রাহাতুন্নেছা বই পড়তে এবং সংগীত শুনতে ভালোবাসতেন। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা তাঁর নানীর মায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন বলে উল্লেখ করেন, যিনি একাধারে বাংলা, উর্দু, ফার্সি, আরবি এবং নাগরি ভাষা জানতেন।[৬১১] তাঁর মাতৃ পরিবারের অন্দরমহলে নিয়মিতভাবে নিরবে সংস্কৃতির চর্চা চলতো। তাই মাহমুদা খাতুন অল্প বয়স থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লেখা শুরু করেন। উল্লেখ্য তৃতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তিনি একটি সম্পূর্ণ খাতা কবিতা লিখে ভরে ফেলে নিজের নানার নামে উৎসর্গ করেন এবং এ খাতার নাম দেন 'ইসলাম জ্যোতি'। উল্লেখ্য গৃহ শিক্ষক নজিবর রহমান এ কবিতাগুলি পড়ে সংশোধন করে দেন যা পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়। মাহমুদা খাতুন ১৯২৮ সালে 'হাইজিনে' ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি রন্ধন প্রণালীতে 'লেডি কারমাইকেল' ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে 'আল ইসলাহ্' পত্রিকায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর কাব্যচর্চার পরিব্যপ্তি ঘটে এবং *বসুমতি*, *সওগাত*, *মানসী*, *মর্মবাণী*, *মোহাম্মদী*, *যুগান্তর*, *আনন্দবাজার*, *আজাদ*, *ইত্তেহাদ*, *সত্যযুগ* প্রভৃতি মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত কাব্যচর্চা করেন। এভাবে কাব্যচর্চায় খ্যাতি

[৬১১] সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭১

ছড়িয়ে পড়লে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে পরিচয় ঘটে। মাহমুদা খাতুন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে বহুবার ব্যক্তিগত বিষয় ও কাব্যচর্চার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। ঠাকুর বাড়িতে গিয়েও তিনি কবি গুরুর সাথে কয়েকবার নানাবিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন বলে জানা যায়। তিনি *সওগাত* অফিসে গিয়ে সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সাথে সাক্ষাত করেন। এছাড়া তিনি *অমৃতবাজার* পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ, *প্রদীপ* পত্রিকার সম্পাদক কবি অতুল কৃষ্ণ ঘোষ, সাহিত্যিক মনোজ বসু, অমিয় কুমার চক্রবর্তী, লোকগায়ক আব্বাসউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আবদুল মাজেদ খান, কবি সুফিয়া কামাল, লেডি অবলা বসু, সরলাবালা চৌধুরাণী প্রমুখ গুণীজনের সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হন।[৬১২] এ সকল গুণীজনদের সংস্পর্শে এসে তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ লাভ করেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য ১৯৩৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতার ইলবার্ট হলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের* পক্ষ থেকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি দেওয়া উপলক্ষে *যশোর সাহিত্য সংঘ* কর্তৃক যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, সে অনুষ্ঠানে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিষয়টি তাঁর জন্য অত্যন্ত সম্মানের এবং গৌরবের ছিল। কেননা তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে একজন নারীকে এ সুযোগ দেওয়া সহজসাধ্য ছিল না। মাহমুদা খাতুন নিজ প্রতিভাবলেই এ সম্মান অর্জন করেন। তিনি ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেন। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা সমাজকর্মী ছিলেন। তিনি নিজ বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা শেখাতেন। তিনি কবিতা রচনা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ হলেও তিনি কুসংস্কার, পর্দাপ্রথা, অশিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রচলিত পর্দাপ্রথা তথা বোরকা ছাড়াই শাড়ি পরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন মন্তব্য করেন, "সমাজের সেই অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে মুসলিম নারী যখন অবরোধের কঠোর প্রাচীরে আবদ্ধ ছিলেন, সে সময় এই তরুণীকে দেখলাম আধুনিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে মুক্তভাবে চলাফেরা করতে। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর মাথার চুলগুলি ছিল 'ববকাটা'।"[৬১৩] অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া এবং সত্বর বিবাহ-বিচ্ছেদ হলেও মাহমুদা খাতুন সারাজীবন একাকী কাটিয়েছেন। তাতে তাঁর মধ্যে কোন

---

[৬১২] সালমা হোসেন (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৬-১১৭

[৬১৩] শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদিত), *জানানা মাহফিল* (বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা ১৯০৪-১৯৩৮), দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮, পৃ. ১৭৩

হাহাকার বা দুঃখবোধ ছিল না। বরং নির্ঝঞ্ঝাট সারাটি জীবন কাব্যচর্চা করেন।[৬১৪] অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের অধিকারী মাহমুদা খাতুন সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন, বিয়ে একজন নারীর জীবনের সবকিছু নয়। বরং অনেক সময় নারীকে স্বামীর ঘরে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তাই নারীমুক্তির জন্য প্রয়োজন নারীর অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন,

> এই জীবন হইতে, এই দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে নিজ উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা রাখিতে হইবে- যাহাতে নিজের মনে না হয় আমি একান্ত অসহায়া, দুর্ব্বলা। যাহাতে পুরুষের মনে না হয়, "আমি ছাড়া, নারীর গতি নাই।" নিজেকে অসহায়া দুর্ব্বলা মনে করিলে হৃদয়ে যে দুর্ব্বলতা জাগে তাহাই মৃত্যু, দুর্ব্বলতা জগতে কোন উপকার করিতে পারে না। আর আপনার উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা রহিলে হৃদয়ে যে সবলতা থাকে তাহা অন্তরকে সজীব রাখে। দুর্ব্বলতা পাপ, এই দুর্ব্বলতা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে হইবে।[৬১৫]

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা "আধুনিকা" শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রবন্ধে তিনি আধুনিক নারীকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার রচনাবলী নিঃসন্দেহে বাংলার নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

বাঙালি নারী জাগরণে অনন্য ভূমিকা রাখেন রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী (১৯০৭-১৯৩৪)। তিনি ছিলেন প্রবন্ধকার, কবি, ছোট গল্প লেখক এবং এককথায় সমাজ বিশ্লেষক। রাজিয়া খাতুন ১৯০৭ সালের ১৬ মার্চ নোয়াখালী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের নাম হাজেরা খানম, পিতা আবদুর রশীদ খান।[৬১৬] ১৩৩১

---

[৬১৪] মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ *পশারিনী* (১৩৩৮), *মন ও মৃত্তিকা* (১৩৬৭) ও *অরণ্যের সুর* (১৯৬৬)। এছাড়া অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যা শতাধিক। মুসলমান বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম সনেট ও গদ্যছন্দে কবিতা রচনা করেন। উল্লেখ্য তাঁর *পশারিনী* কাব্যগ্রন্থের পূর্বে আর কোন বাঙালি মুসলিম নারীর কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এছাড়া সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় এবং পাণ্ডুলিপি আকারে তাঁর অনেক অগ্রন্থিত গল্প ও প্রবন্ধ রয়েছে। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, বুদ্ধদেব বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার তুলনামূলক সমালোচনা করে "বঙ্গভাষা" প্রবন্ধ রচনা করে সাহসিকতার পরিচয় দেন।

[৬১৫] মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, "বর্তমানে নারীর কর্তব্য", *মোয়াজ্জিন*, ৩য় বর্ষ, আষাঢ়-চৈত্র ১৩৩৮; উদ্ধৃত, শাহিন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮২-১৮৩

[৬১৬] রাজিয়া খাতুনের পিতা ছিলেন সে যুগের স্বরাজ পার্টি ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙালি মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। দেশবন্ধু তাকে কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে নিয়োগ দেন। পিতা রাজনীতিতে সক্রিয় থাকায় রাজিয়া খাতুন স্বদেশী আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি "শ্রমিক" শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন। (শান্তনু কায়সার, *রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী ১৯০৭-১৯৩৪*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১১)

সনের ১৮ বৈশাখ কুমিল্লার সুয়াগাজি গ্রামের জমিদার পুত্র আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সাথে বিয়ে হলে, তিনি নিজ নামের শেষে 'চৌধুরাণী' পদবী ব্যবহার করতে শুরু করেন। রাজিয়া খাতুন গৃহশিক্ষকের কাছে বিদ্যার্জন করেন এবং পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে নানা ধরণের বই পড়ে জ্ঞানার্জন করার সুযোগ লাভ করেন। এভাবে তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি ও ফার্সি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা ছাপা হতো সমসাময়িক *সওগাত*, *নওরোজ*, *নববাংলা ও মোহাম্মদী* পত্রিকায়।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সমসাময়িক এবং তাঁর অনুসারী রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী তৎকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতি নিজ লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি মুসলিম সমাজে নারীর পশ্চাৎপদতার কারণ হিসেবে নারীশিক্ষার অভাবকে নির্দেশ করেন। বাংলার নারী যেন শিক্ষা-দীক্ষায় আরো আগ্রহী হয় এজন্য তিনি ইসলামের প্রথমযুগের মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসরতার চিত্র সমাজের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাচীন যুগে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর সময়ও নারীশিক্ষার প্রচলন ছিলো। হযরত খাদিজা (রা.) ও হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) অত্যন্ত শিক্ষিত ছিলেন। কবিতা ও আইনজ্ঞের জন্য আয়েশা (রা.) বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন। মহানবী (সা.) স্বয়ং বলেছেন, "তোমরা এই রক্তাভা গৌরবর্ণা মহিলাকে গুরুরূপে বরণ করিতে পার"।[৬১৭]

রাজিয়া খাতুন সমাজে প্রচলিত পর্দাপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে পর্দার বাড়াবাড়ি নারী সমাজের অগ্রগতির অন্তরায় তা তিনি উপলব্ধি করেন। ইসলামের প্রথম যুগে নারী জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা দেখিয়েছেন। যদি ইসলামে পর্দার কঠোরতা থাকতো তাহলে নিশ্চয় তা সম্ভব হতো না। তিনি বলেন, ইসলাম মোটেই নারীর উপর অবিচার করেনি। ইসলাম নর-নারীর অবাধ সম্মিলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করলেও পর্দাপ্রথার আমল দেয়নি। বর্তমানে আমাদের দেশে যে পর্দাপ্রথা প্রচলিত রয়েছে তা ইসলাম সম্মত নয়। ইসলাম যে আব্রুর ব্যবস্থা করেছে, তা নর-নারীর উভয়ের জন্য। তবে মেয়েদের প্রতি সামান্য একটু বেশি ঢেকে চলার ব্যবস্থা করেছে। সামাজিক জীবনে মুসলিম নারী অতীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। সম্রাজ্ঞী জোবায়দা একজন প্রভাবশালী নারী ছিলেন। আব্বাসীয় বংশের শাসকদের আমলে মুসলিম তরুণীরা ঘোড়ায় চড়ে লড়াই পর্যন্ত করতো, মুকতাদীরের জননী ছিলেন আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি। হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে শেখ শুহদা বাগদাদে ইতিহাস শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। উমাইয়া বংশের নারীগণও উচ্চশিক্ষা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য খুব প্রশংসা লাভ

---

[৬১৭] রাজিয়া খাতুন, "বঙ্গীয় মোসলেম মহিলাগণের শিক্ষারা ধারা"; উদ্ধৃত, শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯

করেন। মুসলিম স্পেনের গ্রানাডা ও কর্ডোভার নাজহাম, জয়নাব, হামদা হাফসা, মরিয়ম প্রভৃতি নারী জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে সুপরিচিত ছিলেন।[৬১৮] ইসলাম অত্যন্ত উঁচুস্তরের ধর্ম যেখানে মেয়েদের সর্বোচ্চ সম্মান দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> ইসলাম নারীকে পদদলিত করেনি, ধুলিবিমলিন ক্রীতদাসীর পর্য্যায় হ'তে ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান পর্য্যায়েই টেনে তুলেছে। নারীর কদর ইসলাম যে কতখানি উপলব্ধি করেছে তা পরগম্বর মুখ নিঃসৃত একটা মহাবচন হতে বিশেষ প্রতিভাত হবে, "বেহেস্ত রয়েছে তোমার মায়ের পায়ের তলায়"।[৬১৯]

নারী স্বাধীনতা প্রত্যাশী রাজিয়া খাতুন সমাজ ও গৃহে নারীকে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিলেন। এজন্য তিনি অবগুণ্ঠন থেকে নারীর মুক্তি আশা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সচেতনতা ও জাগরণের মাধ্যমে মেয়েরা তাদের অধিকারগুলি ন্যায়সঙ্গত পন্থায় আদায় করে নিতে পারে। তাই তিনি অভিমত জ্ঞাপন করেন, শরিয়তে যতটা পর্দা আছে, তা অব্যাহত রেখে আমরা স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা অর্থ রাস্তায় নেচে বেড়ানো নয়, আমরা চাই প্রকৃত মুক্তি, যা মনকে উন্নত, মহান, পবিত্র, স্নিগ্ধ ও দৃঢ় করে; নিজের ধর্ম ও সত্যের সাথে পরিচিত করে; অর্ন্তজগৎ ও বর্হিজগতের বিভিন্ন তথ্য আমাদের মনোগোচর করে দেয়।[৬২০] সমসাময়িক কালে পুরুষ কর্তৃক অন্যায়ভাবে নারীকে সমাজে কোণঠাসা করার প্রবণতা লক্ষণীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সৃষ্ট কতিপয় শব্দ দ্বারা অনেক সময় নারীকে ছোট করা হয়। এমন একটি শব্দ 'সতী'। মেয়েরা সমাজের অন্যায় অনাচারের তথা প্রচলিত নিয়মের বাইরে গেলেই বলা হয় তাঁর সতীত্ব নষ্ট হয়েছে অথবা সে নারী অসতী। শুধু নারীর ক্ষেত্রে কেন, সমভাবে এই শব্দটি পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু সমাজ নারীর ক্ষেত্রেই কেবল এমন ধারণা পোষণ করে। এ প্রসঙ্গে রাজিয়া খাতুন দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন,

> ... সতী শব্দটা এক প্রহেলিকা। ইহা নারীর প্রতি সর্বস্থানে এবং যখন তখন প্রয়োগ করা হয়- কিন্তু পুরুষের প্রতি প্রয়োগ করার মত ইহার প্রতিশব্দ, বাংলা বা এমন যে সভ্য ইংরেজি ভাষা, তাহাতেও নাই। 'সতীত্ব' (Chastity) এসব বুলি একমাত্র নারীর জন্যই একচেটিয়াভাবে

---

[৬১৮] রাজিয়া খাতুন, "ইসলামে নারীর স্থান", *সওগাত*, *মহিলা সংখ্যা*, ১৩৪০, পৃ. ৮

[৬১৯] *ঐ*, পৃ. ৯

[৬২০] রাজিয়া খাতুন, "সমাজ ও গৃহে নারীর স্থান", *সওগাত*, *জানানা মাহফিল*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৫ (১৯২৭), পৃ. ২৭৩-২৭৪

> তৈরি হইয়াছে। ইহা কি পুরুষের নৈতিক হীনতার পরিচায়ক নয়? অবশ্য নৈতিক চরিত্র বলতে শুধু একদিক বুঝায় না, চরিত্রগত সমুদয় গুণকেই বুঝাইয়া থাকে। “সৎ” শব্দ হইতেই “সতীত্বের” উৎপত্তি। সুতরাং মানব চরিত্রের যেকোন গুণের হ্রাস পাইলেই তাহাদের ‘অসৎ’, ‘অসতী’ শব্দ যেভাবে ব্যবহার করা হয়, পুরুষের প্রতি ‘অসৎ’ শব্দটি সেইভাবে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে?[৬২১]

পরিবার পরিচালনায় তথা সুষ্ঠু সমাজ গঠনে নারী ও পুরুষ সমভাবে গুরুত্বের দাবিদার। এক্ষেত্রে গৃহ পরিচালনা ও সন্তান পালনে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। তাই গৃহ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নারীকে শিক্ষিত হতে হবে, তবেই সে নিজ সন্তানকে উত্তমরূপে লালন-পালন এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারবে। রাজিয়া খাতুন বলেন, শিক্ষিত নারী জাতির প্রধান সম্পদ। কেননা সন্তানের জন্য জননীই প্রথম ও উত্তম শিক্ষক। স্বভাবতঃ নারী ও পুরুষ মানব চরিত্র গঠনের দুইদিক ভাগ করে নিয়েছে। পুরুষ অন্ন, বস্ত্র ও পুঁথিগত বিদ্যা সন্তানকে দান করতে পারে কিন্তু নারী স্নেহ, যত্ন, ভালোবাসা দিয়ে, এমনকি নিজেকে উৎসর্গ করেও সন্তানের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে জাগ্রত করে ও জীবন্ত রাখে।[৬২২] তাই নারীকে শিক্ষিত করে তোলা জরুরি। কেননা শিক্ষিত নারী শুধু সন্তান পালন নয়, গৃহ সুপরিচালনাও করতে পারে। শিক্ষিত নারী প্রয়োজনে স্বামীকে সুপথে পরিচালিত করার সুপরামর্শও দিতে পারে। পরিবারের সকল সদস্যের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে। সুন্দর পরিবার গঠনে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, বরং পুরুষের চাইতে নারীকে শিক্ষিত করে তোলা বেশি জরুরি। এ প্রসঙ্গে রাজিয়া খাতুন বলেন, কন্যার শিক্ষা পুত্রের শিক্ষার চেয়ে সমাজ মঙ্গলের দিক হতে বেশি প্রয়োজন। কন্যাকে যদি সুশিক্ষা, স্বাস্থ্যজ্ঞান, জীবনাদর্শ প্রভৃতি ব্যাপারে সমুন্নত করে গড়ে তোলা যায়, স্ত্রীরূপে সে স্বামীর পক্ষে আর্শীবাদস্বরূপ হবে, স্বামী তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানবতার উন্নততর নিদর্শন হয়ে দাঁড়াবে, সন্তানের কাছে সে হবে কল্যাণের উৎস। শিক্ষিত মাতা সন্তান স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে যত্নবান হবে, পাঠশালায় যাবার পূর্বেই সুঅভ্যাস গড়ে উঠবে ও পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন হবে। সামাজিক আচরণ তার সুন্দর হবে, আদর্শের প্রতি তার আকর্ষণ জন্মাবে। মানুষের মত মানুষ হয়ে সে পৃথিবীর বুকে এসে দাঁড়াবে। সুতরাং পুত্রের মতো কন্যারও, বরং পুত্রের চেয়ে কন্যারই বেশি সুশিক্ষা হওয়া প্রয়োজন।[৬২৩]

---

[৬২১] *ঐ*, পৃ. ২৭৫

[৬২২] রাজিয়া খাতুন, “মুসলিম মহিলার সাহিত্য সাধনা”, *সওগাত*, *মহিলা সংখ্যা*, ভাদ্র ১৩৩৫; উদ্ধৃত, শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯২

[৬২৩] রাজিয়া খাতুন, “মায়ের শিক্ষা”, *সওগাত*; উদ্ধৃত, শান্তনু কায়সার, *রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫-৮৭

ইসলাম ধর্মে নারী-পুরুষ সমান হওয়া সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নারীকে অধস্তন করছে। রাজিয়া খাতুন নারী অপেক্ষা সমাজে পুরুষের মর্যাদা বেশি কেন এর কারণ অনুসন্ধান করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সমভাবে শিক্ষার ব্যাবস্থা করা হলে নারী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়াকে তিনি নারীর অবনতির ভয়ংকর দিক বলে বিশ্লেষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> ... বিবাহ ছাড়া নারীর গতি আছে বলিয়া যে- জাতি ভাবিতেও পারে না তাহারাই যে কন্যাকে আদরণীয়া ও সম্মানীতা করিয়া তুলিবে সে আশা সুদূর পরাহত। মেয়ে সাত বৎসরের হইলেই মা বাপের মুখে ভাত রুচে না, ছেলের পিতার বাড়ি তখন দর্গা বা মহাতীর্থ হইয়া উঠে; জুতার ঘন ঘন সংস্কার তখন কন্যার পিতার নিত্য-কর্ম্ম হইয়া উঠে। দেশের আবহাওয়ায় ও হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানগণও তাহাই করিতেছে। পুত্রবৎসল পিতা বা পিতৃভক্ত পুত্র নানা অলঙ্কর ও যৌতুক সমন্বিতা কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়া কন্যা ও কন্যার পিতাকে কৃতার্থ করেন। অনেক স্থলে বোঝার উপর শাকের আঁটির মত পড়ার খরচও আছে। সম্বন্ধ যেখানে আশ্রয় দাতা ও আশ্রিতা, আভরণ যেখানে হীনতা-দীনতা, সহানুভূতি যেখানে সংহত, করুণা যেখানে ঘৃণায় পরিণত, দুঃখ ও দান যেখানে দয়া, মূল্য যেখানে রূপ ও রূপেয়, সেখানে শ্রদ্ধা-সম্মানের কথা তোলা বাতুলতামাত্র।[৬২৪]

তাই বাল্যবিবাহ বন্ধ করে মেয়েসন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলেই সমাজ পরিবর্তিত হবে। নারী শিক্ষিত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীন হলেই সার্বিকভাবে নারীর আত্মমর্যাদার বৃদ্ধি ঘটবে। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ধর্ম যে উদারতার পরিচয় দিয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য। কেননা কোরআন নারীকে পুরুষের সহধর্মী, সহযোগী, সম শিক্ষিত ও স্নেহময়ী হতে উপদেশ দেয়; অবরোধপীড়িত দাসী হতে বলে না। পুরুষকেও নারীর প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও স্নেহশীল হতে বলে; প্রভু হতে বলে না। কোরআন ও হাদীসের উপদেশ যাঁরা সামান্য লোক লজ্জার ভয়ে লংঘন করেন তাঁরাই আবার মুসলমান বলে দাবি করেন। কথিত আছে একদিন এক নারী এসে মহানবী (সা.) এর নিকট অভিযোগ করলো, "আমার স্বামী আমাকে বিনা দোষে প্রহার করিয়াছেন।" তিনি উত্তর দিলেন, "তুমিও প্রহার কর"। তখনই প্রত্যাদেশ হলো, "বিশ্বাসী বা মোমেনা নারীগণ কখনও উদ্ধত আচরণ করে না, তাহারা স্বগৃহে চরকা ও পুণ্য কর্ম্ম লইয়াই জীবনাতিবাহিত করে। অপরের ঔদ্ধত্য সম্বন্ধেও তাহাদের ক্ষমাহীন হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়"। আল্লাহতায়ালা হজরতের বিচারকে খারাপ না বলে উদারতার

---

[৬২৪] রাজিয়া খাতুন, "নারীর কথা", *সওগাত*, *জানানা মাহফিল*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, পৃ. ৮০৮

সাথে ক্ষমা করতে বলেছেন।[৬২৫] তবে সমাজে যত অনাচারই থাকুক নারীকে জেগে উঠতে হবে, আত্মসচেতন হতে হবে এবং জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে পুরুষের বিরোধিতা অতিক্রম করে অসীম মানসিক শক্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। রাজিয়া খাতুন নারীকে জেগে উঠার আহ্বান জানিয়ে বলেন,

> ... যারা নারীর জ্ঞানের আলোক বন্ধ করেছেন, জেগে উঠে আজ তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞান মন্দিরের দ্বার চির অবারিত করতে হবে। আগে মানুষ- পরে জননী, ভগিনী, দারা, সুত। মনুষ্যপদবাচ্য হতে হলে সবকিছু অধিকার নারীকে পেতেই হবে। তা সে বিদ্রোহ করে বা আত্মবলিদান করে যে কোনো প্রকারেই হোক।[৬২৬]

তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে রাজিয়া খাতুনের নারী সম্পর্কিত ধারণা ও বলিষ্ঠ মতামত অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল যা বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তিনি অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন নারী ছিলেন। তাই তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে নারীকে মুক্ত আলো-হাওয়ার মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে এবং সুশিক্ষা লাভ করতে হবে। সমাজের অবস্থাদৃষ্টে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, আমাদের এ দূরবস্থা বেশিদিন থাকবে না।[৬২৭]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের যোগ্য উত্তরসূরী এবং নারীজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)। নোয়াখালী জেলায় ১৯০৮ সালে শামসুন নাহার এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, উদার, প্রগতিশীল এবং সরকারি চাকুরে। তাই তিনি পড়ালেখা শেখার সুযোগ লাভ করে বি. এ পাশ করেন।[৬২৮]

---

[৬২৫] *ঐ*, পৃ. ৮১১

[৬২৬] রাজিয়া খাতুন, "সমাজ ও গৃহে নারীর স্থান", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৫

[৬২৭] রাজিয়া খাতুন, "নারীর কথা", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১২

[৬২৮] শামসুন নাহার মাহমুদ চট্টগ্রামের *খাস্তগীর স্কুল* থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পাশ করেন। পরিবারে পর্দা প্রথার কঠোরতার জন্য তাঁর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে অন্তঃপুরে গৃহশিক্ষকের সহযোগিতায় পড়ানো হয়। ১৯২৬ সালে তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রথম বিভাগ অর্জন করে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের উৎসাহে শামসুন নাহার বোরকা পরে পর্দা রক্ষা করে কলকাতার *ডায়াসিসন কলেজে* পড়াশুনা করে ১৯২৮ সালে আই.এ পাশ করেন। ইতোমধ্যে তাঁর বিবাহ ও সন্তান হওয়ায় কিছুটা বিরতি দিয়ে ১৯৩২ সালে ইতিহাস ও বাংলায় ডিস্টিংশন সহ বি. এ পাশ করেন। উল্লেখ্য, শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯৩৯ সালে *লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে* বাংলা বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৪২ সালে তিনি এম. এ পাশ করেন। (শাহিদা পারভীন, *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৭-৩৩)

উল্লেখ্য শামসুন নাহারের বি. এ পাশে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে সংবর্ধনা দেন। অভিনন্দন বাণীতে রোকেয়া বলেন- "আমার সেই বত্রিশ বছর পূর্বের 'মতিচূরে' কল্পিত লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিস্টারের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে- আমার আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায়? অনেকেই আরদ্ধ কাজের সমাপ্তি নিজের জীবনে দেখিতে পান না; যে বাদশাহ কুতুবমিনার নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমার মিনারের সাফল্য আজ আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম"।[৬২৯] শামসুন নাহার মাহমুদ অল্প বয়স থেকেই *সাধনা*, *অন্বেষা*, *আঙ্গুর* ইত্যাদি পত্রিকায় লেখালেখি করেন। এজন্য অনেক সময় সমাজের বিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হলেও তিনি কখনও নিরুৎসাহিত হননি। শামসুন নাহারের প্রথম রচনা 'পূণ্যময়ী'। যা মাত্র দশ বছর বয়সে লিখেন এবং ১৯২৫ সালে (যখন তাঁর বয়স ১৭ বছর) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে আটজন মুসলিম মহীয়সী নারীর জীবনী রয়েছে, যাঁরা মেয়েদের আদর্শ হিসেবে গণ্য।[৬৩০] এ আটজন নারী হলেন- তাপসী রাবেয়া বসরী, মহানবী (সা.) এর কন্যা ফাতেমা (রা.), মহানবী (সা.) এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) ও খাদিজা (রা.), হাজেরা (রা.), বিবি রহিমা (রা.), সায়রা (রা.) ও আছিয়া (রা.)। শামসুন নাহার মাহমুদ বিশ্বাস করেন নারী জাগৃতির মূল শর্তই হলো শিক্ষা। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত পর্দাপ্রথা ছিল নারীশিক্ষার অন্তরায়। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'নারী জাগরণী' যা নারীকল্যাণমূলক চিন্তাভাবনাকে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। এ প্রবন্ধের মূল কথা হলো- বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের নারী প্রগতি ও আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান নারীকে সে পরিপ্রেক্ষিতে সচেতন করে তোলা।

প্রকৃতপক্ষে সারাবিশ্বে যখন নারী জাগরণের ঢেউ লেগেছে তখনও বাঙালি নারী জাগতে পারেনি। এর অন্যতম প্রধান কারণ পর্দাপ্রথা তথা অবরোধপ্রথা এবং নারীশিক্ষার অপ্রতুলতা। বাঙালি নারীর অজ্ঞতা তাদেরকে পশ্চাৎপদতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে শামসুন নাহার মাহমুদ বলেন,

> সুদীর্ঘ রজনী মোহ নিদ্রার অবসানে মুসলিম জগতে যে জাগরণী বাঁশী বাজিয়াছে, তাহার সুরে সুরে নারীগণও চঞ্চল হইয়া সাড়া দিয়াছে। আজ নবযুগের রক্ত প্রভাতে দাঁড়াইয়া মোসলেম নারী নবপ্রভাতের গান ধরিয়াছে-
>
> "পোহাল পোহাল বিভাবরী
> পূর্ব্ব তোরণে শুনি বাঁশরী।"

[৬২৯] শামসুন নাহার, "যে প্রদীপ দিয়েছে শুধু আলো", *রোকেয়া জীবনী*, পৃ. ১৩; উদ্ধৃত, শাহিদা পারভীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৭

[৬৩০] সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৭

সেই বাশরীর সুরে তুর্ক ললনা জাগিয়াছে- আরও অনেকে জাগিয়াছে- জাগে নাই শুধু বঙ্গরমণী। বাংলার মুসলমান সমাজ নারীর ... অবরোধ ও অশিক্ষার যে বিপুল জগদ্দল শিলা চাপাইয়া দিয়াছে, তাহারই গুরুভারে বঙ্গ-নারী গৃহ-কোণে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে। ঘনঘোর পর্দার আবরণ ভেদ করিয়া বাংলার সুপ্তিমগ্ন মোসলেম নারীর কানে এখনও জাগরণের সুর প্রবেশ করে নাই; কর্ণে প্রবেশ করিলেও অজ্ঞতার কৃষ্ণ আবরণ ছিন্ন করিয়া তাহাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে নাই। অবরোধের বিষময় ফলে আজ তাহারা গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত। তাহাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্যালোকের প্রবেশাধিকার নাই, তাহাদের মনোকক্ষেও তদ্রুপ জ্ঞানালোকের প্রবেশ নিষেধ।[৬৩১]

ইসলামের গৌরবের যুগে মেয়েদের অবস্থা অনেক উন্নত ছিল, এ সময় নারীর স্বাধীনতাও ছিল। তখন নারী সর্বত্র বিচরণ করতেন। কেননা ইসলাম অবরোধপ্রথা সমর্থন করেনি। মেয়েরা সে সময় নানা যুদ্ধ বিগ্রহেও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ করেছেন, জ্ঞানচর্চায় আত্মনিমগ্ন হয়েছেন, বাঙালি মেয়েদের ন্যায় তারা গৃহকোণে আবদ্ধ থাকেননি। এ প্রসঙ্গে শামসুন নাহার মাহমুদ উল্লেখ করেন-

হজরত মোহাম্মদ (স.) এর সময়ে মুসলমান নারীগণ স্বাধীনভাবে বেড়াইতেন, ধর্মসভায় যোগদান করতেন। এমনকি সমর প্রাঙ্গনে পর্যন্ত আর্বিভূতা হইতেন। ওহুদ, বদর প্রভৃতি প্রধানতম প্রত্যেক ধর্মযুদ্ধেই নারীর সংযোগ ও সহযোগিতা অনিবার্য ছিল। হজরতের প্রিয়তমা পত্মী আয়েশা (রা.) অধিকাংশ অভিযানে তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, ... ইসলাম কোনদিনই নারীজাতিকে পর্দার অন্তরালে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। শুধু যুদ্ধ কেন কি ধর্মালোচনা, কি জ্ঞান চর্চা, কি রাজ্যশাসন, কোন বিষয়েই মুসলমান নারীগণ পুরুষের সঙ্গ ছাড়িয়া গৃহকোণে বসিয়া থাকেন নাই।[৬৩২]

বিশ শতকে এসে বর্হিবিশ্বে মুসলিম দেশগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে সকল দেশের নারী পর্দাপ্রথা থেকে তাদের নারীকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছে, সে সব দেশের নারী পুরুষের সহায়তায় শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেদেরকে অগ্রগামী করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও শুরু করেছে। এক্ষেত্রে তুরস্ক, মিশর, পারস্য, এমনকি রাশিয়ার মুসলমান নারীগণও জাগরিত হয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চায় নিয়োজিত হয়েছেন এবং জাতীয় পর্যায়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এ প্রসঙ্গে শামসুন নাহার মাহমুদ বলেন, বর্তমান মুসলিম

---

[৬৩১] শামসুন নাহার, "নারী জাগরণী", *সওগাত*, ১৩৩৩; উদ্ধৃত, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, "মুসলিম নারী জাগরণের সূত্রপাত", *সওগাত*, ৬৩শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৭, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯৪

[৬৩২] শামসুন নাহার, 'নারী জাগরণী', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯৫

জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, মুসলিম নারী পর্দার অন্তরালে ঘুমিয়ে নেই। তুরস্কের শিক্ষামন্ত্রী খালেদা এদিব খানুম (হালিদা এদিব হানুম) নব্যতুর্কীর (Young Turks) অভ্যূত্থানের সময় হতেই জ্ঞান, প্রতিভা, শৌর্য এবং স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল মহিমায় বিশ্ব জোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন। আধুনিক তুরস্কের রূপকার মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের অপরাজেয় শক্তির পশ্চাতে তাঁর পত্মী লতিফা খানুমের বীরত্ব এবং শিক্ষার প্রভাব জগতকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। মিশরের নবজাগরণের মূলেও নারীর ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় দলের নেতা সা'দ জগলুল পাশা যখন স্বদেশ হতে নির্বাসিত হয়েছিলেন তখন তাঁর তেজস্বিনী পত্মী সুফিয়া খানমই স্বদেশবাসীকে পরিচালনার ভার স্বহস্তে নিয়েছিলেন। তিনি প্রকাশ্য সভায় জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় যে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা করতেন, তারই প্রভাবে মিশরীয় জনগণের প্রাণে উত্তেজনার অগ্নিহলক বয়ে যেত। পারস্যের মহিলাগণও গৃহকোণে নিদ্রিত নন। এ মহাজাগরণের যুগে তাঁরা অবগুণ্ঠন তুলে ফেলে মুক্তমনে পুরুষের সাহায্যকারী রূপে দাঁড়িয়েছেন। রাশিয়ার মুসলমান নারীগণও নবযুগের ও জীবনের বোধনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। ১৯২৩ সালে আজারবাইজান শাসনতন্ত্রের রাজধানী বাকু শহরে যে কনফারেন্স হয়েছিল তাতে রুশ সোভিয়েত গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রদেশ হতে প্রচুর নারী প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ১৯২৫ সালে লুফা প্রদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদে দশজন মুসলমান মহিলা নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৬৩৩]

বাংলার মেয়েদেরকে উৎসাহিত করার জন্য শামসুন নাহার মাহমুদ বর্হিবিশ্বের মুসলিম নারী জাগরণের ইতিহাস এভাবে তুলে ধরেন। তিনি চেয়েছেন বাংলায় নারী তাদের পূর্বের গৌরবোজ্জল দিনের কথা স্মরণ করে জেগে উঠুক। পর্দাপ্রথা ও অবরোধপ্রথার শিকল ভেঙ্গে জেগে উঠে শিক্ষা গ্রহণ করে মুক্তবুদ্ধির চর্চায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করুক। তাহলে তারা তাদের লুপ্ত গৌরব ও অধিকার ফিরে পেয়ে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এজন্য তিনি বাংলায় মেয়েদেরকে জেগে উঠার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি দীপ্তকন্ঠে বলেন,

> 'জাগো' বাংলার সুপ্তিমগ্না মোসলেম নারী জাগো। পৃথিবীর মুক্ত আলো বাতাস তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়েছে। মুক্ত বিশ্বের মহাকাশ তলে তুমি উন্নত মস্তকে দাঁড়াও। মোসলেম নারীর চিরন্তন মুক্তি শাশ্বত বন্ধনহীনতার কথা তুমি ভুলিয়া ... জাতীয় জীবনের গৌরব প্রতিষ্ঠায় উন্মাদিনী হও। অন্য দেশের বীর ভগিনীদের দেখ, তাহাদের হুঙ্কারে হুঙ্কারে তোমার হিম শীতল রক্তে ছায়ানটের নৃত্যরাগ জেগে উঠুক। ইরান, তুর্ক, মিশর ভগ্নিদের আদর্শে

---

[৬৩৩] ঐ, পৃ. ৫৯৬

অনুপ্রাণিত হও- তোমার ঘুমন্ত শক্তি উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের মত উদ্বেলিত হইয়া উঠুক, তাহাদের মত তুমিও আজ দেশের ডাকে গৃহহারা উন্নত- শিরে বিশ্ববেদীর সম্মুখে দাঁড়াও। তোমার স্পন্দনহীন প্রাণের বীণার উদার গম্ভীরে ঝঙ্কার উঠুক:

উঠ বীর জারা বাঁধ কুন্তল

মোছ এ অশ্রুনীর।[৬৩৪]

শামসুন নাহার মাহমুদ নারী জাগরণীমূলক আরো কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন, তার মধ্যে অন্যতম- ইরানে নারী জাগরণ (*সওগাত*, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৪), কুমারী জমিলা সিরাজুদ্দীন, পি.এইচ.ডি (*সওগাত*, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪), পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী বৈজ্ঞানিক (*সওগাত*, ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) এবং আন্তর্জাতিক নারী সম্মিলন (*বুলবুল*, ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪০)। শামসুন নাহার মাহমুদ ভারতবর্ষের মধ্যযুগের প্রখ্যাত পাঠান ও মুঘল মেয়েদের জীবন নিয়ে রচনা করেন জীবনীগ্রন্থ *বেগম মহল*।[৬৩৫] এ গ্রন্থটি ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। যে সকল অভিজাত নারীর গৌরবগাঁথা এখানে বর্ণিত হয়েছে তাঁদের নাম যথাক্রমে- সুলতান রাজিয়া, গুলবদন, নূরজাহান, মমতাজ মহল, জাহান আরা, জেবুন্নিসা ও চাঁদ সুলতানা। *বেগম মহল* কেবল জীবনীগ্রন্থ নয়, নারী জাগরণের সহায়ক শক্তির দাবিদারও বটে। শামসুন নাহার মাহমুদ রচিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *রোকেয়া রচনাবলী*, যা ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বলেন, "প্রথম যখন রোকেয়া জীবনী লেখার কল্পনা করি তখন রোকেয়া জীবিত ছিলেন। এ মহিমাময়ী নারীর সাথে কয়েক বৎসর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ আমার হয়েছিল। অবসর সময়ে গল্প করতে করতে তিনি নিজ জীবনের নানা বিচিত্র ছবি আমার চোখের সামনে তুলে ধরতেন। এভাবে তাঁর অদ্ভুত জীবনের এমন বহু নিগূঢ় তথ্যের সথে আমার পরিচয় ঘটে যা জানা অন্য কারও পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।"[৬৩৬]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের পরিশ্রম ও সংগ্রামী জীবন শামসুন নাহারের ব্যক্তিগত ও কর্মময় জীবনে প্রেরণার উৎস ছিল বলেই তিনি *রোকেয়া জীবনী* রচনায় উৎসাহিত হন। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে তিনি নিজের মায়ের দ্বারাও অনুপ্রাণিত হন বলে জানা যায়। অন্যদিকে শামসুন নাহার মাহমুদ *National Council*

---

৬৩৪ *ঐ*

৬৩৫ সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৮

৬৩৬ শামসুন নাহার মাহমুদ, "মুসলিম বঙ্গে নারী আন্দোলন", *রোকেয়া জীবনী*, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ২১০

of Women in India (1925), *All India Women's Conference* (1927), *Bengal Women's Education League* (1927) এবং *আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম* সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এসব সংগঠনের মাধ্যমে তিনি নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও অধিকার অর্জনের আন্দোলন করেছেন। *আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম* সম্পর্কে তিনি *রোকেয়া জীবনী*তে লিখেন,

> গভীর অন্ধকারে রোকেয়া শিক্ষার মঙ্গলদ্বীপ জ্বালিলেন; সমাজের ভবিষ্যৎ জননীদিগকে নিজের হাতে গড়িয়া তুলিবার ভার নিলেন; সেই সঙ্গে মুসলিম নারীর সামাজিক জীবন গঠন করিয়া তুলিবারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি *আঞ্জুমানে খওয়াতিনে ইসলাম* বা *মুসলিম মহিলা সমিতি* নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র এই মহিলা সমিতি। এই সমিতির ইতিহাসের সহিত তাঁহার বিশ বৎসরের কর্ম্মজীবনের কাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৬৩৭]

এ সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে শামসুন নাহার বলেন, *আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম* তার এ দীর্ঘকালের জীবনে কি কি কাজ করেছে তার বিবরণ আলোচনা করলে দেখা যায়, অতীতে বহু বিধবা নারী এর নিকট হতে অর্থ সাহায্য লাভ করেছে, বহু বয়ঃপ্রাপ্ত দরিদ্র কুমারী এর সাহায্যে সৎপাত্রস্থ হয়েছে, বহু অভাবগ্রস্থ বালিকা এর অর্থে শিক্ষা লাভ করেছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজসেবা ও পরোপকারের কথা উল্লেখ করলে এ সমিতি সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না। কলকাতার মুসলমান নারী সমাজের গত বিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় এ সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করে রেখেছে।[৬৩৮] ফলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় *আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম* তৎকালে মেয়েদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এ সমিতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ভূমিকা রাখে। শামসুন নাহার মাহমুদ এ সমিতিতে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে বাংলায় নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। ফলে মেয়েরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে একটি দৃঢ় অবস্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। বাংলায় নারী জাগরণে ও আন্দোলনে *আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম* এক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

---

[৬৩৭] *ঐ*, পৃ. ২১১

[৬৩৮] *ঐ*

বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে শামসুন নাহার মাহমুদ নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেই এগিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য ১৯৩২ সালের প্রথমদিকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও শামসুন নাহার মাহমুদের তৎপরতায় *আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে*র উদ্যোগে এক মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রায় তিনশত মুসলিম নারী অংশগ্রহণ করেন। এখানে নারী কল্যাণে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। যেমন- ১. বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির নিন্দা করে নারীশিক্ষার জন্য একটি আদর্শ পদ্ধতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহিলাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনে গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা। ২. বাংলার প্রত্যেকটি মেয়ে যাতে স্কুল-কলেজে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, প্রভৃতি।[৬৩৯]

মেয়েদের এ সভা সম্পর্কে তৎকালে নানা পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য বিবেকানন্দ বলেছেন, নারী যখন নিজেরাই নিজেদের কল্যাণের ভার নিবেন, নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করবেন, সেদিন থেকে এদেশে নারীজাতির প্রকৃত উন্নতির সূচনা হবে। সমাজে এবং পরিবারে বর্তমানে নারীর যে কর্তব্য ও অধিকার আছে, তা সংকুচিত ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সৌভাগ্যের ও আশার বিষয় নারী সচেতন হয়ে উঠছেন এবং নিজেদের কল্যাণের চিন্তা করছেন। বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ও সামাজিক আচরণে যত বৈষম্যই থাকুক, নারী সম্পর্কে রক্ষণশীল মত ও ধারণা প্রায় একরকম, অধিকাংশ পুরুষের এ মনোবৃত্তি নারীর কল্যাণের পথে একটা প্রবল বাধা। হিন্দু সমাজের শিক্ষিত অংশে নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার বর্তমান যুগে উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে ততটা হয়নি। এ কারণে হিন্দু সমাজের যে অংশে নারী উচ্চশিক্ষা এবং স্বাধীনতার অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছেন, মুসলমান সমাজের অনুরূপ অংশে মহিলারা ততটা সুবিধা পায়নি। এজন্য পুরুষের ধারণারও যেমন পরিবর্তন প্রয়োজন তেমনি নারীর মধ্যেও সংঘবদ্ধ উদ্যম আবশ্যক। উক্ত মহিলা সভা সম্পর্কে *আনন্দবাজার* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে,

> আমরা দেখিয়া আশান্বিত হইলাম কলিকাতার *বঙ্গীয় মুসলমান মহিলা সমিতি* এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। ... বিরুদ্ধ ও বিরূপ সামাজিক ও পারিবারিক আবেষ্টনীর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে সকল উচ্চাভিলাষী জ্ঞান পিপাসু মুসলমান মহিলা বর্তমান প্রচলিত উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহারা তাহাদের শক্তি সামর্থ্যের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে বদ্ধ পরিকর। মুসলিম মেয়েরা যাহাতে সুজননী, সুগৃহিনী ও সুনাগরিক হইয়া দেশের ও দশের এবং

[৬৩৯] মোশফেকা মাহমুদ, *শামসুন নাহার* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৪৬

জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তাহার জন্য তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই হইবে এই সমিতির উদ্দেশ্য।[৬৪০]

আনন্দবাজার পত্রিকায় এ সম্পর্কে আরো বলা হয়,

> ... সমাজ ও স্বদেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই সাধু উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন হইবেন, সে বিষয়ে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ... সমাজ চিরকাল কুসংস্কারের অন্ধকূপ হইয়া থাকিবে না। অবরোধ ও বুদ্ধির দাসত্ব ও ভীরুতা যেখানে অন্ধকারকে অধিকতর গাঢ়তর করিয়া রাখিয়াছে। সেইখানে জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা লইয়া যাইবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন যাঁহারা তাঁহারা নিশ্চয় শক্তিমান ও হৃদয়বানদের সাহায্য পাইবেন।[৬৪১]

বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সমিতি (আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে)র সম্মেলন তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সম্মিলনে একটি কার্যনিবাহী কমিটি গঠিত হলে শামসুন নাহার মাহমুদ তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। এটি দ্বারাই প্রমাণিত হয় এখানে তাঁর গুরুত্ব কেমন ছিল। সমসাময়িক *সওগাত* পত্রিকায় এ সম্মেলনের সফলতা এবং নারীর আরো অগ্রযাত্রার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এ সভা সম্পর্কে সমসাময়িক কালে *আজাদ* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়-

> যে সময় সমগ্র ভারতে তথা সমগ্র জগতে নারী জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, সে সময় মা বোনেরাও দেশের ও দশের কার্যে তাহাদের পুত্র ও ভ্রাতাদের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছে। মুসলিম মহিলারাও যে চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, তাহা নিশ্চিত। কলিকাতা মুসলিম মহিলা সম্মিলনের বিবরণী পাঠ করিয়া সেই ধারণা আরো দৃঢ় হইয়াছে। ... তিন শতাধিক শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্তা মুসলিম মহিলা সম্মিলনে সমবেত হইয়া যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত দেশবাসীর পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ... আমাদের কলিকাতাবাসী মা-বোনেরা অন্ধ-কুসংস্কার দূরে ঠেলিয়া যুগের আলোতে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।[৬৪২]

---

[৬৪০] "স্ত্রী জাতির কল্যাণ", *আনন্দবাজার* পত্রিকা; উদ্ধৃত শাহিদা পারভীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০০-১০১

[৬৪১] *ঐ*, পৃ. ১০২

[৬৪২] *ঐ*

শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯৩৩ সালে নিজের ভাই হাবীবুল্লাহ বাহারকে সাথে নিয়ে যুগ্ম সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন সাহিত্য পত্রিকা *বুলবুল*।[৬৪৩] *বুলবুল* পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল নারী জাগরণের বাণী বাংলার সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সে অনুসারে নারীসমাজকে সচেতন এবং জাগ্রত করা। উল্লেখ্য *বুলবুল* প্রকাশকালে কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, কাজী আবদুল ওদুদ, দিলিপকুমার রায়, শ্রীমতি ইন্দিরা দেবীসহ প্রমুখ প্রতিথযশা ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত প্রশংসা করেন। কাজী নজরুল ইসলাম *বুলবুল* পত্রিকা প্রকাশে আনন্দ প্রকাশ করে তার *সিন্ধু-হিন্দোল* কাব্যগ্রন্থ এ দুই ভাই-বোনের নামে উৎসর্গ করেন।[৬৪৪] *বুলবুল* পত্রিকার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশংসা করেন। বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে *বুলবুল* পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, এ পত্রিকা বাঙালি নারীর সাহিত্য রচনার আরেকটি ক্ষেত্র রচনা করে। পত্রিকাটির লেখায় নারীর অধিকার এবং সামাজিক বাধা বিপত্তির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। এ পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে পর্দা ও অবরোধ বিষয়ক একটি বক্তব্যে দেখা যায়,

> জনৈক হজ্বযাত্রী 'যুগভেরী' পত্রিকায় লিখিতেছেন: 'মক্কা শরীফে আরব রমণীরা স্বাধীনভাবে রাস্তায় হাটে বাজারে দোকানে, ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বেড়ায়, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল রমণী সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাতে কোন বাধাবিঘ্ন নাই। ... রমণীরা রীতিমত বোরকা পরিয়া উটে চড়িতেছে, ঘোড়ায় চড়িতেছে, গাধায় চড়িয়া বেড়াইতেছে। আরব রমণীর যে তেজ, যে সাহস যে উদ্যম তাহা আমাদের দেশের পুরুষেরও নাই। এদেশে রমণীদের স্বাস্থ্য ভাল, সকলেই হৃষ্ট-পুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং অতিশয় কর্ম্মঠ। ... সর্বস্থানে সর্ব্ব অবস্থায় স্ত্রীলোকদের

---

[৬৪৩] বাংলা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয় উনিশ শতকের প্রথমভাগে। কিন্তু এসব পত্রিকা পুরুষ সম্পাদনা করেছেন। এ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নারী পত্র-পত্রিকা সম্পাদনায় আসেন। এক্ষেত্রে আবার হিন্দু নারী অগ্রগামী ছিলেন। তৎকালে স্বর্ণকুমারী দেবী *ভারতী* পত্রিকা, থাকমনি দেবী *অনাথিনী* পত্রিকা এবং মোহিনী দেবী *পরিচারিকা* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। অন্যদিকে করিমুন্নেসা খানম *আহমদী* এবং নবাব ফয়জুন্নেছা *ইসলাম প্রচারক* এর প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। মুসলিম নারী সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা *অন্বেষা*, যা সফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় ১৩২৮ সনে বৈশাখ মাসে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য চার বছর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৩৩৯ সনে পৌষ মাসে কলকাতা থেকে জাহান আরা চৌধুরীর সম্পাদনায় *রূপরেখা* এবং ১৩৪০ সনে *বর্ষবাণী* (বার্ষিক) পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। শামসুন নাহার মাহমুদের সম্পাদনায় *বুলবুল* পত্রিকাও ১৩৪০ সনে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে একজন মুসলিম নারী শামসুন নাহার মাহমুদ তাঁর ভাইকে সাথে নিয়ে *বুলবুল* পত্রিকা প্রকাশ করে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতায় পরিচয় দেন।

[৬৪৪] *সিন্ধু-হিন্দোল* কাব্যগ্রন্থ ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গপত্রে নজরুল লিখেন, "আমার এই লেখাগুলি আদরের ভাইবোন বাহার ও নাহারকে দিলাম"। (শামসুন নাহার মাহমুদ, 'নজরুলকে যেমন দেখেছি', নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৫০, পৃ. ২৫; *জানানা মাহফিল*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৭

অবাধগতি। আরবে পর্দ্দাপ্রথা পূর্ণভাবে আছে, কিন্তু অবরোধের নামগন্ধও নাই। আমাদের দেশের রমণীদের মতন তাঁহারা বন্দিনী নন।[৬৪৫]

বুলবুল পত্রিকা সম্পাদক শামসুন নাহার মাহমুদ অভিমত প্রকাশ করেন শুধু ভারতবর্ষের নারী পর্দার অন্তরালে অবরুদ্ধ হয়ে বসবাস করছে যেখানে পৃথিবীর নানা মুসলিম দেশের নারীসমাজ পর্দাপ্রথা হতে নিজেদেরকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতবর্ষে যাঁরা অবরোধ প্রথা মেনে চলেন তাদের সংখ্যা শতকরা পনরো জনেরও কম। তবে চাষী ও শ্রমিক শ্রেণির মেয়েদের পক্ষে পর্দার আড়ম্বর বজায় রাখা মোটেই সম্ভব নয়। পুরুষের সথে সাংসারিক কাজ কর্মেই তাদের সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। অন্যদিকে তথাকথিত আভিজাত সম্প্রদায় যাঁদের এমন সচ্ছল অবস্থা যে মেয়েদের বসিয়ে রাখলেও চলতে পারেন। তাঁরাই শুধু পর্দা মেনে চলেন। উল্লেখ্য পর্দাপ্রথা ইসলামে অনুমোদিত এমন একটি বিষয়, যা আলোচনায় এলেই তর্ক উঠে। তবে মুসলিম জগত থেকে পর্দার প্রভাব কমে যাচ্ছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তুরস্কের কথা ছেড়েই দিলাম, কিছুদিন আগে পারস্যেও আইন করে পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামের জন্মস্থান হেজাজেও পর্দা বলতে আমরা যা বুঝি তার অস্তিত্ব এখন আর নেই।[৬৪৬]

শামসুন নাহার মাহমুদ পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর বলিষ্ঠ অবস্থান প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জানতেন অন্তঃপুর ছেড়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করতে যাওয়া নারীর উচিত কিনা তা নিয়ে সর্বত্র একটি বিতর্ক রয়েছে। এমনকি বিশ্বের অনেক মনীষী নারীবাদ বিরোধী। মাতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে নারীর স্বাধীন জীবন যাপন তাদের পছন্দ নয়। তাই অনেক সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে কোণঠাসা করা হয়েছে। তবে বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান নারীসমাজ খানিকটা আত্মসচেতন হয়ে উঠে। তাই তাঁরা পড়ালেখা শিখে অর্থ উপার্জনের চিন্তাও শুরু করেন। শামসুন নাহার মাহমুদ নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় জোর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন, নানা কারণে পৃথিবীর অনেক দেশেই বাধ্য হয়ে বহু সংখ্যক নারী অবিবাহিত জীবন যাপন করে। এদেশের অবস্থা এখনও এতটা গুরুতর না হলেও পণপ্রথা, যুবকদের অসচ্ছলতা ও বিয়েতে অনিচ্ছা ইত্যাদি কারণে বাংলার সমাজের অনেক নারীকে স্থায়ীভাবেই হোক, কি অস্থায়ীভাবেই হোক-কুমারী জীবন যাপন করতে হয়। অদূরভবিষ্যতে যে সকল মেয়ের বিয়ে করার সুযোগ ঘটবে না তারা কোনো বৃত্তি অবলম্বন না করে অন্যের গলগ্রহ হয়ে

[৬৪৫] "মক্কা শরীফে পর্দ্দাপ্রথা", *বুলবুল*, তৃতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৩, কলকাতা, পৃ. ৩১৬

[৬৪৬] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৭

থাকবে, এটা সমীচীন নয়। তাছাড়া বিবাহিত সধবাদের যদি কিছু কিছু রোজগার করার উপায় থাকতো, তবে নিজের এবং পরিবারের জন্য খুব ভালো হতো। এদেশে মেয়ে ডাক্তার, ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্স ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব কতখানি তা বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শিক্ষিত মেয়েরা দল বেঁধে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়তে শুরু করলেও এ সকল অভাব দূর হবে না। তবে যতই সমালোচনা থাকুক, নারী (কুমারী, সধবা বা বিধবা) যদি প্রয়োজনের তাগিদে কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করতে আরম্ভ করেন, সকলের পক্ষেই তা খুব কল্যাণকর হবে।[৬৪৭]

উপরোক্ত আলোচনায় শামসুন নাহার মাহমুদের চিন্তাচেতনায় আধুনিকতার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। পণপ্রথা, পুরুষের বেকারত্ব প্রভৃতি কারণে নারীসমাজে দুর্গতি নেমে এলে নারী যেন তাঁর নিজের ও পরিবারের হাল ধরতে পারে এজন্য তাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া অত্যন্ত জরুরি। এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলার মেয়েদের বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার কথা উল্লেখ করেন। শামসুন নাহারের মতে বাংলার মেয়েরা শিক্ষকতায় আসতে পারে, কারণ নারীশিক্ষার জন্য সমাজে মেয়ে শিক্ষকের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আবার বাঙালি মেয়েরা অনেক সময় পুরুষ ডাক্তারের কাছে লজ্জায় মেয়েলি রোগের চিকিৎসার জন্য অনীহা প্রকাশ করে। তাই মেয়ে ডাক্তারের চাহিদাও ব্যাপক। সুতরাং খুব সহজেই এসব পেশায় বাংলার মেয়েরা পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারে এবং এ থেকে তারা যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারে। অবার তৎকালীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে একজন নারী হয়ে *বুলবুল* পত্রিকা প্রকাশ করে শামসুন নাহার মাহমুদ দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। এ সম্পর্কে মুহম্মদ বরকতুল্লাহ বলেন,

> মোঘল যুগে কিন্তু পুরুষের বাহু বলের চর্চ্চাই বেশি পছন্দ করিলেও ঘরে ঘরে রমণীরা পার্শী সাহিত্যের চর্চা করিতেন। বর্তমান যুগেও আমরা দু'চারজন মুসলিম সুলেখিকার সাক্ষাৎ পাই। সম্ভবত: পুণ্যস্মৃতি মিসেস আর এস হোসেনই এই সকল লেখিকার অগ্রণী। অধুনা এক মুসলিম মহিলা একখানি উচ্চাংগের ত্রৈমাসিক পত্রিকার (*বুলবুল*) সম্পাদনে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদের বিস্ময় উৎপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু কত মুষ্টিমেয় এই নারী লেখিকার দল।[৬৪৮]

শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯৩৩ সালে *All India Women's Conference* এ নিজেকে সংযুক্ত করেন এবং এ সম্মিলনের করাচীতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দেন। এখানে তিনি সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃত কাউর, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, বেগম শাহনেওয়াজ, বেগম হাবিবুল্লাহ, বেগম শীফা হামিদ

---

[৬৪৭] 'কলস্রোত' (নারীর ধনোৎপাদন), *বুলবুল*, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩, পৃ. ৬৩৯-৬৪০

[৬৪৮] মোশফেকা মাহমুদ, *শামসুন নাহার*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩

আলী, লেডী হারুন প্রমুখ হিন্দু-মুসলিম নারী-নেত্রীর সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হন। ১৯৩৪ সালে কলকাতায় 'নিখিল ভারত নারী সম্মিলনের' বার্ষিক অধিবেশনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বৈধ নারীপাচার দমন সম্পর্কে *Immoral Traffic Bill* পেশ করার স্বপক্ষে তিনি জোর আন্দোলন চালান।[৬৪৯]

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের আন্দোলনের চাপে 'ভারত শাসন আইন' পাশ করলেও মেয়েদের ভোটাধিকার সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত হয়নি। উল্লেখ্য এ আইনে নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকায় মহিলা আসন বরাদ্দ হয় এবং অভিজাত শ্রেণিকেই শুধু ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। ফলে এসময় সার্বজনীন নারী ভোটাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। পাশাপাশি পর্যাপ্ত মহিলা আসন বরাদ্দের জন্য তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। শামসুন নাহার মাহমুদ এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এরই প্রেক্ষিতে বিহার ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব গভর্ণর স্যার লরী হ্যামন্ডের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় এ কমিটির কাছে শামসুন নাহার মাহমুদ বাংলার মেয়েদের রাজনৈতিক দাবি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করেন। এ সময় হ্যামন্ড কমিটির সাথে বাংলার মেয়েদের বাদানুবাদ হয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, মহিলা সিট সম্বন্ধে হ্যামন্ড কমিটিতে বাংলার মেয়েদের মতামত জ্ঞাপন করার জন্য *নিখিল ভারত নারী সম্মিলন* কলকাতা হতে দু'জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে, সম্মিলনের পক্ষ হতে অন্যতম প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সম্মিলনের অপর প্রতিনিধি ছিলেন মিসেস এন. সি সেন।[৬৫০] শামসুন নাহার মাহমুদ সমগ্র বাংলার নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায় নারীর ভোটাধিকার হ্যামন্ড কমিটির কাছে দাবি করে বলেন, ভোটাধিকার যতদূর সম্ভব বিস্তৃত হওয়া উচিত এটাই আমাদের মত। সুতরাং প্রথম হতে সমগ্র বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে শুধু কলকাতা, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে মহিলা নির্বাচন কেন্দ্রকে সীমাবদ্ধ করার প্রস্তাবেরই আমরা বিরোধী ছিলাম।[৬৫১] হ্যামন্ড কমিটির সামনে তিনি আরো তুলে ধরেন,

> ... গভর্ণমেন্ট আসন বন্টন ব্যাপারে বাংলায় মফঃস্বল শহরের মেয়েদের প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন সে বিষয়ে আমি কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। শুধু কলিকাতা, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার দিলেই সমগ্র বাংলাদেশের দাবি মিটিল না-বরং চট্টগ্রাম প্রভৃতি উন্নতিশীল স্থানগুলিকে বাদ দেওয়ায় বাংলাদেশে নারী ভোটাধিকার যে

---

[৬৪৯] *ঐ*, পৃ. ৮৪

[৬৫০] শামসুন নাহার, "বাংলা কাউন্সিলে মহিলা সিট ও হ্যামন্ড কমিটি", *সচিত্র বর্ষবাণী*, তৃতীয় বর্ষ, ১৩৪২, কলকাতা, পৃ. ১৫৬; উদ্ধৃত, শাহিদা পারভীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩

[৬৫১] *ঐ*, পৃ. ১৫৫

একেবারে অর্থশূণ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, এ কথা আমি কমিটিকে বিশেষভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম।[৬৫২]

শামসুন নাহার মাহমুদ বাঙালি নারীর ভোটাধিকার এবং মহিলা আসন বরাদ্দের ব্যাপারে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। নারীর সার্বজনীন অধিকার এবং তা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তিনি বলিষ্ঠভাবে বলেন যে, "কোন একটি বিশেষ শহরকে নির্বাচন কেন্দ্র হতে বাদ দেওয়া বা তার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় বলতে আমি চাই না। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মেয়েকে নিরপেক্ষভাবে তার নায্য অধিকার দেওয়া হোক এটাই আমাদের কামনা।"[৬৫৩] এসময় বাংলাদেশের মেয়েরা ভোটাধিকার লাভ করলেও এটি ছিল সীমিত। অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় সার্বিকভাবে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়নি। পড়ালেখার মাত্রাভেদে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। এ সম্পর্কে শামসুন নাহার বলেন,

> স্থির হইয়াছে ইহারা ম্যাট্রিক পাশ না হইলে ভোট দিতে পারিবেন না। বাংলার মেয়েরা কিন্তু এই ব্যবস্থায় মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকল সমাজে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ধারী অনেক মেয়ের চেয়ে বেশি উন্নত, অথচ ম্যাট্রিক পরীক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করিবার সুযোগ তাহাদের হয় নাই। এই শ্রেণীর মহিলাদের এমনও কেহ কেহ আছেন স্ত্রীশিক্ষা ও নারী প্রগতি আন্দোলন যাঁহাদের জীবনের ব্রত, কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুসারে ইহারা নিজ শিক্ষার গুণে ভোট দিবার অধিকার পাইলেন না।[৬৫৪]

সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ। তৎকালীন বাংলার নারী সমাজ তাঁর নেতৃত্বে জাগরিত হয়েছেন। সভা সমিতির মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের অধিকার পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জন করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বাংলার নারী সমাজকে উৎসাহিত করতে শামসুন নাহার মাহমুদ ইংল্যান্ডের ভোটাধিকার আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা লাভের আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন,

> ... ইহাদের এই লড়াইয়ের ইতিহাসের দু'একটা বিষয় আমাদের বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য। প্রথমত: আমরা দেখতে পাই নারীর অধিকার কেহ তাহাদিগকে হাতে তুলিয়া দেই নাই। আগাগোড়া

[৬৫২] *ঐ*, পৃ. ১৫৭

[৬৫৩] *ঐ*, পৃ. ১৫৮

[৬৫৪] বেগম শামসুন নাহার, *"নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার"*, *সওগাত* (মহিলা সংখ্যা), কার্তিক, ১৩৪২, পৃ. ৪৭০

নিজের চেষ্টাতেই শত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া তাঁহারা আপনাদের ন্যায্য বুঝিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত: বারে বারে প্রাণপণ চেষ্টা বিফল হইলেও ইহাঁরা একটুও দমেন নাই। যাঁহাদের কাছ থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি আশা করিয়াছেন, হয়ত শেষ মুহুর্তে তাঁরাও বিরুদ্ধদলে ভিড়িয়াছেন, এমন কি নারী সমাজের মধ্যে হইতেও সময় সময় প্রবল বাধা আসিয়াছে। এক দল মহিলা সভা সমিতি ইত্যাদি গঠন করিয়া এই আন্দোলন বাধা দিবার প্রবল চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা পঞ্চাশ বৎসর একমনে একই লক্ষ্য ধরিয়া চলিয়াছেন; তাহাদের সাধনাই শেষে জয়যুক্ত হইল।[৬৫৫]

নিখিল ভারত নারী সম্মিলনী'র যাবতীয় ঘটনাবলি তিনি বিবৃত করেন নারী আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থ মনে রেখে। তিনি বলেন, বিশ্বনারী ও ভারতনারীর মধ্যে এবার রচিত হলো এক অপূর্ব মধুর মমতা ও দরদের সম্পর্ক। প্রগতির পথে ভারত নারী এ দিক দিয়ে ভারতের পুরুষকেও অতিক্রম করে গেলেন, বিষয়টি লক্ষণীয়[৬৫৬] প্রকৃতপক্ষে এ সম্মেলন বিভিন্ন দেশের নারীর মধ্যে একটা প্রাণের যোগসূত্র স্থাপন করে। এছাড়া নারী-পুরুষের নানা সমস্যাবলি এ সম্মেলনে আলোচনা হয়। সে আলোচনার ভিত্তিতে সচেতনতা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য ছিল। এ সম্পর্কে শামসুন নাহার মাহমুদ বলেন, গ্রাম সংস্কারে বালিকাদের শিক্ষা পদ্ধতি, মেয়েদের সমাজসেবা, শিশুপালন, চলচ্চিত্র, স্কুলের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নারীর আইনগত অধিকার, নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার, মাতৃমঙ্গল, নারী ও শিশু ক্রয়-বিক্রয়, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়।[৬৫৭]

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন ভারতবর্ষ তথা বাংলার নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনকে আরো একধাপ এগিয়ে দেয়। নারী আন্দোলনের রূপরেখা চিহ্নিত হয়, এখানে বাঙালি নারীর নানা সমস্যা আলোচনার পাশাপাশি সেগুলি হতে উত্তোরণের দিক নির্দেশনাও পারস্পারিক আলোচনায় উঠে আসে। বাংলার মেয়েদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে বর্হিদেশে মেয়েদের জানার সুযোগ ঘটে। এ সম্পর্কে সম্মেলনের অধিবেশনের এক পর্যায়ে রুমানিয়ার প্রতিনিধি প্রিন্সেস কান্তাকুজেন বলেন, "এদেশের মেয়েদের সঙ্গে কয়েকদিন মিশিবার সুযোগ পাইয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে ইহারা অসাধারণ বুদ্ধিমতী, ইহারা যেভাবে সম্মিলনের কাজ পরিচালনা করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় সুযোগ

---

[৬৫৫] *ঐ*, পৃ. ৪৭১; শাহিদা পারভীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৫

[৬৫৬] শরিফা হামিদ আলী, "আন্তর্জাতিক নারী সম্মিলন", *বুলবুল*, ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৩, পৃ. ৪৩

[৬৫৭] *ঐ*, পৃ. ৪৫

পাইলে ইউরোপের যেকোন উন্নত ও সভ্য জাতির মেয়েদের সঙ্গে ইহারা পাল্লা দিতে পারেন। ভারতীয় ভগ্নিদের উদ্দেশ্যে আমি আজ সহস্র সালাম জানাই" ।[৬৫৮] এ সম্মেলনের অভিভাষণে শামসুন নাহার মাহমুদ বাঙালি মুসলিম নারী সম্পর্কে বলেন,

> পাষাণ কারা ভাঙ্গিয়াছে। অবরোধের প্রাচীর মুসলমান মেয়েদের আর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। যুগ যুগান্তরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া মুসলিম নারী আলোকের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এই আলোকের অভিযানে যাঁহারা মাতিয়াছেন একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে বলিয়া আমি মনে করি।[৬৫৯]

তিনি নারী প্রগতির বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে মুসলিম নারী সম্পর্কে আরো বলেন,

> মুসলমান মেয়েদের এমন অনেকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে যাহা অন্য সমাজের মেয়েদের নাই। কি শিক্ষায়, কি সমাজে, কি আইনগত ব্যাপারে অধিকার তাহাদের অপর্যাপ্ত। ... বাহিরের মিথ্যা বন্ধন একবার কাটিতে পারিলেই হইল, তাহার পর তাঁহাদের গতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।[৬৬০]

বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতি শামসুন নাহার মাহমুদের চরম আকাঙ্খা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন বাঙালি নারীর সুদিন আসবেই। তাই তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব আমাদের উপর পড়েছে। সেদিন হয়ত দূরে নয়, যেদিন খালেদা খানম, সেলমা লেগারলফ এবং সাইগ্রিদ আর্নফ্রেড, গ্রোজিয়া দেলেদ্দা, এথেন মেনিন, পার্লপাক বা ভিকিমে আমাদের মধ্যেও জন্ম নিবেন। তাঁদের আগমনের আশায় আমরা কাজ করে যাই, অনাগত ভবিষ্যতের সুন্দরকে জানাই প্রকাশিত আলোতে আসার শুভ আহ্বান।[৬৬১]

শামসুন নাহার মাহমুদের অপরিসীম প্রচেষ্টায় *বঙ্গীয় আইন সভায়* বাংলার নারীর ভোটাধিকার ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়।[৬৬২] প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ শতকের প্রথম দশকে যখন

---

[৬৫৮] *ঐ*, পৃ. ৪৮

[৬৫৯] মোশফেকা মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫

[৬৬০] *ঐ*, পৃ. ১১৬

[৬৬১] *ঐ*

[৬৬২] কনক মুখোপাধ্যায়, *ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা*, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২২; মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৮

স্বদেশী আন্দোলনসহ নানামুখী স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে তখন নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন সচেতন রাজনৈতিক দাবি হিসেবে নারী সমাজের মধ্য থেকেই উত্থাপিত হয়। ১৯১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর মন্টেগু চেমসফোর্ড মিশনের কাছে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এ দলে বেগম হযরত লোহানী ছিলেন মুসলিম নারী প্রতিনিধি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ১৪ জন মহিলা প্রতিনিধির দল দাবি তোলে যে নারীসমাজের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাতৃমঙ্গলের উন্নতি করতে হবে এবং পুরুষের সমান ভোটাধিকার দিতে হবে। কিন্তু এ সময় এ দাবি গৃহীত হয়নি। ১৯১৮ সালে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস ভারতীয় মেয়েদের ভোটাধিকার দাবি সমর্থন করে। এসময় ভোটাধিকারের দাবিতে *Women's Indian Association* গড়ে ওঠে। এ সংগঠনে প্রথম থেকে সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, রাজকুমারী অমৃত কাউর, রাজেশ্বরী নেহেরু, হামিদা আলী, ডা. মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী প্রমুখ নারী যুক্ত ছিলেন। ১৯২১ সালে এ সংগঠনের পক্ষ থেকে অ্যানি বেসান্ত ও সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে মহিলাদল স্মারকলিপি দেয়। এ স্মারকলিপিতে উল্লেখ ছিল- ১. সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার দিতে হবে ২. যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতে হবে এবং ৩. নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। ঠিক এ সময় ভারতীয় মেয়েরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললে মহিলাদের ভোটাধিকার বিষয়টি প্রদেশের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯২১ সালে মাদ্রাজের আইনসভা প্রথম মেয়েদের ভোটের অধিকার দেয় এবং ১৯২৫ সালের মধ্যে উড়িষ্যা ও বিহার ছাড়া ভারতের সব প্রদেশের আইনসভায় ভিন্ন ভিন্নভাবে নারীর ভোটাধিকার দেওয়া হতে থাকে। সবশেষে ১৯৩৫ সালে ভারতের নারীসমাজ ভোটাধিকার লাভ করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।[৬৬৩]

১৯৩৫ সালের ১৮-২৫ এপ্রিল তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে *আন্তর্জাতিক মহিলা কংগ্রেসের* দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শামসুন নাহার মাহমুদ সহ ভারতীয় মুসলমান নারী এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এখানে বহুবিবাহ রহিতকরণ এবং ভারতীয় নারীর নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের অসুবিধার বিষয় আলোচিত হয়। এ সকল দাবি-দাওয়া আন্তর্জাতিক মহিলা সংঘ সর্বান্তকরণে সমর্থন করে।[৬৬৪] ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *International Council of Women* এর উদ্যোগে কলকাতায় একটি আন্তঃদেশীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের চল্লিশটি দেশের নারী প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে যোগদান করেন। *আঞ্জুমানে*

---

[৬৬৩] মফিদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬

[৬৬৪] শরিফা হামিদ আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯

*খাওয়াতিনে ইসলামে*র পক্ষ থেকে বাংলার মুসলিম মেয়েদের প্রতিনিধি হিসেবে শামসুন নাহার মাহমুদ এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর মত বিনিময় ছাড়াও এখানে নারী সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় যেমন- গ্রাম সংস্কার, শিক্ষা পদ্ধতি, সমাজসেবা, শিশুপালন, ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাদ্য ও স্বাস্থ্য, নারীর আইনগত অধিকার, নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার, মাতৃমঙ্গল, নারী ও শিশু ক্রয়-বিক্রয়, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি আলোচনা হয়।[৬৬৫] শামসুন নাহার মাহমুদ এ সম্মেলনে তাঁর ভাষণে- বাঙালি মুসলিম নারীর অগ্রগতির অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করেন এবং এসকল সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীতে শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯৪১ সালে *নিখিল ভারত নারী সমিতি*র কলকাতা শাখার বার্ষিক অধিবেশনে "মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত কিনা" শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শামসুন নাহার মাহমুদ বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। নারীশিক্ষার মাধ্যমে তিনি নারীর কল্যাণ করতে প্রয়াসী হন। শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে নারী জাগরণ সম্ভব বলে নারীশিক্ষার প্রতি তিনি অনুরাগ দেখিয়েছেন। সাহিত্যের মাধ্যমে নারীকে জাগরিত করা সম্ভব ভেবে তিনি সাহিত্য রচনা করেন। এছাড়া তৎকালীন বিভিন্ন নারী সংগঠনে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে সংযুক্ত করে, নারী অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সরাসরি নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তাই বলা যায়, মুসলিম নারী জাগরণের ইতিহাসে রোকেয়া যেখানে শেষ করেন, ঠিক সেখান থেকে শামসুন নাহার মাহমুদ শুরু করেন। বাংলার মুসলমান নারী সমাজের নারী মধ্যে তিনি যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়েছিলেন, বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনীতিতে তারই প্রচণ্ড একটি আলোড়ন পরিলক্ষিত হয়। শামসুন নাহার মাহমুদ এ জাগরণের বলিষ্ঠ একজন কর্মী, রোকেয়ার অরদ্ধ কাজ সম্পাদনের প্রধান চালিকা শক্তি।[৬৬৬]

প্রতিথযশা নারী সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে এক রক্ষণশীল জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এ পরিবারটি ছিল তার মাতুলালয়। তার পারিবারিক পরিমণ্ডলে অত্যাধিক পর্দার কঠোরতা ছিল। সুফিয়া কামাল রোকেয়ার মত স্কুলে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাননি। তিনি অন্তঃপুরে বাংলা, আরবি ও ফার্সি ভাষা শিখেন এবং মামার লাইব্রেরি থেকে প্রচুর

---

[৬৬৫] মোশফেকা মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪

[৬৬৬] মজির উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা*, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ৯০-৯৯

সংখ্যক বই পড়ে জ্ঞানার্জন করেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামীর সহযোগিতায় *তরুণ* পত্রিকার ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় সুফিয়া কামালের লেখা একটি গল্প মিসেস এস এন হোসেন নামে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে সুফিয়া কামাল উল্লেখ করেন,

> বারো বছর বয়স হতেই বিয়ে হয়ে গেল। তখনও কি আত্মপ্রকাশের সাধ্য ছিল? শায়েস্তাবাদ ছেড়ে বরিশাল এলাম। বরিশালের অশ্বিনী বাবুর ভাইয়ের ছেলে 'তরুণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করলেন। লেখা চাই। আমার স্বামী সে পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। তখন তাঁর মনে হলো আমিও ত লিখি। ২/৩টি লেখা নিয়ে সম্পাদককে দেখাতে একটি গল্প ও কবিতা মনোনীত করলেন। আমার লেখা প্রথম গল্প 'সৈনিক বধূ' নামে *তরুণ* পত্রিকায় ছাপা হল। আশ্চর্য সেদিনের হিন্দু-মুসলমান সকলেই অত্যন্ত প্রশংসা করে আরো লেখার জন্য তাগাদা দিলেন।[৬৬৭]

সুফিয়া কামাল বলেন, তৎকালে সুকুমার দত্তের স্ত্রী বি.এ পাশ করে বরিশাল এসে *মাতৃমঙ্গল* ও *শিশুসদন* সমিতি গঠন করলেন। *বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়ে*র মধ্যে এ সমিতির সভা হতো, বোরখা পরে চারদিক ঘেরা ঘোড়ার গাড়ী করে সাবিত্রী দিদির সাথে ঐ সভায় যোগদানের জন্য যেতাম। কী হাস্যকর সে যাত্রা। তবুও কী অসীম তৃপ্তি লাভ করতাম। অসহায়, অশিক্ষিত মায়েদের শিশুদের সাথে। আরও হিন্দু মহিলারা ছিলেন। আমার তখনও কৈশোর কাটেনি। বন্ধু স্থানীয় ছেলেরা হাসত। বলত, ওদের (সবিত্রীদিরও তখন ছেলেমেয়ে হয়নি) নিজেদেরই ছেলেমেয়ে নেই, ওরা আবার শিশু মঙ্গল করে। আমরা জেদ করে আরও বেশি করে উৎসাহ দেখাতাম।[৬৬৮] উল্লেখ্য এ সময় কামিনী রায় বরিশালে আসেন এবং একজন মুসলিম নারী সুফিয়া কামালের প্রতিভায় মুগ্ধ হন। তিনি সুফিয়াকে উৎসাহিত করতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন।

অন্যদিকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সুফিয়া কামালের রচিত কবিতা পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং *অভিযান* পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশ করায় সহযোগিতা করেন। আবার মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁর *সওগাত* পত্রিকায় সুফিয়ার কবিতা নিয়মিত প্রকাশ করেন। এভাবে সুফিয়া কামাল স্বামীর সহায়তায় কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন।[৬৬৯] তিনি কলকাতায় কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ

---

[৬৬৭] সুফিয়া কামাল, 'একালে আমাদের কাল', *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৮০

[৬৬৮] হাসনা বেগম, "দেশ ও মানবদরদী সুফিয়া কামাল", *নারীমুক্তি বেগম রোকেয়া ও অনন্যা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫

[৬৬৯] সুফিয়ার স্বামী নেহাল হোসেন অত্যন্ত প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় সুফিয়া *সওগাত* পত্রিকায় ছবিসহ কবিতা প্রকাশ করেন। তিনি বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রথম বিমানে উড্ডয়ন করেন (১৯২৯)। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সুফিয়াকে বিমানে উড্ডয়নের জন্য সংবর্ধনা দেন। (সুফিয়া কামাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮১)

বসু, লীলা রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হন এবং নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানেও যোগদান করার সুযোগ পান। এ সম্পর্কে সুফিয়া কামাল উল্লেখ করেন,

> ... আমরা চরভাঙ্গা, ঘরভাঙ্গা হয়ে কলকাতা এলাম। সেটা তিরিশের কথা। 'সওগাত' এ লেখা দিলাম। কাজী নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে থাকতেন। মাঝে মাঝে সওগাত অফিসে আসতেন। একদিন এসে শুনলেন আমি কলকাতায় আছি। হঠাৎ এক দুপুরে প্রাণোচ্ছ্বাসের প্লাবন ছড়িয়ে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। ... তাঁর সুফিয়া ডাক শুনে আমরা ত হতভম্ব ... সুফু। আমার বোন নেই। তুমি আমাকে দাদু ডাকবে ... কবি দাদুর মাধ্যমেই সওগাত সম্পাদক নাসিরুদ্দীন সাহেবের বাড়ী ১১নং ওয়েলেসলী স্ট্রীটে যাওয়া আসার সূত্রপাত। সেই থেকে নাসিরুদ্দীন সাহেব আমার সুখে-দুঃখে বিপদে শোকে অগ্রজের ভূমিকা পালন করে সদা সতর্ক স্নেহ দৃষ্টি দিয়ে সাহিত্য সাধনায় আমাকে নিয়োগ রেখেছেন। এ কথা আমি কখনও ভুলব না।[৬৭০]

সুফিয়া কামাল আরো স্মৃতিচারণ করে বলেন যে,

> কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহও কি কম পেলাম? তাঁর জন্মদিনে তাঁকে একটা কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম। তিনিও সুন্দর করে ক'টি কবিতার লাইন লিখে আমাকে পাঠালেন। সাদর আমন্ত্রণ জানালেন কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যেতে। গেলাম একদিন বোরখা পরে। ... তাঁর বাড়ীতেই দেখা হয়েছে নেতাজী সুভাষ বোসের সঙ্গে। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে। তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে। ... অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন আমার লেখার, উৎসাহ দিয়েছেন। শান্তি নিকেতনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু তখন কি আমার সে অবরোধ ঘুচিয়ে যাবার উপায় ছিল? বন্দিনী খাঁচার পাখীর শুধু পাখা ঝাপটানোই সার হয়েছে। বাধার পর বাধা, কত যে নিগড় ভেদ করে এ জীবন মুক্তি লাভ করতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। পারেনি বলেই আজ মনে হয় যদি পারতাম লেখাপড়া করতে, যদি পারতাম মুক্ত ভবনে বিচরণ করতে, তবে পারতাম লিখতে মনের মতো সুন্দর করে। জীবনের শ্রেষ্ঠ দান রেখে যেতাম সবার জন্য। কিন্তু পারলাম না। সাধ থাকলেও সাধ্য হল না কাউকে কিছু দেয়ার।[৬৭১]

স্বামী ক্ষয়রোগে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে ২১ বছর বয়সী সুফিয়া একটি কন্যা ও মাকে নিয়ে কলকাতার একটি স্কুলে ৫০ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সাত বছর অত্যন্ত সংগ্রাম করে বিধবা জীবন

---

[৬৭০] ঐ, পৃ. ৫৯০

[৬৭১] ঐ, পৃ. ৫৯১

অতিবাহিত করার পর বহরমপুরে সরকারি চাকুরীরত চট্টগ্রামের কামালউদ্দীন আহমেদ খানের সাথে ১৯১৯ সালে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। এ স্বামীও সুফিয়ার গুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এ বিয়ের পর তিনি 'সুফিয়া কামাল' নামে পরিচিত হতে থাকেন।

সুফিয়া কামাল একজন কবির চেয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রণী নেত্রী হিসেবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তার কবিতার মধ্যে মানসিক চেতনা, সামাজিক অগ্রগতি, নারী অধিকার ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, নারী কোনো অবলা জীব নয়। পুরুষের মনোরঞ্জনই নারীর একমাত্র কাজ একথাও তিনি স্বীকার করেন না। বরং নারীর মধ্যে আছে অনন্ত শক্তি, সুযোগ পেলে সেও বিশ্ববিজয়ী রূপ দেখাতে পারে। যাঁরা পুরুষ প্রদত্ত অবলাসত্তা অতিক্রম করে মানবসত্তায় নিজেদের বিকশিত করেছেন, এমন মেয়েদের নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। এজন্যই তাঁর কবিতার বিষয় হয়েছেন নারী আন্দোলনের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, আলজিরিয়ান মুক্তিসংগ্রামী জমিলা বুমেদীন, প্যালেস্টাইনি মুক্তিযোদ্ধা লায়লা খালেদ এবং প্রথম নারী নভোচারী ভ্যালেনটিনা তেরেসকোভা।[৬৭২] এসব উজ্জ্বল নারীকে কবিতায় ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে তিনি বাঙালি মেয়েদেরকে জাগরণে ও আন্দোলনে আহ্বান জানান। সুফিয়া কামাল একটি কবিতায় উচ্চারণ করেন,

> ... নারীর বাহুতে শক্তি রয়েছে, অন্তরে জ্ঞান-তৃষা
>
> সংশয় ভরা সংসার মাঝে আঁধার-আলোর দিশা
>
> শত বাধা ব্যবধান
>
> তারি মাঝ হতে, দূর হতে যেন শোনা যায় আহ্বান
>
> দূর হতে আসে আলো
>
> জাগো মাতা-বধূ![৬৭৩]

গৃহের সীমানা ছাড়িয়ে সুফিয়া কামাল রোকেয়ার মতো বাঙালি নারীকে জেগে উঠার আহ্বান জানান। রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'র ন্যায় সুফিয়া কামালও নারীমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। তাই অবরুদ্ধ নারীকে

[৬৭২] বিশ্বজিৎ ঘোষ, "সুফিয়া কামালের কবিতা : নারী ভাবনা ও জেন্ডারচেতনা", *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২১৬

[৬৭৩] সুফিয়া কামাল, 'আলোর ঝরণা', *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৮

মুক্তির পথে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। নারীশিক্ষার পথে পুরুষের তৈরি করা প্রতিবন্ধকতাসমূহ তিনি ভেঙ্গে ফেলার কথা বলেন। শিক্ষা ও জ্ঞান নারীকে সামাজিকভাবে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, তাই তিনি নারীকে জ্ঞানার্জনের জন্য এগিয়ে আসার পথ নির্দেশ করেন এভাবে যে,

তোমরাও এস প্রাণের প্রদীপে জ্ঞানের আলোক জ্বালি
দূর করি দিয়ে আলোকের তীরে অজানা ভীতির কালি
নির্মল নীল আকাশের মতো উদার গভীর ছায়া
তোমরা আনিয়ো দু'চোখ ভরিয়া ছড়াইয়া দিয়া মায়া
অবরুদ্ধারা যেখানে মরিছে রুদ্ধ করিয়া শ্বাস
সেই ঘরে ঘরে এনে দাও নব জীবনের আশ্বাস।[৬৭৪]

নারীর প্রকৃত মুক্তির জন্য পুরুষের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। পর্দা ও অবরোধ থেকে নারীকে মুক্ত করে শিক্ষা-দীক্ষায় পরিপূর্ণ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্ততার সুযোগ দিতে হবে। তবেই নারীমুক্তি ঘটবে, সমাজ এগিয়ে যাবে এবং আমরা উন্নততর জাতিতে পরিণত হয়ে বর্হির্বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। আর এজন্য দরকার পুরুষের আন্তরিক সহযোগিতা। সুফিয়া কামাল নারীকে চিরায়ত জননী হিসেবে কল্পনা করে বলেন,

যত বীর, যত মহান মানব
জগতে এসেছে, তারে
জঠরে ধরেছে, পালন করেছে
স্তন্যদুগ্ধ ধারে
সে যে 'নারী', সে যে মাতা মহিয়সী
কোথায় তুলনা তার!

[৬৭৪] সুফিয়া কামাল, 'অবরুদ্ধাকে', ঐ, পৃ. ৭৫

সর্বংসহা জননী, শ্রেষ্ঠ

সৃষ্টি সে বিধাতার।[৬৭৫]

সুফিয়া কামাল সমাজসেবার কাজটি শুরু করেন কিশোর বয়স থেকে, বরিশাল শহরে প্রথম স্বামী নেহাল হোসেনের সাথে বসবাস কালেই।[৬৭৬] তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন। এ সময় রোকেয়ার সাথে তিনি বস্তিতে গিয়ে নারীর দুর্দশা অবলোকন করেন এবং দীনহীন মানুষের জন্য সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করেন। বস্তির মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, হাতের কাজ, সেলাই ও কুটির শিল্পের কাজ শিখিয়েছেন। উল্লেখ্য এ সময় *আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম* সমিতিতে লেডী গজনবী, লেডী ফারুকী, মিসেস মোমেন, মিসেস গফফার, শামসুন নাহার মাহমুদ প্রমুখ প্রগতিশীল ও সুশিক্ষিত নারী জাগরণের নেত্রীরা সদস্য ছিলেন। সে সময়কার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুফিয়া কামাল উল্লেখ করেন,

> আমরা হিন্দু মুসলমানদের বস্তীতে ঘুরেছি। ভদ্রলোকদের জন্যও স্কুল ছিল। তারা ত অনেক উন্নতি করেছে, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও তখন বস্তীতে এত অনুন্নত সম্প্রদায় ছিল-অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের ছিল বেশি। মুসলমানদের মধ্যে অচ্ছুৎ সম্প্রদায় নাই। কিন্তু আমার এখনও মনে আছে আমার প্রথম জীবনে হিন্দু অচ্ছুৎ সম্প্রদায় আমরা তখন দেখেছি, একদম বস্তীতে। ভদ্রলোকদের সাথে যাওয়া আসা বা স্কুল কলেজে তারা যেতে পারে না। সেইসব জায়গায় রোকেয়ার আঞ্জুমান থেকে আমরা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র করেছি। তবে সেটা কি বি.এ, এম.এ পাশ কররবার জন্য? না- এই প্রাথমিক শিক্ষাটা অক্ষর পরিচয়, একটা চিঠি লেখা, একটু হিসাব লেখা, এই পর্যন্ত আমরা শেখাবার চেষ্টা করেছি।[৬৭৭]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সুফিয়া কামালকে বলেছিলেন, "তুই তো কবি হয়েছিস, তারপরও তুই সমাজের জন্য কাজ করতে পারবি। তোর লেখার ভিতর দিয়ে তুই সমাজকে জাগিয়ে তোল।"[৬৭৮] তৎকালীন সমাজের পুরুষের মানসিকতার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ সমাজ সেবামূলক কাজে কেউ কেউ প্রশংসা করেছে, আবার অনেকে সমালোচনাও করেছে। এ প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল বলেন,

---

[৬৭৫] সুফিয়া কামাল, 'নারী', *ঐ*, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭

[৬৭৬] হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭

[৬৭৭] সুফিয়া কামাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮৪

[৬৭৮] *ঐ*, পৃ. ৫৮৬

... কত মহিলারা আমাদের সাথে আগ্রহ করে লেখাপড়ার জন্য ঘরে ঘরে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খুলতে চেয়েছেন। কত মহিলারা আমাদের সাথে আগ্রহ করে মিশতে চেয়েছে, তাদের স্বামীরা বলেছে 'ইয়ে লোগত খারাব আওরাত হ্যায়, ইয়ে লোগকো মাত আনে দো, ইয়ে লোগ বস্তী বস্তীমে ঘুমতা'। এই কলিকাতার বস্তিওয়ালারা। কিন্তু তবু আমরা গেছি। আবার কেউ কেউ আদর করে বসিয়েছেন। ... আমরা ত তখন বোরখা ছাড়া বেরোতে পারি না- তাহলে তো ঘরেই ঢুকতে দিবে না। কিন্তু অনেক বস্তীর ব্যাটা-ছেলেরাত বলেছে- হ্যাঁ, এরাতো ভাল কাজ করছে। আমরাও যদি লেখাপড়া শিখতাম তাহলে আমাদের এরকম অবস্থা হত না। চেতনা যদি আনতে হয়, তাহলে এরকম করে কাজ করতে হয়। ... এক একটা সংসার আছে যেখানে অশিক্ষিত লোক আছে কিন্তু তারা মানুষ হিসেবে ভাল। এম.এ পাশ করবে না কিন্তু পড়াশুনা জানলে দুনিয়ার খবর রাখতে পারবে, জানতে পারবে যে, দুনিয়াতে কি হচ্ছে, নিত্য পরিবর্তনশীল দুনিয়া।[৬৭৯]

কলকাতার পিছিয়ে থাকা নিরক্ষর, অসংগঠিত মুসলিম মহিলাদের জাগরিত করার কাজে সুফিয়া কামাল আত্মনিয়োগ করেন। তবে এ কাজে তাকে শুনতে হয়েছে বহু বিরুদ্ধ সামাজিক সমালোচনা। অনেক সময় রক্ষণশীল অবরোধবাসিনীদের কাছ থেকেও পেয়েছেন বাধা। এসব বাধায় হতোদ্যম এবং বিচলিত না হয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কাছ থেকে শুনেছেন উপদেশ "যদি সমাজের কাজ করতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করতে হবে, কোন নিন্দা-গ্লানি, উপেক্ষা-অপমান কিছুতে আঘাত না পাও। মাথার খুলিকে এমন মজবুত করতে হবে যেন ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রবিদ্যুৎ প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়"।[৬৮০] রোকেয়ার এ কর্মদীক্ষা সুফিয়া কামাল আজীবন চর্চা করেছেন এবং বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের উত্তরসূরিদেরকে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মূলত সুফিয়া কামাল কলকাতার সংগ্রামী মেয়েদের সাহচর্যে নিজেকে নারী জাগরণের দীক্ষায় আলোকিত করেন, পরবর্তীতে তাঁর নারী প্রগতির চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটে পূর্ব বাংলায়। এক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্ব বাংলার ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর কলকাতার ঠাকুর পরিবারের সাথে একটা যোগাযোগ ছিলো, যার ফলে তাঁর মধ্যেও একটা আলোকিত ভাবধারা চলে আসে।[৬৮১]

সুফিয়া কামাল স্বামীর কর্মসূত্রে বর্ধমানে অবস্থান করার সময় (১৯৪২-১৯৪৩) 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র সদস্য হন। সেখানে মণিকুন্তলা সেনের সাথে তিনি মুসলিম মহিলাদের সংগঠিত করার কাজ করেন।

---

[৬৭৯] *ঐ*, পৃ. ৫৮৭

[৬৮০] মালেকা বেগম, "নারী আন্দোলন ও সুফিয়া কামাল", *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৯

[৬৮১] আয়শা খানম, সাক্ষাতকার, ০১.০২.২০১৮

১৯৪৬ সালে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আবারও সুফিয়া কামালকে সমাজসেবীর ভূমিকায় দেখা যায়। তিনি মরিয়ম মনসুরের কন্যা জাকিয়া মনসুর, হোসনে আরা বেবী, রোকেয়া মান্নান, নুরুন্নাহার (ফয়জুন্নেসা) ও নিজের মেয়ে আমেনা (দুলু) কে সাথে নিয়ে কলকাতায় *লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের* আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করেন। এ সময় অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। কলকাতার দাঙ্গা শেষ হলে শিল্পী কামরুল হাসান, হাসান জান ও মুকুল ফৌজ কর্মীদের সহযোগিতায় কংগ্রেস এক্সিবিশন পার্কের মধ্যে 'রোকেয়া মেমোরিয়াল স্কুল' নামে শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৮২] মূলত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাথে সুফিয়া কামালের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। রোকেয়া সুফিয়াকে 'ফুলকবি' সম্বোধন করে ডাকতেন। তিনি রোকেয়ার আদর্শ মনেপ্রাণে ধারণ করেন। জীবনব্যাপী রোকেয়ার নারীমুক্তি আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ শতকের নারী জাগরণে আরো ভূমিকা রাখেন কামিনী রায় (১৮৩৩-১৯৪৩), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫) প্রমুখ। এছাড়া *মহিলা শিল্প সমিতি* (১৯০৭), *ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল* (১৯১০), *নারী শিক্ষা সমিতি* (১৯১৯) প্রভৃতি মহিলা সংগঠন নারী জাগরণ ও আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নারী জাগরণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্ব ইচ্ছায় অবরোধপ্রথার কঠোরতার কবল থেকে তথা ঘর থেকে মেয়েদের বের হয়ে আসার চেষ্টায় পরিবারের পুরুষের সহযোগিতা ছিলো। নারী পরিবারকে অবহেলা করে নয় বরং পরিবারের প্রতি যাবতীয় দায়িত্ব পালনের পর নিজেদের উন্নয়নে কাজ করেছেন।[৬৮৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে (১৯০১-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সময়ে) বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে প্রথম এবং প্রধান কর্ণধার হিসেবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে পাওয়া যায়। লেখনীর মাধ্যমে প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচার করে তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী সম্পর্কে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার প্রতিহত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। নারী জাগরণের মূল কথা নারীশিক্ষা-তা তিনি উপলব্ধি করেন। তাই *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল* প্রতিষ্ঠা করে নারীশিক্ষা প্রসারে প্রয়াসী হন। বিভিন্ন প্রকার হাতের কাজ, সেলাই ও কুটির শিল্পের কাজ শিখিয়ে নারীর জন্য কর্মসংস্থান শিক্ষা এবং সমাজসেবার উদ্দেশ্যে রোকেয়া *আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম* নামক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি সারাটি জীবন নারী কল্যাণে সময় অতিবাহিত করেছেন। রোকেয়ার দেখানো নারী জাগরণী পথ

[৬৮২] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭২

[৬৮৩] হাবিবা খাতুন, *সাক্ষাতকার*, ২৮.০২.২০১৮

অনুসরণ করেন তাঁর উত্তরসূরীরা। যারা নানাভাবে নারীজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। এসময়কালে তাদের লেখনীগুলিতে নারীজাতির ব্যাথা, বেদনা ও অধঃপতিত অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি নারীর মুক্তিলাভের পন্থা সম্পর্কে নানারকম চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে *অন্বেষা*, *সুনীতি*, *রূপরেখা*, *বর্ষবাণী*, *বুলবুল*, *সওগাত* প্রভৃতি পত্রিকা বাংলার মেয়েদের মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তখন বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠনের মাধ্যমে বাঙালি নারীসমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজসেবার মহান ব্রত গ্রহণ করেছেন। আবার নারীশিক্ষার প্রসারেও তারা কাজ করেছেন। ফলে এ সময়ে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন একটি গতিশীল ভাবধারায় সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

জাগরণ ও আন্দোলনে নারী : সাফল্যের খতিয়ান (১৯৪৭-১৯৭১)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯৪৭ সাল একটি মাইলফলক। কেননা এ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ধর্মভিত্তিক এ বিভক্তি প্রগতিশীল সমাজ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ভাষা ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান কখনো পারস্পারিক সৌহাদ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি। এরপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকমহল যখন অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের রাজনীতি শুরু করলো তখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষুপ্ত হয়ে উঠলো। এসব বিক্ষোভের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী, পুরুষের পাশাপাশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরো জোরদার হয়। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এসময় নারীমুক্তিতে বিশ্বাসী পুরুষ যুক্ত থাকলেও নারীই তাদের নিজ অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অধিকহারে তৎপর হয়েছে। এর ফলে নারীমুক্তি আন্দোলনে পুরুষের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে। সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বাঙালি নারী দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। অবরোধপ্রথার কঠোরতা অনেকখানি হ্রাস পাওয়ায় এসময় পড়ালেখা শিখে নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। ফলে পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান অনেকটা উন্নত হয়েছে। তবে নারীর এ অগ্রগতি শহরকেন্দ্রিক। গ্রামের প্রান্তিক নারীর অবস্থা খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি তখনও। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৯৪৭-১৯৭১) এসে বাঙালি নারীর সমাজ সংস্কারে, নারীশিক্ষা প্রসারে, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায়, বিশেষ করে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৯৪৭-১৯৭১) পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে যে সকল নারী অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম শামসুন নাহার মাহমুদ। যার পরিচয় এবং নারী জাগরণ ও আন্দোলনে সম্পৃক্ততা ইতোপূর্বে (চতুর্থ অধ্যায়ে) আলোচনা করা হয়েছে। এ কাল পর্বে (১৯৪৭) শামসুন নাহার মাহমুদ ভারত বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় চলে আসেন এবং *ঢাকা গার্লস কলেজে* অধ্যাপনা শুরু করেন। উল্লেখ্য অত্যন্ত স্বল্পকালীন সময় তিনি এ চাকুরীতে যুক্ত থাকেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনে সংশ্লিষ্ট থেকে বহুবিধ সরকারি ও বেসরকারি কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পূর্ববাংলার অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এসময় শামসুন নাহার মাহমুদের "পাকিস্তানে মেয়েদের অগ্রগতি" শীর্ষক প্রবন্ধ বাঙালি নারী জাগরণ ও আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ প্রবন্ধটি পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড জাতিসংঘ শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি (UNESCO) প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তান জাতীয়

কমিশনের সদস্য শামসুন নাহার মাহমুদের সফরকালে করাচী বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়।[৬৮৪] তাই রচনাটি বেতার কথিকা তথা রেডিও কথিকা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রবন্ধটিতে পাকিস্তানে নারী প্রগতির গতিধারা আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য এ কথিকায় চারজন আলোচক অংশগ্রহণ করেন। শামসুন নাহার মাহমুদ ছিলেন সর্বশেষ আলোচক। এ আলোচনায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েদের নানাদিক তুলে ধরা হয়। অনেকে মনে করেন আধুনিক মেয়েরা তাদের স্বাভাবিক মাধুর্য হারিয়ে ফেলছে। সত্যিকার অর্থে তৎকালে সমাজের একশ্রেণির ফ্যাশন বিলাসী অতি আধুনিক মেয়েদের জীবন যাপনের পদ্ধতিগুলি সমাজের মানুষদের ভাবিয়ে তুলেছিলো। তবে সমাজের সার্বিক চিত্র ছিল ভিন্ন। শামসুন নাহার মাহমুদ প্রসঙ্গক্রমে বলেন,

> ... মাধুর্য জিনিসটা মেয়েদের প্রকৃতিগত। তা একেবারে ধ্বংস হবে কেন? একথা সত্যি যে, আজকের দিনে জীবন সংগ্রাম অনেক কঠিন হয়েছে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধেরও হচ্ছে পরিবর্তন। নারীর মাধুর্য্য বলতে কি বুঝায়। নারীত্বের আদর্শই বা কি? সে সম্পর্কে এই যুগ সন্ধিক্ষণে স্পষ্ট ধারণা দরকার। ... মেয়েরা নিজেরাও যদি এ বিষয়ে সতর্ক এবং সজাগ হন, তাহলে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলনের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। সুদূর অতীতে ইসলাম নারীত্বের যে আদর্শ নির্ণয় করেছিল, আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় তা অপরাজেয় হয়েই আছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা তারই প্রতিধ্বনি খুঁজে পাই:
>
> দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী
>
> পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি নহি
>
> অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে
>
> তাও আমি নহি।
>
> যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটের পথে
>
> দুরূহ চিন্তারে যদি অংশ দাও
>
> আমার পাইবে তবে পরিচয়।[৬৮৫]

[৬৮৪] শাহিদা পারভীন, *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬১

[৬৮৫] শামসুন নাহার, "আধুনিক মেয়েরা কি নারী সুলভ মর্যাদা হারাচ্ছে", *দিলরুবা*, ঢাকা, ১০ম বর্ষ, পাকিস্তান সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃ. ৪৩৩

পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণ ও আন্দোলনের অন্যতম কর্মী শামসুন নাহার মাহমুদ নারীর আদর্শ ও কর্তব্য সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। ইসলামি ঐতিহ্য ও অনুশাসনের আলোকে তিনি নারী সমাজকে আধুনিক হতে বলেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের নারী প্রগতিতে তিনি উচ্ছসিত হয়েছেন। বিশেষ করে তুরস্কের নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের সফলতা তাঁকে প্রভাবিত করে। তিনি তুর্কি নারীর অতি আধুনিকতার সমর্থন করেন। শামসুন নাহার মাহমুদ "তুরস্কের নারী প্রগতি" শীর্ষক আরেকটি রেডিও কথিকায় তুর্কি নারীর বর্ণনা দেন এবং বাংলার নারী সমাজকে সে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন,

> তুরস্কে আমরা যা দেখেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখবার সুযোগ হয়েছে বোধ হয় শিক্ষার আয়োজন। প্রাথমিক স্তরে দেখেছি ছেলেমেয়েরা মিলেমিশে একসঙ্গে শিক্ষা লাভ করছেন। ছেলেদের ও মেয়েদের স্বতন্ত্র স্কুল এবং সহশিক্ষা দুরকম ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে মাধ্যমিক স্তরে। আবার ইউনির্ভাসিটিতে অবাধে চলছে সহশিক্ষা। প্রাইমারী স্কুলগুলিতে টিচার দেখেছি পুরুষ ও মেয়ে দুই-ই আছেন। মেয়েদের সিনিয়র স্কুল 'লিখে'তে বেশির ভাগ শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকও আছেন জন কয়েক। তুরস্কের বিদ্যালয়গুলিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও আইন প্রভৃতি বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক মেয়েরাও শিক্ষালাভ করেছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন শাখায়ও আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছি মহিলা শিক্ষার্থীর। ইউনির্ভারসিটির বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে মহিলা অধ্যাপকেরও অভাব নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বত্রই মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকগণ ভোগ করছেন সমান বেতন।[৬৮৬]

শামসুন নাহার মাহমুদের নারী জাগরণী আরেকটি প্রবন্ধ "পাকিস্তানের গৃহিণী"। যা রেডিও টোকিও থেকে প্রচারের জন্য রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ কথিকার শুরুতেই তিনি বলেন,

> পূর্ব পাকিস্তানের মেয়েরা আজকাল ঘরের কোণে বসে নেই। তাঁরা ঘরকন্না করছেন, ছেলেপিলে মানুষ করছেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কর্মতৎপরতা ছড়িয়ে পড়ছে দেশময়। শুধু তাই নয়, দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক জগতেও বিস্তৃত হচ্ছে তাদের কর্মক্ষেত্র। কিন্তু তবু তারা গৃহিণীই বটে।[৬৮৭]

---

[৬৮৬] শামসুন নাহার মাহমুদ, "তুরস্কের নারী প্রগতি", *মাহেনও*, ঢাকা, অষ্টম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুন ১৯৫৬, পৃ. ২২; উদ্ধৃত, শাহিদা পারভীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪

[৬৮৭] শামসুন নাহার মাহমুদ, "পূর্ব পাকিস্তানের গৃহিণী", *বেগম*, ঢাকা, ৯ম বর্ষ, ২২শ সংখ্যা, ৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬, পৃ. ১০

গৃহিণীর সকল কার্যক্রম এবং প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় বিষয় সবিস্তরে বর্ণনা করেছেন এ কথিকায়। তিনি মনে করেন, সংসারে কাজকর্মের পাশাপাশি নারীর একান্তই নিজের জন্য কিছু করা দরকার। শুধু নিজের জন্য নয়, দেশ ও জাতির প্রতিও তাঁর কর্তব্য আছে। নারী এগিয়ে না এলে জাতীয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হতে পারে। তাই তিনি উল্লেখ করেন, ঘরে এবং বাইরে আমাদের কাজের অন্ত নেই। কিন্তু তবু তারই মধ্যে রোজ না হয় অন্তত সপ্তাহে অল্প একটু সময় আমরা দেশের কাজের জন্য দিতে পারি। সবাই মিলে একটু একটু করলেও তো জাতি গঠনের কাজ বেশ অনেকখানি এগিয়ে যায়।[৬৮৮]

শামসুন নাহার মাহমুদ রাজনীতি এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধও রচনা করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীমূলক একমাত্র গ্রন্থ *আমার দেখা তুরস্ক*। এ গ্রন্থটিও বাংলার মুসলিম নারী জাগরণ ও আন্দোলনের সহায়ক শক্তি। ১৯৬২ সালে শামসুন নাহার মাহমুদ পাকিস্তানের শুভেচ্ছা দূত হয়ে তুরস্ক সফর করেন, এ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে তুরস্কের নারী প্রগতির ইতিহাস আমাদের এদেশীয় নারী জাগরণকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে এবং তুরস্কের নারী আন্দোলন বাংলায় নারী অগ্রগতির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। শামসুন নাহার মাহমুদ এ গ্রন্থে তুরস্কের নারীর অগ্রগতির বাস্তবচিত্র তুলে ধরেন। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের আধুনিক তুরস্কে নারীসমাজ অধিকার সচেতন হয়ে উঠে এবং তৎকালে সেখানে নারীমুক্তি ঘটে। তুরস্কের নারীমুক্তি ও নারী প্রগতির প্রভাব বাংলায়ও পরিলক্ষিত হয়। তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের স্ত্রী লতিফা খানুম এবং নারী জাগরণের অগ্রদূত হালিদা এদিব হানুম (খালেদা এদিব খানুম) এর কাছ থেকে শামসুন নাহার মাহমুদ নারী জাগরণে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তাই তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে,

> তুরস্ক। যুগে যুগে মুসলিম জাহানের শক্তি ও প্রেরণার প্রাণকেন্দ্র এই তুরস্ক। ... নারীমুক্তি সংগ্রামের পথে আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তুরস্কের নারী জাগরণ।[৬৮৯]

তুরস্কের নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের সফলতা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান শামসুন নাহার মাহমুদ। এ চেতনা থেকে স্পৃহা নিয়ে তিনি বাঙালি মুসলিম নারী সমাজকে জাগরিত করতে সচেষ্ট হন। তুরস্ক ভ্রমণকালে তিনি তুর্কি নারী জাগরণ ও আন্দোলনের অগ্রদূত হালিদা এদিব হানুমের সাথে সাক্ষাত লাভের সুযোগ পান। শামসুন নাহার মাহমুদের সাথে আলোচনাকালে হালিদা এদিব হানুম বলেন, "শুধু ইসলামের দোহাই পাড়িলে চলিবে না; অনুসরণ করিতে হইবে ইসলামের সত্যিকার আদর্শ। জাতির

---

[৬৮৮] *ঐ*, পৃ. ১১

[৬৮৯] শামসুন নাহার মাহমুদ, *আমার দেখা তুরস্ক*, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃ. ১-২

অর্ধেকাংশ যদি অচল হইয়া থাকে; কোন কাজেই সাফল্য আসিতে পারে না"।[৬৯০] হালিদা এদিব আরো বলেন, "নারী স্বাধীনতাই যদি চাই, সমাজ অধিকারই যদি আমাদের লক্ষ্য, তাহা হইলে কোন রকমের অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করিব আবার কোন দাবিতে?"[৬৯১]

হালিদা এদিব হানুম বলতে চেয়েছেন ইসলামে অবরোধ নেই এবং ইসলাম বলেনি যে মেয়েরা ঘরে বন্দি থাকবে। অর্থাৎ শরিয়ত মোতাবেক শালীনতা বজায় রেখে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণসহ নানা অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হবে। সমাজের অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী। তাই নারী পিছিয়ে থাকলে সার্বিকভাবে সমাজের অগ্রগতি হবে না, নারী পুরুষে সমতা আসবে না। নারীর অতিরিক্ত সুবিধা চাওয়াও ঠিক নয়, তাহলে তাদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। শামসুন নাহার মাহমুদ হালিদা এদিবের নারী জাগরণী এসকল চিন্তাভাবনা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন এবং বাঙালি নারীর মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির প্রয়াসে তা উল্লেখ করেন।

শামসুন নাহার মাহমুদ তুরস্ক ভ্রমণকালে সেখানকার উচ্চপদস্থ নারীর সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পান। তিনি তুরস্কের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নারীকল্যাণ সমিতির সংস্পর্শে আসেন। এরকম ৪টি মহিলা সমিতির বর্ণনা তিনি তাঁর গ্রন্থে করেছেন। সমিতিগুলি হলো- ১. তুর্কি মহিলা সমিতি (Turk Kadinlar Birliye) ২. জীবিকা অর্জনকারী মহিলা ক্লাব (Soroptimist Kulubu) ৩. বিশ্ববিদ্যালয় নারী সংঘ (Universiteli Kadinlar Dernegi) ও ৪. জনহিতব্রতী নারী সমিতি (Yardam Sevenler Dernegi Society for Serving the People)।[৬৯২] এ সকল সমিতি ও সংগঠন তুর্কি সমাজ এবং রাষ্ট্রে নারীর যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বের দাবি রাখে। সমিতিগুলি তুরস্কে নারী সংশ্লিষ্ট দাবি আদায়ের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে। তুর্কি নারী নিজেদেরকে শক্তিশালী করে রাষ্ট্রীয় জীবনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে, যা থেকে বাংলার নারীসমাজ অনুপ্রাণিত হতে পারে বলে শামসুন নাহার মাহমুদ বিশ্বাস করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন,

> তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিপ্লবের ইতিহাসে তুর্কী নারীর দান অপরিসীম। বিশ্ববিখ্যাত হালিদা এদিব হানুম ছাড়াও আরো কতশত তুর্কী নারীর সাধনা তুরস্কের জাতীয় আন্দোলনে শক্তি ও প্রেরণা যোগাইয়াছিল। তাহাদের সকলের নাম লেখা হয় নাই ইতিহাসের পাতায়।

---

[৬৯০] ঐ, পৃ. ১৯

[৬৯১] ঐ, পৃ. ২০

[৬৯২] ঐ, পৃ. ২৩

> চরম দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে সেদিন পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী নারীরও নবজন্ম লাভ হইয়াছিল। বিপ্লবের আগে ও পরে তুর্কী নারী আগে যে ছিল অশিক্ষিত, জড়তাগ্রস্ত, সমাজের ভারস্বরূপ, পরে সেই আপন বুদ্ধির গৌরব ও কর্মের মহিমায় সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত হইল। তুর্কী নারী জীবনের এই অদ্ভুত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা। শুধু তুরস্কের নয়, যুগে যুগে সারাবিশ্বের নারী সমাজকে এক নুতন জীবনে উদ্বুদ্ধ করিবে এই বিপ্লব।[৬৯৩]

প্রকৃতঅর্থে শামসুন নাহার মাহমুদ তুরস্কের এ বিপ্লবের আদর্শ দ্বারা বাংলার নারীকে জাগরিত করতে প্রয়াসী হন। তিনি পরোক্ষভাবে বলতে চেয়েছেন তুরস্কের নারী যদি নানাদিক দিয়ে এতটা অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হতে পারে তাহলে বাঙালি নারীর পক্ষেও তা সম্ভব। অর্থাৎ বাংলার নারীও তাদের মেধা এবং শ্রম দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। শামসুন নাহার মাহমুদ আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করেছেন তুরস্কের নারী প্রগতির বাণী এদেশের নারী সমাজের অজ্ঞতার প্রকোষ্ঠে অনুপ্রবেশ করে তাদেরকে জাগরিত ও আন্দোলিত করুক।

শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর *All Pakistan Women's Association* (APWA) এর সাথে যুক্ত থেকে পূর্ববাংলার অবহেলিত মেয়েদের শিক্ষাসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। *All Pakistan Women's Association* গঠনের পটভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় গড়ে ওঠা *মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি*র কাজ ছিল নারীর অধিকার সহ সার্বিক বিষয় দেখাশুনা করা। কিন্তু দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালের ২৬ মে এ সংগঠনটি বে-আইনি ঘোষণা করা হয়।[৬৯৪] এ সময় সমিতির হিন্দু সদস্যরা অনেকে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান এবং সেখানে নারী আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখেন। পূর্ববাংলায় যাঁরা থেকে গেলেন তারাও বিভিন্ন স্থানে নারী আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে থাকেন। পূর্ব পাকিস্তানে নারী আন্দোলন খুব বেশি প্রয়োজন ছিল, কেননা এখানকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ছিল মুসলমান। উল্লেখ্য এ সময়কাল পর্যন্ত নারী জাগরণ ও আন্দোলনের ফলে অবরোধমুক্তি ও নারীশিক্ষার অগ্রগতি বেশি হয়েছিল হিন্দু এবং ব্রাহ্মসমাজের নারীর মধ্যে। মুসলিম নারীসমাজ এক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে ছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ সরকার নানা বিধি নিষেধ আরোপ করে। এ সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগের নেতাদের স্ত্রীরা এবং মহিলা মুসলিম লীগের নেতারা বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে উদ্যোগী হন।

---

[৬৯৩] *ঐ*, পৃ. ২৭

[৬৯৪] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১২১

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের স্ত্রী রানা লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আহ্বানে পশ্চিম পাকিস্তানের তরুণী ও বয়স্ক নারী প্রাথমিক চিকিৎসা, ত্রাণ পুনর্বাসনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং অবহেলিত নারী ও শিশুদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। উল্লেখ্য মুসলিম লীগ সরকার মেয়েদের এ সব কাজে বাধা প্রদান করেনি, বরং উৎসাহিত করেছে। তৎকালীন রানা লিয়াকত আলী খানের তত্ত্বাবধানে *Women's Voluntary Association* (১৯৪০), *Pakistan Women's National Guard* (১৯৪৯) এবং *Pakistan Women's Neval Reserve* (১৯৪৯) এ তিনটি মহিলা সমাজকল্যাণমূলক সমিতি সরাসরি সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।[৬৯৫] দুই হাজার চারশত (২,৪০০) নারীর সমন্বয়ে তিনটি ব্যাটালিয়ান গঠন করে তাদের *ন্যাশনাল গার্ড* হিসেবে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এভাবে সর্বপ্রথম বাঙালি নারীসমাজ সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। কেননা মুসলিম লীগ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ভারতবিরোধী প্রচারণা বেগবান করা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণে যেকোন সময় নারীও যেন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে পারে সেভাবে তাদের প্রশিক্ষিত করা।

১৯৪৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি রানা লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য ১০০ জন মহিলাকে নিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনেই আগত মেয়েদের নিয়ে গঠিত হয় *All Pakistan Women Association (*APWA).[৬৯৬] ১৬ বছর বয়সের উর্ধ্বে সকল ধর্মের নারীর জন্য এ সংগঠনে অন্তর্ভুক্তি উন্মুক্ত রাখা হয়। এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি, শিক্ষায় সচেনতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম ও শহরের নারী সমাজের মধ্যে কাজ করা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য রানা লিয়াকত আলী খান বলেন যে, "আপনি যদি একজন পুরুষকে শিক্ষিত করে তোলেন তবে শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিই শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হলো, কিন্তু যদি একটি মেয়েকে আপনি শিক্ষিতা করে তোলেন তবে শিক্ষার আলোক পাবে গোটা একটি পরিবার"।[৬৯৭]

*নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি*র কর্মপদ্ধতির মধ্যে অন্যতম ছিল অন্তঃপুর থেকে মেয়েদের মুক্ত করে এনে হাতে-কলমে শিক্ষার মাধ্যমে পেশাগত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ

---

[৬৯৫] *ঐ*, পৃ. ১২২

[৬৯৬] *ঐ*

[৬৯৭] জাহান আরা ফারুক, "সমাজ কল্যাণে মহিলা সমিতির ভূমিকা", *বেগম*, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ২৪শ বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা, ১৪ই আগষ্ট ১৯৭০, পৃ. ২৮ (বাংলা একাডেমি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা)

করা ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঘটানো। কুটির শিল্প কেন্দ্র সম্প্রসারণ করে মেয়েদের হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং উৎপাদনমুখী কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে করে তারা নিজগৃহে অর্থকরী কাজ করতে পারে। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে মেয়েদের সচেতন করা। সর্বোপরি জনকল্যাণমূলক কাজে নারীকে উৎসাহিত করা। *নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি*র অন্য একটি আদর্শ হলো আন্তর্জাতিকতাবোধ। এ বিষয়ের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করার দায়িত্ব পালন করে সমিতিটির আন্তর্জাতিক বিভাগ। এটি পাকিস্তান ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারী সমাজের মধ্যে সহযোগিতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহিলা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে কাজ করে। *International Council of Women, Associated Country of Women* প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে *All Pakistan Women Association* বাংলার নারী কল্যাণে কাজ করে।[৬৯৮] ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সংগঠনটি সাধারণ শ্রেণির নারীর মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

পূর্ব পাকিস্তানে *All Pakistan Women Association* এর শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয় যার প্রথম সভাপতি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন খানের স্ত্রী এবং সহ-সভাপতি হলেন শামসুন নাহার মাহমুদ। এ সময় থেকে *নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি*র সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে শামসুন নাহার মাহমুদ পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষা, অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিষয়সহ বিভিন্নভাবে মেয়েদের সহযোগিতার মাধ্যমে নারী জাগরণ ও আন্দোলনে কাজ করেন। উল্লেখ্য ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ববাংলায় *মুসলিম মহিলা সমিতি*র উদ্যোগে রানা লিয়াকত আলী খানের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে শামসুন নাহার মাহমুদ পূর্ববাংলার নারী কল্যাণের নানাদিক তুলে ধরেন। উল্লেখ্য এ সময় একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় যার বিষয় ছিল 'বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা নারী সমাজের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র'। এ বিতর্ক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শামসুন নাহার মাহমুদ। নারী সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠিত এ বিতর্ক অনুষ্ঠানটি পূর্ব বাংলার নারী সচেতনতায় ভূমিকা রাখে।

তৎকালীন *আন্তর্জাতিক কমিশনের* সভাপতি মিসেস এলিনর রুজভেল্ট *All Pakistan Women Association* এর আমন্ত্রণে পাকিস্তান সফরে এসে স্বল্প সময়ের জন্য ঢাকা ভ্রমণ করেন। এ স্বল্পকালীন ভ্রমণে তাঁর সাথী হয়েছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ। তাঁরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করে নাগরিকদের বিশেষ করে নারীর বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করেন। উল্লেখ্য ১৯৫০ সালের ১৫ ডিসেম্বর *নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি*র পূর্ব পাকিস্তান শাখার সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং এখানে শামসুন

[৬৯৮] *ঐ*, পৃ. ২৯

নাহার মাহমুদ ১৯৫০-১৯৫১ সালের জন্য পূর্ব পাকিস্তান ইউনিটের কার্য নির্বাহী পরিষদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।[৬৯৯]

শামসুন নাহার মাহমুদ বাংলায় সর্বস্তরে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। আজকের শিক্ষার্থী বা ছাত্রী আগামী দিনের জাতির ভবিষ্যত। নারী ঘর সামলিয়ে, সন্তানকে সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত করবে এবং তাকে (নিজেকে) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতে হবে। তাহলে নারী জাতি গঠনে পুরুষের সমান অংশগ্রহণ করতে পারবে। ১৯৫২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শামসুন নাহার মাহমুদ ঢাকায় ছাত্রী ইউনিয়নের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন,

> ... আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ছাত্রী সমাজ জাতি গঠনে তাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। ভগিনী, জায়া ও মাতা হিসেবে ভবিষ্যতে জাতি গঠনে তাঁদের দায়িত্ব পুরুষের চেয়েও বেশি। আমাদের সামনে অগণিত সমস্যা। শিশু ও প্রসূতি মৃত্যু কমাতে হবে। জাতির স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে হবে, কুটির শিল্পটি পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। নিরক্ষরতা দূর করতে হবে, আর সাহিত্যের মাঝে আনতে হবে নবযুগ। ছাত্র সমাজকে একাজে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু ভবিষ্যতেই নয় ছাত্রাবস্থাতেও।[৭০০]

১৯৫৩ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলমান বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপিত হয়। বাংলার সচেতন মুসলমান নারীসমাজ এ বিলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আপত্তি জানায়। কেননা বিলটি মুসলিম নারীর কল্যাণ বয়ে আনবে না বলে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় *নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির* প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরি সভা আহ্বান করা হয় (১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে)। শামসুন নাহার মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় উক্ত বিল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বিলটি বাতিলের দাবি জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৭০১] এভাবে শামসুন নাহার মাহমুদ বাংলার মুসলিম নারীসমাজের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করেন যা বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে ১৯৫৪ সালে ঢাকায় *বেগম ক্লাব* গঠিত হলে শামসুন নাহার মাহমুদ ক্লাবটির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। *বেগম ক্লাবের* সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে তিনি নারী

---

[৬৯৯] *বেগম*, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৫০, পৃ. ১৫

[৭০০] মোশফেকা মাহমুদ, *শামসুন নাহার* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৪৮

[৭০১] *বেগম*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩, পৃ. ১১ (বাংলা একাডেমি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা)

জাগরণ ও আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা রাখেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, *বেগম ক্লাব* সম্পর্কে পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১৯৫৩ সালে শামসুন নাহার মাহমুদ চারমাস ব্যাপী ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করেন। এ সফরকালে তিনি সেখানকার বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, সংবাদপত্র অফিস, কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেন। মিসেস এলিনর রুজভেল্টের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি নিউইয়র্কে যাওয়ার সুযোগ পান। ফলে তাঁর সাথে শামসুন নাহার মাহমুদ নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। আবার বিলেতে সফরকালে তিনি সেখানকার সকল স্তরের আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।[৭০২] পাশ্চাত্য দেশসমূহে নারী প্রগতি দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হন এবং স্বদেশে নারী জাগরণ ও আন্দোলনে আরো বেশি জোরালো ভূমিকা রাখতে উৎসাহী হন।

শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯৫৫ সালে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে *International Council of Women* এর সুবর্ণ জয়ন্তী সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।[৭০৩] এ সম্মেলনে তিনি বাংলার নারীসমাজের জীবনের নানাদিক তুলে ধরেন। এ বছরই পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বিবাহ ও পারিবারিক আইন সংশোধনের জন্য সাত সদস্যের কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে তিনি কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। সমাজে বঞ্চিত নারীর ইসলামি বিধানমত অধিকার সংরক্ষণ এ কমিশনের একটি উদ্দেশ্য ছিল। বিয়ে ও তালাক রেজিষ্ট্রি, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই তালাক প্রদানের ব্যাপারে আদালতের সাহায্য গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং নারীর অধিকারের যাবতীয় বিষয় মীমাংসার জন্য পেনাল আদালত স্থাপন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কমিশন রিপোর্ট প্রদান করে। কমিশনের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে শামসুন নাহার মাহমুদ ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলার মেয়েদের সংগঠিত করার কাজ করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালের ১৫ অক্টোবর তিনি *বেগম ক্লাবে* এক সভা আহ্বান করেন। এখানে বিবাহ ও পারিবারিক আইন সংশোধনের বিষয়ে উল্লেখ করেন,

> পাকিস্তান সরকারের বিবাহ ও পারিবারিক আইন গঠনের পশ্চাতে সামাজিক অবিচারের এক ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম নারীসমাজ তার নায্য মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। অবশ্য এই অবস্থার জন্য কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে দায়ী করা সমীচীন

---

[৭০২] কামরুন নাহার, "নারী প্রগতির ইতিহাসে একটি অমর নাম : বেগম মাহমুদ", *বেগম*, ২০শ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ৯ এপ্রিল, ১৯৬৭, পৃ. ৬ (বাংলা একাডেমি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা)

[৭০৩] *ঐ*, পৃ. ৭

নয়। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক কাঠামোই এর জন্য দায়ী। আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, অবস্থারও হয়েছে পরিবর্তন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহু প্রাচীন ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে নুতন করে গড়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত আইনকানুন সমাজ জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে, ইসলামের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বর্তমান বিবাহ ও পারিবারিক আইনের ত্রুটিগুলো সাধারণের বিশেষ করে মহিলাদের জীবনে একটি স্থায়ী অশান্তি ও আশংকার কারণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। নারী সমাজকে তার পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এই কমিশন নিয়োগ করা হয়েছে।[৭০৪]

নারী জাগরণে ও নারী আন্দোলনে এবং সর্বোপরি নারীসমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন শামসুন নাহার মাহমুদ। তাই তিনি চেষ্টা করেন নারী-পুরুষ সকলের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে মুসলিম নারীবান্ধব একটি পারিবারিক আইন প্রচলনে তৎকালীন সরকারকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতে। আর একজন্য তিনি মেয়েদেরকে সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। তাহলে নারী তাদের সুচিন্তিত মতামত অত্যন্ত যুক্তিসম্মতভাবে এসব সভাসমিতির মাধ্যমে প্রদান করতে পারবেন। শামসুন নাহার মাহমুদ নারী প্রগতির পথে প্রধান সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেন এবং এ সকল অন্তরায় দূরীকরণের ব্যাপারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য ১৯৫৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের এক সম্মেলনে শামসুন নাহার মাহমুদ বলেন,

... নারী সমাজের বিশেষ সমস্যার বিশেষ সমাধান প্রয়োজন। জাতির সাধারণ সমস্যার সঙ্গে তা মিলিয়ে দেওয়া চলে না। যুগে যুগে দেশে দেশে নারীকে পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে। আজ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর প্রতিকারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে জাতির অগ্রগতি অসম্ভব। ... মহিলাদের একনিষ্ঠ সংগ্রামে সমাজের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যখন আমরা প্রথম লিখি তখন লেখা ছিল অপবাদ, আজ আর তা নেই। আজ মহিলারা নির্বিবাদে সাহিত্যচর্চা করতে পারছেন।[৭০৫]

১৯৫৭ সালের জুন মাসে যশোরে অনুষ্ঠিত *পাকিস্তান নারী সমাজকল্যাণ ও সেবা সংঘের* প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে শামসুন নাহার মাহমুদ যোগদান করেন। এখানে তিনি নারী জাগরণী

---

[৭০৪] *বেগম*, ১৭শ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ৩রা মে, ১৯৬৪, পৃ. ১৩ (বাংলা একাডেমি পত্রিকা শাখা, ঢাকা)

[৭০৫] *ঐ*, পৃ. ১৫

বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি নারীকে সমস্যা সমাধানে তাদের নিজেদেরকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। অন্যদিকে ১৯৬০ সালে শামসুন নাহার মাহমুদ প্রাদেশিক উপদেষ্টা পরিষদের একমাত্র মহিলা সদস্য নিযুক্ত হন। ফলে তিনি বিবাহ ও পারিবারিক আইন বাস্তবায়নের জোর দাবি তোলেন পরিষদে। এ প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল বলেন, "Family Law নিয়ে তিনি (শামসুন নাহার মাহমুদ) খুব খেটেছেন। সাহিত্যিক হিসেবে যতটা না করেছেন তারো চেয়ে বেশি সমাজসেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন"।[৭০৬]

এ বছরই (১৯৬০) বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশনের রিপোর্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। এতে শামসুন নাহার মাহমুদ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অন্যদিকে তিনি *বেগম ক্লাবের* এক সভায় (এপ্রিল, ১৯৬০) নারী কল্যাণের স্বার্থে কয়েকটি বিষয় যেমন- নিকাহনামা রেজিষ্ট্রি করা, বাল্যবিবাহ রোধ (বিবাহের নিম্নতর বয়স মেয়েদের ১৬ বছর ও পুরুষের ১৮ বছর নির্ধারণ), বহু বিবাহ রোধের জন্য বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ, তালাকনামা রেজিষ্ট্রি করা, বিবাহ ও পারিবারিক আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কোর্ট স্থাপন (প্রত্যেক জেলায় কোর্ট গঠন, সে কোর্টে দায়রা জজের ক্ষমতাতুল্য একজন সভাপতি নিয়োগ এবং মামলার রায় যথাশীঘ্র প্রকাশ করা) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন।[৭০৭] ১৯৬১ সালে বিবাহ ও পারিবারিক আইন কার্যকর হয়। এ বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শামসুন নাহার মাহমুদের সভাপতিত্বে *নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির* পূর্ব পাকিস্তান শাখার উদ্যোগে 'মহিলা সমিতি সপ্তাহ' উদযাপিত হয়। এ অনুষ্ঠানে নারী সমস্যার নানাদিক তুলে ধরে এগুলির সমাধানের উপায় এবং এক্ষেত্রে সরকারের করণীয় কি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

১৯৬১ সালের ২২ জানুয়ারি *বেগম ক্লাবে* অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট মহিলাদের এক বিশেষ সভায় বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার পরিপ্রেক্ষিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শামসুন নাহার মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ হামিদা খানম, তুবা খানম, জাকিয়া রশীদ, *বেগম পত্রিকার* সম্পাদক নূরজাহান বেগম প্রমুখ প্রতিথযশা নারী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বিবাহ ও পারিবারিক আইনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়-

---

[৭০৬] শাহিদা পারভীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৬

[৭০৭] *বেগম*, ১৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১০ই এপ্রিল, ১৯৬০, পৃ. ১২ (বাংলা একাডেমি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা)

প্রথমত : বিবাহ কার্য সম্পন্নের জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল স্বল্প সংখ্যক মনোনীত যোগ্য ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত : বিশেষ বিবাহ আদালতের পরিবর্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে বিবাহ ও তালাক সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার প্রদান করতে হবে।

তৃতীয়ত : বিবাহের জন্য সরকার নির্ধারিত নিকাহনামা প্রবর্তন করবেন এবং এ নিকাহনামায় একটি করে কপি বর-কনে ও সরকারকে প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে এবং তাতে বর ও কনের স্বাক্ষর (নিরক্ষর হলে টিপসহি) থাকবে।

চতুর্থত : তালাক-ই-হাসান নামক এক প্রকার তালাকের ব্যবস্থা থাকবে। তিন মাসের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী পুনর্মিলনের জন্য আপোষ মীমাংসায় উপনীত না হলে এ সময়ের পর তালাক-ই-হাসান বৈধ হবে।

পঞ্চমত : দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধের আপোষ মীমাংসা ব্যর্থ হলে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের সময় স্ত্রীর তালাকের অধিকার থাকবে এবং তালাকের ফলে প্রথম স্ত্রী তার দেনমোহরের অর্থ এবং পুনর্বার বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত ভরণ-পোষণের ব্যয় লাভ করবেন।

ষষ্ঠত : আইন অমান্যকারীর নিকট থেকে তার বার্ষিক আয়ের এক চতুর্থাংশ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে এবং অনাদায়ে তার ছয় মাসের কারাদণ্ডের বিধান থাকবে।

সপ্তমত : প্রয়োজন হলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল আবেদনের ব্যবস্থা থাকবে।[৭০৮]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বহুবিবাহের ব্যাপারে শামসুন নাহার মাহমুদের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ-

> পাশ্চাত্য দেশসমূহে পুরুষের মাত্র এক বিবাহের যে আইন আছে, তার পারিবারিক ও সামাজিক অসুবিধা বিবেচনা করে কমিশন নিয়ন্ত্রিত বহু বিবাহের সুপারিশ করেছেন। ... পবিত্র কোরআনে বহুবিবাহের যে উল্লেখ আছে তা শর্তসাপেক্ষ। বিনা শর্তে বা বিনা কারণে বহু বিবাহ ইসলাম সমর্থন করে না।[৭০৯]

---

[৭০৮] *বেগম*, ১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২৯শে জানুয়ারি, ১৯৬১, পৃ. ৪-৭ (বাংলা একাডেমি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা)

[৭০৯] *ঐ*, পৃ. ১২ ও ১৪

অবশেষে ১৯৬৯ সালের ১৫ জুলাই থেকে মুসলিম পারিবারিক অর্ডিন্যান্স কার্যকরী হয়। উল্লেখ্য এ আইন স্বার্থান্বেষী মহল বাতিল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এভাবে শামসুন নাহার মাহমুদ নারী কল্যাণের অক্লান্ত কর্মী হিসেবে কাজ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে *বাংলা একাডেমিতে* এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে *আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের* কার্যক্রম পুনরায় চালু করেন। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত জীবনকালে শামসুন নাহার মাহমুদ *নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড*, *জাতিসংঘ শিক্ষা*, *বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদের পাকিস্তান শাখা*, *প্রাদেশিক রেডক্রস সোসাইটি*, *ঢাকা ইউনির্ভাসিটি কোর্ট*, *বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি*, *ইডেন গার্লস কলেজ* ও *ঢাকা আর্ট কলেজের* গভর্ণিং বডি, *প্রভিন্সিয়াল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সর* ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পূর্ব বাংলা শিশু কল্যাণ পরিষদের সভাপতি এবং শেষ জীবনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। সর্বোপরি তিনি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণ ও আন্দোলনে তথা নারীর সার্বিক অগ্রযাত্রায় এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন। শামসুন নাহার মাহমুদ সম্পর্কে *বেগম পত্রিকায়* মন্তব্য করা হয়,

> ... রোকেয়ার প্রদর্শিত পথ ধরেই তিনি মুসলিম বাংলার অশিক্ষিতা, অবহেলিতা নারী সমাজকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় আজীবন সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। তিনি প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম নারীসমাজকে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছেন, জটিল রাজনীতি ক্ষেত্রে নারীর যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন এবং সর্বোপরি সমাজ জীবনে নারীর অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য সফল নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।[৭১০]

বিশ শতকের মধ্যভাগে ও দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে যে সকল নারী অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম সুফিয়া কামাল। তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নারী জাগরণী আদর্শের অনুরাগী ছিলেন। মাত্র ৬/৭ বছর বয়সে রোকেয়ার সাথে পরিচিত হন এবং ধীরে ধীরে তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। সুফিয়া কামাল রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সম্পর্কে বলেন,

> ... উনি যা করেছেন তা কি আর আমরা করতে পারি? তবু উনি বলতেন আমার স্বপ্ন তোদের মধ্যে থাকবে। আমি যা পারি নাই তোরা তাই করবি। তোরা মেয়েদের স্বাধীনতা, মেয়েদের যে ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব সেইটাকে জাগাবি। আমাদের দেশের মেয়েরা বড়ই নির্যাতিত। বড়ই উপেক্ষিত। কেন মেয়েরা এরকম থাকবে? স্বামী, বাপ, ভাই তাদেরকে নিয়েই আমাদের

[৭১০] কামরুন নাহার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

সংসার। আমরাও তাদেরকে বাদ দিয়ে চলতে পারি না। সংসার ছেড়ে আমরা সমাজে যেতে পারি না। সেই সংসারটা যাতে সুখের হয়, শান্তির হয়, স্বাচ্ছন্দের হয়, ভাইয়ের সাথে, স্বামীর সাথে, বাপের সাথে বন্ধুত্বের ব্যবহার যাতে থাকে, সহযোগিতা যাতে থাকে, এই নিয়ে তোরা কাজ করবি। ... সমাজ যাতে সুখী সমাজ হয় সেটা গড়ার উদ্দেশ্যেইত আমাদের কাজ।[৭১১]

সুফিয়া কামাল রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নিকট হতে নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তিনি নারী প্রগতির পথে ও অগ্রযাত্রায় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের একান্ত সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও নিজের স্বামীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেন। কাব্য বা সাহিত্য চর্চা, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, সমাজকল্যাণমূলক কাজ এবং সভা সমিতিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ প্রভৃতি কাজে স্বামীর সমর্থন লাভ করেন। তাই তিনি মনে করেন পুরুষের সহযোগিতা পেলে নারী অল্প সময় এবং শ্রম দিয়ে অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে পারবে। সুফিয়া কামাল নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মেয়েদের অবরোধপ্রথা এবং কঠোর পর্দাপ্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আদর্শে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রোকেয়া সম্পর্কে উল্লেখ করেন,

মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল যে, মেয়েদের কিভাবে উন্নতি হতে পারে। আর পুরুষের মুক্তবুদ্ধির বিষয়ে বলতেন পুরুষও যদি এগিয়ে আসে তাহলে মেয়েদের অশিক্ষা দূর হয়। ... বলতেন আমাদের আর বেঁধে রেখ না। শরীয়তের দোহাই দিয়ো না। শরীয়তে তোমরা দেখ, ধর্মের মধ্যে তোমরা দেখ যে, আমাদের কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ধর্মান্ধতার মোহে আর আমাদেরকে বন্দিনী করে রেখ না, ... ধর্মের গূঢ়ার্থটা জান... ওই চার দেওয়ালের মধ্যে বন্ধ করে রাখা তাকে কি পর্দা বলে? পর্দা নিজের মনের মধ্যে। সারা দুনিয়ার মহিলারা কি করে চলাফেরা করছে? সারা দুনিয়ায় মহিলারা কি করে এগিয়ে আসছে? তোমরা পথটাকে সুগম করে দাও। তোমাদের বাদ দিয়ে ত আমরা চলতে পারি না।[৭১২]

১৯৪৭ সালে সুফিয়া কামাল কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসার পর নতুন উদ্যমে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে কাজ শুরু করেন। এ সময় ঢাকায় লীলানাগ নারীশিক্ষা বিস্তারসহ

---

[৭১১] সুফিয়া কামাল, *একালে আমাদের কাল*, সাজেদ কামাল (সম্পাদিত), *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৮৭

[৭১২] *ঐ*, পৃ. ৫৮৯

নানারকম নারী কল্যাণে কাজ করছিলেন। সুফিয়া কামাল ঢাকায় এসে লীলানাগের সাথে একযোগে কাজ শুরু করেন। উল্লেখ্য তখন থেকে সুফিয়া কামাল ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অন্যদিকে লীলানাগ কলকাতায় অবস্থানকালে সুফিয়া কামালের সমাজ ও নারী কল্যাণের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলে, তাঁকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে গঠিত 'শান্তি কমিটি'র সাথে যুক্ত করেন।[৭১৩] আর এ সময় থেকেই তিনি *শান্তি কমিটি*র সাথে যুক্ত হয়ে নানা রকম উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন,

> যখন ঢাকায় এলাম 'নারী শিক্ষা মন্দির' এর প্রতিষ্ঠাত্রী স্বনামধন্য লীলানাগ (লীলা রায়) আমাদের লীলাদি তখন হিন্দু মুসলমান মহিলাদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'শান্তি কমিটি'। তাঁর ডাকে তাঁর সাথে যোগ দিলাম। তখনকার দিনের এম.এল.এ আনোয়ারা খাতুন, ইনুদি, ডলিদি, আরও অনেক মহিলা এসে ঢাকার শহরতলী ছাড়িয়ে দূর গ্রাম বন্দর গঞ্জেও শান্তি কমিটির কাজে যোগ দিলেন। যারা যে দেশে আছেন, যখন নিজের দেশকে গড়ে তুলতে হিংসা দ্বেষ অভাব দুঃখ দারিদ্র ভুলে কাজে এগিয়ে আসেন, তখনই টের পাওয়া যায় শান্তি নিরাপত্তা স্থাপন করতে মেয়েদের মায়েদের ভূমিকাই প্রধান।[৭১৪]

*শান্তি কমিটি*র সদস্যরা দিনরাত ঘরহারা, স্বজনহারা, স্বামী-পুত্রহীনা মায়েদের কষ্টের কথা, তাদের হৃদয়ের কান্নার কথা অনুধাবন করা চেষ্টা করেছে। এসকল অত্যাচারিত, নির্যাতিত মা-বোনদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করেছে *শান্তি কমিটি*। সুফিয়া কামাল বলেন, "অসীম ধৈর্য ছিল লীলাদির। বলতেন ওদের (সকল স্তরের মানুষের) সাথে না মিশলে, সমব্যাথী না হলে ওরা আমাদের কথা শুনবে কেন? এই একটা শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। এবং আজও সেই শিক্ষার জন্যই আমি আন্তরিকভাবে যেটুকু পারি সমাজসেবায় অংশ নিয়ে দুঃখীদের সাথে, দরিদ্রদের সাথে মিশতে পারি।"[৭১৫] মূলত লীলানাগ স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেন, দেশভাগের পর মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের হাল ধরার একমাত্র উপযুক্ত মানুষটি সুফিয়া কামাল। তাই *মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি*র উদ্যোগে গঠিত *সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকারী শান্তি কমিটি*র কাজে তাকে সভাপতি নিযুক্ত করেন।

---

[৭১৩] হাসনা বেগম, "দেশ ও মানবদরদী সুফিয়া কামাল", *নারীমুক্তি বেগম রোকেয়া ও অন্যান্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৯১

[৭১৪] সুফিয়া কামাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯২

[৭১৫] *ঐ*, পৃ. ৫৯৩

এভাবে বৈরী পরিবেশে প্রগতি চেতনার যোগ্য উত্তরাধিকারী সুফিয়ার হাতে নারী জাগরণ ও আন্দোলনের মশাল ধরিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সুফিয়া কামাল নিজ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৭ সালে *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকা প্রকাশ করে সুফিয়া কামালকে প্রধান সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেন। *বেগম* পত্রিকা এসময় থেকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে, পত্রিকাটির সূচনা সম্পাদকীয়তে সুফিয়া কামাল লিখেন-

> মুসলিম সমাজ আজ এক কঠোর দায়িত্ব গ্রহণের সম্মুখীন। অর্জিত স্বাধীনতা, সম্মান ও গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে হলে কেবল পুরুষেরই নয়, মুসলিম নারীকেও এগিয়ে আসতে হবে, নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কাজে। তার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ নারী সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে তারা সেই স্বাধীন সার্বভৌম আদর্শ রাষ্ট্রের সত্যিকার দাবিদার হতে পারে সগৌরবে। এর জন্য চাই আমাদের মানসিক প্রসার আশা-আকাঙ্খার ব্যাপ্তি আর জীবন সম্পর্কে এক স্থির ধারণা। ... সুধী ব্যক্তিরা বলেন, জাতি গঠনের দায়িত্ব প্রধানত নারী সমাজের হাতে- কথাটা অনস্বীকার্য নয়। এবং এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হলে পৃথিবীর কোনো দিক থেকেই চোখ ফিরিয়ে রাখলে আমাদের চলবে না। একথাও মানতে হবে, শিল্প, বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে গৃহকার্য ও সন্তান পালনে-সর্বক্ষেত্রে আমরা সত্যিকার নারীরূপে গড়ে উঠতে চাই।[৭১৬]

প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম নারী সমাজের পাশ্চাৎপদতা দূর করা, অবরোধ থেকে মুক্ত করা এসব কাজ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু তখন রাজনৈতিক পরিবেশ নারী প্রগতি তথা সমাজ প্রগতির পক্ষে ছিল না। কেননা তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকার ধর্মীয় অনুশাসনের নামে নারীর উপর চাপিয়ে দেয় নানা প্রগতি বিরোধী আইন। ফলে নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনকারী নারী-পুরুষ অনেকটা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রথম মুসলিম বাঙালি মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন,

> কংগ্রেস ত্যাগ করি ১৯৩৫ সালে। দীর্ঘদিন সমাজসেবামূলক কাজ করার পর ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেই। তখন মনে হয়েছিল পাকিস্তান হলে আমরা শিক্ষা ও সম্পদে হিন্দুদের সমকক্ষ হতে পারব। পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে মেয়েরা যদি ভোট না দিতেন তবে

[৭১৬] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, (নূরজাহান বেগম কর্তৃক প্রকাশিত), ৩৮ শরৎগুপ্ত রোড, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৩৩৮

পাকিস্তান হতো না। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি, যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সফল হবে না।[৭১৭]

১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি'র সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেন সুফিয়া কামাল। এ সংগঠনটির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে তখন পূর্ববাংলার নারী জাগরণ ও নারী অধিকার রক্ষায় এক অনবদ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন তিনি। একই সময় লীলানাগের উদ্যোগে গঠিত হয় 'উয়ারী মহিলা সমিতি'। এ সমিতির সভাপতিও করা হয় সুফিয়া কামালকে। এ বছর (১৯৪৮) ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় *পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে*র আয়োজন করা হয়।[৭১৮] এ সম্মেলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ধারাবাহিকভাবে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনেও সুফিয়া কামাল অন্যান্য মহিলাদের সাথে নিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং এসব অনুষ্ঠানে নারী জাগরণ ও আন্দোলনে সকল নারীকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। এভাবে তিনি নানা সভা সমিতি ও সম্মেলনে নারী প্রগতির লক্ষ্যে মত বিনিময় করেন এবং বক্তৃতা প্রদান করেন।

সুফিয়া কামাল নিজের লেখনী ও সৃষ্টিশীলতা কিংবা প্রাত্যহিক কাজের মধ্যদিয়ে মানুষের শুভবোধকে জাগ্রত করেছেন। তিনি মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে আলো ছড়িয়েছেন। সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন আলো দিয়ে আলো জ্বালানো একজন মানুষ। নারীর উপর নৃশংসতা কিংবা সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল তরুণ প্রজন্মকে অগ্রাধিকার দিতেন; তাদের সুকুমার বৃত্তি গঠন কিংবা সৃজনশীলতার বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি নারীকে আপন ভাগ্য গড়ে তোলার কথা বলেন। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন যে, "মেয়েদের স্বাধীনতা কেউ দিয়ে দেবে না। আদায় করে নিতে হবে। পুরুষশাসিত সমাজ শতাব্দীকাল ধরে মেয়েদের পায়ে যে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে তা ভাঙতে হলে সচেতন লড়াই দরকার। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে মানবিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করা।"[৭১৯]

১৯৫১ সালে সুফিয়া কামাল *পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের* সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং একটি যুক্তিবাদী, মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন, অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি বিকাশের প্রয়াসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। একই

[৭১৭] "বাংলাদেশের প্রথম মুসলমান মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরী", *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ম বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ঢাকা; উদ্ধৃত, মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০

[৭১৮] হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২

[৭১৯] রাখী দাশ পুরকায়স্থ, 'শতাব্দীর সাহসিকা', *সমকাল*, ২০ জুন ২০১৬, পৃ. ৯

সময়ে তিনি গড়ে তোলেন *শিশুরক্ষা সমিতি*। উল্লেখ্য ১৯৫৬ সালে ঢাকার তারাবাগে নিজ বাড়ির আঙিনায় আয়োজিত সভা থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে *কচিকাচার মেলা*। পরে তিনি শিশুকল্যাণ পরিষদের সথেও সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।[৭২০] ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে মেয়েদেরকে উজ্জীবিত করে সুফিয়া কামাল কবিতা রচনা করেন সমসাময়িক নানা পত্র-পত্রিকায়। এ সম্পর্কে *একুশে সংকলন* গ্রন্থপঞ্জিতে তাঁর ৬৫টি কবিতার উল্লেখ আছে। ভাষা আন্দোলন সুফিয়া কামালকে খুব স্পর্শ করে। এ সম্পর্কে লিখেন,

> পাকিস্তানের শুরুতেই মাতৃভাষার উপর আঘাত এল। রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অবশ্য শায়েস্তাবাদের আমাদের পরিবারেরও তখনকার ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু আমাদের রক্ত মাংস অস্থি মজ্জার যে ভাষা মিশে গেছে তা বাংলা। বাংলার ভাষা, বাংলার আকাশ-বাতাস, মাটি পানিতে এ দেহ পুষ্ট। এর প্রকৃতির শোভায় চোখ জুড়ায়। এর গানে সুরে সংস্কৃতিতে আমাদের গৌরব, একে ছেড়ে কি বাঁচা যায়? বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর বুকে এক নতুন ইতিহাস, বিষ্ময়।[৭২১]

তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পর পাকিস্তান সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেয়। এসময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ঢাকার রাজপথে প্রথম মেয়েদের ঘেরাও আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী আতাউর রহমানকে রাস্তায় ঘেরাও করা হয়। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও সুফিয়া কামাল সক্রিয় ছিলেন। উল্লেখ্য ১৯৬১ সালে তাঁর ভূমিকায় 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন সুফিয়া কামাল। আজীবন তিনি এ পদে আসীন ছিলেন। এভাবে তিনি নানাভাবে বহুমুখী কার্যক্রমের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন যা অন্যান্য নারীর কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হয়।

বাংলার সমাজে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ক্রমবিকশিত নারী আন্দোলন বিভিন্ন বাধা, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে সমাজে বহমান পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, নারীর প্রাপ্য নাগরিক অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত রাখার প্রবণতা ইত্যাদি মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তাঁর এ আন্দোলনে প্রধান অনুপ্রেরণাদাত্রী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তাই ১৯৬০ সালে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ঢাকায় *বেগম*

---

[৭২০] আনিসুজ্জামান, "সুফিয়া কামাল : চিরন্তন প্রেরণার উৎস", *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ* (আনিসুজ্জামান, আয়শা খানম, সুলতানা কামাল ও মফিদুল হক সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ*, ২০১১, পৃ. ৫০

[৭২১] সুফিয়া কামাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯৫

রোকেয়া সাখাওয়াত স্মৃতি কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের* প্রথম ছাত্রী হলের নাম 'রোকেয়া হল' করার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।[৭২২] উল্লেখ্য এসময় পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হওয়ার ফলে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। অল্পসময়ের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ার ফলে সুফিয়া কামাল উয়ারী *মহিলা সমিতি* ও *শিশুরক্ষা সমিতির* কাজ পুরোদমে শুরু করেন। ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন ঘোষণা করলে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীরা এর বিরোধিতা করতে থাকলে সুফিয়া কামাল ও শামসুন নাহার মাহমুদের নেতৃত্বে সাংবাদিকদের ডেকে এ অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানান। উল্লেখ্য তৎকালীন মুসলিম পারিবারিক আইন প্রণয়নে সুফিয়া কামাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি দেশের মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল ধর্মের জন্য অভিন্ন পারিবারিক নারী স্বার্থ রক্ষাকারী আইন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশে নারী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

সুফিয়া কামাল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক মূল্যবোধ ও নারীর মানবাধিকার বিষয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকার ব্যাপারে নারী সমাজকে জাগরিত ও সচেতন করেছেন। অন্যদিকে পুরুষ প্রাধান্যে পরিচালিত নানা সামাজিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে, নারীর মানবাধিকার ও সমঅধিকার অর্জন ও রক্ষায় পুরুষ সহকর্মীদের সহযোগিতা, ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জাগরণ ঘটাতেন। অত্যন্ত সাহসিকতার অধিকারী সুফিয়া কামাল ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিক নারীদিবস (৮ মার্চ) উদযাপনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কো সফর করেন।[৭২৩] তিনি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারী সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনগত ও সাংস্কৃতিক সম অধিকার অর্জনের ইতিহাস জানার সুযোগ লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি *সোভিয়েতের দিনগুলি* নামক ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেন। সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকাশ ও আদর্শের নানাদিক এবং সোভিয়েতের নারী জাগরণ সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পূর্ব বাংলায় নানা সভা সমিতিতে সোভিয়েতের নারী জাগরণের কথা তুলে ধরে বাঙালি নারী সমাজকে প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো,

> আমরা জন্মেছিলাম পৃথিবীর এক আশ্চর্যময় রূপায়নের কালে। প্রথম মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিম রেনেসাঁর পুনরুত্থান, রাশিয়ান বিপ্লব, বিজ্ঞান জগতের নতুন নতুন

---

[৭২২] হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩

[৭২৩] *ঐ*

আবিষ্কার, সাহিত্য সংস্কৃতির নবরূপ সূচনা, এসবের শুরু থেকে যে অভাবের মধ্যে শৈশব কেটেছে তারই আদর্শ আমাদের মনে ছাপ রেখেছে সুগভীর করে। স্বাধীনতা চাই, শান্তি চাই, সাম্য চাই। এই বাণী তখনকার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হত। এখনও মানুষ সেই সংগ্রাম করছে।[৭২৪]

উল্লেখ্য সুফিয়া কামাল *পাকিস্তান-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি*র সভাপতি নিযুক্ত হন। এ সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুহম্মদ ইদ্রিস ও প্রধান সংগঠক ছিলেন শহীদুল্লা। তিনি *সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি*র বিভিন্ন কার্যক্রমে নারী সমাজের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন।[৭২৫] প্রকৃতপক্ষে সুফিয়া কামাল মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল ধর্মের নারীকে একইভাবে মূল্যায়ন করেন। তিনি সব সময় সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উর্ধ্বে থেকেছেন। এক্ষেত্রে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের চিন্তাচেতনা তথা দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সুফিয়া কামাল মনে করেন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যে নারী জাগরণ শুরু করেন তার সফলতা আজ আমরা পরিলক্ষিত করছি। এ প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল *বেগম পত্রিকায়* লিখেছেন,

... রোকেয়া তাঁর 'পদ্মরাগ', 'মতিচূর', 'অবরোধবাসিনী'র মধ্যে কি হিন্দু, কি মুসলিম, কি খ্রিস্টান সমগ্র নারী জাতির দুঃখ-দুর্দশা, অত্যাচার, অবহেলা, অনাচারের প্রতিবাদ করেছেন, দেখিয়েছেন শিক্ষা বঞ্চিত নারী কত অসহায়। কুশিক্ষার ফল কি বিষময়। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ছিল প্রধানতঃ সমাজ সংস্কারের দৃঢ় সংকল্পে নিয়োজিত। তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। ... তাঁর 'তারিণীভবন' এ নির্যাতিতা অসহায় অশিক্ষিতা মেয়েদের আশ্রয় হয়ে শিক্ষা সেবাদানের পথ প্রদর্শন করেছেন, সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি নারীকে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করার আবেদন জানিয়েছেন। আজ তাই আমাদের সমাজে শিক্ষিতা কর্মিষ্ঠা নারীর অভাব আর নেই।[৭২৬]

সুফিয়া কামাল ১৯৬৯ সালে 'মহিলা সংগ্রাম কমিটি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। আইয়ুব বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকায় মহিলাদের সমাবেশে সভাপতিত্ব ও মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এসময় আইয়ুব সরকার বিরোধী প্রতিবাদস্বরূপ তিনি 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' উপাধি (পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একটি শ্রেষ্ঠত্ব

---

[৭২৪] সুফিয়া কামাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭৮

[৭২৫] মালেকা বেগম, "নারী আন্দোলন ও সুফিয়া কামাল", *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৭

[৭২৬] সুফিয়া কামাল, "সাহিত্যে নারী", *বেগম*, ২০শ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, ১৯শে মার্চ, ১৯৬৭, পৃ. ১৯ (বাংলা একাডেমি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা)

পুরস্কার, যা পাকিস্তানের যে কোনো নাগরিককে দেশের জন্য তাঁর সেবা বা অর্জনের ভিত্তিতে দেওয়া হয়) প্রত্যাখ্যান করেন।[৭২৭] উল্লেখ্য সুফিয়া কামাল জাতীয় স্বাধিকার আন্দোলনের মূলধারায় নারী আন্দোলনের সম্পৃক্ততার বিষয়ে নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জরুরি আইন প্রত্যাহার, দমননীতি বন্ধ ও রাজবন্দির মুক্তিসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে চলতে থাকা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি নারী সমাজের বৃহত্তর আন্দোলনের অব্যাহত ধারা সক্রিয় ছিল। আর এ নারী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন সুফিয়া কামাল।

১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় *পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ*। এ সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতার প্রস্তুতিপর্বে এদেশের নারী আন্দোলনের সার্বিক রূপায়নে সচেষ্ট থাকে। অন্যদিকে সুফিয়া কামাল এসময় *সমাজ উন্নয়ন সংস্থার* সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দুর্গত নারী ও শিশুদের রক্ষায় সুফিয়া কামালের অবদান অনস্বীকার্য। অন্যদিকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনে ঢাকার মহিলাদের সমাবেশ ও মিছিলে নেতৃত্ব দেন সুফিয়া কামাল।[৭২৮] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে অবস্থান করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেন। পাকবাহিনীর ভয়ভীতি ও মানসিক নির্যাতন উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। সুফিয়া কামাল কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি *একাত্তরের ডায়েরি* পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম টেলিভিশন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।[৭২৯]

স্বাধীন বাংলাদেশের নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে সুফিয়া কামাল অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি নির্যাতিত মেয়েদের পুনর্বাসনের অভিপ্রায়ে 'নারী পুনর্বাসন সংস্থা'র সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' নামে আত্মপ্রকাশ করে পুরোদমে দেশসেবার কাজ করে।[৭৩০] সুফিয়া কামাল আজীবন সভাপতি পদে এ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করেন। উল্লেখ্য *বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ* এর কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

---

[৭২৭] হাসনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪

[৭২৮] *ঐ*, পৃ. ৯৫

[৭২৯] *ঐ*

[৭৩০] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩২

ছিল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সম-অধিকার ও সম-পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নারীকে বিবেচনা করা, সামাজিকভাবে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ বৈষম্যহীন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। 'নারীমুক্তি মানেই মানব মুক্তি'- এ স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রচলিত বৈষম্যমূলক আইন পরিবর্তিত করে পুত্র-কন্যার, পিতা-মাতার সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার প্রবর্তন করা এবং নারী নির্যাতনের হাতিয়ার যৌতুক ও বহুবিবাহ প্রথার রোধ করা প্রভৃতি দাবিতে সার্বজনীন পারিবারিক আইন প্রবর্তনের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে।[৭৩১] এসব কাজে সুফিয়া কামাল অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

সুফিয়া কামাল একটি পশ্চাৎপদ দেশে যেখানে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিবার ও সমাজ পরিচালিত ও প্রভাবিত হয়, সেখানে নারীর ব্যক্তি অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও চেতনাকে বিকশিত করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। তিনি বিশ্বাস করেন নারী কোনো অবলা জীব নয়, পুরুষের মনোরঞ্জনই তার একমাত্র কাজ একথাও তিনি স্বীকার করেন না। নারীর মধ্যে আছে অনন্ত শক্তি, সুযোগ পেলে সেও দেখাতে পারে বিশ্ব বিজয়ী রূপ- এ ভাবনায় ছিল তাঁর গভীর প্রত্যয়। নারীর প্রতিভা ও সক্ষমতা তিনি স্মরণ করেন। যাঁরা পুরুষ প্রদত্ত অবলাসত্তা অতিক্রম করে মানব সত্তায় নিজেকে বিকশিত করেছেন এমন মেয়েদের নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। একারণেই তাঁর কবিতার বিষয় হয়েছেন নারী জাগরণ ও আন্দোলনের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, আলজিরিয়ান মুক্তিসংগ্রামী জমিলা বুমেদীন, প্যালেস্টাইনি মুক্তিযোদ্ধা লায়লা খালেদ কিংবা প্রথম নারী নভোচারী ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা।[৭৩২] সুফিয়া কামাল সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন,

> ... সমাজের জমাট অন্ধকারের মধ্যে অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল প্রত্যয়, প্রগতি ও সাহসিকতার দীপশিখা নিয়ে পথ চলেছেন সুফিয়া কামাল। কখনো মনে হয়েছে তাঁর অভিযান বুঝি একজন ব্যক্তির কিংবা একান্তই নারীর অথবা তাঁর সম্প্রদায়ের। আসলে তা সমষ্টির, তা দেশকালাশ্রয়ী, মাতৃস্বরূপা তিনি, তিনি প্রেমময়ী, কল্যাণী, অভয়দাত্রী। তিনি আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস।[৭৩৩]

---

[৭৩১] *ঐ*, পৃ. ১৩৩

[৭৩২] বিশ্বজিৎ ঘোষ, "সুফিয়া কামালের কবিতা : নারী ভাবনা ও জেন্ডার চেতনা", *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৫-২১৬

[৭৩৩] আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩

বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন নূরজাহান বেগম (১৯২৫-২০১৬)। নূরজাহান বেগম ১৯২৫ সালের ৪ জুন চাঁদপুরের পাইকারদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের কন্যা। নূরজাহান বেগমের মায়ের নাম ফাতেমা খাতুন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন স্ত্রী এবং কন্যাকে পড়ালেখা শেখানোর জন্য বাড়ীতে মহিলা শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এভাবেই নূরজাহান বেগমের পড়ালেখার হাতেখড়ি। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি ভর্তি হন কলকাতায় *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে*। এ স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। উল্লেখ্য ১৯৪৬ সালে তিনি বি. এ পাশ করেন।

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সচিত্র *মহিলা সওগাত* পত্রিকার দ্বারা নারী জাগরণের কাজ করেন। ১৯৪৬ সালে এসে তিনি মনে করেন বাংলায় সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের অগ্রগতির জন্য আরো বেশি তৎপর হতে হবে। মেয়েদেরকে আরো বেশি লেখালেখিতে সক্রিয় করতে হবে। তাহলে দ্রুত বাঙালি নারীর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে এবং তাঁরা প্রগতির পথে পরিচালিত হয়ে আত্মউন্নয়ন ঘটাতে পারবে। এমন ধারণা থেকেই নাসিরউদ্দীন ১৯৪৬ সালে *মহিলা সওগাতে*র শেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং এর পরিবর্তে ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই *বেগম পত্রিকা* সাপ্তাহিকভাবে (প্রতি রবিবার) প্রকাশ করা শুরু করেন। কলকাতা বিকাশমান শহর হওয়ার কারণে এখান থেকে এ পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পত্রিকাটি প্রকাশের পর সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয় সুফিয়া কামালকে। এ সময় নূরজাহান বেগম সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।[৭৩৪] এভাবে চারমাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নূরজাহান বেগম আজীবন *বেগম পত্রিকা*র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময় *বেগম পত্রিকা* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালে পত্রিকাটির অফিস ঢাকাতে স্থানান্তরিত হয়। এটি তখন ৩৮ শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা থেকে নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে। উল্লেখ্য *বেগম* পত্রিকা আজও নিয়মিতভাবে (মাসে একবার) প্রকাশিত হয়।

---

[৭৩৪] বাংলার মেয়েদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে *বেগম পত্রিকা*। উল্লেখ্য ১৯৪৭ সালে *বেগম পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ ৪২ সংখ্যা পর্যন্ত কলকাতার ১২নং ওয়েলেসলি স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ২০৩ নং পার্ক স্ট্রীট *বেগম* কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। প্রথম সংখ্যা থেকেই *বেগম* ছিল মেয়েদের সচিত্র পত্রিকা। পত্রিকাটির কভার পৃষ্ঠায় কোন একজন মেয়ের ছবি বড় করে প্রকাশ করা হয়। প্রকাশনার প্রাথমিক যুগে (১৯৪৭-১৯৫০) অনেক মেয়ে বিভিন্ন বিভাগে লেখা দিয়ে পত্রিকাটি সমৃদ্ধ করেন। কেবল কলকাতা থেকে প্রকাশিত *বেগমে*র কয়েকজন লেখকের নাম নিম্নরূপ- সুফিয়া কামাল, শামসুন নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, রাজিয়া খাতুন, জাহানারা আরজু, নূরুন নাহার, আফসারুন্নেসা, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, আইনুন নাহার, সুরুচিবালা সেন গুপ্ত, হাসিরাশি দেবী, হুসনা বানু খানম, নাসিমা বানু, ইন্দ্রিরা দেবী, রাবেয়া খাতুন, প্রতিভাবসু প্রমুখ। (মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৩৯)

বিশ শতকের মধ্যভাগে তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে অবহেলিত নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে *বেগম পত্রিকা* প্রকাশ ছিল একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। এভাবে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন আহ্বান জানান মেয়েদেরকে রুদ্ধদ্বার থেকে বাইরে আসার জন্য। মেয়েরা স্বাধীনভাবে লিখবে, সাংবাদিকতা করবে- সে সুযোগ তিনি সৃষ্টি করে দেন। এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অনেক মেয়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে।[৭৩৫] নূরজাহান বেগমের বলিষ্ঠ সম্পাদনার মধ্য দিয়ে *বেগম* পত্রিকাটি এদেশের শিক্ষা-সাহিত্যে উৎসাহী নারী সমাজের কাছে ছিল এক অপূরণীয় প্রেরণা। নূরজাহান বেগম ছিলেন জ্ঞান বিকাশের অনন্য দিশারী, নারী জাগরণের অক্লান্তকর্মী। নূরজাহান বেগম প্রথম বাঙালি নারী সম্পাদক যার প্রথম এবং প্রধান পরিচয় সাংবাদিক হিসেবে। নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে সাহিত্য ক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে আনার লক্ষ্যে *বেগম* পত্রিকার জন্ম হলেও তিনি নারী জাগরণ, কুসংস্কার বিলোপ, গ্রামাঞ্চলের নির্যাতিত নারীর চিত্র, জন্মনিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের জীবনবোধ থেকে লেখা চিঠি ও বিভিন্ন মনীষীর বাণী তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য *বেগম* পত্রিকা তৎকালীন শিক্ষিত মুসলিম নারী লেখকদের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, যা কেবল নূরজাহানের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়। এ পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালি নারী বিশেষ করে সমাজে পিছিয়ে পড়া মুসলিম নারী হাজার প্রতিবন্ধকতার মাঝেও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখে। নূরজাহান বেগম পশ্চাৎপদ নারীকে সামনে আনার জন্য লেখালেখিতে উৎসাহ ও সহযোগিতা করেন। তিনি মেয়েদেরকে উজ্জীবিত করতে গিয়ে বলেন,

> ... মুসলিম বিশ্বে নারী জাগরণের তুফান উঠিয়াছে। ইহা রোধ করিবার শক্তি কাহারও নেই। আজ তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান, আলবেনিয়া প্রমুখ সকল মুসলিম সাম্রাজ্যে নারী প্রগতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। এই এমন সুন্দর দিনে বাংলাদেশের মুসলিম নারী কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? মুসলমান যত বেশি ঘুমাইতে পারে, জাগিতেও পারে তত শীঘ্র। তাই আমরা প্রভাতের ঘুম জাগানিয়া পাখির অকুল কাকলি শুনিবার আগেই দেখিতেছি বহু মুসলিম নারীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।[৭৩৬]

---

[৭৩৫] সেলিনা হোসেন, *সাক্ষাতকার*, ০৪.১২.২০১৭

[৭৩৬] কুমারী নূরজাহান, "বঙ্গে-মুসলেম নারী-জাগরণ", *মাসিক জাগরণ*, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৫; হাবিব রহমান (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), *নির্বাচিত সংকলন মাসিক জাগরণ পত্রিকা*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১০। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নূরজাহান বেগম পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি খুব বেশি করেননি। তবে তিনি নিজের নাম ব্যবহার না করে অনেক সময় লিখতেন, আবার ছদ্ম নামেও লিখেছেন। তেমনি কুমারী নূরজাহান নামে তিনি *জাগরণ পত্রিকায়* প্রবন্ধ লিখেন। এ তথ্য দিয়েছেন নূরজাহান বেগমের জ্যৈষ্ঠ কন্যা ফ্লোরা নাসরীন খান (বর্তমান সম্পাদক *বেগম পত্রিকা*)।

প্রকৃতপক্ষে এসময় মুসলিম সমাজের গোঁড়ামির মধ্যে আবদ্ধ রক্ষণশীল অবস্থা হতে নারী জাগতে শুরু করেছে। এ জাগা সার্থক হবে সেদিন, যেদিন বাংলার সকল নারী এক শামিয়ানার নিচে এসে দাঁড়াবেন। এসময় অবরোধপ্রথার কিছুটা শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় এবং মেয়েরা পড়াশুনায় এগিয়ে এসেছে, যা অত্যন্ত আশার কথা। মেয়েরা ঘরের কাজে সচরাচর বাইরে যাওয়া শুরু করেছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য নারীর বিলেত গমনের খবরও জানা যায়। তবে যেখানে আফগানিস্তানের নারী কলকারখানায় কাজ করছে, তুরস্কে নারী প্রশাসনিক কাজ করছে, এমনকি উকালতি ও ডাক্তারি করছে সেখানে বাঙালি নারীরও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া জরুরি বলে নূরজাহান বেগম মনে করেন। বাংলার মেয়েরা কেমন ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারে সে প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন,

> ... মহিলা ডাক্তার না থাকায় মেয়েরা সাধারণত নিজেদের গোপন ব্যাধির কথা কোনো পুরুষ ডাক্তারকে বলতে চায় না। তাই মহিলা ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে। আবার কলকাতা কর্পোরেশনে অনেক মুসলমান মেয়ে স্কুল খুলেছে। এখানে মুসলমান মেয়ে শিক্ষয়িত্রীর অভাব রয়েছে। তাই বাংলায় মেয়েরা শিক্ষকতা পেশায়ও আসতে পারে।[৭৩৭]

মুসলিম মেয়েদের বাইরের জগতে বের হবার জন্য সমাজে প্রচলিত অবরোধ ও পর্দাপ্রথার প্রতি তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন। ব্রাহ্ম বা খ্রিস্টান মেয়েরা যেমন তথাকথিত পর্দা ছাড়া সাধারণ পোশাকে বাইরে আসে তেমনি মুসলিম মেয়েরাও আসতে পারে বলে নূরজাহান বেগম মনে করেন। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারায় প্রগতিশীলতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। নূরজাহান বেগম বোরখা ছাড়া প্রচলিত সাধারণ পোশাকেই সবসময় চলাফেরা করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রগতিশীল চিন্তাধারা, আধুনিক সাজসজ্জায় চলাফেরা এবং সর্বোপরি তাঁর (নূরজাহান বেগমের) নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ ও সফলতার পিছনে কাজ করে তাঁর পিতা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এবং স্বামী রোকনুজ্জামান খানের[৭৩৮] অকুণ্ঠ সমর্থন। নূরজাহান বেগম তাঁর পত্রিকার জন্য মেয়েদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে লেখা সংগ্রহ করতেন। তাদের উৎসাহিত করার জন্য লেখকের ছবি

---

[৭৩৭] *ঐ*, পৃ. ১১১

[৭৩৮] রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই (১৯২৫-১৯৯৯) ফরিদপুর জেলার পাংশা উপজেলায় (বর্তমান রাজবাড়ী জেলার অংশ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক ও শিশু সংগঠক। তিনি কলকাতার *ইত্তেহাদ* (১৯৪৭), *শিশু সওগাত* (১৯৪৯) ও *দৈনিক মিল্লাত* (১৯৫১) পত্রিকায় সাংবাদিতা করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় যোগদান করে 'দাদাভাই' ছদ্মনামে শিশুদের পাতা 'কচি-কাঁচার আসর' সম্পাদনা শুরু করে আমৃত্যু এর সাথে যুক্ত ছিলেন। এ থেকে তিনি দাদাভাই নামে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে শিশু সংগঠন 'কচি-কাঁচার মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন।

সংগ্রহ করে ছবিসহ লেখা ছাপাতেন। এ প্রসঙ্গে নূরজাহান বেগম *প্রথম আলো* পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন, "সে সময় মেয়েরা পত্রিকা অফিসে এসে লেখা জমা দিয়ে যেতে পারতেন না। কিন্তু হিন্দু এবং মুসলিম মেয়েরা ডাকে প্রচুর লেখা পাঠাতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যেই *বেগম* জাগরণ সৃষ্টি করতে পেরেছিল।"[৭৩৯] নূরজাহান বেগম ও তাঁর সম্পাদনায় *বেগম* পত্রিকা তৎকালীন পূর্ব বাংলায় নারীর মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্রে তৈরি করে। *বেগম* পত্রিকা প্রকাশকালে শামসুন নাহার মাহমুদ নিম্নরূপে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন,

> আজ ভারতের মুসলমানের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের অভ্যূদ্বয় হচ্ছে। এই নব অরুণোদয় ক্ষণে মেয়েদের স্থান শূণ্য থাকবে না, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। মুসলিম ভারতে যে নতুন ইতিহাস রচিত হতে চলেছে সকলের মিলিতদানে সে ইতিহাস সমৃদ্ধ হোক। ... এই জয়যাত্রার পদে অন্য কারুর তুলনায় বাংলার মেয়েদের হাতের মশাল যেকোন অংশে হীন-তেজ হবে না একথা জোর গলায় বলতে আর দ্বিধাবোধ করবার কোন কারণ নেই। এই যুগ সন্ধিক্ষণে মেয়েদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম' এর প্রতিষ্ঠা ও প্রচার সার্থক ও গৌরবান্বিত হোক।[৭৪০]

বেগম পত্রিকায় মেয়েরা নিজেদের কথা, নিজেদের মত করে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে। নারীর অপরিসীম ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ করে দেয় *বেগম*। ফলে মেয়েদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এ পত্রিকায় বলা হয়, "শত সহস্র বছর ধরে মানুষের নৃশংস, বর্বরতা ও অত্যাচারের স্বীকার হয়েও নারীই সহিষ্ণুতার প্রতীক। পুরুষের সকল জ্ঞানের উৎস নারী। এমনকি তার মুখের ভাষাও যুগিয়েছে নারী। নারীই পারে পুরুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে।"[৭৪১] বাঙালি মেয়েরা *বেগম* পত্রিকার মাধ্যমে নানা বিষয়ে সচেতন হওয়ার শিক্ষা লাভ করে। এ পত্রিকা সমগ্র বাংলার এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু পালন প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কাজ করে। মেয়েদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার সৃষ্টি করে- এককথায় বাংলায় নারী বিপ্লব ঘটানোর কাজে *বেগম* এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। *বেগম* পত্রিকায় পরিবারে নারীর গুরুত্ব বোঝাতে বলা হয় যে,

> আদর্শ মা থেকেই আদর্শ জাতি গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষিতা মায়ের সন্তানই সুশিক্ষা পেয়ে উন্নত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক সন্তানই প্রথম শিক্ষার সুযোগ পায়

---

[৭৩৯] *প্রথম আলো*, মঙ্গলবার, ২৪শে মে, ২০১৬, পৃ. ১৪

[৭৪০] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪৪

[৭৪১] *বেগম*, ২০শ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, ১৯শে মার্চ, ১৯৬৭, পৃ. ৪ (বাংলা একাডেমি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা)

> মায়ের কাছ থেকে। ... শিশুমন কি চায়, কিসে খুশী হয়, কোন পথে অগ্রসর হতে চায়, কোন শিক্ষাকে শিশুমন সহজে এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে- শিশুর সেইসব প্রবণতার কথা সবচেয়ে বেশি বোঝেন মা। সুতরাং প্রথম গৃহশিক্ষকের ভূমিকাটি যে একান্তভাবে মায়ের- অর্থাৎ নারীর।[৭৪২]

১৯৫৫ সালের পর থেকেই *বেগম* পত্রিকার মাধ্যমে নারীর নবজাগরণের গতি বৃদ্ধি পায়। এ সময় *বেগম পত্রিকা* বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত। সাধারণ নারীসমাজ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এ পত্রিকা পড়তেন। এর প্রভাব ছিল অত্যাধিক। এমনকি দেশ বিদেশে তখন *বেগম পত্রিকা*র সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে নূরজাহান বেগমের কন্যা ফ্লোরা নাসরীন খান বলেন,

> ... আমার মতে ৬০ এর দশক ছিল *বেগমের* স্বর্ণযুগ। কবি সাহিত্যিকগণ *বেগমকে* এরই মাঝে ভালোবেসেছিলেন। ... *বেগম* সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হতে থাকে এদের সুন্দর যুগোপযোগী রচনায়। 'বেগম' তখন শাখা মেলেছে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর আমেরিকা, ইউ. কে, জার্মানীসহ দূর প্রবাসের নানা স্থানে বাঙালি পাঠিকাদের হাতে। দূর-দূরান্ত থেকে প্রবাসী লেখিকারা তখন লিখতে থাকেন বেগমের পাতায়।[৭৪৩]

নারী পুরুষের সমান অধিকার বিষয়ে সমাজ দর্পনরূপে *বেগম* অবদান রেখেছে। পত্রিকাটি বাংলার নারী জাগরণের একটি মশাল। নারীর স্বপ্ন, সাধ ও কল্পনার উন্মুক্ত দিগন্ত। নারীসত্ত্বার বিকাশে ও নারীর মতামত প্রকাশের আন্দোলনে *বেগম* পত্রিকা নারী সাহিত্যিকদের সূতিকাগার এবং নূরজাহান বেগম তাদের জননীসম।

দেশ বিভাগের পর সংস্কৃতানুরাগী মুসলিম নারী অনেকে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে এলেন। এখানে এসে তারা অনেকে রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রচেষ্টা চালানোর চিন্তাভাবনা শুরু করেন। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতানুরাগী মেয়েদের একত্রিত হওয়ার নির্দিষ্ট কোন স্থান ছিল না। আবার সমাজের কঠোর রক্তচক্ষুর ভয়ে মুসলিম নারী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সাহস পেতেন না। মহিলা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এ দুর্দিনে ঢাকায় এলেন প্রখ্যাত মার্কিন মহিলা সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী মিসেস আইদা আলসেথ। সাপ্তাহিক *বেগম* অফিসও একদিন

---

[৭৪২] খোদেজা খাতুন, "শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী", *বেগম*, ২০শ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ২৬শে মার্চ, ১৯৬৭, পৃ. ৪

[৭৪৩] ফ্লোরা নাসরীন খান, "স্মৃতির অলিন্দে *বেগম* ও আমার মা", *বেগম*, ৭২ বছর পূর্তি (১৯৪৭-২০১১) সংখ্যা, ২০ জুলাই, ২০১৯, পৃ. ৯

পরিদর্শন করতে এলেন তিনি। *বেগম* পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে পরিচিত হয়ে তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন। মিসেস আলসেথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহিলাদের সাংস্কৃতিক জাগরণের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমেরিকার নারী সমাজ অনেক বাধা বিপত্তির সাথে লড়াই করে বর্তমান উন্নত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তিনি সেখানকার মেয়েদের নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের এবং প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি বাঙালি নারীকে সেটি থেকে উদ্দীপনা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।[৭৪৪]

মূলত মিসেস আইদা আলসেথের কাছ থেকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে নাসিরউদ্দীন *বেগম ক্লাব* প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেন। তিনি বলেন, কলকাতায় যেমন নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও 'সওগাত সাহিত্য মজলিস' প্রতিষ্ঠা করেছিলাম এবং সেখানে যেরূপ সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের মিলন ঘটেছিল এবং যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বহু কবি-সাহিত্যিক, ঢাকায় মহিলাদের তদ্রুপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে হয়তো তাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজসেবামূলক কাজে এগিয়ে আসবেন।[৭৪৫] এ উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর ঢাকায় *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন *বেগম ক্লাব* প্রতিষ্ঠা করেন। *বেগম* পত্রিকা অফিসের পরিমণ্ডলেই গড়ে উঠে *বেগম ক্লাব*। প্রথমদিকে মাসে একবার এবং পরবর্তীতে বছরে অন্তত একবার *বেগম* পত্রিকার লেখকরা সম্মিলিত হয়ে সাহিত্য সমাজসেবামূলক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। শামসুন নাহার মাহমুদকে *বেগম ক্লাবের* প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। এ ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন,

> সাপ্তাহিক বেগমের পক্ষ থেকে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই আনন্দের বিষয়। বেগম ক্লাবের যে উদ্দেশ্য, তা সঠিকভাবে কার্যকরী হলে পূর্ব বাংলার মেয়েদের নানাদিকে উন্নতি সাধিত হবে তা সহজেই বলা যায়। এর মাধ্যমে লেখিকা, সাহিত্যিকা, সমাজসেবিকা, শিল্পী ও অন্যান্য মহিলাদের একস্থানে সমাবেশ হলে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা সহজ হবে। আজ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের লেখিকা বা সাহিত্যিকাদের জন্য এ ধরণের পৃথক কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। *বেগম ক্লাব* এদিক দিয়ে এই অভাব মোচন করতে পারবে ।[৭৪৬]

বেগম পত্রিকার সেবার ব্রতকে আরো সুদূরপ্রসারী করার কাজ করে *বেগম ক্লাব*। ক্লাবটি ছিল নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের কাজ পরিচালনার একটি কেন্দ্র। এখানে নারী সমাজের ভবিষ্যৎ

---

[৭৪৪] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৪৩

[৭৪৫] *প্রথম আলো*, ২৪ মে, ২০১৬

[৭৪৬] *বেগম*, ১৭শ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ৩রা মে, ১৯৬৪, পৃ. ৯২ (বাংলা একাডেমি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা)

উন্নয়নের কথা সকলে মিলে একত্রে চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পারস্পারিক ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উৎসব উদযাপনে *বেগম ক্লাবে*র অবদান অনন্য। এ প্রসঙ্গে কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা বলেন,

> এরূপ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এ সময় পূর্ব বাংলার মুসলিম মেয়েদের নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকার আর সময় নেই। মেয়েদের আজ নানা বিষয়ে এবং নানা দিকে পুর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলা দরকার। লেখিকা এবং সমাজসেবিকাগণ একত্রিত হয়ে উন্নত ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করবেন। তাদের ভাবের আদান-প্রদানের দ্বারা আমাদের সমাজ জীবনে এক নতুন শক্তি বিকাশ লাভ করবে ।[৭৪৭]

বেগম ক্লাব পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। এ ক্লাবের মাধ্যমে নারী একটি স্থানে নিজেদেরকে একত্রিত করার প্রথম সুযোগ লাভ করে। মেয়েদের সাহিত্য রচনা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের চিন্তাভাবনাকে আরো সুবিস্তৃত করার সুযোগ ঘটে। এখানে নানা সময় বিভিন্ন দেশের নারীজাগরণে অংশগ্রহণকারী নারীর আগমন ঘটে। ১৯৫৫ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের মহিলা প্রতিনিধিদলকে *বেগম ক্লাবে* সংস্বর্ধিত করা হয়।[৭৪৮] স্থানীয় শিল্পী, সমাজকর্মী, লেখক ও বহু ভদ্রমহিলা এ অনুষ্ঠানে সমবেত হয়। এসব বিদেশি লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিল চীনা লেখক ও গ্রন্থকার মিস মেরিয়া ইয়েন, ব্যাংককের *সান্ত্রীসারন* পত্রিকার সম্পাদক মিস নীলাওয়ান পিনতং এবং আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের করাচী শাখার প্রতিনিধি বিশিষ্ট উপন্যাসিক মিস কোররাতুল আয়েন হায়দার। *বেগম ক্লাবে*র পক্ষ থেকে নূরজাহান বেগম এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আমি আন্তরিকতার সাথে বিদেশ থেকে আগত মাননীয় অতিথিবর্গকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এ ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে যোগদান করে তারা এর শোভাবর্ধন করেছেন। আমরা তাঁদের সফরের কথা আনন্দের সাথে স্মরণ রাখবো। তাঁদের এ সফর মহিলাদের মধ্যে আন্তঃএশীয় বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা গড়ে তুলবে সন্দেহ নেই।[৭৪৯]

---

[৭৪৭] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪৫

[৭৪৮] *ঐ*

[৭৪৯] *ঐ*, পৃ. ১৩৪৬

বিদেশি নারী লেখকরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বাঙালি নারীর সাহিত্য সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা ও সমাজসেবার প্রশংসা করেন। এভাবে আন্তঃএশীয় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটে যা পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনকে আরো বেগবান করে। *বেগম ক্লাব* প্রতিষ্ঠার পর নারী লেখকদের সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ক্লাবের সম্পাদক নূরজাহান বেগম এক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ *বেগম ক্লাবের* সাথে সংযুক্ত নারী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ অনুষ্ঠানে *বেগম ক্লাবের* সম্পাদক নূরজাহান বেগম- এ ক্লাব সম্পর্কে বলেন যে,

> যে সমস্ত মহিলা কর্মী নারী সমাজের পুরোভাগে রয়েছে এবং যাঁরা কাজে, সাহিত্য এবং সমাজ সেবায় আগ্রহী তারা যাতে সম্মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সুস্থ্য ও গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই বেগম ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। এছাড়া শিক্ষামূলক আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে মহিলাদের অবসর যাপনের ব্যবস্থাও ক্লাবের লক্ষ্য। আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনে সুধী সমাজের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক।[৭৫০]

এভাবে *বেগম ক্লাবের* মাধ্যমে নারী জাগরণে তৎকালীন সমাজের পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতা ও নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশা করা হয়। উল্লেখ্য ১৯৫৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর *বেগম ক্লাবের* এক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক, ঐতিহাসিক অধ্যাপক মি. রাশব্রুক উইলিয়ামসের পত্মী মিসেস উইলিয়ামস। শিক্ষামূলক এক সফরে তিনি পাকিস্তান এসে ঢাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বৃটেনের নারী সমাজের অবস্থা বর্ণনা করে বক্তৃতা দেন, যা ছিল বাংলার মেয়েদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপক। তিনি বলেন, বিগত মহাযুদ্ধের বিভীষিকাময় দিনগুলিতে ইংল্যান্ডের নারী "মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী" গঠন করে জনসেবায় যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল তা জগতের যেকোনো দেশের নারী সমাজের জন্য আদর্শ হিসেবে গণ্য হতে পারে। ইংল্যান্ডের মেয়েরা বেশির ভাগই স্বাবলম্বী। সম্পদের সমবন্টনের ফলে মহিলারা দৈন্যবোধ করেন না। ইংল্যান্ডের গ্রামগুলিতে মহিলাদের নানা রকম প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলি নারী সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে।[৭৫১] মিসেস রাশব্রুক উইলিয়ামস *বেগম ক্লাবের* কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বাঙালি নারীর অগ্রগতিতে ও জাগরণে *বেগম ক্লাব* এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট নারীর নানামুখী কর্মতৎপরতার প্রশংসা

---

[৭৫০] *বেগম*, ১৭শ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২-১৩

[৭৫১] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪৭

করেন। এখানকার অভিজ্ঞতা তিনি নিজ দেশের গ্রামের ক্লাবের সদস্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ববাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে *বেগম ক্লাব* সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে। এ ধারায় ১৯৫৫ সালের ১৬ নভেম্বর হল্যান্ডের পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত এবং *লিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির* প্রতিষ্ঠাতা রানা লিয়াকত আলী খানকে সম্বর্ধিত করা হয় *বেগম ক্লাব* থেকে।[৭৫২] এ অনুষ্ঠানে সভাপতি শামসুন নাহার মাহমুদ পূর্ব বাংলার মেয়েদের সাহিত্যিক ও সমাজসেবামূলক কাজের বিবরণ তুলে ধরেন। এ বছরই ৩ ডিসেম্বর গণচীনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাদাম লিতে চোয়ান সহ একদল নারী প্রতিনিধিকে *বেগম ক্লাব* সম্বর্ধনা দেয়। এখানে চীনের নারী জাগরণ ও নারী উন্নয়নের প্রশংসা করা হয়, পাশাপাশি এশিয়ার নারী সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, "এশিয়ার নারী সমাজকে বিপুল উন্নতি সাধন করতে হবে। আজ জাগরণের যে সাড়া আমাদের মধ্যে জেগেছে, তাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, নিজ নিজ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতীয় প্রতিভা ও জীবন যাত্রার রীতির সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।"[৭৫৩] *অল চায়না ডেমোক্রাটিক উইমেন্স ফেডারেশন* সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন ধর্মের এবং জাতীয়তা সম্পন্ন মহিলাদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান। এর নানা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয় এ অনুষ্ঠানে। এভাবে দুটি দেশের নারী উন্নয়ন বিষয়ক কাজের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

১৯৫৬ সালের ৯ এপ্রিল ১০ সদস্য বিশিষ্ট ইন্দোনেশিয় মহিলা প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা দেয় *বেগম ক্লাব*। এখানে ইন্দোনেশিয় নারীর অগ্রযাত্রা এবং স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধের প্রশংসা করে মানপত্র রচনা ও পাঠ করা হয়। প্রতিনিধিদলের তরুণ নেত্রী মিসেস তিতি মেমেত তানু মিজাজা এ মানপত্রের জবাবে পারস্পারিক ভাব বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টির প্রশংসা করেন। তিনি নিজ দেশের নারীর কথা বর্ণনায় বলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইন্দোনেশিয় পুরুষ সমাজ সরকারি উন্নয়ন ও দেশরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার কাজে নিয়োজিত থাকায় এসময় নারী সমাজ উন্নয়ন এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ফলে যুদ্ধের পূর্বে যেখানে নিরক্ষরতার সংখ্যা ছিল শতকরা ৮০ জন, সেখানে আজ ৪০ জন।[৭৫৪]

---

[৭৫২] *ঐ*

[৭৫৩] *ঐ*, পৃ. ১৩৪৮

[৭৫৪] *ঐ*, পৃ. ১৩৫০

বেগম ক্লাবে এ ধরণের বিদেশি নারী প্রতিনিধি দলের সম্বর্ধনা প্রদানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল পারস্পরিক ভাব বিনিময় করা। বিভিন্ন দেশের নারীর অগ্রগতি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলার মেয়েদের উৎসাহিত করা। আশা করা হয় এসকল অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে বাংলার নারী নিজেদেরকে নানা রকম উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্তকরণে উৎসাহবোধ করবে। অন্যদিকে ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে *বেগম ক্লাব* এক বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে যেখানে সমসাময়িক পত্র পত্রিকার সম্পাদক ও পত্রিকা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ সম্মেলনে পূর্ব বাংলার মেয়েদের শিক্ষা সমস্যা তুলে ধরা হয়, বাংলার নারীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে পুরুষকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। এভাবে *বেগম ক্লাব* পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের পর *বেগম ক্লাবের* কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

নূরজাহান বেগম এবং তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পারিচালিত *বেগম পত্রিকা* এবং *বেগম ক্লাব* পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। নূরজাহান বেগম নানা সমাজ কল্যাণমূলক কাজও করেছেন। এ প্রসঙ্গে ফ্লোরা নাসরীন খান (নূরজাহান বেগমের কন্যা) বলেন,

> ... মহিলা সমাজের মুখপত্র 'বেগম' বহু সমাজ উন্নয়ন কাজ করেছে। এসবের মধ্যে অন্যতম কাজ ছিল বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, নারিন্দা মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট আমার মা তখন পাড়ায়-মহল্লায় নারীদের জাগিয়ে তুলতেন ত্রাণ সংগ্রহের কাজে। আমরা শিশুরাও বড়দের সঙ্গে চাঁদা তুলতে বেরিয়ে পড়তাম *বেগম* অফিস সংলগ্ন ইসলামপুর ও পাটুয়াটুলির দোকানগুলিতে।[৭৫৫]

তৎকালে বন্যাদুর্গত অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো এবং দরিদ্র পীড়িত মেয়েদের সহযোগিতার কাজ করেন নূরজাহান বেগম। উল্লেখ্য সমসাময়িক *গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি*[৭৫৬] বিভিন্ন প্রকার নারী উন্নয়নমূলক

---

[৭৫৫] ফ্লোরা নাসরীন খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

[৭৫৬] ১৯50 সালে আশালতা সেন ও শাহজাদী বেগম কর্তৃক *গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি* গঠিত হয়। অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে মহিলাদের সচেতন করা এবং সদস্যদের উদ্যমকে জনসাধারণের কল্যাণের কাজে বিশেষত মহিলা ও শিশুদের স্বার্থে নিয়োজিত করা এর মূল উদ্দেশ্য ছিল। এ সমিতির বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, শিল্প, জনকল্যাণমূলক কাজ, স্বাস্থ্য, সমাজ উন্নয়ন বিভাগ ও সংস্কৃতি বিভাগ। সমিতি পরিচালিত *গেন্ডারিয়া ফ্রি প্রাইমারী স্কুল* ছাড়াও চারটি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র, দুটি কোরান-দীনিয়াত শিক্ষা কেন্দ্র যা প্রধানত: দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য নির্ধারিত। (জাহান আরা ফারুক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১)

কাজ এবং *উয়ারী মহিলা সমিতি*[৭৫৭] নারীর জন্য সহায়তামূলক কাজ করেছে। এভাবে নূরজাহান বেগম পূর্ববাংলায় নারীর মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্র রচনাসহ নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি *All Pakistan Women,s Association*, *জোনটা ইন্টারন্যাশনাল*, *বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ*, *বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ*, *বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ* ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হয়ে সমাজসেবা এবং নারী জাগরণে আজীবন কাজ করেন।

বিশ শতকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন দৌলতননেছা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭)। দৌলতননেছা খাতুন ১৯২২ সালে পিতার কর্মস্থল বগুড়া জেলার সোনাতলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ইয়াছিন আলী ছিলেন রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার। পিতার পৈতৃক নিবাস ছিল বৃহত্তর যশোর জেলার মাগুরায় (বর্তমান জেলা)। মাতার নাম নছিরন নেছা। সাহিত্যচর্চায় অনুরাগী তাঁর পিতা *স্বগোদ্যান*, *হীরার ফুল* ও *জীবনতারা* নামক উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। উদারপন্থী ও সংস্কারমুক্ত পিতার ছায়াতলে দৌলতননেছা ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখা শুরু করেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে বৃত্তি লাভ করেন। মাত্র আট বছর বয়সে গাইবান্ধার ডা. হাফিজুর রহমানের সাথে বিয়ে হওয়ার পর স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় পড়াশুনা করতে থাকেন, যদিও শ্বশুর বাড়ীর পরিবেশ ছিল রক্ষণশীল। দৌলতননেছা খাতুন স্বামীর সহযোগিতায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে। সবশেষে *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের* সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন।[৭৫৮]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্ববাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী শামসুন নাহার মাহমুদেরও প্রায় একই বয়সে বিবাহ হয়। শামসুন নাহার মাহমুদ পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পড়াশুনা চালিয়ে যান এবং এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। দৌলতননেছা খাতুনও একইভাবে নিজ চেষ্টায় নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। তবে শামসুন নাহার মাহমুদ যতোটা পরিবারের সহযোগিতা লাভ করেন, দৌলতননেছা ততটা সুযোগ সুবিধা

---

[৭৫৭] *উয়ারী মহিলা সমিতি* কুটির শিল্পে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এসমিতি একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত করতো যেখানে মেয়েদের কাপড়ের কাজ, মেশিনচালিত ফুলের কাজ, সূঁচের কাজ, হাতের কাজ, চিত্রের কাজ (মৃৎশিল্প), মাদুর, বস্তা ও তাঁতে কাপড় বুনন শেখানো হয়। বাড়ীর গৃহিণীরা যাতে অবসর সময় ঘরে বসেই কিছুটা অর্থ উপার্জন করতে পারে সে ব্যবস্থা করে *উয়ারী মহিলা সমিতি*। (জাহান আরা ফারুক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০)

[৭৫৮] মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা*, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ১৪৫

পাননি, বরং নানা বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে নিজের পড়ালেখা শেষ করেন।[৭৫৯] এক্ষেত্রে দৌলতননেছা খাতুনের মানসিক দৃঢ়তা প্রশংসার দাবি রাখে।

দৌলতননেছা খাতুন বারো বছর বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর রচনা *বঙ্গশ্রী*, *দেশ*, *নবশক্তি*, *বিচিত্রা*, *সওগাত*, *বেগম* প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস *পথের পরশ* ১৯৫৭ সালে এবং দ্বিতীয় উপন্যাস *বধূর লাগিয়া* ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর *কোমরপুরের ছোট বউ*, *বিবস্ত্র ধরণী* ও *নাসিমা ক্লিনিক* নামে তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরো কয়েকটি উপন্যাস পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া যায় এবং পঞ্চাশটিরও বেশি ছোটগল্প নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৭৬০] তিনি শিশুসাহিত্য, নাটক এবং প্রবন্ধও রচনা করেন।

দৌলতননেছা খাতুন ছিলেন আজীবন একজন সংগ্রামী নারী। তাঁর লেখায় সমাজ ও সংসারে নারীর ভূমিকা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর গল্প 'দিনের শেষে' ঈদ সংখ্যা *বেগম* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পে শিক্ষিত চাকুরীজীবী স্বামীর স্ত্রী হিসেবে একজন আধুনিক শিক্ষিত স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তা তিনি তুলে ধরেছেন।[৭৬১] অর্থাৎ নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি এখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন। আবার তাঁর 'মাথার কাটা' (১৩৫৮ সনে প্রকাশিত) গল্পে সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর বিবাহের সমস্যাকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পে বাঙালি নারী তখনকার সময়েও যে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা দ্বারা চিহ্নিত হচ্ছে সে বিষয়টি এখানে জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধি বিবেচনার দিক দিয়ে এসময় সমাজ নারীকে ছোট করে দেখছে এবং সমাজে নারীর মূল্যায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে না সে বিষয়টি লেখক স্পষ্ট করেছেন।[৭৬২] দৌলতননেছা খাতুন 'নারীর মূল্য' নামক একটি একাঙ্কিকা (এক অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক) রচনা করেন। এখানে মানব-মানবী তথা নারী পুরুষের সম্পর্কজাত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিবার ও সমাজে নারী যে অমূল্য সম্পদ তা তিনি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।[৭৬৩]

---

[৭৫৯] শাহেদ আলী, "দৌলতননেছা খাতুন : অন্তরঙ্গ আলোকে", *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭; উদ্ধৃত, গোলাম কিবরিয়া পিনু, *দৌলতননেছা খাতুন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩

[৭৬০] গোলাম কিবরিয়া পিনু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১

[৭৬১] *ঐ*, পৃ. ২৪

[৭৬২] *ঐ*, পৃ. ২৭

[৭৬৩] *ঐ*, পৃ. ৩৩

বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণী রচনার মধ্যে দৌলতননেছা খাতুনের "পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলনের গতি" প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এ প্রবন্ধের শুরুতে যুগ যুগ ধরে সমাজে প্রচলিত ধর্মের নামে অযাচিতভাবে নারী তথা সমগ্র মানুষকে অবদমিত করে রাখার প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> চিরকালই দেখা গেছে ধর্ম্মের অনুশাসনের নামে মানুষকে যত সহজে অবনমিত করা যায় আর কোন শক্তি তা পারে না, তাই দেখা গেছে ধর্ম্মের নামে ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধর্ম্মের বুকে এমন অনেক জিনিস জমা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের অঙ্গ নয়। হয়ত কোন প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি করেছে মানুষকে আয়ত্বে রাখবার জন্য অথবা কোন সমষ্টিগত শক্তি করেছে নিজেদের ক্ষমতাকে সমাজের বুকে কায়েমী রাখার জন্য।[৭৬৪]

এ প্রবন্ধে তিনি রেনেসাঁ ও ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট, মার্টিন লুথার কিং এর বক্তব্যসহ নানা বিষয় তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন সমাজ কাঠামোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তুলে ধরেন। অন্যদিকে বাংলায় নারীর অবস্থান কোন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে তার বর্ণনাও অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। দৌলতননেছা খাতুন বিভিন্ন দেশের নারী আন্দোলনের সাথে বাংলার নারী আন্দোলনের তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং বাংলায় ধর্মীয় গোঁড়ামীর দোহায় দিয়ে নারীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা হচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এরপরও তিনি বাঙালি নারী জাগরণ এবং নারীর অগ্রগতিতে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে দৌলতননেছা বলেন যে,

> ... পাশ্চাত্যদেশের নারী আন্দোলনের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আমাদের দেশের নারী আন্দোলনের গতিও একই ধারায় পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। সময়ের পার্থক্য আছে কিন্তু গতির পার্থক্য নাই। আমাদের দেশেও ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে পুরুষ, নারী জাতির অগ্রসরণের পথে বার বার বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তবুও সমস্ত বাধা বিপত্তি ঠেলে নারীর অগ্রসরণ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। যদিও এখনও করবার রয়েছে আরো অনেক।[৭৬৫]

এভাবে দৌলতননেছা খাতুন বাঙালি মুসলিম নারীকে তাদের নানা অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সমাজে প্রচলিত নারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের সমালোচনা করে আইনকে

---

[৭৬৪] ঐ, পৃ. ৯৯

[৭৬৫] ঐ, পৃ. ১০১

ধর্মের অনুশাসন থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রের আওতায় আনার জোর দাবি জানান। এক্ষেত্রে তিনি মুসলিম নারী অধিকার রক্ষায় উদ্যোগী হয়ে নারীকেই এগিয়ে এসে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে উৎসাহিত করেন। এভাবে তিনি মুক্তবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণ ও আন্দোলনে দৃঢ় ভূমিকা রাখেন। দৌলতননেছা খাতুন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। গাইবান্ধা জেলার স্থানীয় মহিলাদের সংগঠিত করে 'গাইবান্ধা মহিলা সমিতি' গঠন করেন (১৯৩২) এবং এ সমিতির সাথে আজীবন সম্পৃক্ত থেকে স্থানীয়ভাবে পিছিয়ে পড়া নারীর শিক্ষা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা, সমাজকল্যাণমূলক কাজ এবং নারী অধিকার আদায়ে নারীকে উদ্যোগী করে গড়ে তোলার কাজ করেন। তিনি পরবর্তীতে *উন্নত পরিবার গঠন মহিলা সংস্থা* নামক আরেকটি নারী সংগঠন গড়ে তোলেন (১৯৭৮)।

ইতিহাস খ্যাত পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় দৌলতননেছা খাতুন নিজে এতিমখানা স্থাপন করে মানবসেবার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তৎকালীন বিভাগীয় স্কুল ইন্সেপেক্টর ফকীর দাস ব্যানার্জী এতিমখানাটি পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন- এখানে এত ধনাঢ্য লোক থাকতে একজন মহিলার এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করার মত দুঃসাহস কেমন করে হলো? কেবল এতিমখানা নয়, দুগ্ধবিতরণ কেন্দ্র খুলে অসংখ্য শিশুর জীবনরক্ষাও করেছেন তিনি।[৭৬৬] দৌলতননেছা খাতুন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিশুকল্যাণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। অন্যদিকে বাংলার রাজনীতির বিষয়েও তার প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনসহ বাংলার বিভিন্ন মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৫ সালে বিশ্বনারী কল্যাণ সংস্থার যে চল্লিশ জাতি সম্মেলন চীনের পিকিং এ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে চীন সরকারের আমন্ত্রণে একজন প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে বাংলার নারী সমাজের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং এ সকল সমস্যার যুক্তিসম্মত সমাধানে বিশ্ব প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। উল্লেখ্য পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যৌতুক বিরোধী বিল উত্থাপন করেন। তাই দেখা যায় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে দৌলতননেছা খাতুন এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

বিশ শতকের মধ্যভাগে পূর্ব বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা রাখেন আনোয়ারা বাহার চৌধুরী (১৯১৯ খ্রি.)। আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ১৯১৯ সালে মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

[৭৬৬] সদরুল হোসেন, *রংপুর প্রতিভা*, ১ম খণ্ড, (লেখক কর্তৃক প্রকাশিত), গাইবান্ধা, পৃ. ১০৩; উদ্ধৃত গোলাম কিবরিয়া পিনু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

ছোটবেলায় খালা ফাতেমা খানমের (পূর্ব বাংলার নারী জাগরণের অক্লান্তকর্মী) নিকট লালিত পালিত হন। আনোয়ারা বাহার চৌধুরীর স্বামী হাবিবুল্লাহ বাহার (শামসুন নাহার মাহমুদের ভাই) চৌধুরী ছিলেন প্রগতিশীল ব্যক্তি। তিনি ১৯৩৮ সালে বি.এ এবং ১৯৪০ সালে বি.টি পাশ করেন। *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে* শিক্ষকতার মধ্যদিয়ে চাকুরীজীবন শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে আনোয়ারা বাহার চৌধুরী কলকাতায় *লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজে* অধ্যাপনা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ময়মনসিংহের *বিদ্যাময়ী স্কুলে* এবং পরে ঢাকার *কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের* প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯৪১ সালে *সুরবিতান* নামে নৃত্য ও সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য তিনি *বুলবুল ললিতকলা একাডেমির* প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

বাঙালি নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে আনোয়ারা বাহার চৌধুরী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আদর্শ অনুসরণ করেন। তিনি ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে *আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের* সম্পাদক পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[৭৬৭] এক্ষেত্রে তিনি স্বামী হাবীবুল্লাহ বাহারের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। আনোয়ারা বাহার চৌধুরী *All India Women's Conference* এর সদস্য হিসেবে সমসাময়িক অনেক বিখ্যাত নারীর সংস্পর্শে আসেন। সরোজিনী নাইডু, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, অরুণা আসফ আলী প্রমুখ প্রতিথযশা নারী যাঁরা তৎকালীন বাংলায় নারী প্রগতিতে ভূমিকা রাখেন, তাঁরা ছিল আনোয়ারা বাহার চৌধুরীর সহকর্মী। ফলে দেখা যায় তিনি এসকল মেয়েদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার মেয়েদের জাগরণে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন।

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী সারাজীবন শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত থেকে ছাত্রীদের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রতি উৎসাহিত করেন। উল্লেখ্য তাঁরই তত্ত্বাবধানে কার্জন হলের মাঠে ১৯৫০ সালে ২৫০ জন ছাত্রী মার্চপাস্ট ও শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করে, যা ছিল সর্বসম্মুখে পূর্ববাংলার মেয়েদের শরীরচর্চায় প্রথম অংশগ্রহণ।[৭৬৮] আনোয়ারা বাহার চৌধুরী পূর্ববাংলার প্রথম মুসলিম নারী যিনি ঢাকায় মেয়েদের জন্য পৃথক নাচ ও গানের স্কুল প্রতিষ্ঠা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী আবদুল আহাদ, উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী মতি মিয়া, রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হুসনা বানু খানম, স্বনামধন্য নজরুল সংগীত শিল্পী লায়লা আরজুমান্দ বানু, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গওহর জামিল প্রমুখ ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। আনোয়ারা বাহার চৌধুরীর

---

[৭৬৭] কাজী মদীনা, *আনোয়ারা বাহার চৌধুরী*, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৯

[৭৬৮] *ঐ*, পৃ. ৩১

জ্যেষ্ঠ কন্যা সেলিনা বাহার জামানের নাচ শেখার হাতেখড়ি এ প্রতিষ্ঠানে হয়। উল্লেখ্য ১৯৫৫ সালে স্কুলটি পরিচালনা করার মত লোকের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়।[৭৬৯] এরপর তিনি *বুলবুল একাডেমি*র প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করেন। আনোয়ারা বাহার চৌধুরী মেয়েদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষকতা জীবনে তিনি ছাত্রীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রতি উপদেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি মেয়েদের সুকুমার বৃত্তি তথা সাংস্কৃতিক চর্চার প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি কর্মময় জীবনে ১৯৬১ সালে পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক দলের প্রধান হিসেবে ইরান ও ইরাক সফর করেন। ১৯৬৩ সালে একইভাবে আফগানিস্তান ও রাশিয়া সফর করেন। এছাড়া তিনি রেডিও কথিকা এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করে বক্তৃতার মাধ্যমে বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলিম নারীর শিক্ষা ও সাংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এভাবে তিনি সংস্কারমুক্ত মানসিকতা নিয়ে বাংলার সমাজে নারীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন।

এছাড়া আলোচ্য কালপর্বে (১৯৪৭-১৯৭১) আরো কতিপয় নারী বাংলায় মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেন। তাঁরা সাহিত্য রচনা, নারীশিক্ষায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে পূর্ব বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খোদেজা খাতুন (জন্ম ১৯১৭), জোবেদা খানম (জন্ম ১৯২০), জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪), জাহান আরা আরজু (জন্ম ১৯৩২), রাবেয়া খাতুন (জন্ম ১৯৩৫), নাজমা জেসমিন চৌধুরী (জন্ম ১৯৪০), খুরশীদ জাহান (জন্ম ১৯৪২), জুবাইদা গুলশান আরা (জন্ম ১৯৪২), মালেকা বেগম (জন্ম ১৯৪৪), সেলিনা হোসেন (জন্ম ১৯৪৭), বেবী মওদুদ (জন্ম ১৯৪৬) প্রমুখ।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলার নারীর মধ্যে সচেতনতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ সময়ে নারীমুক্তিতে বিশ্বাসী পুরুষ যুক্ত থাকলেও নারীই তাদের নিজ অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অধিক হারে তৎপর হয়েছে। পূর্বের তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁরা আরো বেশি অগ্রসরমান হয়েছে এবং অবরোধপ্রথার কঠোর শৃঙ্খল ভেঙ্গেছে বিপুল সংখ্যক নারী। কর্মজীবী নারীর পরিচয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। অপেক্ষাকৃত অভিজাত পরিবারের মেয়েরা শিক্ষকতা ও ডাক্তারি পেশায় আসতে আগ্রহী ছিলেন। আবার বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলার মেয়েরা গৃহকর্মী হিসেবে সম্মানের সাথে অর্থ উপার্জন করেছেন। এসকল গৃহকর্মীদের আদব কায়দা, কোরআন শিক্ষা এবং সূচিকর্ম শেখানো হতো। এছাড়া জীবিকার জন্য অনেক নারীকে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মুড়ি, ঘুঘনি

[৭৬৯] *ঐ*, পৃ. ৩২-৩৩

দানা, খুদ প্রভৃতি বিক্রি করতে দেখা যায়। আবার পুরানো ঢাকার কারখানায় তৈরি জুতার উপরের নানা নকশা বানানোর কাজ করে মেয়েরা তখন অর্থ উপার্জন করেছেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ফলে নারী পরিবার ও সমাজে অধিকার প্রয়োগ ও স্বাধীনতা ভোগে সক্ষম হয়েছেন। তবে বাঙালি নারীর এ অগ্রযাত্রা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল শহরকেন্দ্রিক। গ্রামের সাধারণ নারীর সামগ্রিক অবস্থার খুব একটা উন্নতি এ সময় পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নানাবিধ অত্যাচার, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হয়েছেন গ্রামীণ নারী। তবে সার্বিকভাবে বিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় যে নারী জাগরণ শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের পর তা পরিণতি লাভ করে। দেশ বিভাগের পর নারী আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ সময়ে এসে মেয়েরা অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠে। তারা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বাঙালি নারী : চেতনা ও বাস্তবে

বাংলার প্রাচীন কালের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, বৈদিক যুগে লোপা ও গার্গী যোদ্ধা নারী ছিলেন। ঋকবেদ থেকে জানা যায় মৃদুগালিনী যুদ্ধ জয় করেন, এক যুদ্ধে বিশপলার একটি পা এবং বধ্রিমতির হাত কাটা যায়। অন্য একজন নারী শশিয়সী বীরাঙ্গনা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কর্টিয়াস নামক রোমান লেখক মেসেনা অবরোধের সময় যুদ্ধরত ভারতীয় নারীর কথা তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন।[৭৭০] খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে যোদ্ধা নারী শক্তিকীর নাম পাওয়া যায়। জৈনধর্মের নারী-বিদ্বেষী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মল্লীবাই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে হিন্দুধর্মে কালী দেবীকে যোদ্ধা হিসেবে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে সুলতানী আমলে (মুসলিম শাসনামল) সুলতান রাজিয়া পুরুষের পোশাক পরে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি হাতে শত্রুদের মোকাবেলা করেন। মুঘল আমলে রানী যুধাবাঈ, রানী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা, হামিদা বানু, মাহাম আনগা, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, মমতাজমহল, শাহজাদী জাহানআরা ও রওশনআরা, জীজাবাঈ, তারাবাঈ এবং মীরাবাঈ রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।[৭৭১] অন্যদিকে ঘষেটি বেগমকে ইতিহাসে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হলেও তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি নারী যিনি রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রচেষ্টার পথিকৃৎ। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফরের পত্নী মুন্নী বেগম যখন স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থে ইংরেজদের হাতে বাংলার এক একটা অঞ্চল তুলে দিচ্ছিলো তখন বীরভূমের রাজা আসাদুজ্জামানের স্ত্রী লাল বিবি ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলনের নেতাদের প্রচুর অর্থ ও স্বর্ণালংকার দান করেন তাদের বিদ্রোহ পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য।[৭৭২] ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যায় রাজস্ব সংগ্রহের বিরুদ্ধে পরিচালিত ফকির সন্ন্যাসী দলটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গঠিত ছিল।[৭৭৩] ফলে সহজেই অনুমান করা যায়, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহে নারীর অন্তর্ভুক্তি ছিল। উল্লেখ্য এ বিদ্রোহের একজন অন্যতম নেত্রী ছিলেন দেবী চৌধুরাণী।

---

[৭৭০] অদিতি ফাল্গুনী, *বাংলার নারী সংগ্রামের ইতিহাস*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৪

[৭৭১] ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খান, *মুঘল ভারতের ইতিহাস*, ইতিবৃত্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৪৭১

[৭৭২] এম. আবদুর রহমান, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা*, প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২৯

[৭৭৩] আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১০৩

ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে চোয়াড়[৭৭৪] বিদ্রোহে নিম্ন আয়ের পরিবারের মেয়েদের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা জানা যায়। আবার ওয়াহাবী আন্দোলনের সময় ওয়াহাবী নেতা আমীর খাঁর কন্যা জেবুন্নেসা আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং সংগৃহীত অর্থভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। তিতুমীরের বিদ্রোহে তাঁর মা আয়েশা বেগম সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।[৭৭৫] ফরায়েজি আন্দোলনের সময় হাজী শরীয়ত উল্লাহর স্ত্রী মেয়েদেরকে সংগঠিত করার কাজ করেন। আবার নীল বিদ্রোহের সময় বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের নারী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) সময় দক্ষিণ ভারতের গঙ্গাঁবাঈ (মাতাজী মহারানী), ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁর সহচরী মোতীবাঈ, কিট্টুরের রানী চেন্নামা এবং সাধারণ মেয়েরা হাতে অস্ত্র তুলে নেন।[৭৭৬] সিপাহী বিদ্রোহে মুসলিম নারী হযরত মহল বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।[৭৭৭] এছাড়া সিপাহী বিদ্রোহে যে সকল নারী প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে অন্যতম মধ্য প্রদেশের রামগড়ের রাজা লক্ষণ সিং এর বিধবা পত্মী মহারানী অবন্তীবাই, মুজাফফর নগরের আসগরী, রণবীরী, রাজকাউর, রহিমী, জামিলা এবং নর্তকী আজিজান, আশাবাদী, ভগবতী প্রমুখ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭ সালে মুজাফফর নগরেই আনুমানিক ২৫৫ জন গ্রামীণ তরুণী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দেন।[৭৭৮]

---

[৭৭৪] ১৭৯৮-৯৯ খ্রি. বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে একটি আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ বিদ্রোহটি চোয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত। মূলত চোয়াড় শব্দটি দ্বারা বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের আদিবাসীদের বোঝানো হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এ অঞ্চলটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং এখানে চোয়াড় সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতো। অতীতে এমনকি মুঘল নবাবি আমলেও কোন শাসকই চোয়াড়দের স্বাধীন জীবনযাপনে হস্তক্ষেপ করেনি। অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে এবং আদিম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। এ অঞ্চলের উপর ইংরেজ সরকারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে চোয়াড় সম্প্রদায়ের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে থাকে। (*ঐ*, পৃ. ১৩২)

[৭৭৫] অদিতি ফাল্গুনী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫

[৭৭৬] *ঐ*, পৃ. ২৬

[৭৭৭] ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের আক্রমণে অযোধ্যার শাসক নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ লক্ষ্মৌ শহর ত্যাগ করলে তাঁর স্ত্রী হজরত মহল ১১ বছর বয়স্ক পুত্র বিরজিস কাদিরকে অযোধ্যার নবাব ঘোষণা করেন। সে সময় হজরত মহলের জ্বালাময়ী ভাষণের সম্মোহনী শক্তিতে অযোধ্যার জনগণ বিরজিস কাদিরকে নবাব হিসেবে মেনে নেয়। স্বামীর অবর্তমানে হজরত মহল নাবালক পুত্রের অভিভাবক হয়ে ইংরেজ প্রতিনিধি স্যার কেলিন ক্যাম্পবেলের ৩১ হাজার সৈন্য বাহিনীর সম্মুখে এক প্রত্যক্ষ সমরে অংশগ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত হজরত মহলের পক্ষে সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তথাপি একজন মুসলিম নারীর এ বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক যুদ্ধের বিষয়টি ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। (Manmohan Kaur, *Women in India's Freedom Struggle,* Sterling Publishers, New Delhi, 1992, p. 36)

[৭৭৮] অদিতি ফাল্গুনী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭

প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাঙালি নারীকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে। তবে এক্ষেত্রে মুসলিম নারীর তুলনায় হিন্দু নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ছিল অনেক বেশি। এ সময় বাঙালি নারী উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ হতে ভারতবর্ষের মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ প্রতিনিধি Lord Ripon (1827-1909) এর আইন পরিষদের সদস্য Sir Courtenary Peregine Ilbert (1841-1924) একটি বিল উত্থাপন করেন, যা 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত। এ বিলের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে একটি আন্দোলন শুরু হয়। তৎকালীন বেথুন কলেজের ছাত্রী কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), অবলা বসু (১৮৬৬-১৯৫১) এবং সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫) ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিয়ে ছাত্রীদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। বেথুন কলেজের ছাত্রীরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৮৮৫ সালে Alen Auktovian Hume কর্তৃক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান *All India National Congress* (hereafter Congress) গঠিত হলে স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী দেবী এ সংগঠনে যোগদান করেন। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে দশজন মহিলা ডেলিগেট অংশগ্রহণ করেন। এ সকল নারীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, পণ্ডিত রামাবাঈ, শেবন্তীবাঈ ত্রিম্বক, শান্তাবাঈ নিকাম্বো, কাশীবাঈ কানিতকর, মানেকজী, কারমেতজী প্রমুখ।[৭৭৯] এভাবে বাংলার নারী নিজেদেরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। উল্লেখ্য ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের কলকাতা সম্মেলনে দুইজন নারী প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন (স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলী)। এ সময় কংগ্রেসের অন্যান্য যারা নারী সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অ্যানি বোসান্ত, ম্যাডাম কামা, মার্গারেট কাজিনন্স এবং সরোজিনী নাইডু অন্যতম।[৭৮০]

বিশ শতকের শুরুতে বাঙালি নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৯০১ সালে *All India National Congress* এর অধিবেশনে ২০০ জন নারী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।[৭৮১] অন্যদিকে কংগ্রেসের পাশাপাশি *National Social Conference* (1887) নামক ভিন্ন একটি সংগঠনের ১৯০২ সালের অধিবেশনে এক হাজার পুরুষ প্রতিনিধির মধ্যে ৫০ জন নারীর অংশগ্রহণ লক্ষ্য

---

[৭৭৯] আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১*, প্রগতিশীল প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৮৬

[৭৮০] Kanak Mukherjee, *Women's Emancipation Movement in India,* National Book Centre, New Delhi, 1989, p. 44

[৭৮১] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৯৬

করা যায়। তৎকালে বাঙালি মেয়েদের নানারকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) এবং তাঁর কন্যা সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৬) মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে সরলাদেবী এদেশের নারী জাগরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখায়, বক্তৃতায় ও কার্যক্রমে নারী জাতির সম্মুখে এক দীপ্ত আদর্শরূপে ফুটে উঠেছে এবং সে আদর্শ অনুসরণ করে বাংলার বালিকা, কুমারী, যুবতী এমনকি প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধারা পর্যন্ত জেগে উঠেছে।[৭৮২] সরলাদেবী তৎকালীন প্রভাবশালী *ভারতী পত্রিকা* (প্রকাশকাল ১৮৯৫) সম্পাদনা করেন। এ পত্রিকার মূলমন্ত্র ছিল দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।[৭৮৩] তিনি নানাভাবে মেয়েদের আত্মশক্তি অর্জনের অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য 'অন্তরঙ্গ' নামক একটি নারীদল গঠন করেন। উল্লেখ্য ১৯০০ সালে সরলাদেবী বাঙালি যুবক ও যুবতীদের জন্য লাঠিখেলা, তলোয়ার চালানো, কুস্তিলড়াই, শরীরচর্চার নানা কৌশল প্রভৃতি শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথমদিকে মেয়েদের খুব বেশি সাড়া না পাওয়া গেলেও তরুণ সমাজের এ শিক্ষার প্রতি ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। অন্যদিকে সরলাদেবী সংগীতের মাধ্যমে দেশপ্রেমের মন্ত্রে নারী-পুরুষকে উজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হন। তাঁর রচিত 'নমো হিন্দুস্তান' শীর্ষক গানটি ১৯০১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের এক অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়।[৭৮৪] বাঙালিদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার জন্য মারাঠীদের 'শিবাজি উৎসব' এর অনুকরণে তিনি ১৯০৩ সালে কলকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' উদযাপন করেন। এ উৎসবে তরুণরা মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, লাঠিখেলা, তলোয়ার পরিচালনা প্রভৃতি খেলায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। ১৯০৪ সালে তিনি বাংলার যুবকদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি জাগ্রত করার লক্ষ্যে 'বীরাষ্টমী ব্রত' উদযাপন করেন।[৭৮৫] এ উপলক্ষে তিনি বীরাষ্টমী গানও রচনা করেন। সরলাদেবী 'বঙের বীর' সিরিজের ছোট ছোট

---

[৭৮২] *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ জুলাই ১৯৩৪, পৃ. ৩ (১৫ সংখ্যা ৭৪ ভাগ)

[৭৮৩] আরিফা সুলতানা, "বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালি নারী", *অধ্যাপক মুহাম্মদ ইসহাক ফান্ড বক্তৃতা* ২০১৬, ৪ অক্টোবর ২০১৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৩

[৭৮৪] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪

[৭৮৫] সরলাদেবী ভারতীয়দের উৎসাহিত করেছেন যে, ইংরেজ সৈন্যদের হাতে কেউ অপমানিত হলে বিচারের জন্য অপেক্ষা না করে সাথে সাথে নিজেদের মতো করে প্রতিকার করতে হবে। যারা তৎকালে এরূপ প্রতিকার করে সাহসিকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতো তাদের বীরত্বের কাহিনী *ভারতী পত্রিকায়* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হতো। এসময় কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি একটি *অন্তরঙ্গ দল* গঠন করেন। সরলাদেবী এ দলের সদস্যদের সামনে ভারতের মানচিত্র রেখে শপথ করিয়ে প্রত্যেক জনের হাতে একটি করে রাখি বেঁধে দিতেন। এ রাখি ছিল মাতৃভূমির জন্য যেকোন প্রতিরোধ বা যুদ্ধ মাথা পেতে নেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের দিনে এ রাখিবন্ধন নতুনরূপে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। (কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩১)

পুস্তক রচনা করে বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা চালাতেন। আবার তিনি 'উদয়াদিত্য উৎসব' পালন করেন। এ উৎসবে মঞ্চে একটি তরবারি রেখে বীরযোদ্ধা উদয়াদিত্যকে (প্রতাপাদিত্যের পুত্র) স্মরণ করে ঐ তরবারিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পন করা হতো।[৭৮৬] মূলত এসকল কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শত্রুর বিরুদ্ধে দেশীয়দের শক্তির বৃদ্ধি ঘটানো এবং দেশপ্রেম জাগানো।

সরলাদেবী স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করার প্রচারণার জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' খুলেছিলেন। এটি ছিল বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা স্বদেশী বস্ত্র ও নানা জিনিসপত্রের দোকান। উল্লেখ্য শুধু মেয়েদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র লক্ষ্মীভাণ্ডারে পাওয়া যেত।[৭৮৭] সরলাদেবী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও বিপিনচন্দ্র পালের সাথে *Bengal Party* নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।[৭৮৮] তিনি যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এবং আরো কয়েকজনকে নিয়ে কলকাতার বৌবাজারে 'Swadeshi Stores' নামক আরেকটি স্বদেশী জিনিসের দোকান পরিচালনা করেন। এ প্রসঙ্গে সরলাদেবী লিখেছেন যে, "আমার ও যোগেশ বাবুর স্বদেশী প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বহু পূর্বেই শুরু হয়েছিল"।[৭৮৯] উল্লেখ্য সরলাদেবী সারাজীবন স্বদেশী পোশাকে সজ্জিত থেকেছেন। তিনি ১৯০৫ সালে *ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতি*র 'প্রতাপাদিত্য ব্রত'র দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং এ অধিবেশনে সর্বপ্রথম জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরাম' গানটি সামান্য পরিবর্তন করে সুমধুর কণ্ঠে গেয়ে শোনান। এসময় মহারাষ্ট্রের 'ভবানী পূজা'র ন্যায় সুহৃদ সমিতিতে কালীপূজার প্রচলন করেন এবং প্রচার করেন, যে কোনো শত্রুর হাত থেকে দেবী কালী দেশকে রক্ষা করবে। উল্লেখ্য এ বছরই (১৯০৫) পাঞ্জাবের আর্য সমাজের নেতা পণ্ডিত রামভূজ দত্ত চৌধুরীর সাথে সরলাদেবীর বিবাহ হলে তিনি স্বামীর সাথে পাঞ্জাবে চলে যান। ফলে বোম্বাই ও উত্তর ভারতে তাঁর বিপ্লবী কার্যক্রম গতিহীন হয়ে পড়ে। সরলাদেবী সমসাময়িক মেয়েদের প্রেরণার উৎস ছিলেন। তাই স্বদেশী আন্দোলনে তাঁর আদর্শ ও কার্যক্রমের প্রভাব বাঙালি নারীর মধ্যে প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়।

---

[৭৮৬] *ঐ*, পৃ. ৩২

[৭৮৭] Bharati Roy, "Swadeshi Movement and Women's Awakening in Bengal 1903-1910", *Calcutta Historical Journal*, Vol. X, N. 2, 1985; *ভারতী*, কার্তিক, ১৩১১

[৭৮৮] *Terrorism in Bengal*, (A Collection of Documents, Vol. 1-4, Compiled and Edited by Amiya K. Samanta, Director, Intelligence Branch, Govt. of West Bengal, Calcutta, 1995), Vol. II, p. 808

[৭৮৯] কমলা দাশগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩

১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে এর বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এ আন্দোলন ছিল আত্মসচেতন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাঙালি জাতির সর্বাত্মক স্বদেশিকতার আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১)। এ আন্দোলনে প্রধানত পুরুষ অংশগ্রহণ করলেও বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও দেখাশোনা, সংবাদ ও অস্ত্র সরবরাহ প্রভৃতি কাজে মেয়েদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ শাসন বর্জন ও বিলেতি পণ্য বয়কট করে স্বরাজ লাভের জন্য ভারতবর্ষে সর্বত্র স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য পরিচালিত এ আন্দোলনে নারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বারা পরিচালিত, তাই এ আন্দোলনে শুধু মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের নারী প্রথমাবস্থায় অংশগ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে আশালতা সেন বলেন,

> আমার শৈশবের সবচেয়ে স্পষ্ট স্মৃতি হচ্ছে ইংরেজি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও লেখনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মবোধক গান আর ক্ষুদিরাম, কানাইলালের পিস্তলের গুলি সমস্ত দেশকে মাতিয়ে তুলেছিল। .... বিদেশি শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা, মিছিল, ধর্মঘট, বিদেশি জিনিস বর্জন প্রভৃতি আন্দোলন ব্যাপকভাবে চালান, যার সাথে পরবর্তী কালের গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস প্রতিরোধ পদ্ধতির সাদৃশ্য আছে। ... ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের অর্ধ শতাব্দী পরে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনই সবচেয়ে বড় ইংরেজ বিরোধী দেশব্যাপী বিপ্লব প্রচেষ্টা।[৭৯০]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালি নারীর অংশগ্রহণের জন্য প্রথম আহ্বান জানিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রতধারণ' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।[৭৯১] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাকে দেবী দুর্গার সাথে তুলনা করে একটি সংগীত রচনা করেন। অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চিত্রকলায় ভারতকে 'ভারতমাতা' রূপে চিত্রিত করেন। এ সময় আন্দোলনকারীরা দেশকে দুর্গা ও কালী দেবীর সাথে কল্পনা করায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ঘটে, অন্যদিকে মুসলমানরা স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। কলকাতার রিপন কলেজের অধ্যাপক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী স্বদেশী আন্দোলনে নারীকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' শীর্ষক একটি

---

[৭৯০] আশালতা সেন, *সেকালের কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১১

[৭৯১] আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫

পুস্তিকা রচনা করেন।[৭৯২] এভাবে শহরাঞ্চলে শিক্ষিত সমাজ থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলে তথা সর্বস্তরের মেয়েদের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে নানাভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। এ সময় 'স্বদেশ বান্ধব' সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমিতির সাথে যুক্ত থেকে বাঙালি নারী স্বদেশী শিল্প, সাহিত্য ও কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে সক্রিয় থেকে আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।[৭৯৩] উল্লেখ্য স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, নির্ঝরিণী দেবী, কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরী, লাবণ্যপ্রভা দত্ত, আশালতা সেন, কুমুদিনী মিত্র, বনলতা সেন প্রমুখ নারী স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সমসাময়িক *বামাবোধিনী পত্রিকা*, *অন্তঃপুর পত্রিকা* সহ নানা পত্র-পত্রিকা স্বদেশী ভাবধারায় মেয়েদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। মূলত বাংলার নারীর স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রমাণ করে তারা শুধু ঘরের কাজ নয় বাইরের জগতের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে, পাশ্চাত্যের অগ্রসরমান নারীর ন্যায় দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম।[৭৯৪] অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর সিস্টার নিবেদিতা বারোদা নামক স্থানে অরবিন্দ ঘোষের সাথে পরিচিত হয়ে ইংরেজ অধীনতা থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা উভয়েই সরলাদেবীর 'গুপ্ত সমিতি'তে যোগ দেন। নিবেদিতা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উপর প্রবন্ধ রচনা করে ইংরেজ বিদ্বেষ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে থাকেন।[৭৯৫]

১৯০৫ সালে বিপিনচন্দ্র পাল 'স্বদেশী মণ্ডলী' নামক একটি চরমপন্থী দল গঠন করেন। এ দলে পুরুষের সাথে নারীর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। এ সময় শহর ও গ্রামে মেয়েরা দেয়াশলাই, সাবান, কাগজ, কালি, চরকার সুতা প্রভৃতি স্বদেশী পণ্য উৎপাদনের জোয়ার সৃষ্টি করে। ১৯০৬ সালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় *যুগান্তর* পত্রিকায় এবং *বন্দে মাতরম* পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ ও কতিপয় নারী স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে উৎসাহব্যাঞ্জক লেখা প্রকাশ করেন।[৭৯৬] তৎকালে সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে যারা স্বদেশী

---

[৭৯২] রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদের জোমাকান্দীতে নিজ বাসভবনে স্থানীয় মেয়েদের আমন্ত্রণ জানান। তাঁর কন্যা গিরিজাদেবী 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' উপস্থিত পাঁচ শতাধিক নারীর মধ্যে পাঠ করেন। এ পুস্তিকার মূল কথা ছিল বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে দেবী লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং শুধু লক্ষ্মীতুল্য বাঙালি নারীই পারে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে তাকে ধরে রাখতে। (*ঐ*, পৃ. ৫)

[৭৯৩] Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal*, Peoples Publishing House, New Delhi, 1977, p. 288

[৭৯৪] Aparna Basu, "*The Role of Women in the Indian Struggle for Freedom", *in Indian Women : From Purdah to Modernity, B.R. Nanda (ed.), Vikas Publishing, New Delhi, 1976, p. 17

[৭৯৫] কমলা দাশগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২-১৩

[৭৯৬] *ঐ*, পৃ. ১৪

আন্দোলনে অনবদ্য ভূমিকা রাখেন তার মধ্যে অন্যতম চারণ কবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪)। মুকুন্দ দাস গেয়েছেন-

ও আমার বঙ্গনারী

পরো না বিলেতী শাড়ী

ভেঙ্গে ফেলো বেলোয়ারী চুড়ি।

তখন মেয়েরা মঞ্চে উঠে চুড়ি ভেঙ্গে ফেলার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতো। আবার তিনি নজরুল ইসলামের 'দুর্গম গিরি কান্তর মরু' এবং 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গেয়ে সকলকে আলোড়িত করতেন।[৭৯৭] মুকুন্দ দাস মেয়েদের সহায়তায় একটি যাত্রাদল গঠন করেন এবং যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জায়গায় যাত্রাপালার আয়োজন করে স্বদেশী বার্তা প্রত্যন্ত গ্রামের নারী-পুরুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। অন্যদিকে মনোমোহন চক্রবর্তীর 'ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী, কভু হাতে পরো না, জাগো ওগো মা ভগিনী, মোহের ঘোরে আর থেকো না' গানটি মেয়েদের মধ্যে স্বদেশী চেতনায় উজ্জীবিত করতো।[৭৯৮] এসময় জাতীয় নেতাদের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, নিবারণ চন্দ্র দাস, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতা তাদের ভাষণের মাধ্যমে মেয়েদেরকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতেন। এভাবে কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, শিল্পী, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন ধারার ব্যক্তিবর্গ বিলেতি পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারে নারীকে উৎসাহিত করেন। কেননা নারী ছিলেন ঘরের কাজের প্রধান চালিকাশক্তি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিসপত্র নারীর হাতেই গৃহ পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত হতো। তাই স্বদেশী ভাবধারার নারীকে সচেতন করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনে যে সকল নারী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ব্রাহ্মনেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র। তিনি মেয়েদের আহ্বান জানান পুরুষের সাথে একযোগে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করার জন্য। এ উদ্দেশ্যে তিনি মেয়েদের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে অতীতের পূণ্যবতী নারীর কথা স্মরণ করেন যারা স্বদেশপ্রেমে সম্মুখ যুদ্ধে স্বামী-পুত্রকে প্রেরণ করেছেন, এমনকি নিজেও অংশগ্রহণ করেছেন।[৭৯৯] স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ অনেকটা কম ছিল। মুসলিম নারী এসময়

[৭৯৭] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৮৩

[৭৯৮] গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশি গান*, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১০

[৭৯৯] কুমুদিনী মিত্র, *"মাতৃভূমির দুর্দ্দিনে মহিলাগণের কর্তব্য"*, *ভারত মহিলা*, ভাদ্র ১৩১২, পৃ. ১২-১৫

শিক্ষায় যেমন পিছিয়ে ছিলেন, তেমনি রাজনৈতিকভাবে তারা খুব একটা সচেতন ছিলেন না। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ভূমিকা পালন করেন পূর্ববাংলার খায়রুন্নেসা খাতুন (১৮৮০-১৯১২)। উল্লেখ্য বঙ্গভঙ্গের আগেই ১৯০৫ সালে *নবনূর* পত্রিকায় "স্বদেশানুরাগ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেন যে,

> ভগ্নিগণ আইস, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশি শাড়ী পরিত্যাগ করি, বিলাতি বডিজ, সেমিজ ও মোজা ঘৃণার চোখে দেখি, লেভেন্ডারের পরিবর্তে আতর ও গোলাপ ব্যবহার করিতে শিখি এবং লেডী-সু পায়ে দিয়ে হুচট খাওয়ার দায় হইতে নিস্কৃতি পাই। তবেই আমরা স্বদেশের উপকার করিতে পারিব। ... আমরা নির্ব্বোধ না হইলে সাত সমুদ্র পার হইতে বণিকগণ আমাদিগকে সামান্য জার্মান সিলভারের গহনা ও বেলোয়ারী চুড়ি দ্বারা প্রতারিত করিয়া জাহাজ ভরিয়া ভারতের ধন ও ধান্য লইয়া যাইতেছে।[৮০০]

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নারী খায়রুন্নেসা নিজ বক্তব্য লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি স্বদেশী ভাবধারায় মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে বলেন- বোম্বাই, ঢাকা, পাবনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে নানারকম ধুতি ও রেশমী শাড়ি এবং চিকন কাপড় প্রস্তুত হয়। এ সকল বস্ত্র ব্যবহার করলে দেশের টাকা দেশেই থেকে যাবে, নিজ দেশের শিল্পের প্রসার ঘটবে, গরীব শ্রমজীবী তাঁতীরা অর্থ উপার্জন করে পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারবে। উল্লেখ্য প্রথমাবস্থায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানরা অংশগ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করলেও খায়রুন্নেসার স্বদেশী ভাবধারা মুসলমানদের এ আন্দোলনে আকৃষ্ট করে। মুসলমানদের মধ্যে প্রখ্যাত ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল, টাঙ্গাইলের জমিদার এবং কলকাতার খ্যাতনামা আইনজীবী আব্দুল হালিম গজনভী, বর্ধমানের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা আবুল কাসেম, *দি মুসলমান* পত্রিকার সম্পাদক মুজিবর রহমান এবং পূর্ব বাংলার সিরাজগঞ্জের কবি ইসমাঈল হোসেন সিরাজী সহ অনেকে স্বদেশী আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে যোগদান করেন।[৮০১] অন্যদিকে সিরাজুল ইসলাম, শামসুল হুদা, দেলওয়ার হোসেন আহমেদ এবং আমীর হোসেন প্রমুখ নেতা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন।

ব্রিটিশদের শাসননীতির ফলে বাঙালি জাতি তথা ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে- তৎকালে এ বিষয়টি উপলব্ধি করে যারা বিচলিত ছিলেন তাদের মধ্যে খায়রুন্নেসা অন্যতম। একজন নারী হিসেবে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল যুগের তুলনায় অনেক বেশি প্রাগ্রসর। 'শিখাগোষ্ঠীর' প্রায় দেড় যুগ

---

[৮০০] খায়রুন্নেসা খাতুন, "স্বদেশানুরাগ", *নবনূর*, তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ (৬ষ্ঠ) সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১২, পৃ. ২১

[৮০১] Prodip Kumar Lahiri, *Bengali Muslim Thought, 1818-1947*, K.P Bagchi, Calcutta, 1984, pp. 246-282

আগে একজন প্রত্যন্ত গ্রামের নারী খায়রুন্নেসা ‘খয়ের খাহ মুনসী’ ছদ্মনামে একাধিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন।[৮০২] তিনি শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ে একটি প্রবন্ধে লিখেন,

> ইংরাজ ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও সময় সময় রাষ্ট্রীয় মন্তব্যের প্রচার করিয়া এদেশীয় শিক্ষিতগণের হৃদয়ে যে আকাঙ্খা উদ্দীপিত করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন। ইহাতে চারিদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ... কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের পক্ষেই রাজনৈতিক আন্দোলন সমান প্রয়োজনীয়। এ জন্যই দেখা যাইতেছে যে, আজকাল হিন্দু মুসলমান পরস্পরের হাত ধরিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।[৮০৩]

অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী খায়রুন্নেসা খাতুন দেশি শিল্পের পুনরুজ্জীবন করতে সকলকে উৎসাহিত করেন। বিদেশি কৌটার গুড়া দুধের পরিবর্তে দেশি গরুর দুধ, বিদেশি রিফাইন্ড চিনির পরিবর্তে দেশি আখের চিনি ও খেজুরের গুড় খাওয়ার জন্য সকলের নিকট আবেদন জানান। আবার বিদেশি চুরুট ও সিগারেটের বিষাক্ত নেশা ত্যাগ করার জন্য পুরুষকে আহ্বান জানান। তিনি স্বদেশী পণ্য গ্রহণে মেয়েদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আশাকরি তোমরা প্রত্যেকেই প্রাণপণে স্বদেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে। তোমরা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকলে এই দরিদ্র ভারতের আর কোন উপায় নেই। এখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গার সময় হয়েছে।”[৮০৪]

স্বদেশী আন্দোলন সফল করার জন্য বাঙালি নারী কলকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে যোগদান করতেন। এ ধরণের অনেক সভা নারী নিজেরাই আয়োজন করতো বলে সমসাময়িক *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায়। প্রকাশ্য সভার মঞ্চে নারী আসন গ্রহণ করতেন, আবার অনেক সময় মূল মঞ্চের সাথে পর্দাঘেরা ছাউনিতে বসতেন।[৮০৫] পুরুষ কর্তৃক আয়োজিত সভায় অনেক সময় নারীও বক্তৃতা করতেন। সে সময় পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে স্থানীয় জমিদার উপেন্দ্রমোহন পাল চৌধুরীর প্রস্তাবে এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু চিন্তাহরণ মজুমদারের অনুমোদনে এরূপ একটি স্বদেশী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব

---

[৮০২] সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রুন্নেসা খাতুন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৪৭

[৮০৩] খায়রুন্নেসা খাতুন, “রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান”, *নবনূর*, তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১২

[৮০৪] খায়রুন্নেসা খাতুন, “স্বদেশানুরাগ”, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩

[৮০৫] যোগেশচন্দ্র বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ১৬৭

করেন স্বদেশানুরাগী জমিদার শ্যামলাল পাল চৌধুরী। এখানে 'বন্দে মাতরাম' ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং স্থানীয় অনেক নারী এতে অংশগ্রহণ করেন।[৮০৬] ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত একটি স্বদেশী সভায় অভিমত জ্ঞাপন করা হয় যে, গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা অবসর সময়ে বিশেষ করে হিন্দু বিধবারা চরকায় সুতা কেটে, বস্ত্রবয়ন যন্ত্রে কাপড় বুনে এবং সে কাপড় কেটে সেলাই করে পরিবারের প্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা পূরণ করতে পারে।[৮০৭]

১৯০৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর ঢাকার গেন্ডারিয়ায় দীননাথ সেনের বাসভবনে মেয়েদের একটি স্বদেশী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বলা হয়, 'বঙ্গীয় নারী সকলই সহিয়া লইতে এবং মনে করিলে সকলই করিতে পারেন।'[৮০৮] এ উক্তি উচ্চারণ করে নারীকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলে। এভাবে পূর্ববাংলার ফরিদপুর, মাদারীপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর, বরিশাল প্রভৃতি জায়গায় ব্যাপক হারে মহিলাদের স্বদেশী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যা সমসাময়িক *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা নিয়মিতভাবে খবর প্রকাশ করে। উল্লেখ্য এ সময় স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য নারী নানারকম নিপীড়নের স্বীকার হন- এ তথ্যও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে বাংলার নানা জায়গায় স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন শুরু হয়। এ সময় ঢাকার মুন্সিগঞ্জে ক্যাপসুল (ঔষধ), বরিশালের উজিরপুর, রহমতপুর ও কীর্ত্তিপাশা গ্রামে নিব (কলমের) তৈরি হয়, কলকাতার দি গ্রেট ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানি সিমেন্ট ও পেইন্টার রং উৎপাদন শুরু করে।[৮০৯] আবার বাঙালি নারী চরকায় সুতা কেটেছেন। পূর্ব বাংলার মানিকগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, রাজবাড়ী, বিক্রমপুর প্রভৃতি জায়গায় চরকার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। উল্লেখ্য ১৯০৬ সালে 'সখি সমিতি', 'মহিলা শিল্পাশ্রম' নামে পুনরায় সক্রিয় হয়।[৮১০] এখানে বিধবা মেয়েদের সুতাকাটা, বস্ত্রবয়ন, কলের মোজা, গেঞ্জি, লেস, কাপড় কাটা, পোশাক তৈরি, মোমবাতি তৈরি, চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। গৃহে তৈরি দ্রব্যের প্রদর্শনীর জন্য শিল্পমেলারও আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে বহুসংখ্যক বাঙালি নারী নিজেদের জমানো সীমিত অর্থ এবং অলংকার দিয়ে স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনায় তহবিল

[৮০৬] *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, পৃ. ৫

[৮০৭] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, পৃ. ৮

[৮০৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯০৫, পৃ. ৩

[৮০৯] *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, পৃ. ৯

[৮১০] যোগেশচন্দ্র বাগল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২

সংগ্রহ করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বরিশালের অশ্বিনী কুমার দত্তের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'তে (স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত) অনেক নারী অর্থ ও অলংকার প্রদান করেন। বরিশালের সরোজিনী বসু নিজের হাতের স্বর্ণের বালা স্বদেশী ভাণ্ডারে জমাদানের জন্য অশ্বিনী কুমারের কাছে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে ১৯০৮ সালে সরোজিনী বসু 'বঙ্গলক্ষ্মী' উপাধিতে ভূষিত হন।[৮১১]

এছাড়া বরিশালের স্বল্পবয়সী গৃহবধূ মনোরমা বসু (১৮৯৭-১৯৮৬) হাতের কব্জিতে হলুদ রং এর সুতার রাখি বেঁধে স্বদেশী আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সারাটি জীবন মনোরমা বসু বাংলার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন। ১৭ বছর বয়সী গৃহবধূ লাবণ্যপ্রভা দত্ত (১৮৮৮-১৯৭১) তাঁর পরিবারকে বিদেশি পণ্য বর্জনে উদ্বুদ্ধ করেন। বরিশালের অন্য একজন নারী কুসুমকুমারী দাসী স্থানীয় মেয়েদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সচেতনতার প্রয়াসে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নিজেই শিক্ষকতা শুরু করেন।[৮১২] আবার ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীমতি দীনমনি চৌধুরী তাঁর প্রজাদের স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেন।[৮১৩] অন্যদিকে অভিজাত পরিবারের বাঙালি নারীগণ বিদেশি বস্ত্র বর্জন করে স্বদেশী তাঁতের ও খাদি শাড়ী পরা শুরু করে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সমর্থন জানান। এ প্রসঙ্গে আশালতা সেন বলেন-

> বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দেশের লোকের মনে একটা বৈপ্লবিক ভাবধারা এনে দিয়েছিল। প্রাচীন পন্থী পর্দানশিন মহিলারা পর্যন্ত বিদেশি জিনিস বয়কটের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেন। আমার মাতামহী নবশশী দেবী আমাকে পাড়ার গৃহবধূদের কাছে পাঠালেন 'বিদেশি বর্জন আর স্বদেশী ব্যবহারের' প্রতিজ্ঞা পত্রে সই করাতে। ... তিনি আমাকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজপুত, মারাঠা আর শিখদের লড়াইয়ের ইতিহাস আর বাংলার প্রতাপাদিত্য, মনিপুরের টিকেন্দ্রজিৎ, ইতালির গ্যারিবল্ডির জীবনী জাতীয় অনেক বিপ্লবাত্মক বই পড়তে দিতেন। দেশের স্বাধীনতা কি করে আনা যায়- এই কথা প্রায়ই ভাবতাম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' আর স্বামী বিবেকানন্দের লেখা খুব আগ্রহ ভরে পড়তাম।[৮১৪]

---

[৮১১] আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, ১১

[৮১২] *ঐ*, পৃ. ১৩

[৮১৩] *ঐ*, পৃ. ১৪

[৮১৪] আশালতা সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

উল্লেখ্য আশালতা সেন স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালি নারীকে উজ্জীবিত করার জন্য বিপ্লবাত্মক বিভিন্ন কবিতা, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর জীবনচরিত এবং সাবিত্রীর কাহিনী রচনা করেন।[৮১৫] এছাড়া বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে হাওড়া জেলার ননীবালা দেবী, বীরভূমের দুকড়িবালা দেবী, ময়মনসিংহের ক্ষিরোদা সুন্দরী দেবী, বরিশালের হেমনলিনী গুপ্তা, লাবণ্যপ্রভা দত্ত, কুসুম কুমারী দাসী, পাবনার বিন্দুবাসিনী দেবী, মুসলিম নারী জোবেদা খাতুন চৌধুরী, শামসুন নাহার মাহমুদ, ময়মনসিংহের রাজিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, সামসুন্নেসা বেগম, রওশন আরা বেগম, রাইজু বানু বেগম, বদরুন্নেসা বেগম প্রমুখ নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগদান করেন। সুশীল সমাজের নারী ছাড়াও বারবনিতা নারীও এসময় বিদেশি পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার ও স্বদেশী ভাণ্ডারে অর্থ প্রেরণ করেন। এভাবে স্বদেশী আন্দোলনে সকল শ্রেণির নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

মূলত স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বাঙালি নারীর সাহসিকতার বৃদ্ধি ঘটে। তাই এরপর সহিংস আন্দোলনে বাঙালি নারীকে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্রথমদিকে উল্লেখযোগ্য হাওড়া জেলার বালিতে জন্মগ্রহণকারী নারী ননীবালা দেবী (১৮৮৭-১৯৬৭)। ভ্রাতুষ্পুত্র অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি অস্ত্র চালনার দীক্ষা নেন। ১৯১৫ সালে বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে ননীবালা তার নকল স্ত্রী সেজে রামচন্দ্রের সাথে জেলখানায় দেখা করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের সাথে ননীবালা দেবী একযোগে কাজ করেন। অবশ্য তিনি এসব কাজের জন্য পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং এই অর্থে তিনিই বাংলার প্রথম নারী রাজবন্দি।[৮১৬] এ পর্যায়ে আরেকজন নারী বীরভূমের ঝাউপাড়া গ্রামের দুকড়িবালা দেবী (১৮৮৭-১৯৭০)। তিনিও ভাগ্নে নিবারণ ঘটকের বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হন। ভাগ্নে সাতটি পিস্তল দুকড়িবালা দেবীর ঘরে লুকিয়ে রাখলে পুলিশ তাঁর বাড়ি তল্লাসি করে এবং অস্ত্র পেয়ে দুকড়িবালাকে বন্দি করে জেলখানায় নেওয়া হয় (১৯১৭)।[৮১৭] ক্ষিতিশ চৌধুরী ও বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের 'যুগান্তর' দলের সদস্য হন ময়মনসিংহের ক্ষিরোদা সুন্দরী দেবী (জন্ম ১৮৮৩)। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে দক্ষতার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হন। এভাবে বাংলার নারী স্বদেশী আন্দোলনের পথ ধরে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন।

---

[৮১৫] *ঐ*, পৃ. ১৭

[৮১৬] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮

[৮১৭] *ঐ*, পৃ. ৯৯

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (১৯১৪-১৮) ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের দমননীতি বৃদ্ধি পায়। এ সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। অসাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ব্রিটিশ বিরোধী কর্মতৎপরতার জন্য সাত বছরের জন্য বিনা বিচারে কারাগারে বন্দি হন। এমতাবস্থায় ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে তাঁরা আমন্ত্রিত হলে, পুত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের মা বি-আম্মা[৮১৮] অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য কংগ্রেসের এ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন সদ্য কারামুক্ত অ্যানি বোসান্ত। সম্মেলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়াস ছিল লক্ষ্য করার মতো বিষয়। একই মঞ্চে 'আল্লাহু আকবর' ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি উঠে। এখানে আরো উপস্থিত ছিলেন সরোজিনী নাইডু। বি-আম্মা প্রথমবারের মতো কোন রাজনৈতিক মঞ্চে পুরুষের পাশে বসে বক্তৃতা করেন। উর্দুতে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, "দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য প্রয়োজনে স্বামী-পুত্রদের পাঠাতে হবে জেলে এবং নিজেরাও ভয় দ্বিধা পরিত্যাগ করে বরণ করে নিতে হবে কারাগার। আমার সন্তানরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করেছে। সে জন্য জননী হিসেবে আমি গর্ববোধ করছি।"[৮১৯] এ কাজে তাঁর পুত্রবধুরা তাঁকে সহযোগিতা করতেন।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মহাত্মাগান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে ভারতব্যাপী ব্যাপক সাড়া জাগে। বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী (১৮৮০-১৯২৫)। ব্রিটিশ বিরোধী কার্যক্রমে চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেপ্তার হলে তার বন্দি জীবনের সময় বাসন্তী দেবী *বাঙলার কথা* পত্রিকাটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। উল্লেখ্য চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত (১৯২২ সালে) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক সম্মেলনে বাসন্তী দেবী সভাপতিত্ব করেন।[৮২০] এখানে তিনি বাঙালি নারীকে স্বদেশী পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করেন এবং বাংলার গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। আবার ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত করায় চিত্তরঞ্জন দাসের পুত্র চিররঞ্জন দাস কারাবন্দি হলে এর প্রতিবাদ

---

[৮১৮] বি-আম্মার প্রকৃত নাম আবাদি বানু বেগম। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট মৌলভী আবদুল আলী খানের স্ত্রী। ১৮৮০ সালে মাত্র ২৮ বছর বয়সে বি-আম্মা বৈধব্য বরণ করেন। নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকা সত্ত্বেও তিন পুত্র জুলফিকার আলী, শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলীকে ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত করেন। তাঁর প্রেরণায় পুত্ররা সরকারি চাকুরি ত্যাগ করে দেশ ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। জনগণ আবাদি বেগমকে সম্মান করে 'বি-আম্মা' অর্থাৎ জনগণের শ্রদ্ধার জননী বলে সম্বোধন করতো। (আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯১)

[৮১৯] এম. আবদুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১

[৮২০] অদিতি ফাল্গুনী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭

জানিয়ে বাসন্তী দেবী বড় বাজারে সভা করে আইন ভঙ্গের আহ্বান জানান। তখন বাসন্তীদেবীর সাথে উর্মিলা দেবী, সুনীতিদেবী সহ ২১ জন নারীকে গ্রেপ্তার করা হলে জনরোষের মুখে সরকার তাদের মুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়।

অন্যদিকে হেমপ্রভা মজুমদার (১৮৮০-১৯৬২) জেলখানার জেল রক্ষকদের সাথে অত্যন্ত বাকবিতণ্ডা করে বন্দি চিররঞ্জন দাসের সাথে সাক্ষাত করেন। উল্লেখ্য, অসহযোগ আন্দোলনে হেমপ্রভা মজুমদার বহুমুখী অবদান রেখেছেন। তিনি পূর্ববাংলার চাঁদপুর ও গোয়ালন্দের (১৯২১) স্টীমার ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন। আসাম চা বাগান থেকে পূর্ব বাংলায় আসা নারী কুলিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেন। তিনি নারায়ণগঞ্জে একটি মহিলা সংগঠনের সূচনা ঘটান বলেও জানা যায়। পরবর্তী জীবনে সরোজিনী নাইডুকে নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেন।[৮২১] আবার চিত্তরঞ্জন দাসের ছোট বোন উর্মিলা দেবী (১৮৮৩-১৯৫৬) বাঙালি মেয়েদের মধ্যে চরকার প্রচলন বৃদ্ধি করা এবং স্বরাজ লাভের জন্য *নারী কর্মমন্দির* (১৯২১) নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য উর্মিলা দেবী পরবর্তীতে সরোজিনী নাইডু যখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন (১৯২৬) তখন তাঁর সাথে নানা জায়গায় সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং আজীবন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থেকে দেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করেন।

অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নারীর মধ্যে অন্যতম জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী। তিনি ১৯২০ সালে কলকাতা কংগ্রেসে প্রথম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। ফলে সংঘবদ্ধভাবে বাঙালি নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রথম পরিদৃষ্ট হয়।[৮২২] এ সময় কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলীর প্রচেষ্টায় রেণুকা রায়সহ *ডায়াসিসন কলেজের* আরো অনেক ছাত্রী কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়।[৮২৩] ইংরেজ নারী নেলী গ্রে (১৮৮৫-১৯৭৩) যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সাথে বিয়ে করে পূর্ব বাংলার চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। নেলী গ্রে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। অন্যদিকে মানিকগঞ্জের বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামশংকর সেনের কন্যা মোহিনী দেবী (১৮৬৩-১৯৫৫) অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এজন্য তাকে কারাবরণ করতে হয়।

---

[৮২১] *ঐ*, পৃ. ৪৮

[৮২২] রেজিনা বেগম, *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী* ((১৯০৫-৪৭), বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৪৯

[৮২৩] Anup Taneja, *Gandhi, Women and the National Movement 1920-47,* Har Anand Publications, Delhi, 2005, p. 51

বিক্রমপুরের আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৮৬) ১৯২১ সালে ঢাকার গেন্ডারিয়ায় *শিল্পাশ্রম* নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[৮২৪] এ শিল্পাশ্রমের সদস্য মেয়েরা খদ্দরের কাপড় তৈরি করতো। অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম সদস্য আশালতা সেন ১৯২২ সালে প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে যোগদান করেন। এখানে বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতা বিষয়ে বিধানসভা বর্জনকারীদের পক্ষাবলম্বন করে এক অগ্নিঝরা বক্তব্য দেন। দেশে ফিরে সুশীলা সেন, গিরিবালা দেবী, সরমা গুপ্তা ও সরযূগুপ্তার সহায়তায় 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি' স্থাপন করেন। এ সমিতি প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় মেয়েদের মধ্যে সক্রিয় দেশপ্রেম ও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বাণী ও কর্মপন্থা প্রচার করা।[৮২৫] *গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতির* সদস্যরা এ সময় খদ্দর কাপড় নিয়ে দূরদূরান্তে যেতেন বিক্রি করতে এবং সাথে সাথে মহাত্মা গান্ধীর বাণী প্রচার করতেন। উল্লেখ্য এ সমিতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে আশালতা সেন লীলানাগের সাথে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দু'জনের (আশালতা ও লীলানাগ) বিপ্লবের ধারা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। লীলানাগ তরুণ গোষ্ঠীর সহায়তায় 'গেরিলা' যুদ্ধে বিশ্বাসী ছিলেন, অন্যদিকে আশালতা সেন অহিংস গণ-আন্দোলনের পক্ষপাতি ছিলেন।[৮২৬] পরবর্তীতে আশালতা সেন ১৯২৫ সালে 'নিখিল ভারত চরকা সংঘে'র সদস্যপদ লাভ করে খাদি বস্ত্র প্রচারে সর্বাত্মকভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯২৭ সালে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের প্রসারে ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহায়তায় 'কল্যাণ কুটির' নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[৮২৭]

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ব বাংলার আরো যে সকল নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিলেটের সরলাবালা দেবী, দিনাজপুরের প্রভা চট্টোপাধ্যায়, ভোলার সরযুবালা সেন, ইন্দুমতি গুহঠাকুরতা, নোয়াখালির সুশীলা মিত্র, খুলনার স্নেহশীলা চৌধুরী, ময়মনসিংহের উষা গুহ, বরিশালের প্রফুল্লকুমারী বসু প্রমুখ। এ সকল নারী নিজ নিজ এলাকায় অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে নারী সমাজকে সংগঠিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করেন।

ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুরস্ক খণ্ড বিখণ্ড করায় মুসলমানদের ধর্মীয়

[৮২৪] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২

[৮২৫] আশালতা সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮

[৮২৬] *ঐ*, পৃ. ১৯

[৮২৭] *ঐ*, পৃ. ২০

অনুভূতিতে আঘাত লাগে। তাই তুরস্কের মুসলিম খিলাফত রক্ষার আন্দোলন ভারতবর্ষেও শুরু হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলন ও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন অর্থাৎ ব্রিটিশদের বিরোধিতা করা। ফলে ধর্মীয় বিভেদ ভুলে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে আন্দোলন দুটি পরিচালিত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের ন্যায় খিলাফত আন্দোলনেও নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর মাতা বি-আম্মা (আবাদি বানু বেগম) ছিলেন এ আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। শিক্ষিত এবং উদার মনোভাবাপন্ন নারী আবাদি বেগমের সাথে ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে গিয়ে সভা করতেন। আবাদি বেগম লক্ষ্মৌ ও দিল্লীর বিভিন্ন জনসভায় জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে ব্যাপক জনসমর্থন লাভের প্রচেষ্টা চালান।[৮২৮] ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক সংখ্যক নারী খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

তৎকালে মহিলারা আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য অর্থ সাহায্য করতেন এবং পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরকে আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতেন। বি-আম্মা মহাত্মা গান্ধীর সাথে অসহযোগ আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা সফর করেন এবং সম্মোহনী বক্তৃতা দিতেন। তাঁর ভাষণে জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে খিলাফত আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করে। পাশাপাশি বি-আম্মা অসহযোগ আন্দোলনেও মেয়েদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করা এবং পিকেটিং ও পতাকা উত্তোলনের কাজে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।[৮২৯] বি-আম্মা পাঞ্জাব, পাটনা, ভাগলপুর, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরানওয়ালা, কাসুর, বিহার প্রভৃতি স্থানে সভা করে মহিলাদের খদ্দর বস্ত্র ব্যবহার এবং স্বরাজ আন্দোলনে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানান। এসময় অনেক নারী আবেগে আপ্লুত হয়ে বি-আম্মার হাতে বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য নগদ অর্থ ও অলংকার তুলে দেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (১৯২৪) বি-আম্মা মুক্তি সংগ্রামে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত সম্মান করতেন বি-আম্মাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বালগঙ্গাধর তিলক উল্লেখ করেন, “এদেশে যেন বি-আম্মার মতো বীর জননীর অভাব না হয়। জননী হওয়া গৌরবের বটে, কিন্তু বীর জননী হওয়া অধিকতর গৌরবের। দেশকে আজাদী করতে হলে বি-আম্মার মতো হাজার হাজার বীর জননী প্রয়োজন”।[৮৩০]

---

[৮২৮] আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯০

[৮২৯] Gail Minault, “Purdah Politics : The Role of Muslim Women in Indian Nationalism, 1911-1924” in Separate Worlds (ed.), Hannah Papanek and G. Munault, Chanakya Publications, 1982, pp. 245-161

[৮৩০] এম. আব্দুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনে হিন্দু নারীর তুলনায় মুসলিম মেয়েদের অংশগ্রহণ কিছুটা কম পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত সময়ে মুসলিম নারী জাগরণ ও আন্দোলনের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। তবে নানা লেখনীর মাধ্যমে তিনি বাঙালি মুসলিম মেয়েদেরকে স্বদেশী, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। বিশেষ করে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নানা রকম কুটির শিল্প তৈরিতে মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বদেশী চেতনায় তাদেরকে আগ্রহী করে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন মিসেস এম. রহমান (মাসুদা খাতুন)। এম. রহমান নিজে খদ্দরের বস্ত্র পরিধান করেছেন। এমনকি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুর পর কাফনও খদ্দরের কাপড় দিয়েই করা হয়েছিল।[৮৩১] তাঁর 'বাড়বানল', 'শক্তি ও শান্তি' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্বরাজ ও স্বদেশী ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে।

মূলত ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে ধর্মের সংযোগ ও সহ-অবস্থান থাকায় নারীর জন্য অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করে। এজন্য উক্ত দু'টি আন্দোলনে ভারতবর্ষের মেয়েদের অংশগ্রহণের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে মহৎ চরিত্রের অধিকারী মহাত্মা গান্ধীর হৃদয়গ্রহী আহ্বানে নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণে উৎসাহবোধ করে। মহাত্মা গান্ধী সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে নারীর অবস্থার উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে প্রয়াসী ছিলেন এবং নারীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাস ও বিপিনচন্দ্র পালের মতো জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা কর্তৃক রাজনীতিতে নিজের স্ত্রী ও বোনদের সম্পৃক্ত করা বাঙালি নারীকে রাজনীতিতে নিজের দক্ষতা প্রদর্শনে অনুপ্রাণিত করে। তাই এ সময় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল নারীই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে সংযুক্ত করতে প্রয়াসী হয়।

পূর্ব বাংলার ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নারী লীলানাগের নেতৃত্বে রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। লীলানাগ *দীপালি সংঘের* মাধ্যমে পূর্ববাংলার মেয়েদেরকে সংগঠিত করা শুরু করেন। তিনি অনুধাবন করেন নারীমুক্তির জন্য নারীর রাজনৈতিক মুক্তি ভীষণ প্রয়োজন। তৎকালে ঢাকায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমন উপলক্ষে লীলানাগ কবিগুরুকে অভিনন্দন জানানোর জন্য এক বিশাল মহিলা সভার আয়োজন করেন। কবিগুরু বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এত বড় নারী সমাবেশ তিনি সমস্ত এশিয়ার আর কোথাও দেখেননি।[৮৩২] বিপ্লববাদী তৎপরতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে লীলানাগ

---

[৮৩১] আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৫

[৮৩২] আগমনী লাহিড়ী, "নারী আন্দোলন ও নারী সংগঠন- লীলা রায়ের ভূমিকা", *লীলানাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি*, প্রধান সম্পাদক অজয় রায়, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ১৭৩

১৯২৫ সালে যোগ দেন 'শ্রী সংঘ' (লীলানাগের স্বামী অনিল রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) নামক ঢাকার একটি বিপ্লববাদী সংগঠনে। ১৯২৬ সালে তাঁর উদ্যোগে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকায় একটি যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য এ সম্মেলনে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী বিনয় সরকার ও সরলাদেবী চৌধুরাণী আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। এখানে লীলানাগ 'হিন্দু দায় ভাগ' আইনের নানা অসঙ্গতি এবং নারী সমাজের প্রতি অবিচার, বৈষম্য ও বঞ্চনার দিকগুলি যুক্তিসম্মতভাবে তুলে ধরেন। সম্পত্তিসহ নানা বিষয়ে নারীকে তুচ্ছ বিবেচনা করার বিরুদ্ধে তিনি জোর প্রতিবাদ জানান। লীলানাগ নারীর জন্য রাজনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে পুরুষের সমানাধিকারের দাবি তুলে ধরেন।[৮৩৩]

১৯২৬ সালে লীলানাগ গড়ে তোলেন বাংলার প্রথম ছাত্রী সংগঠন 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' নামক একটি সমিতি। মূলত সে সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের গণ-সংগঠনের ছত্রছায়ায় ছাত্রীদের পক্ষে যোগদান করা দুঃসাধ্য ছিল। তাই লীলানাগের *দীপালি ছাত্রী সংঘের* মাধ্যমে ছাত্রীরা নিজস্ব দাবি-দাওয়া তুলে ধরা এবং ব্যাপকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার সুযোগ লাভ করে। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, *জগন্নাথ কলেজ*, *ইডেন হাইস্কুল* প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ছাত্রী সংঘের কার্যক্রম ছিল ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।[৮৩৪] বাংলা এবং আসামের বিভিন্ন স্থানে এ সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। শরীরচর্চার নানা কৌশল আয়ত্ত করার মাধ্যমে মেয়েরা যাতে হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের জন্য ১৯২৭-২৮ সালে লীলানাগ 'নারী আত্মরক্ষা তহবিল' গঠন করেন।[৮৩৫] পরবর্তীতে তিনি সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং *মহিলা সত্যাগ্রহ সমিতি* গঠন করে কারাবরণ করেন।[৮৩৬] উল্লেখ্য অনিল রায় বিপ্লবী কার্যক্রমের জন্য গ্রেপ্তার হওয়ার পর লীলানাগ *শ্রী সংঘের* নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 'শ্রী সংঘে'র মাধ্যমে মেয়েদের শরীরচর্চা, লাঠিখেলা, ছোরা ও তরবারি চালনা প্রভৃতি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য তাদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। এ সময় *দীপালি সংঘ*, *দীপালি ছাত্রী সংঘ* ও *শ্রী সংঘ* একত্রে যুক্ত হয়ে একযোগে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম শুরু করে। এসব সংঘের কর্মীরা বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগ্রহ করে ঢাকা ও কলকাতার সাথে সংযোগ রক্ষা করে ব্রিটিশ বিরোধী

[৮৩৩] দীপংকর মোহান্ত, *লীলানাগ (১৯০০-১৯৭০)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৬

[৮৩৪] *ঐ*, পৃ. ৩৭

[৮৩৫] চিত্রব্রত পালিত, "বিপ্লবী লীলা রায় ১৯০০-১৯৭০", *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল*, প্রথম খণ্ড (রাজনীতি সমাজ প্রশাসন), আবদুল মমিন চৌধুরী ও শরীফউদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৪৫

[৮৩৬] ঐ, পৃ. ১৪৯-১৫০

আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। লীলানাগের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে ঢাকার বকশিবাজার, আজিমপুর, কয়েতটুলি, চাঁদনিঘাট, উয়ারী, ঠাটারিবাজার, তাঁতিবাজার, বাংলাবাজার, লক্ষ্মীবাজার, গেন্ডারিয়া, ফরাশগঞ্জ, সিদ্ধেশ্বরী প্রভৃতি এলাকায় অস্ত্রের ঘাঁটি পরিচালিত হতো এবং এসব ঘাঁটির অধিকাংশের রক্ষক ছিলেন মেয়েরা।[৮৩৭] এ সকল মেয়েদের মধ্যে ঢাকার বেনুকণা সেনগুপ্ত, অনুপমা বসু, লতিকা দাস (সেন), রেণুকণা দত্ত (ব্যানার্জী), হেলেনা দত্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য লীলানাগ কয়েকবার জেলখানায় বন্দি হন। সবশেষে ১৯৩৭ সালে কারামুক্ত হয়ে ১৯৩৮ সালে সিলেটে মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সারাজীবন বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন।

১৯৩০ সালের ১২ মার্চ ব্রিটিশ সরকারের Salt Act বা লবন আইন অমান্য করে এক সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দেন মহাত্মা গান্ধী। এ লক্ষ্যে তিনি গুজরাটের সমুদ্র উপকূলবর্তী ড্যান্ডি গ্রামের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু করেন। এ অভিযানে মহাত্মা গান্ধীর সহযাত্রীদের মধ্যে একমাত্র নারী সদস্য ছিলেন সরোজিনী নাইডু।[৮৩৮] ড্যান্ডিতে দাদাভাই নওরোজীর নাতনী খোরশেদ বেন, মৃদুলা সরভাই সহ আরো অনেক নারী তাৎক্ষণিকভাবে মহাত্মা গান্ধীর সাথে এ আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তখন নারী সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আইন অমান্য আন্দোলনকে সফল করার লক্ষ্যে মিটিং ও মিছিলে অংশগ্রহণ এবং নানাবিধ দেশাত্মবোধক গান রচনা করে গাইতে থাকেন। এ সকল কাজে তারা পুলিশী বাধার সম্মুখীন হন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, হেনসা মেহতার নেতৃত্বে প্রায় ৫০০ নারীর একটি দল বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুবার্ষিকীতে যোগদান করতে বের হলে পুলিশের লাঠিপেটার সম্মুখীন হয়ে অনেকে বন্দি হন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নারী রক্ষণশীল পরিবারের গণ্ডি পার হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়ে এসে সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। তৎকালে 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ' (১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণায় লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত) নামক মেয়েদের একটি সংগঠন আইন অমান্য আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। সংগঠনটি স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করে কলকাতার বড় বাজার, বউবাজার, শ্যামবাজার, নিউমার্কেট প্রভৃতি এলাকায় বিদেশি বস্ত্রের দোকান, নানা প্রকারের বিলেতি সামগ্রীর দোকান এবং মদের দোকানে পিকেটিং করে। উল্লেখ্য অরুবালা সেনগুপ্ত এ স্বেচ্ছাসেবী দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন।[৮৩৯]

---

[৮৩৭] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮

[৮৩৮] রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬

[৮৩৯] যোগেশচন্দ্র বাগল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩

১৯৩০ সালের ১৩ মার্চ কলকাতায় কয়েকজন কংগ্রেস নেত্রী ও কর্মীর উদ্যোগে 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' গঠিত হয়। উর্মিলা দেবীর সভাপতিত্বে গঠিত এ সমিতির সহ সভাপতি ছিলেন মোহিনী দেবী, জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী, নিস্তারিণী দেবী, অশোকলতা দাস এবং হেমপ্রভা দাশগুপ্ত; যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শান্তি দাস (কবির) এবং বিমলপ্রভা দেবী। এছাড়া ইন্দুমতি গোয়েঙ্কা, সরলাবালা সরকার, অন্নালিকা দেবী, জোৎস্না মিত্র, সজ্জন দেবী, মানসনলিনী দেবী, প্রীতি দাস, সুষমা দাশগুপ্ত সহ আরো অনেকে এ সমিতির সদস্য ছিলেন।[৮৪০] 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' অল্প সময়ের মধ্যে রাজনীতি সচেতন নারীর মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সমিতিটির সদস্যদের কাজ ছিল বিলেতি জিনিস বিক্রিতে বাধা দেওয়া, মদ বিক্রি বন্ধ করায় কাজ করা, বিদেশি জিনিসপত্র বিক্রি হয় এমন দোকানের সামনে পিকেটিং করা এবং প্রয়োজনে সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করা।[৮৪১] নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সদস্যরা বড় বাজার, মনোহরদাস কাট্‌রা, পচাগলি, সুতাপটি, বউবাজার, গ্রান্ট স্ট্রীট, চাঁদনী প্রভৃতি জায়গায় পিকেটিং করতো। উল্লেখ্য নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সদস্যরা ১৯৩০ সালের ২২ জুন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ সময় তারা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বার্ষিক শ্রাদ্ধ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে প্রচণ্ড পুলিশের বাধার মুখে পড়ে নির্যাতনের স্বীকার হন। প্রবল প্রতিরোধ থাকা সত্ত্বেও এ যাত্রায় নারী ছিলেন অদম্য এবং দুঃসাহসী। অন্যদিকে এ সময় লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের লক্ষ্যে দাদাভাই নওরোজীর নাতনী পেরিন ক্যাপ্টেন, অবন্তীকাবাঈ গোখালী এবং জয়শ্রী রাইজীর নেতৃত্বে 'দেশ সেবিকা সংঘ' সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ৯০০ নারী অল্পসময়ের মধ্যে এ সমিতিতে যোগদান করে সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।[৮৪২]

ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় এ সময় লবণ তৈরির কাজ শুরু হয়। ১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল মহিসুবাতানে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ৩৪ জন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে একটি কুটির নির্মাণ করেন এবং কুটিরের উপর জাতীয় পতাকা উড়িয়ে লবণ প্রস্তুত শুরু করেন। অখিলচন্দ্র দত্ত, সুরেশ মজুমদার, মাখন সেন, প্রভাত গাঙ্গুলী, অমর বসু, হেমন্ত বসু প্রমুখ পুরুষের সাথে শ্রীমতি মোহিনী দেবীসহ আরো কয়েকজন নারী এখানে লবণ তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে নীলায় ২৫ জন সত্যাগ্রহী লবণ তৈরি করে স্থানীয়ভাবে বিক্রি করে বলে জানা যায়।[৮৪৩] আবার কাঁথির ৬ মাইল দুরে নিচাবনী গ্রামে ডা. সুরেশচন্দ্র

---

[৮৪০] কমলা দাশগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮

[৮৪১] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৮-৮৯

[৮৪২] অধ্যাপক মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৭৪

[৮৪৩] *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ মার্চ, ১৯৩০ (৪৫ সংখ্যা ৬৯ ভাগ)

বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২৯ জন নারী-পুরুষের একটি স্বেচ্ছাসেবক দল লবন প্রস্তুত করে এবং তারা পুলিশের বাধার স্বীকার হন।[৮৪৪] উল্লেখ্য কাঁথি তৎকালে লবণ তৈরির উপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়, তাই এ আন্দোলনকে সর্বাত্মকভাবে সার্থক করে তোলার জন্য নানা স্থানের সত্যাগ্রহীরা কাঁথি অভিমুখে যাত্রা করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ববাংলার কিশোরগঞ্জের বাণী গ্রামের সত্যাগ্রহীরা যশোদানন্দন গোস্বামীর নেতৃত্বে ৩০ জন নারী-পুরুষ এবং ময়মনসিংহের ৭০ জন নারী-পুরুষের একটি দল কাঁথি যাত্রা করে।[৮৪৫] এছাড়া বরিশালের নিস্তারিণী গাঙ্গুলী, কুমিল্লার হেমপ্রভা মজুমদার, চট্টগ্রামের অম্বিকা চক্রবর্তী সহ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি জায়গায় লবণ প্রস্তুতের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয়।[৮৪৬]

পূর্ব বাংলায় সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা রাখেন আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৮৬)। ১৯৩০ সালের ২২ মার্চ সহকর্মী সুরমা গুপ্তকে সাথে নিয়ে তিনি গঠন করেন 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল'। একই বছর ১৩ এপ্রিল নোয়াখালী গিয়ে তিনি সরমাগুপ্তা ও উষাবালা গুহ সহ আরো কতিপয় নারীর সহায়তায় লবণ আইন ভঙ্গ করে, লবণ পানি (নোনা জল) নিয়ে এসে ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে করোনেশন পার্কের বেদিতে চুলা তৈরি করে মাটির পাত্রে জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি করেন।[৮৪৭] এভাবে লবণ আইন অমান্য করে ঢাকায় আন্দোলন চলতে থাকে। সভা-সমাবেশ ও পিকেটিং এর সময় সত্যাগ্রহী সুনীতি বসু, প্রতিভা সেন, কামিনী বসু ও সরযুবালা গ্রেপ্তার ও কারাদ্বণ্ডে দ্বণ্ডিত হন। ঢাকার বাইরে এ সময় শ্রীহট্ট, জামালপুর ও চাঁদপুরে সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলন ছিল একটি অহিংস আন্দোলন। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাতকারে জানান- "সম্পূর্ণ অহিংস নীতিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচলিত হচ্ছে। ইংল্যান্ডের সাথে ভারতীয়দের সমস্ত সম্পর্ক বর্জন করে স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে এ আন্দোলন সর্বত্র চলমান।"[৮৪৮]

১৯৩১ সালে আশালতা সেন 'বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ' গঠন করেন। অল্পকালের মধ্যে এ সংঘের বহু শাখা পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং আইন আমান্য আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে। এ বছরই

---

[৮৪৪] *ঐ*

[৮৪৫] *ঐ*

[৮৪৬] *ঐ*

[৮৪৭] কমলা দাশগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২

[৮৪৮] *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ এপ্রিল ১৯৩০, (৪৭ সংখ্যা ৬৯ ভাগ)

আগস্ট মাসে আশালতা সেন ঢাকায় 'নারীকর্মী শিক্ষা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেন। এ কেন্দ্রে শিক্ষক হিসেবে মানভূমের কংগ্রেস নেতা নিবারণ দাসগুপ্তকে আহ্বান জানানো হয়। এ প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর সংগ্রামী আদর্শ স্থানীয় মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়।[৮৪৯] নারীকর্মী শিক্ষা কেন্দ্রে ঢাকা, বিক্রমপুর ও শ্রীহট্টের ৫০ জন নারী বিপ্লবী দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তারা স্ব স্ব এলাকায় ফিরে গিয়ে বিপ্লবী ভাবধারা স্থানীয় নারীর মাঝে ছড়িয়ে দেন। উল্লেখ্য মেদিনীপুরের কাঁথিরে এরূপ একটি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এভাবে সর্বত্র সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য ১৯৩২ সালে নির্যাতনমূলক আইন 'Bengal Public Security Act- 1932' পাশ করে। এ আইন পাশের পক্ষে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের যুক্তি ছিল যে, প্রচলিত অন্যান্য আইন সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনকারী কর্মীদের মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট নয়।[৮৫০] এ আইনের আওতায় মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয় (১৯৩২, ৪ জানুয়ারি)। পূর্ব বাংলার ঢাকার *গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি* ও *কল্যাণ কুটির* বে-আইনী ঘোষিত হয়। প্রতিবাদে আশালতা সেন 'নশঙ্কর মহিলা শিবির' প্রতিষ্ঠা করে বিপ্লবী মেয়েদের নেতৃত্ব দিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সত্যাগ্রহী আন্দোলন পরিচালনা করেন। ফলে বিপ্লবী মেয়েদেরকে পুলিশের নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়।[৮৫১]

আবার ঢাকা জেলায় সরমা গুপ্তা'র নেতৃত্বে একদল সত্যাগ্রহী মহিলা ১১ জানুয়ারি শেখরনগর থেকে নবাবগঞ্জ পর্যন্ত আইন অমান্য করে মিছিল বের করেন। এ মিছিলের সবাইকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা জেলখানায় নেওয়া হয়।[৮৫২] অন্যদিকে ১৯৩২ সালের ৩ মার্চ সুরবালা দেবীর নেতৃত্বে একদল মহিলা সত্যাগ্রহীকে গ্রেফতার করে পুলিশ গভীর রাতে জনমানবহীন এক নদীর চরে বাসে করে নিয়ে গিয়ে খাদ্য পানীয় ছাড়া ফেলে রেখে আসে। এ দলে হারাধন দেবনাথ, নগেন্দ্রঘোষ, মুনীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি যেসকল

---

[৮৪৯] কমলা দাশগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩

[৮৫০] শওকত আরা হোসেন, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১-১৯৩৬ অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৮০

[৮৫১] আশালতা সেন ১৯৩৯ সালে পূর্ববাংলার উত্তরবঙ্গের কংগ্রেস কর্মী শশীবালা দেবীর অনুরোধে হেমাঙ্গিনী দেবী এবং বরিশালের ইন্দুমতি গুহ ঠাকুরতাকে সাথে নিয়ে পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, গাইবান্ধা, দিনাজপুর প্রভৃতি জায়গা ভ্রমণ করে স্থানীয় পর্যায়ে 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' গঠন করেন। এছাড়া খুলনা, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া প্রভৃতি জায়গায় পরিভ্রমণ করে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা চালান। তিনি ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদান করে কারাবন্দি হন। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করে নানারূপ গঠনমূলক কাজ করেন। আশালতা সেন সারাজীবন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে দেশের সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন। (কমলা দাশগুপ্ত, ঐ, পৃ. ১০৬-১০৭)

[৮৫২] আশালত সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩

পুরুষ বিদ্রোহী ছিল তাদের উপর নৃশংস অত্যাচার চলে।[৮৫৩] সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন মেদিনীপুরের কৃষক ঘরের মেয়ে মাতঙ্গিনী হাজরা। সত্যাগ্রহী আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারী ব্যাপকভাবে কারাভোগ করেন। এ সময় অন্যান্য রাজনৈতিক মহিলা কয়েদিদের মধ্যে ছিলেন সরযূগুপ্তা, উষাগুহ, সরমাগুপ্তা, কিরণ কুমারী, সরযুসেন, কিরণ রুদ্র, সুখলতা দাশগুপ্তা, শ্যামলা সূত্রধর, বাসন্তী দাশগুপ্তা, অমিয়বসু এবং হেমাঙ্গিনী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী বিষয় ছিল যে, অমিয় বসু দুগ্ধপোষ্য শিশু কোলে নিয়েই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন এবং বাচ্চাকে সাথে নিয়েই কারাবাস করেন। আবার হেমাঙ্গিনী দেবী ছিলেন রক্ষণশীল পর্দানশিন ব্রাহ্মণ পরিবারের বিধবা। কিন্তু দেশের ডাকে তিনি সমস্ত ভয়-ভাবনা মুহূর্তে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হননি। এসময় গণহারে নারীর কারাবরণ সম্পর্কে আশালতা সেন এক কবিতায় বলেন,

> নেমেছে সন্ধ্যা, লৌহ-কপাট বন্ধ হয়েছে এবে,
> বন্দিনী মম সঙ্গিনীদল, শুনি মহা কলরবে,
> কোলাহলময় করিয়া তুলেছে রুদ্ধ পাষাণ কারা,
> পাষাণ শিলার বেষ্টনে যেন রুদ্ধ নিঝর ধারা।
> ...
> এসেছে প্রবীণা, এসেছে নবীনা, এসেছে বালিকা মেয়ে
> ...
> আমি বসে’ দেখি চেয়ে
> দুঃখ ভরা বুক আনন্দে ভাসে, গৌরবে যায় ছেয়ে।[৮৫৪]

সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী মেয়েদের মধ্যে হিন্দু নারীর সংখ্যা বেশি হলেও স্বল্প সংখ্যক মুসলিম নারী এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম মেয়েদের মধ্যে জোবেদা খাতুন ছিলেন অন্যতম। প্রথম জীবনে জোবেদা খাতুন সিলেটে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে নানা সভায় অংশগ্রহণ করে তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বিকাশলাভ করে। উল্লেখ্য, ১৯২৮ সালে প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে জোবেদা খাতুন কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে

---

[৮৫৩] *ঐ*, পৃ. ২৪

[৮৫৪] *ঐ*, পৃ. ২৫

অংশ নেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে অন্যান্য নারীর সাথে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তবে মুসলিম নারী হওয়ার কারণে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য এসময় ৬০ জন নারীকে বন্দি করা হয় বলে জানা যায়। জোবেদা খাতুন ১৯৩০ সালে সিলেটে কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মহিলা শ্রীহট্ট সংঘে'র সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।[৮৫৫] অন্য একজন মুসলিম নারী দৌলতননেছা আইন অমান্য আন্দোলনে সভা-সমিতি ও মিছিলে অংশগ্রহণ করে সাহসিকতার পরিচয় দেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯৩২ সালে 'গাইবান্ধা মহিলা সমিতি' গঠন করে বামুনডাঙ্গা, সুরতখালি, বিজয়ডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, কূপতলা, তুলসীঘাট, ফুলছড়ি প্রভৃতি জায়গার মেয়েদের ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করেন। এ সময় তিনি কয়েকবার কারাবরণও করেন।

পূর্ব বাংলার ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভ্রাতুষ্পুত্রী কবি হোসনে আরা বেগম (১৯১৬-১৯৯৮) কলকাতা ময়দানে ১৯৩২ সালে মেয়েদের একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর দলের সদস্য রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।[৮৫৬] এছাড়া ঢাকার শামসুন নেসা বেগম (গোলাম জিলানীর মা), রওশন আরা বেগম (গোলাম জিলানীর স্ত্রী), রাইসা বানু (আসফ আলী বেগের স্ত্রী) ও বদরুন নেসা বেগম (আকতার উদ্দীন হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী) সহ আরো অনেক নারী অহিংস সত্যাগ্রহী আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে বিক্রমপুরের ফুলবাহার বিবি (জন্ম ১৯১৬) কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখে বন্দি হন। অতএব দেখা যায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বাঙালি মুসলিম নারী অল্প সংখ্যক অংশগ্রহণ করেন। এর অন্যতম কারণ এ সময় তারা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে ছিলেন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় নানা কুসংস্কার দ্বারা এক প্রকার গৃহে বন্দি ছিলেন। সমাজ তাদেরকে বাইরের জগতে বের হতে নিরুৎসাহিত করতো। তারপরও যেসকল মুসলিম নারী এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তাদের একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপনের চিত্র ফুটে উঠে। অন্যদিকে হিন্দুদের সাথে একত্রিত হয়ে বিদ্রোহে অংশ নেওয়ায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মূলত মহাত্মা গান্ধীর বিপ্লবী ভাবধারার প্রতি বাঙালি নারীর মনোভাব দিন দিন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের

---

[৮৫৫] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯১

[৮৫৬] *ঐ*, পৃ. ৯২

আনন্দ মঠ উপন্যাসে মাতৃবন্দনা তথা দেশপ্রেমের জয়গানে বাঙালি পুরুষের পাশাপাশি নারী বিপ্লবী আদর্শে উজ্জীবিত হন। তবে বাংলার নারী বিপ্লবী আন্দোলনে প্রথমাবস্থায় প্রত্যক্ষ ভূমিকায় আসেননি। প্রথম পর্বে অনেক নারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবী পুরুষকে আশ্রয় দেওয়া, পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আদান-প্রদান করা, বিপ্লব সংশ্লিষ্ট গোপন কাগজপত্র সংরক্ষণ করা, সংগ্রাম পরিচালনায় তহবিল সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদি কাজ করেছেন।[৮৫৭] কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ পর্যায়ে এসে বাঙালি মেয়েরা ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে অত্যন্ত উৎসাহবোধ করে। বিপ্লবী কাজের জন্য মেয়েদেরকে রাস্তায় নেমে পিকেটিং করা, পুলিশের হাতে নির্যাতনের শিকার হওয়া, কারাবরণ করা প্রভৃতি কষ্ট সহ্য করতে হয়। এক কথায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেয়েরা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, আবার অনেক সময় বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে চিরায়ত সংস্কার ছেড়ে গোপন কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিপ্লবীদের স্ত্রীর ভূমিকায় কাজ করতেও দ্বিধা করেনি। উল্লেখ্য তখন বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনে নিয়োগকৃত ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা করে ব্রিটিশ প্রশাসনকে বিপদগ্রস্থ করা। বিপ্লবী পুরুষ এমন অনেক ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এমনকি ফাঁসির দণ্ডও ভোগ করেছে। বিপ্লবী দলের এরূপ কার্যক্রমে মেয়েরা অংশগ্রহণে সদিচ্ছা প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি।[৮৫৮]

আন্দোলনের এ পর্যায়ে বাংলার তরুণদের নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রগামী ভূমিকায় দেখা যায়, তবে প্রবীণরা যে একেবারেই এসব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি তা বলা যায় না। অন্যদিকে এসময় অনেক নারী পরিবারের রক্তচক্ষুর ভয়ে লুকিয়ে বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, আবার অনেকে পরিবারের শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আপনজনদেরকে বুঝিয়ে বিপ্লববাদী কাজে যোগদান করেছেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বীনা দাস *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের* সমাবর্তনে বাংলার গভর্ণর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করার আগে *ডায়াসিসন কলেজের* হোস্টেলে এসে উঠেন। অন্যদিকে বিপ্লবী কাজে অংশগ্রহণের জন্য কমলা দাশগুপ্ত পরিবার ছেড়ে মেয়েদের হোস্টেলে উঠেন।[৮৫৯] বীনা দাস এবং কমলা দাশগুপ্ত তাদের স্মৃতিকথায় এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

---

[৮৫৭] *ঐ*, পৃ. ৯৩

[৮৫৮] *ঐ*

[৮৫৯] রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৮

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার ছাত্রীরা বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে অন্যতম কুমিল্লার *ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের* ১৪ বছর বয়স্ক ছাত্রী সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষকে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনসনকে হত্যার দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গিয়ে তাকে হত্যা করে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। Stevens died on the spot and santi and suniti were taken to Comilla District Jail where they signed a statement admitting their guilt. Santi and Suniti wanted to become the first women martyrs and were angry to hear they would not be hanged but would instead to prison.[৮৬০] অন্যদিকে বরিশালের শান্তিসুধা ঘোষ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'শান্তি বাহিনী'। এ বাহিনীর মেয়েদেরকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হতো। আবার কুমিল্লায় 'ত্রিপুরা শান্তি সংঘ' গঠিত হয়। এ সময় কুমিল্লা যুগান্তর দলে যোগ দেন প্রফুল্ল নলিনী, উর্মিলা গুহ, নীলিমা নন্দী, শান্তি সেন, জাহানারা চৌধুরীসহ আরো অনেক নারী।[৮৬১] অন্যদিকে প্রতিভা ভদ্রের নেতৃত্বে কুমিল্লায় 'বিপ্লবী নারী অনুশীলন দল' গড়ে ওঠে। বৃহৎ পরিসরে বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় সরোজ আভা দাস ও পারুল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'মহিলা অনুশীলন সমিতি' গঠিত হয়।[৮৬২] এ সকল অনুশীলন দল বাঙালি নারীকে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে সংগঠিত করার কাজ করে।

পূর্ব বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের সাথে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সূর্যসেন, আম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, গণেষ ঘোষ ও নির্মল সেনকে নিয়ে গঠিত হয় 'বিপ্লবী পরিষদ'। সিদ্ধান্ত হয় চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলকে *Indian Republican Army* চট্টগ্রাম শাখা বলে অভিহিত করা হবে।[৮৬৩] সূর্যসেন ছিলেন এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। এভাবে চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা সংঘবদ্ধ হতে থাকে এবং বিপ্লবের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল ঐতিহাসিক যুব বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ বিদ্রোহে প্রথমদিকে নারীকে সদস্যপদে

---

[৮৬০] Raj Kumar, Rameshwari Devi, Romila Pruthi (eds.), *Women and the Indian Freedom Struggle*, Pointer Publishers, Jaipur, 2013, p. 39

[৮৬১] তীর্থ মন্ডল, *ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বীরাঙ্গনা (১৯০৫-৩৯)*, মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৬-২৭

[৮৬২] *ঐ*, পৃ. ২৮

[৮৬৩] কনক মুখোপাধ্যায়, "জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে অগ্নিযুগ মুক্তির সংগ্রামে নারী ও প্রীতিলতার অবদান", *অগ্নিযুগের দুই বিপ্লবী মৃত্যুঞ্জয়ী রোকেয়া ও প্রীতিলতা*, মালেকা বেগম (সম্পাদিত), ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২১-২২

অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও অচিরেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। অল্প সময়ের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ইন্দুমতি সিংহ, সাবিত্রী দেবী, কল্পনা দত্ত, কুন্দ প্রভা ও আয়শা বানু প্রমুখ নারী বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। আয়শা বানুকে 'সূর্যসেনের বিপ্লবী কন্যা' বলা হতো।

বাংলার বীর নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগ্রামে সশস্ত্র নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন। মাস্টারদা সূর্যসেনের পরামর্শক্রমে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত লীলানাগের *দীপালি সংঘে* যুক্ত হয়ে বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর প্রীতিলতা সমসাময়িক রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সুভাষ ঘোষের *Indian Republican Army*'র সদস্যপদে যোগদান করেন।[৮৬৪] তৎকালে বিপ্লবীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল চট্টগ্রামের *ইউরোপীয়ান ক্লাব*। এ ক্লাবে স্থানীয়দের ঢুকতে দেয়া হতো না ।[৮৬৫] এটি বিপ্লবীদের ঘৃণার উদ্রেক করে এবং তারা ক্লাবটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুট এবং জালালাবাদ ও ধলঘট সংঘর্ষ শেষ হলে পর পর দুইবার (১৯৩০-৩২ সালের মধ্যে) *ইউরোপীয়ান ক্লাবটি* আক্রমণ করে বিপ্লবীরা ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৯৩২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ২১ বছর বয়সী তরুণী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে তৃতীয় এবং শেষবারের মতো ক্লাবটিতে সফল আক্রমণ পরিচালিত হয়। এ প্রসঙ্গে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে প্রীতিলতার অন্যতম সহযোদ্ধা বীরেশ্বর রায় লিখেছেন, "সেদিন সকালে আক্রমণে যারা যাবে তারা সবাই মিলে মাস্টারদা ও ফুটুদাকে (তারকেশ্বর দস্তিদার) ঘিরে বসল। মাস্টারদা তখন ধীরভাবে জানালেন যে, সেদিনের অভিযানের নেত্রী হবেন প্রীতিলতা। তখন প্রীতিদি ভাইদের যোগ্যতার কথা ভেবে আপত্তি তুললে বাকি সবাই একবাক্যে প্রীতিলতাকেই আক্রমণকারী দলের নেত্রী হিসেবে মেনে নিলেন।"[৮৬৬] *ইউরোপীয়ান ক্লাব* আক্রমণকালে প্রীতিলতা যখন গুলিবিদ্ধ হন তখন সহযোদ্ধাদের ফিরে যাবার পথ সুগম করে দিয়ে তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে কোন উপায় না দেখে নিজের কাছে থাকা পটাশিয়াম সায়ানয়েড খেয়ে আত্মাহুতি দেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এভাবে প্রথমবারের মতো কোন নারী দেশ মাতৃকার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। প্রীতিলতা দেশের জন্য আত্মদান করে প্রমাণ করেন বাঙালি নারীর শক্তি ও সাহস পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

---

[৮৬৪] অধ্যাপক এম. এম. আকাশ, "বীরকন্যা প্রীতিলতা : আত্মপরিচয়ের সন্ধানে", *মাস্টারদা সূর্যসেন স্মারক বক্তৃতা-২০১৮*, রবিবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৩

[৮৬৫] Kalpana Dutt, *Chittagong Armoury Raiders Reminiscences*, Peoples Publishing House Private Limited, New Delhi, 1979, p. 82

[৮৬৬] চিত্রাদেব, "আঁধারপথে দিলাম পাড়ি মরণ স্বপন দেখে", *অগ্নিযুগের দুই বিপ্লবী মৃত্যুঞ্জয়ী রোকেয়া ও প্রীতিলতা*, মালেকা বেগম (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২

প্রীতিলতার অন্যতম সহযোগী কল্পনা দত্ত পুলিশী হয়রানি থেকে রক্ষা পেতে তখন সূর্যসেনের নির্দেশে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে পুনরায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করে পুরুষের বেশে জনৈক বিপ্লবীর সাথে কাজে যাবার পথে কল্পনা দত্তকে পুলিশে গ্রেপ্তার করে।[৮৬৭] উল্লেখ্য ১৯৩৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মাস্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসির খবর কল্পনা দত্ত জেলে বসেই শুনেন। ১৯৩৯ সালে কারামুক্ত হয়ে তিনি পুনরায় সংগ্রামী জীবন বেছে নেন। মূলত চট্টগ্রামের ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে বিপ্লবী নারীর বলিষ্ঠ অবদান ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। এ আন্দোলনে বিপ্লবী সত্ত্বা নারী সত্ত্বাকে অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, যা পরবর্তীতে বাঙালি নারীকে সশস্ত্র সংগ্রামে দুঃসাহসিক নেতৃত্ব গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।

সন্ত্রাসবাদী নেতারা চট্টগ্রাম বিপ্লবে ব্যর্থ হবার পর তারা ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রী তথা কমিউনিস্ট মতাদর্শে ঝুঁকে পড়েন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ১৯১৮ সালে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক পরিচালিত ও অন্যান্য আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় থাকে। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৩০-১৯৪২ সালের মধ্যে বাংলার নারী বামদল তথা কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। এ সকল নারীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলার কনক মুখোপাধ্যায়, বোম্বের (মুম্বাই) নার্গিস বাল্টিওয়ালা, পাঞ্জাবের পেরিন ভারুচা প্রমুখ। ১৯৩৬ সালে বাংলার ছাত্ররা গঠন করে 'Bengal Provincial Students Federation' এবং ১৯৩৯ সালে ছাত্রীরা গঠন করে 'The Bengal Provincial Girl's Student Association'।[৮৬৮] কনক দাশগুপ্ত ছিলেন এ ছাত্রী সংগঠনের প্রথম সম্পাদক। প্রথমদিকে মেয়েরা ছাত্রী সংঘের মাধ্যমে কমিউনিস্ট ভাবধারায় দীক্ষা গ্রহণ করতে থাকে এবং তারা রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি জানায়। এ সময় লতিকা ঘোষ, কমলা চ্যাটার্জী, কনক মুখার্জী, শান্তি ঘোষ (সরকার), গীতা মুখার্জী, মণিকুন্তলা সেন, কল্যাণী মুখার্জী, প্রীতি লাহিড়ী, ইন্দুসুধা ঘোষ, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, কল্পনা দত্ত (যোশী) এবং মার্কসবাদী সুনীতি চৌধুরী ও সুধারায় সহ প্রমুখ নারী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্রীদের সংগঠিত করার কাজ করতেন।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে জলপাইগুড়ির লায়লা সামাদ, বর্ধমানের মাকসুদা বেগম ও রাবেয়া খাতুন, কলকাতার নাজিমুন্নেসা প্রমুখ মুসলিম নারী কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ

---

[৮৬৭] মালেকা বেগম, *সূর্যসেনের স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী নারীদের কথা*, প্যাপিরাস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪৮

[৮৬৮] সরোজ মুখোপাধ্যায়, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১২২; আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৩

সকল মেয়েদের অনেকে কৃষক-শ্রমিকদের সাথে তাদের অধিকার আদায়ে কাজ করেন। উল্লেখ্য ত্রিশের দশকে চব্বিশ পরগণার জুটমিল কর্মী দুখমন বিবি ও রাইস মিল কর্মী গুলবাহার বিবি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যুক্ত হন।[৮৬৯] অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় রংপুর ও দিনাজপুর এলাকার বেশ কয়েকজন নারী কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে দৌলতননেছা অন্যতম। তৎকালে আরো যে সকল নারী শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন তাদের মধ্যে সন্তোষ কুমারী (চটকল শ্রমিকদের সাথে কাজ করেন), প্রভাবতী (কলকাতায় জমাদার এবং ধাঙড়দের মধ্যে কাজ করেন), সুধারায় এবং মৈত্রেয়ী বসু (বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেন) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বীণা দাস, পদ্মিনী সেনগুপ্ত, বিমল প্রতিভা দেবী সহ আরো অনেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৪০ সালে ছাত্র ফেডারেশনের আয়োজনে লক্ষ্মৌতে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রেণুরায় চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সরোজিনী নাইডু। এখানে ছাত্রীদের নানা দাবি-দাওয়া যুক্তিসম্মত উপায়ে তুলে ধরা হয়। নারী জীবনের নানাদিক তথা সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদে নারী পুরুষের সমঅধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ বিষয়ে প্রস্তাবনা গৃহীত হয়।[৮৭০] এ সম্মেলন বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য সম্মেলনটি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের বলিষ্ঠতা প্রমাণ করে।

সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন অভিজাত মুসলমান পরিবারের সন্তান সাকিনা মুইদজাদা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সাকিনার বাবা আগা মুইদজাদা পারস্যে (বর্তমান ইরান) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন।[৮৭১] ফলে সহজেই অনুমান করা যায় সাকিনা মুইদজাদার রক্তে ব্রিটিশ বিরোধী ভাবধারা মিশে ছিল। সাকিনা শ্রমিকদের সাথে সহজেই মিশে যেতেন এবং তাদের বস্তিতে গিয়ে সমস্যার কথা শুনতেন এবং তা প্রতিকারে নানা কৌশল অবলম্বন করে শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতেন। ১৯৪০ সালের ২৬ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত সাকিনা মুইদজাদার নেতৃত্বে ধাঙড়রা বেতন বৃদ্ধি, মহার্ঘভাতা, ছুটি, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির দাবিতে ধর্মঘট করে।[৮৭২] ১৮০০০ শ্রমিকের অংশগ্রহণে এ ধর্মঘটে পুলিশের নির্যাতন ও গুলিবর্ষণ শুরু হয়। এ সময়

---

[৮৬৯] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১০

[৮৭০] কনক মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪; রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৯

[৮৭১] আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৪

[৮৭২] রেণু চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০)*, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৫৪

সাকিনা মুইদজাদা পুলিশী অত্যাচারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য দেন। শেষ পর্যন্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী সহজানন্দ সহ আরো কতিপয় বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদের প্রচেষ্টায় এবং শ্রমিকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এ ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য ধাঙড় ধর্মঘটের পর ১০,০০০ শ্রমিক নিয়ে সাকিনা মুইদজাদার সভাপতিত্বে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়।[৮৭৩] তৎকালে সাকিনা মুইদজাদা শ্রমিকদের মাঝে নেতা হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

অবিভক্ত বাংলার বামপন্থী আন্দোলনে অন্য একজন সক্রিয় নেত্রী ছিলেন মণিকুন্তলা সেন (১৯১১-১৯৮৭)। তিনি ১৯৪২ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং সার্বক্ষণিক মাসিক বৃত্তিভোগী কর্মী নিযুক্ত হন। মণিকুন্তলা সেন পরম নিষ্ঠার সাথে বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরে পার্টি সংগঠন মজবুত করেন এবং ফ্যাসিস্ট বিরোধী প্রচারের পাশাপাশি মহিলা সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনি একদিকে নারীকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন আবার কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের বিরোধিতা করতে গিয়ে তথাকথিত জাতীয়তা বিরোধী ভূমিকা পালন করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন।[৮৭৪] প্রকৃতঅর্থে দক্ষ সংগঠক মণিকুন্তলার মধ্যে ছিল এক অসাধারণ ক্ষমতা, যা দ্বারা তিনি সহজেই ছাত্র ও যুবকদের সাথে এবং বিভিন্ন পরিবারের অন্তঃপুরবাসী মেয়েদের সাথে অতি সহজেই যোগাযোগ করতে পারতেন। তৎকালে সরকার বিরোধী নানারকম কর্মতৎপরতার কারণে মণিকুন্তলাকে কয়েকবার কারাবরণও করতে হয়েছে। তাঁর রাজনীতির ক্ষেত্র কলকাতা হলেও তিনি বরিশালের মেয়ে হওয়ার কারণে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মণিকুন্তলার একচেটিয়া স্থান ছিল। এভাবে বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলিম নারী এক অনবদ্য ভূমিকা রাখে, যা বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলনকে পরিণতির দিকে নিয়ে আসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) শুরু হলে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে। তখন জাতীয় নেতৃবৃন্দ মতামত প্রদান করে যদি ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের স্বাধীনতা প্রদান করে তবেই তারা ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু ইংরেজ সরকার এ দাবি মেনে না নেওয়ায় মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন।[৮৭৫] উল্লেখ্য এক বছর (১৯৪০-১৯৪১) চলার পর মহাত্মা গান্ধী এ আন্দোলনটি বন্ধ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট কংগ্রেসের এক সম্মেলনে মহাত্মা

---

[৮৭৩] অদিতি ফাল্গুনী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০

[৮৭৪] নির্বাণ বসু, “মণিকুন্তলা সেন (১৯১১-৮৭) রাজনীতির ভিতরে ও বাইরে”, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৫-৩৬॥ ১৪১৯-২১/মে-২০১৫, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি*, ঢাকা, পৃ. ২৩৯-২৫৬

[৮৭৫] রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮

গান্ধী 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব ঘোষণা করেন।[৮৭৬] তিনি বলেন "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" (Do or die)। এসময় ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলে মহাত্মা গান্ধীসহ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। ফলে এসকল নেতাদের মুক্তির লক্ষ্যে গণ-আন্দোলন শুরু হয় যা ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এক দুর্বার সংগ্রাম। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং পুরুষের সাথে নারীও এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। গান্ধীসহ অন্যান্য জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবিতে সমগ্র বাংলায় সভা-সমিতি ও মিছিলে নারী অংশ নেয়। 'মুসলিম আত্মরক্ষা লীগ' গঠন করে মুসলিম নারী 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র সাথে একযোগে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।[৮৭৭] এ সময় ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ব্যবসায়ী-পেশাজীবী, কৃষক-শ্রমিকসহ আপামর জনগোষ্ঠী ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বদেশভূমি উদ্ধার আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মনিয়োগ করে। সর্বত্র ব্যাপক বিদ্রোহে ব্রিটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে *All India National Congress* কে বে-আইনী সংগঠন ঘোষণা করে, সভা-সমিতি নিষিদ্ধ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে। প্রতিবাদে বাংলার নারী-পুরুষ বিদ্রোহীরা রেললাইন তুলে ফেলাসহ, রেলওয়ে স্টেশন ও পোস্ট অফিস জ্বালিয়ে দেয়, সরকারি শস্যের ঘাঁটি লুট করে, টেলিগ্রাফ ও ট্রামের তার কেটে দেয় এবং সরকারি রসদবাহী যুদ্ধ ট্যাংক ধ্বংস করে। অন্যদিকে কৃষকরা বহু জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেয় এবং ছাত্ররা সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ বন্ধ করার জন্য পিকেটিং করে। তখন বিপ্লবীদের সাথে শত শত নারী দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রত্যয়ে পুলিশের গুলির সম্মুখে এগিয়ে এসেছেন। তারা স্বামী, সন্তান ও পরিবারের মায়া ত্যাগ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পুলিশ ফাঁড়ি (থানা) আক্রমণ করলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে। এ সময় মাতঙ্গিনী হাজরা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে সবার সামনে এসে উচ্চস্বরে বলেন, "করবো অথবা মরবো, হয় জয় না হয় মৃত্যু"। ঠিক এ সময় পুলিশ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। জাতীয় পতাকা উঁচুতে রেখে তিনি ভুলুণ্ঠিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[৮৭৮] অন্যদিকে মহীয়সী নারী আশালতা সেন ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ছয়মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন।[৮৭৯] এভাবে ১৯৪২-১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুই বছর ধরে জাতীয় সরকার গঠন করার লক্ষ্যে অসংখ্য নারী অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। উল্লেখ্য

[৮৭৬] কমলা দাশগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫

[৮৭৭] আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১২

[৮৭৮] আশালতা সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬

[৮৭৯] *ঐ*, পৃ. ৩১

১৯৪৪ সালে ভারতের পূর্ব সীমান্তে সুভাষচন্দ্র বসু 'ঝাঁসীর রানী বাহিনী' নামক একটি নারী বাহিনী গঠন করেন। মেয়েদের বিভিন্ন অধিকার রক্ষার দাবি এবং জাতীয় আন্দোলনে এ বাহিনীর সদস্যরা অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর দেখা দেয়। মূলত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়ের দাম হঠাৎ অনেক বৃদ্ধি পায় যা একশ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের সৃষ্ট কারসাজি। এ সময় অন্নের অভাবে চারিদিকে হাহাকার পড়ে যায়, একের পর এক মানুষের মৃত্যু হতে থাকে। অনুমান করা যায় যে, এই মন্বন্তরে ৩৫ লাখ লোকের মৃত্যু হয়, অবশ্য সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংখ্যা ১৫ লাখ।[৮৮০] এ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় পুরুষের সাথে নারীও একযোগে কাজ করেন। এক্ষেত্রে *মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি* ও *মুসলিম লীগ মহিলা সমিতি*র নারী সদস্যরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বলে জানা যায়।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে সংঘটিত বাংলার কৃষক আন্দোলনে গ্রামীণ সমাজের মেয়েরা আন্দোলন পরিচালনা, শত্রু মোকাবেলা, সংগঠন গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি সশস্ত্র সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নারী সংঘবদ্ধভাবে টংক (ধান কড়ারি খাজনা, ধান উৎপাদন না হলেও কৃষক কড়ার ধান জমিদারকে দিতে বাধ্য থাকতো এবং এ ধরণের জমিতে কৃষকের স্বত্ব থাকতো না), নানকার (এক প্রকারের অর্থদাস প্রথা, সামান্য জমি ও আশ্রয়ের পরিবর্তে জমিদার বাড়িতে সারাবছর নানকার প্রজাদের বেগার খাটতে হতো) এবং তেভাগা (উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ কৃষকের এবং এক ভাগ জমিদার/জোতদার পেত) এ তিনটি আন্দোলনে বাংলার গ্রামীণ নারীর একটি বড় অংশকে সংগঠিত করা হয়।[৮৮১] কারণ দীর্ঘদিন ধরে বাংলার প্রান্তিক কৃষকরা জমিদার ও জোতদারদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও অত্যাচার সহ্য করেছে। বাংলার ভূমিহীন ভাগ চাষীরা ফসল উৎপাদনের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ ও শ্রম দিয়ে ফসলের যে অংশ পেত সেখানেও জমিদার ও জোতদাররা ভাগ বসাতো। এ সময় জোতদাররা খোলা চাঁছা, গোলপূজা, মহলদারী, বরকন্দাজী, মণ্ডপ, সেলামী, হাতিখোয়া, ঘোড়াখোয়া, সন্ন্যাসী খোয়া (এদের খাওয়ানোর খরচ), পালা-পার্বণ, যাত্রা-থিয়েটারের খরচ এবং কর্জ করা ধানে দেড় বা দুই গুণ সুদ (কৃষক কর্তৃক কর্জ করা) বাবদ বাড়তি ধান কৃষকের কাছ থেকে আদায় করতো।[৮৮২] আবার

---

[৮৮০] শাহানারা হোসেন, *বেলা শেষের পাঁচালি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৮-২৯

[৮৮১] আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৭

[৮৮২] কল্যাণী বন্দোপাধ্যায়, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ*, (নিম্নবর্গের নারীর আর্থ সামাজিক অবস্থান), ম্যানস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, হাওড়া, ২০০০, পৃ. ১৫২

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অথবা অন্যকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল উৎপন্ন না হলেও কৃষককে খাজনা থেকে রেহায় দেওয়া হতো না। উপরন্তু কৃষকের উপর নানা নির্যাতন করা হতো এবং পরিবারের নারী সদস্যদের উপরও নিপীড়ন করা হতো। দীর্ঘদিন ধরে জোতদারের শাসন, শোষণ, নির্যাতন ও ধর্ষণের ফলে কৃষক নারীর মনে যে ক্ষোভ জমাটবদ্ধ হয়েছিল তা এ সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছিল।

চল্লিশের দশকে আদিবাসী হাজং জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে গড়ে উঠে টংক বিরোধী আন্দোলনের নামে কৃষক বিদ্রোহ। এ আন্দোলনের মূল দাবি ছিল টংক প্রথা উচ্ছেদ এবং জমির উপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বকেয়া টংক মওকুফ করে দেওয়া। এ বিদ্রোহের মূল স্লোগান ছিল 'জান দেবো তবু ধান দেবো না'।[৮৮৩] টংক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন রাশিমনি হাজং। ১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারি নেত্রকোণা জেলার বহেরাতলী গ্রামের নিকট রাশিমনি হাজং এর নেতৃত্বে নারী গেরিলা বাহিনী এবং সুরেন্দ্র হাজং এর নেতৃত্বে পুরুষ গেরিলা বাহিনীর এক সভা একত্রিতভাবে চলাকালীন সময়ে খবর আসে তৎকালীন Eastern Frontieer বাহিনীর (ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী) কতিপয় সদস্য বহেরাতলী গ্রামে ঢুকে সদ্য বিবাহিত নববধূ কুমুদিনী হাজংকে জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। খবরটি শোনামাত্র রাশিমনি দলবল নিয়ে কুমুদিনীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে বাটুল, গুলাই, বল্লম, বেও, রামদা, পাথর ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৮৮৪] উল্লেখ্য যে, রাশিমনি তার হাতে থাকা রামদা দিয়ে কুপিয়ে দু'জন ব্রিটিশ সৈন্যকে হত্যা করে কুমুদিনীকে রক্ষা করেন। কিন্তু হঠাৎ একজন ব্রিটিশ সৈন্যের গুলিতে রাশিমনি হাজং এবং সহযোদ্ধা সুরেন্দ্র হাজং সেখানে সম্মুখ লড়াইয়ে শহীদ হন। এভাবে নিঃসন্তান সমাজসেবী রাশিমনি হাজং টংক আন্দোলনে মহিলা গেরিলা বাহিনীর দুঃসাহসিক নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়েছেন। পরবর্তীতে টংক আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নিয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। অন্যদিকে সমসাময়িক সময়ে সিলেটের নানকার মেয়েরা এক প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য বিশ শতকের ত্রিশের দশকে সিলেটের মণিপুরী মেয়েরা মৌলভীবাজার মহাকুমার (বর্তমান জেলা) ভানুবিল এলাকায় জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে।[৮৮৫]

বাংলার কৃষক আন্দোলনের আরেকটি অধ্যায়ের নেতৃত্ব দেন তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলামিত্র। ইলামিত্র সাঁওতালদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে (১৮৫৫-৫৬ খ্রি.)

---

[৮৮৩] সেলিনা হোসেন, "ইতিহাসের পথযাত্রায় নারীর প্রতিরোধ", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা-২০১৬*, ২৩ নভেম্বর ২০১৬, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৪

[৮৮৪] *ঐ*, পৃ. ৫

[৮৮৫] অদিতি ফাল্গুনী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫

পূর্ববাংলায় আরো একবার সাঁওতালরা ব্রিটিশ কর্তৃক সৃষ্ট জমিদার ও মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তৎকালে সাঁওতাল নারীর উপর পাশবিক অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া যায়।[৮৮৬] ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাদেশিক পরিষদের কৃষক সভায় তেভাগার দাবির প্রেক্ষিতে রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি মোট ১৩টি জেলায় কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। তৎকালে যে সকল দাবির প্রেক্ষিতে আন্দোলন শুরু হয় তা হলো- ১. উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগের পুরোটাই কৃষককে দিতে হবে। ২. জমিতে ভাগচাষীদের দখলদারিত্ব দিতে হবে। ৩. শতকরা সাড়ে বারো ভাগের বেশি অর্থাৎ মনকরা ধানে পাঁচ সেরের বেশি সুদ হবে না। ৪. বিভিন্ন প্রকারের আবোয়াব বন্ধ করতে হবে। ৫. রসিদ ছাড়া কোন ভাগ দেওয়া হবে না। ৬. আবাদযোগ্য পতিত জমিতে চাষাবাদ করতে হবে। ৭. জোতদারের পরিবর্তে ভাগচাষীদের খোলানে (আঙ্গিনায়) ধান তুলতে হবে।[৮৮৭] উল্লিখিত দাবিগুলির ভিত্তিতে সেদিন বাংলায় যে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয় তাতে তেভাগার পক্ষে 'আধি নয় তেভাগা চাই', 'নিজ খোলানে ধান তোলো', 'জমিদারি জুলুম চলবে না', 'চাষীর হাতে জমি চাই', 'খাজনার বদলে আয়কর চাই', 'আট ঘন্টার বেশি খাটুনি নাই', 'দালালরা হুশিয়ার, মজুর হও তৈয়ার' প্রভৃতি স্লোগানে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়।[৮৮৮]

তৎকালীন কৃষক বিদ্রোহে যে সকল নারী অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দীপেশ্বরী, যিনি ঠাকুরগাঁওয়ের কৃষক বিদ্রোহে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য দীপেশ্বরীর সাথে ঠাকুরগাঁওয়ের জয়মণি ও দিনাজপুরের আরো অনেক নারী কৃষক বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন। অন্যদিকে পূর্ববাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর জেলার নড়াইলের (বর্তমান জেলা) দোগাছা, বাকড়ি, ঘোড়ানাচ, কমলাপুর, হাতিয়ারা, গুয়াখোলা, বেলাহাটি প্রভৃতি এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ জোরদার হয়। তখন গুয়াখোলা গ্রামের সরলাবালা পাল শত শত মহিলাকে নিয়ে 'ঝাঁটা বাহিনী' গঠন করেন।[৮৮৯] অত্যন্ত সাহসী ও কৌশলী কৃষক নারী সরলাবালা পাল ঝাঁটা বাহিনী নিয়ে বহুবার পুলিশ বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তীতে সরলাবালা পাল ১৯৪৮ সালে সুন্দরবন অঞ্চলের চন্দনা পিঁড়ি গ্রামের অহল্যা, উত্তমী, সরোজিনী ও বাতাসী সহ ১৬-১৭ জন মেয়ের একটি জঙ্গী দল দা, বটি, ঝাঁটা ও তীর-ধনুক

[৮৮৬] আবদুল বাছির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯

[৮৮৭] সেলিনা হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬

[৮৮৮] সুস্নাত দাস, *অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনা-পুনর্বিচার*, নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৫০; মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, *নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সমকালীন রাজনীতি ও ইলামিত্র*, উত্তরণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১১৬-১১৭

[৮৮৯] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭

হাতে নিয়ে ৩৬ জন রাইফেলধারী গুর্খা সৈন্যের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য সমসাময়িক সময়ে ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলেও কৃষক বিদ্রোহ হয় বলে জানা যায়।

বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরবঙ্গের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল এলাকায় কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন রমেন মিত্র ও ইলামিত্র। ১৯৪৮-৪৯ সালে উক্ত এলাকার আন্দোলনে সাঁওতাল নারী অমানুষিক জুলুম, অত্যাচার, ধর-পাকড় ও কারাবরণের স্বীকার হয়। ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি নাচোল উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের উপর পুলিশী নির্যাতন শুরু হয়। ইলামিত্রের নেতৃত্বে এখানে সাঁওতালরা ব্যাপক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।[৮৯০] কিন্তু ৭ জানুয়ারি রোহনপুর স্টেশনে পুলিশের হাতে ইলামিত্র ধরা পড়েন। তিনি জেলখানায় যে অবর্ণনীয় অত্যাচার, শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষণের স্বীকার হন তা ইতিহাসে যেকোন কালের বর্বরতাকে হার মানায়। পরবর্তীতে ইলামিত্রের দেওয়া এক লোমহর্ষক জবানবন্দিতে সে সব নির্যাতনের চিত্র জনসম্মুখে উঠে আসে। তৎকালে অন্যান্য যে সকল নারী বাংলার কৃষক বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে বীরত্ব দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে বালিয়াডাঙ্গির জয়মণি ও রোহিণী, রানী সংকাইলের তাঞ্চানী, বীরগঞ্জের ফুলেশ্বরী, সেতাবগঞ্জের ভুত্বেরী, ফুলখড়ির বুধমনি ও যমুনা, দেবীগঞ্জের বুড়িমা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে উল্লেখ্য বাংলার কৃষক বিদ্রোহে হিন্দু নারীর সাথে মুসলিম পর্দানশীন মেয়েরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। কেননা এ সময় গ্রামীণ কৃষক সমাজের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। এ বিদ্রোহে মুসলিম মেয়েদের সাথে হিন্দু নারী একযোগে অংশ নেয় এবং স্লোগান দেয় 'হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই'।[৮৯১] পূর্ব বাংলায় তেভাগা, টংক ও নানকার আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। যথা-

১. ব্যাপকভাবে মেয়েদের অংশগ্রহণ
২. নারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন (ঝাঁটা বাহিনী, লাঠি বাহিনী, নারী বাহিনী)
৩. নারী হামলার বিরুদ্ধে মেয়েদের দৃঢ় প্রতিরোধ লড়াই
৪. নারীর পাল্টা আক্রমণে পুলিশ সাময়িকভাবে পর্যদুস্ত ও পরাজিত, গ্রেপ্তারের হাত থেকে সহকর্মীকে উদ্ধার
৫. মেয়েদের নিজস্ব হাতিয়ার-দা, বঁটি, ঝাঁটা, লাঠি প্রভৃতি শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার

[৮৯০] ইলামিত্র ও তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫-১৬৯

[৮৯১] Peter Custers, *Women in the Tebhaga Uprising*, Naya Prokashan, Calcutta, 1987, pp. 122

৬. নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা নানা কৌশল নির্ধারণ ও কৌশলসমূহের প্রয়োগ, যেমন- শঙ্খ ও ঘন্টা বাজিয়ে শত্রুর আগমনবার্তা সম্পর্কে সবাইকে সংকেত প্রদান, গোপনে নেতা কর্মীদের পালিয়ে যাওয়া, লুকিয়ে রাখার কৌশল
৭. কৃষকদের মাঝ থেকে শক্তিশালী ও সাহসী নারী নেতৃত্বের বিকাশ
৮. পুরুষের অনুপস্থিতিতে মেয়েদের ঐক্যবদ্ধ একক ভূমিকা, গ্রেপ্তারের হাত থেকে সহকর্মীকে রক্ষা করা
৯. মেয়েদের বীরোচিত আত্মদান
১০. সামগ্রিকভাবে সংগ্রামী নারীসমাজের অতুলনীয় সাহস, দৃঢ়তা, তীক্ষ্ম উপস্থিতবুদ্ধি, কৌশল, উদ্ভাবনী শক্তি, পারস্পারিক সহমর্মিতা ও ঐক্য
১১. নেপথ্যে থেকে কৃষককর্মীদের ভাত রেঁধে খাওয়ানো, পালাতে ও লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করা, অসুখে সেবাযত্ন প্রভৃতি কাজে অসংখ্য নারীর ঝুঁকিপূর্ণ অংশগ্রহণ।[৮৯২]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলিম মেয়েরা অনেকটা পশ্চাতে ছিল। ১৯৩২ সাল থেকে মুসলিম মেয়েদের এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৪০ সালের পর এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। এতদসত্ত্বেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু নারীর তুলনায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ছিল অতি নগন্য। মুসলিম নারীর পশ্চাৎপদতার কারণের মধ্যে ছিল তাদের শিক্ষার অভাব, পর্দা ও অবরোধপ্রথার কঠোরতা, সামাজিক বিধি-নিষেধ ইত্যাদি। অন্যদিকে ভারতীয় আন্দোলনগুলিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারা তীব্রভাবে গেঁথে থাকায় এবং প্রায় সকল আন্দোলনে মাতৃদেবী হিসেবে কালীর বন্দনা প্রচলিত থাকা ও বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির সুতা ও রাখিবন্ধনের প্রচলন ছিল। তাই মুসলমান সমাজের মেয়েরা নিজেদের ধর্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে হিন্দুদের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত হতো।[৮৯৩] তবে মুসলমান মেয়েদের অনেকে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের ভক্ত ছিলেন। আবার মাতৃভূমি রক্ষার প্রয়োজনে এবং শত্রুমুক্ত করার

---

[৮৯২] হেনাদাস, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৫১

[৮৯৩] বিপিনচন্দ্র পাল জাতীয়তাবাদী কর্মসূচিতে কালীদেবী ও শিবাজি উৎসবের প্রচলন করেন। বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে তৎকালে শাক্ত দর্শনের ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। চিত্তরঞ্জন দাস বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। এভাবে বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ বিদ্যমান ছিল। (Rajat Kanta Roy, *Social Conflict and Political Unrest in Bengal 1875-1927*, Oxford University Press, Delhi, 1947, p. 177; Subas Chandra Bose, "An Indian Pilgrim", Edited by Sishir Bose, *Netaji Collected Works*, Vol. I, Calcutta, 1980, pp. 37-46)

লক্ষ্যে মুসলিম নারী হিন্দুদের সাথে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাকে ইসলামের পরিপন্থী মনে করেনি। তাই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী বিভিন্ন বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে।

ভারতবর্ষে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এবং নারীকে সংগঠিত করার জন্য কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি নিজ নিজ দলের মেয়েদের মধ্যে সমিতি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল। মূলত বিশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের ধারা গড়ে ওঠে। এ সময়ের মধ্যে *কংগ্রেস মহিলা সংঘ*, *মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি*, *মুসলিম লীগ মহিলা সমিতি*, *হিন্দু মহাসভা মহিলা সমিতি*, *নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন*, *খ্রিস্টান মহিলা সমিতি* সহ নানা সমিতি গড়ে ওঠে। এসব সমিতির অধিকাংশের কার্যক্রম ইতোমধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য বিশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত সবচেয়ে বৃহৎ এবং কার্যকরী মহিলা সংগঠন ছিল *নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন*[৮৯৪] (১৯২৬ সালে কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)। এ সময় পর্যন্ত সম্মেলনটিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন সরোজিনী নাইডু, রেণুকা রায়, কমলা দেবী, বেগম হামিদা আলী প্রমুখ নেত্রী। অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মেয়েদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৩৮ সালে 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' গঠিত হয়। তবে সমসাময়িক মুসলিম নারীর মধ্যে 'মুসলিম লীগ মহিলা সমিতি'র প্রতি আকর্ষণ বেশি ছিল। ১৯৩৯ সালে কমলা চ্যাটার্জী, মণিকুন্তলা সেন, শান্তি ঘোষ, কল্পনা দত্ত প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'রাজবন্দিদের মায়েরা' নামক সংগঠন।[৮৯৫] আবার কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আসা কমিউনিস্ট মেয়েদের সফলতায় আকৃষ্ট হয়ে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহর সহযোগিতায় লেডি আবদুল কাদির, ফাতিমা বেগম এবং মিস এম. কোরেশীর নেতৃত্বে গঠিত হয় *মুসলিম লীগ মহিলা সমিতি*।[৮৯৬] স্বামী সরকারি চাকুরীজীবী হওয়ায় নানারকম বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ এসময় রাজনীতিতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করে সাহসিকতার পরিচয় দেন। তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা এবং সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা ছিল অসাধারণ। তাঁর প্রচেষ্টায় মুসলিম নারী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে অনুপ্রাণিত হয়। উল্লেখ্য ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে *মুসলিম লীগ মহিলা সমিতি*তে যারা নেতৃত্বের ভূমিকায় সক্রিয় ছিলেন তাদের মধ্যে শামসুন নাহার মাহমুদ, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, দৌলতননেছা প্রমুখের নাম অগ্রগণ্য।

---

[৮৯৪] কনক মুখোপাধ্যায়, *ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা*, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৫

[৮৯৫] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯-১১০

[৮৯৬] Shaista Ikramullah, *From Purdah to Parliament*, Cresset Press, London, pp. 70-71

অন্যদিকে বাঙালি মুসলিম নারীর মর্যাদা রক্ষা ও সমঅধিকারের আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে চল্লিশের দশকে মুসলিম মহিলা সমিতিগুলি একযোগে কাজ করে। বিভিন্ন প্রদেশে নারী কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় *প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।* এ সমিতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় বহু মহিলা সমিতি গঠন করে এবং সবশেষে কেন্দ্রিয় সংগঠনের সাথে একীভূত হয়ে ১৯৪৩ সালে এক সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয় *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।*[৮৯৭] এ সংগঠনে প্রথম থেকে পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করেন ইন্দ্রিরা দেবী চৌধুরাণী (প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি), লীলা মজুমদার, নেলী সেনগুপ্তা, রানী মহলনবিশ, প্রভাবতী দেবী, স্বরস্বতী, আর্যবালা দেবী প্রমুখ প্রতিথযশা নারী।[৮৯৮] এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল দেশরক্ষা করা, জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য কাজ করা, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করা, দুর্ভিক্ষে মৃতপ্রায় জনগণকে রক্ষা করা, নারীকে মর্যাদার সাথে জীবনযাপনে সহযোগিতা করা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিষ্ঠার সাথে কাজ করা প্রভৃতি। উল্লেখ্য ১৯৪২ সালে ৯ আগস্ট মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হলে গান্ধীসহ অন্যান্য বন্দি নেতাদের মুক্তির দাবিতে *বঙ্গীয় প্রাদেশিক আত্মরক্ষা সমিতি* ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নওগাঁ, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, বরিশাল, মাদারীপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে সভা করে। অন্যদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের জন্য খাদ্য আন্দোলন, ভুখা মিছিল, লঙ্গরখানা পরিচালনা প্রভৃতি কাজ করে।

১৯৪৩ সালে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি একযোগে *বঙ্গীয় প্রাদেশিক আত্মরক্ষা সমিতির* উদ্যোগে ঐক্যবদ্ধ নারী আন্দোলন গড়ে তোলে। তখন কলকাতায় নাজিমুন্নেসা আহমেদের নেতৃত্বে ৫০০ মুসলিম নারী গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৪ সালে দিনাজপুরে *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি*র সম্মেলনে শাহজাদী বেগম, সবেদা খাতুন, মনিকুন্তলা সেন, নেলী সেনগুপ্তা, কল্পনা দত্ত, মনোরমা বসু, নিবেদিতা নাগ, রেণু চক্রবর্তী, যুঁইফুল রায়, কনক মুখার্জি, বীণাদাস গুপ্ত প্রমুখ নারী উপস্থিত ছিলেন।[৮৯৯] এ সমিতি পূর্ববাংলার বরিশালে মনোরমা বসুর নেতৃত্বে 'মাতৃমন্দির' নামক একটি নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করে। এভাবে *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি*র মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার নানা স্তরের নারী সমাজ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে নিজেদেরকে সংগঠিত করে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলনের

---

[৮৯৭] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৩; রেণু চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১

[৮৯৮] *ঐ*

[৮৯৯] রেণু চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩

পাশাপাশি বাঙালি নারী তাদের সামাজিক অধিকারের বিষয় নিয়েও এ সময় আন্দোলন করে। ১৯৪১ সালে বি. এন. রাও (Benegal Narsing Rau) কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৪৩ সালে পার্লামেন্টে বিবাহ ও সম্পত্তির বিল উত্থাপিত হয়। এ বিলে বিবাহ বিচ্ছেদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কিছুটা সংশোধনীর সুপারিশ করে। এখানে পিতৃ সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমানাধিকারের দাবি তোলা হয় এবং স্ত্রী বা স্বামী জীবিত থাকাবস্থায় উভয়ের জন্য পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়।[৯০০] তৎকালে বাংলার নারী নেত্রীরা এ বিলের পক্ষে আন্দোলন করে এবং আইনসভায় রেণুকা রায় এ বিলের পক্ষে মতামত প্রদান করে।

এভাবে ধীরে ধীরে বাংলার নারী নিজেদেরকে সংগঠিত করে সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা নির্ধারণ করে। আবার সাম্যবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ অনেক নারীকে সামাজিক চাপে রাজনীতি পরিত্যাগ করতে হয়। অন্যদিকে অনেক নারী অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে থেকেও সংগ্রামী জীবন বেছে নেন। এ সময় রাজনীতি সচেতন মুসলিম নারীর মধ্যে পর্দাপ্রথার শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য দিনাজপুরে ১৯৪৪ সালের ২৬ মার্চ *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি*র একটি সম্মেলনে শাহজাদী বেগম এবং শাহেদা খাতুনের নেতৃত্বে মুসলিম মেয়েরা বোরখা না পরে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।[৯০১] আবার কনক মুখার্জির সভাপতিত্বে ৮-৯ মে *রাজশাহী মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি*র সম্মেলনে প্রায় ৩৫০ জন মুসলিম নারী একইভাবে অংশ নেন। এভাবে বোরখা তথা প্রচলিত পর্দা ছাড়া মুসলিম মেয়েদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ তাদের দুঃসাহসিকতার প্রমাণ দেয়।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে (১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে) কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য এ সময় চট্টগ্রাম থেকে আইনসভায় নেলী সেনগুপ্তা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকা থেকে আশালতা সেন বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন।[৯০২] এ বছর ১৩ আগস্ট এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গা সম্পর্কে শাহানারা হোসেন (১৯৩৭-২০১৯) বলেন, "ভারতীয় মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটি ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা Direct Action Day উদযাপনের জন্য ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাংলার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার মূখ্যমন্ত্রী তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৬ আগস্ট ছুটির দিন ঘোষণা করেন। অবশ্য কয়েকদিন আগে থেকেই কলকাতায় থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। ১৬ আগস্ট সকালে মানিকতলা

---

[৯০০] রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৬

[৯০১] *ঐ*, পৃ. ২৪১

[৯০২] আশালতা সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩; মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭

বাজারে দোকানপাট বন্ধ করা নিয়ে গোলমাল শুরু হয়। মানিকতলার পর শোভাবাজার, শ্যামবাজার, বাগবাজার থেকে দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর, কালীঘাট ও টালীগঞ্জ এলাকায়। ঠিক এভাবে দাঙ্গা শুরু হয়ে অতি দ্রুত নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে'।[৯০৩] ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী হামিদা খানম তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন-

> ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'র পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। পড়ন্ত বিকেলে পাঁচ তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো মিটিং থেকে ফেরা উন্মত্ত জনতার স্রোত বয়ে আসছে। চোখে পড়লো কারো কারো হাতে নতুন ফ্যান, কারো হাতে পিতলের নতুন কলসি। মাথায় করে আনছে নতুন ফার্ণিচার। চমকে উঠলাম, সবতো লুটের মাল- তবে কি দাঙ্গা বেঁধেছে? কথাটা মনে হওয়ার সাথে সাথেই হৈ হৈ করে দাঙ্গাবাজ লোকেরা সামনের রাস্তার ওপারের পরেশ ঘোষের মিষ্টির দোকান লুট করে ফেললো। এ পরিস্থিতির জন্য তো আমরা প্রস্তুত ছিলাম না- ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ... একদিক থেকে নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর ধ্বনি, অন্যদিকে দূর থেকে ভেসে আসছিল বন্দে মাতরম।[৯০৪]

কলকাতার এ দাঙ্গায় ১৬ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত বহুলোক নিহত হয়। উল্লেখ্য দাঙ্গা প্রশমনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তখন দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন যে সকল নারী তাদের মধ্যে সুফিয়া কামাল, আশালতা সেন, মনিকুন্তলা সেন, লীলানাগ, মায়া লাহিড়ী ইলা মিত্র, মনোরমা বসু, কমলা চ্যাটার্জি, বেলা লাহিড়ী, বিভা সেন, অশোকা গুপ্ত, নেলী সেনগুপ্ত সহ আরো অনেকে। এছাড়া *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল, লেডি ব্রেবোর্ণ স্কুল ও কলেজে*র ছাত্রীদের মধ্যে নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা, রোকেয়া মান্নান, হোসনে আরা বেবী প্রমুখ ছাত্রী দাঙ্গা বিরোধী 'শান্তি ক্যাম্পে' কাজ করেন। দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। এ সময় ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ থেকে স্বদেশ ভূমি মুক্ত করার সংগ্রামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পুরুষের সাথে নারী বলিষ্ঠ এবং সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে অবস্থা আরো গুরুতর হয়ে ওঠে। তখন বাঙালি মেয়েরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নানাভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে। এ সম্পর্কে শাহানারা হোসেন বলেন,

---

[৯০৩] শাহানারা হোসেন, *সাক্ষাতকার*, ১৮.১২.২০১৮

[৯০৪] হামিদা খানম, *ঝরা বকুলের গন্ধ* (স্মৃতি আলেখ্য), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৭৬

১৯৪৭ সালে পার্ক সার্কাসে যখন আমরা বসবাস করছিলাম তখন আমি মুকুল ফৌজের সদস্য হয়েছিলাম। প্রতি রবিবার বিকেলে আমীর আলী পার্কে মুকুল ফৌজের সদস্যরা সমবেত হয়ে প্যারেড করতো। প্যারেডের সময় আমরা গাইতাম কবি নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গান-

চল চল চল!

উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

অরুণ প্রাতের তরুণ দল

চলরে চলরে চল!

এছাড়া নজরুল ইসলামের 'কান্ডারী হুশিয়ার' নামক বিখ্যাত গান-

দুর্গম গিরি কান্তর মরু দুস্তর পরাবার

লঙ্ঘিতে হবে রাত্রী নিশীথে যাত্রিরা হুশিয়ার![৯০৫]

তৎকালীন সময় অনেক মেয়ে মুকুল ফৌজের সদস্য ছিল। সমসাময়িক *আজাদ*, *ইত্তেহাদ* সহ নানা পত্রিকায় সমগ্র দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিরতা বিষয় নিয়ে নিয়মিত লেখা হতো। ১৯৪৭ সালের মার্চ-এপ্রিল থেকে রাজনৈতিক অবস্থা আরো জটিল হতে থাকে। তখন গান্ধী, জিন্নাহ, জওহরলাল নেহেরু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সীমান্তের গান্ধী গফফার খান, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, শরৎ বসু, কিরণ শঙ্কর রায়, বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন সহ বিভিন্ন রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম মুখে মুখে উচ্চারিত হতো।[৯০৬] অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্ট ব্যাটেনের এক ঘোষণা দ্বারা ভারত বিভাগের পরিকল্পনা হয় যা জুলাই মাসে বিলটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। অবশ্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু ও কিরণশঙ্কর রায় বাংলার অখণ্ডতা রক্ষার প্রচেষ্টা চালালেও দেশ ভাগ হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই পাকিস্তানকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং বাংলা, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পশতু, বেলুচী ইত্যাদি ভাষাগুলির পরিবর্তে একটি

---

[৯০৫] শাহানারা হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮

[৯০৬] শাহানারা হোসেন, *সাক্ষাতকার*, ১৮.১২.২০১৮

বিদেশি ভাষা উর্দুকে ইসলামি ভাষার মর্যাদা দিয়ে তাকে সমগ্র জনগণের উপর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্তমূলক সিদ্ধান্ত নেয়।[৯০৭] উল্লিখিত ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ছিল সবচেয়ে উন্নত ভাষা। অন্যদিকে ব্রিটিশ ভারতে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ছিল পাকিস্তানভুক্ত অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। তাই বাংলাভাষী জনগণের কাছে খুব সহজেই ধরা পড়ে যে উর্দু ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক দূরভিসন্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে এসময় ভাষার প্রশ্ন নিয়ে সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হয়। উল্লেখ্য ১৯৪৭ সালে *বেগম* পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়তে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। আবার 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে মোহসেনা ইসলাম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, গ্রন্থ প্রকাশক, উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারি এবং বিশিষ্ট নাগরিকরা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রদান করেন। উল্লেখ্য এ স্মারকলিপিতে *জয়শ্রী* পত্রিকা সম্পাদক লীলানাগ এবং *নিখিল বঙ্গ মোসলেম মহিলা সমিতি*র সম্পাদক আনোয়ারা চৌধুরী স্বাক্ষর করেন।[৯০৮] অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা প্রথম থেকেই পরিলক্ষিত হয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তান সরকারের অবজ্ঞার পরিচয় প্রকাশের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায়- মুদ্রা, মানি অর্ডার ফরম, ডাক টিকিট ইত্যাদি থেকে বাংলা ভাষা বাদ দিয়ে উর্দু ও ইংরেজিকে স্থান দেওয়া হয়।[৯০৯] ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিশ কর্তৃক *সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ* গঠিত হলে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু হবে- এটি নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকারের যানবাহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী আবদুর রব নিশতার সরকারি এক সফরে সিলেট ভ্রমণ করলে এ সময় সেখানকার ছাত্র সমাজ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে লিখিত একটি পত্র দেয়। উল্লেখ্য সিলেটের *মহিলা মুসলিম লীগে*র জেলা কমিটির সভাপতি জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সহ-সভাপতি সৈয়দা শাহেরা বানু, সম্পাদক সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন, রাবেয়া খাতুন সহ আরো অনেক নারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি

[৯০৭] বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৪

[৯০৮] মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *ভাষা আন্দোলন ও নারী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১০১

[৯০৯] ড. সুফিয়া আহমেদ, "বায়ান্নোর স্মৃতিকথা", বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ২ (কার্যনির্বাহী কমিটি ২০১৬-২০১৭ এর প্রথম মাসিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত প্রবন্ধ)

সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের নিকট প্রেরণ করেন।[৯১০] অন্যদিকে ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণ পরিষদের পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণ-পরিষদের অন্যতম প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৯১১] কিন্তু গণপরিষদের নেতা ও কেন্দ্রিয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ দাবিকে প্রত্যাখান করে বলেন এর পশ্চাতে প্রাদেশিকতা ও গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। তৎকালীন সরকারের এরূপ মনোভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় ভাষার দাবিকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সমন্বয়ে 'রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' গঠন করা হয়।[৯১২] একই বছর ২১ মার্চ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বলেন, 'But let me make it very clear to you the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other Language' এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন বক্তৃতায়ও তিনি ঘোষণা করেন, "কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"।[৯১৩] এ ঘোষণার পর থেকে বাঙালিদের মনে বিদ্রোহ ও ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়। বহু ছাত্র-ছাত্রী ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে পিকেটিং করে। পুরুষের পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানে যে সকল নারী এ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেগজাদী মাহমুদা নাসির, লায়লা আরজুমান্দ বানু, মমতাজ বেগম, সুলতানা রাজিয়া, আফরোজা, লিলি খান, খালেদা খানম, মালেকা বেগম এবং পিকেটিংএ অংশগ্রহণ করে লুলু বিলকিস বানু, মেহেরুন্নিসা, দিল আফরোজ, লায়লা, শামসুন্নাহার প্রমুখ নারী। উল্লেখ্য এটি ছিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত মেয়েদের প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলন।[৯১৪] অবশ্য এ ঘটনা ইতিহাসে তেমনভাবে লিখা হয়নি।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। এ সময় ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষার দাবিসহ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির একটি স্মারকলিপি

---

[৯১০] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১

[৯১১] বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫৩

[৯১২] ড. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

[৯১৩] ঐ, পৃ. ৩; মাহফুজা খানম, *ছাত্র রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ আগে ও পরে*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১১১

[৯১৪] মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩

লিয়াকত আলী খানকে প্রদান করা হয়। একই বছর ডিসেম্বর মাসে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক আরবী হরফে বাংলা লেখার সিদ্ধান্ত প্রচণ্ড চাপের মুখে সরকারকে বাতিল করতে হয়। ১৯৫০ সালে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে ঢাকায় পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত জাতীয় মহাসম্মেলনে (Grand National Convention) অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবের সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানানো হয়।[৯১৫] ১৯৫০ সালে মুসলিম লীগ সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল আন্দোলনকে স্তব্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ দাঙ্গা প্রতিরোধে পুরুষের সাথে নারী সমাজও সংগঠিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে মালেকা বেগম বলেন,

> ১৯৫০ সালে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে লীলানাগের নেতৃত্বে সুফিয়া কামাল ও উয়ারী মহিলা সমিতির সদস্যরা ঘোড়ার গাড়িতে, কখনও পায়ে হেঁটে কাজ করেছেন। এসব কাজের মধ্যদিয়ে ঢাকার মহিলারা সমিতি গঠনের কাজে নতুন উদ্যমে সংগঠিত হতে থাকেন। যুঁইফুল রায় উদ্যোগী হন 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতির' পুনর্গঠনে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রীদের সাথে নারী নেত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেন স্বনামখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার।[৯১৬]

তখন লীলানাগ, সুফিয়া কামাল, লুৎফুন্নেসা প্রমুখ নারীনেত্রীরা ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দাঙ্গা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে কামরুন নাহার লাইলী, ফাতেমা খাতুন, সামিনা খাতুন, হালিমা খাতুন (এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ছাত্রী) এবং নারী নেত্রী নুরজাহান মুরশিদ, রোকেয়া রহমান কবির, বেগম মহিউদ্দিন, রাইসা হারুন সহ প্রমুখ প্রগতিশীল নারী তৎকালীন পাকিস্তান শাসন বিরোধী আন্দোলনে মেয়েদেরকে সংগঠিত করার কাজ করেন।[৯১৭] ১৯৫১ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এ বছর ঢাকার শান্তিনগরের একটি স্কুলে মহিলাদের সমাবেশে সুফিয়া কামালকে সভাপতি ও দৌলতননেছা খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক করে 'ঢাকা শহর শিশু রক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরিতে একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করা হয়। এ সভায় বিভিন্ন বক্তার সাথে ইডেন কলেজের তৎকালীন ছাত্রী মাহবুবা খাতুনও বক্তৃতা করেন। মাহবুবা খাতুন বলেন, "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা

---

[৯১৫] *ঐ*, পৃ. ১০৪

[৯১৬] মালেকা বেগম, "রাজনীতি : অন্দরমহল রাজপথ ও সংসদ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী", সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পাদিত), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০৪

[৯১৭] আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২০

তাদের রক্ত বিসর্জন দেবে"।[৯১৮] উল্লেখ্য এ সভায় পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য একটি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এ পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন আনোয়ারা খাতুন (পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদের সদস্য)।[৯১৯] ৪ ফেব্রুয়ারি *রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ* পরিকল্পনা করে তারা ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশ ব্যাপী হরতাল, ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল করে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ ঘেরাও করবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মেয়েরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। প্রসঙ্গক্রমে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সুফিয়া আহমেদ বলেন,

> ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রায় দুই সপ্তাহ আগে থেকে আমরা হরতাল পালনের প্রস্তুতি শুরু করি। আন্দোলনে আমার সহপাঠী ও সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন খোরশেদী আলম ডলি, আমার প্রতিবেশী ও বামপন্থী মহিলা সাংবাদিক লায়লা সামাদ, ড. শাফিয়া খাতুন, সারা তৈফুর প্রমুখ। এসময় ছাত্রীদেরকে সংগঠিত করার জন্য আমরা ঢাকার আনন্দময়ী গার্লস স্কুল, কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল, বাংলা বাজার গার্লস স্কুল ও ইডেন কলেজে প্রচারণা চালাই। সর্বত্রই আমরা ব্যাপক সাড়া লাভ করি এবং হরতালের কর্মসূচি যে সর্বাত্মক সাফল্যমণ্ডিত হবে সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হয়ে উঠি।[৯২০]

পাকিস্তান সরকার ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন অনুমান করতে পেরে ২০ ফেব্রুয়ারি সারা ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ) এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সুফিয়া আহমেদ উল্লেখ করেন,

> এই জনসভায় ঢোকার পথে আমার পূর্ব পরিচিত তৎকালীন ঢাকার এসপি মাসুদ মাহমুদের সাথে দেখা হলে তিনি আমাকে বাসায় ফিরে যেতে বলেন। কেননা সরকার পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর হাতে বিক্ষোভ দমন করার নির্দেশ দিয়েছে। তাই আমারও বিপদ হতে পারে। কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে আমি জনসভায় যোগদান করি। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় আলী আহাদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুল মতিন, মোহাম্মদ সুলতান সহ প্রমুখ নেতাদের আলোচনায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় প্রথমদিকে

---

[৯১৮] বদরুদ্দিন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৫

[৯১৯] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৩১

[৯২০] প্রফেসর ড. সুফিয়া আহমেদ, *সাক্ষাতকার*, ০৭.১০.২০১৭

> মিছিল বের হলে পুলিশ ছাত্রদের ট্রাকে তুলে নেয়। পরে ছাত্রীদের সামনে দিয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করা হয়। এ সময় ড. শাফিয়া খাতুন, শামসুন নাহার (বোরকা পরিহিতা), রওশন আরা বাচ্চু, সারা তৈফুর ও ইডেনের একটি ছাত্রীর নেতৃত্বে প্রথম মেয়েদের দলটি এগিয়ে যায়। উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলার আইন পরিষদের দিকে এগিয়ে গিয়ে সেখানে চলমান পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী সাংসদদের নিকট দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করা। কিন্তু পুলিশের ব্যরিকেড পার হয়ে এগোলেই পুলিশ লাঠিপেটা করে এবং কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ করায় আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। এ সময় মেয়েদের আরো কয়েকটি দল বেরিয়ে পড়ে এবং একই রকমের বাধার সম্মুখীন হয়। আমরা সবাই আহত হই।[৯২১]

২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী নারীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন রওশন আরা বাচ্চু। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> আমি তৃতীয় দলে বেরোয়। আমার মনে প্রশ্ন দেখা দেয় পুলিশের ব্যরিকেড না ভাঙ্গা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হলো না। তাই আমার দৃঢ় প্রত্যয় হলো, আমি লাঠির উপর বা নিচ দিয়ে বেরোব না, লাঠির ব্যরিকেড ভেঙ্গেই বেরোব। আমার সামনের পুলিশের লাঠি দুই হাতে শক্ত করে ধরে সামনে পিছনে জোরে ধাক্কা দিই। আমার দেখাদেখি অন্যান্যরাও লাঠি ধরে ধস্তাধস্তি করে। এভাবে এক পর্যায়ে লাঠির ব্যরিকেড ভেঙ্গে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লাঠিচার্জ শুরু হয়। টিয়ার শেলে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। বিক্ষুদ্ধ জনতার 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', 'পুলিশী জুলুম চলবে না', 'চলো চলো এসেম্বলী চলো' প্রভৃতি স্লোগানে ঢাকা শহর প্রকম্পিত হয়। এ সময় পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ শহীদ হন।[৯২২]

২২ ফেব্রুয়ারি বিকেলে পূর্ববাংলা আইন পরিষদে ছাত্রহত্যা ও পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আনোয়ারা খাতুন (আইন পরিষদের নারী নেত্রী) বক্তৃতা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশী নির্যাতনে ৮ জন মেয়ে মারাত্মক জখম হয়েছেন।[৯২৩] এ সময় নারী নিপীড়নের প্রতিবাদে ১২ নম্বর অভয়দাস লেনে

---

[৯২১] *ঐ*

[৯২২] রওশন আরা বাচ্চু, *সাক্ষাতকার*, ১৩.০৩.২০১৮

[৯২৩] *Proceedings of the East Bengal Legislative Assembly*, 22^{nd} February 1952, Vol. VII, p. 98; উদ্ধৃত, ড. সুফিয়া আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫

সুফিয়া কামাল এবং সাজেদা খাতুনের (কাজী মোতাহার হোসেনের স্ত্রী) নেতৃত্বে সমবেত হয়ে নারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ভাষা আন্দোলন শুধু ঢাকা মহানগরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তদানীন্তন নারায়ণগঞ্জের *মর্গান গার্লস স্কুলের* প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম ভাষা শহীদদের রক্তের শপথে নারায়ণগঞ্জবাসীকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উজ্জীবিত করার অপরাধে কারাবরণ করেন। জেলখানায় পুলিশ তাকে নির্যাতন করে। এক পর্যায়ে তৎকালীন সরকারের চাপে মমতাজ বেগমকে স্বামী তালাক দেয়।[৯২৪] আবার মমতাজ বেগমের সাথে কারাবন্দি হন ছাত্রী ইলা বকশী, বেনু ধর ও শীবানী। অন্যদিকে নড়াইলের সুফিয়া খাতুন, রিজিয়া খাতুন ও রুবি- এ তিন জন নারী স্থানীয়ভাবে ভাষা আন্দোলন করেন।[৯২৫] সিলেটের কুলাউড়ার সালেহা বেগম (*ময়মনসিংহ মুসলিম গার্লস স্কুলের* দশম শ্রেণির ছাত্রী) বহিস্কার হন, খুলনার স্কুল ছাত্রী হামিদা খাতুন মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ করার অপরাধে লাঞ্ছিত হন। এছাড়া সিলেটে জোবেদা খাতুন, শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, সৈয়দা নজিবুন্নেছা খাতুন, শিক্ষক রাবেয়া আলী, রাবেয়া খাতুন, চট্টগ্রামে প্রতিভা মুৎসুদ্দি, তালেয়া রহমান প্রমুখ নারী স্থানীয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[৯২৬]

ভাষা আন্দোলনের সাফল্যের পশ্চাতে পূর্ব বাংলার মেয়েদের আত্মত্যাগের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবোজ্জল। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ক'জন তা হাতে গোনা যেত। অথচ এ ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেওয়া তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে একটি অতি বৈপ্লবিক ঘটনা। তাই ভাষা আন্দোলনকে বাংলার নারীমুক্তির অন্যতম সোপান বলে অভিহিত করা যায়। কারণ তৎকালীন সমাজ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে রক্ষণশীল সমাজে থেকে নারীর অংশগ্রহণ ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনের অন্যতম মাইলফলক।

১৯৫২ সাল পরবর্তী থেকে পূর্ব বাংলার নারী বিভিন্ন প্রকার সংগ্রামী কার্যক্রমে অবাধ এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে 'শহীদ দিবস' হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৯২৭] এ লক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরে ছাত্র-ছাত্রীরা ফেস্টুন

---

[৯২৪] *প্রথম আলো*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

[৯২৫] *ঐ*

[৯২৬] রওশন আরা বাচ্চু, *সাক্ষাতকার*, ১৩.০৩.২০১৮, ঢাকা

[৯২৭] মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯

হাতে প্রভাত ফেরীতে অংশগ্রহণ করেন। এখানে যে সকল নারী অংশ নেন তাদের মধ্যে অন্যতম ফরিদা বারী মালিক, জহরত আরা, খালেদা ফেন্সী খান প্রমুখ। এদিন পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়। উল্লেখ্য *ইডেন কলেজ* ও *ঢাকা কলেজের* ছাত্র-ছাত্রীরা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির চেষ্টা করলে অধ্যক্ষের কারণে ব্যর্থ হয়।[৯২৮] *কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ে* একটি ভাষা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। এদিন অপরাহ্নে *রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের* একটি সভায় হালিমা খাতুন বক্তৃতা প্রদান করেন। অন্যদিকে ১৯৫৪ সালে *বেগম ক্লাব* ও *বেগম পত্রিকা* সংশ্লিষ্ট শামসুন নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সারা তৈফুর, হোসনে আরা মোদাব্বের, বিলকিস বানু, শাহজাদী বেগম, খোদেজা খাতুন, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, সেলিনা বাহার চৌধুরী প্রমুখ নারী ভাষা আন্দোলনের উপর একটি আলোচনা সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় তারা বক্তব্য রাখেন।[৯২৯] ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়ে সহস্র কণ্ঠে স্লোগান দেয় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', 'পুলিশী জুলুম বন্ধ করো' ইত্যাদি।[৯৩০] পুনরায় পুলিশী নির্যাতন শুরু হয় এবং প্রতিভা মুৎসুদ্দি, কামরুন নাহার লাইলী, ফরিদা বারি মালিক, হোসনে আরা, লায়লা নূর সহ ২২ জন ছাত্রী তখন গ্রেপ্তার হন।[৯৩১] এভাবে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে গৃহীত ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে ২১৪নং অনুচ্ছেদে উর্দুর সাথে বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।[৯৩২] বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে সম্মুখযুদ্ধে মোকাবেলা করতে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলামি পার্টি সম্মিলিতভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টের সদস্য না হলেও পরোক্ষভাবে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দেয়।

---

[৯২৮] রফিকুল ইসলাম, *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৫৭-৫৮

[৯২৯] আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৩

[৯৩০] মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১

[৯৩১] বশির আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬০৫

[৯৩২] *ঐ*, পৃ. ৬১১

বাংলার নারী সমাজ উৎসাহ নিয়ে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগ সরকার ঘোষণা করে যে, কোনো মহিলা যে কেন্দ্রে প্রার্থী হবেন তাঁকে সে স্থানের ভোটদাতা হতে হবে। এ ঘোষণায় নারী প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে ১৪ জন নারী আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- নূরজাহান মুরশিদ, দৌলতননেছা খাতুন, বদরুন্নেসা আহমেদ, আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, এফতুন্নেসা, মেহেরুন্নেসা খাতুন প্রমুখ। এসময় সংখ্যালঘু নেলী সেনগুপ্তা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য সংরক্ষিত আসন থেকে মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থী শামসুন নাহার মাহমুদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। অন্যদিকে মুসলিম লীগের অপর প্রার্থী জোবেদা খাতুন চৌধুরী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনে পরাজিত হন।[৯৩৩] এভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাংলার নারী সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য নূরজাহান মুরশিদ, রাজিয়া বানু ও দৌলতননেছাকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।[৯৩৪]

১৯৫৫ সালে মেয়েদের বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলার নারী সংগঠনগুলি সম্মিলিত উদ্যোগে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করে। এ ফ্রন্ট তৎকালে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির প্রতিবাদে অসংখ্য সভা-সমাবেশ ও ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করে। পাশাপাশি নারী শরীয়ত আইন সংস্কারের জন্য তুমুল আন্দোলন শুরু করে। ফলে বাধ্য হয়ে তৎকালীন সরকার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রশিদকে সভাপতি করে একটি কমিশন গঠন করে। ইসলাম নারীকে যে সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা দেশের প্রচলিত আইনে প্রদত্ত বিয়ে, তালাক, খোরপোষ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি অধিকারের ক্ষেত্রে কতটুকু বিদ্যমান তা পরীক্ষা করার জন্য এ কমিশন গঠিত হয়।[৯৩৫]

১৯৫৭ সালে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে National Awami Party'র (ন্যাপ নামে পরিচিত) জন্ম হয়। এ সময় প্রতিথযশা নারী আজিজা ইদরিস ন্যাপের ঢাকা নগর কমিটির কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সক্রিয় হন আজিজা ইদরিস।[৯৩৬] পরবর্তীতে তিনি বাংলার

---

[৯৩৩] আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২১

[৯৩৪] অজয় রায়, "প্রগতিশীল আন্দোলন : নূরজাহান মুরশিদ", আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *নূরজাহান মুরশিদ স্মারকগ্রন্থ*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৩; উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯

[৯৩৫] অদিতি ফাল্গুনী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬

[৯৩৬] মাহফুজা খানম, *তোমরাই ধ্রুবতারা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩১-৩২

প্রতিটি আন্দোলনে এক লড়াকু সৈনিক ছিলেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে পূর্ব বাংলার নারী আন্দোলন অল্প সময়ের জন্য স্তিমিত হয়ে পড়ে। সারাদেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর সামরিক শাসনের দমন পীড়ন শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হন। ফলে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মুক্তির জন্য গঠন করা হয় 'পূর্ব বাংলা রাজবন্দি সাহায্য কমিটি'। এ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন।[৯৩৭] উল্লেখ্য প্রতিথযশা নারী সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

সারাদেশে প্রচলিত সামরিক শাসন সম্পর্কে মালেকা বেগম উল্লেখ করেন, "নানা অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমতে থাকে। পত্রিকায় কারাবন্দিদের নাম পড়তাম, গোপনে আলোচনা শুনতাম। দুঃখ-ক্ষোভ-প্রতিবাদ সবই তখন ছিল গোপন বিষয়"।[৯৩৮] উল্লেখ্য সে সময় দৌলতননেছা, আশালতা সেন, সুফিয়া কামাল প্রমুখের উপরও সামরিক শাসনের চাপ এসেছিল। এভাবে কিছুদিন চলার পর ১৯৬০ সালের শুরুতে পুনরায় *গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি*, *উয়ারী মহিলা সমিতি*, *শিশু রক্ষা সমিতি*, *ইসলামিক মহিলা সমিতি*, *All Pakistan Women's Association, University Women's Federation* প্রভৃতি নারী সংগঠনগুলি তাদের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে। উল্লেখ্য ১৯৬১ সালে 'পারিবারিক আইন' প্রণীত হয়। এ আইনটিতে 'বিচারপতি রশিদ কমিশন' এর সকল সুপারিশ গৃহীত না হলেও নারী সমাজের অধিকার অর্জনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। অন্যদিকে এ বছর সংবিধানের ২০ ধারায় জাতীয় পরিষদে প্রদেশ থেকে ৩টি করে মোট ৬টি ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশের ৫টি করে ১০টি আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত রাখার নিয়ম চালু হয়।[৯৩৯] উল্লেখ্য এ নারী আসনের মনোনয়ন দিতেন রাষ্ট্রপতি। পূর্ববাংলার শামসুন নাহার মাহমুদ এ সময় জাতীয় পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। তিনি মুসলিম লীগ সরকারি দলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববাংলার নারী সমাজের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করেন।

১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হলেও পরবর্তীতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি

---

[৯৩৭] *ঐ*, পৃ. ৬২

[৯৩৮] মালেকা বেগম, *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৭

[৯৩৯] *ঐ*, পৃ. ৩৬

শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমেদ, আবুল মনসুর আহমেদ, তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) সহ আরো অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৯৪০] উল্লেখ্য ৮ জুন আইয়ুব খান সামরিক আইন তুলে নেন। আগস্ট মাসে শরিফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে পুনরায় ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়, কেননা এ রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা সংকোচনের সুপারিশ ছিল। তাই ছাত্ররা এ রিপোর্ট বাতিলের দাবি তোলে। আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণকারী সংগ্রামী নারী মালেকা বেগম বলেন,

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ছাত্র সংগঠনের ডাকে শিক্ষা দিবসে প্রতিবাদ মিছিলে প্রথম আমি যোগ দিই ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। সশস্ত্র পুলিশ ও ছাত্রীরা মুখোমুখি, পেছনে ছাত্রনেতারা আক্রমণের মুখে সকলেই পিছু হটলেও আমি ছিলাম অনভিজ্ঞ, পিছু হটার কথা ভাবতে পারিনি। ... ছাত্র রাজনীতির সূত্রে তখন থেকে নারী অধিকার আন্দোলনের নেত্রীদের সাথে পরিচিত হতে থাকি।[৯৪১]

১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী আরেকজন প্রতিথযশা নারী মাহফুজা খানম বলেন,

> ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন (শরীফ কমিশন) এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল। তৎকালীন ঢাকা কলেজের ছাত্ররা এ বিষয়ে প্রথম আন্দোলন শুরু করে। পর্যায়ক্রমে জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আজম কলেজ ও ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীরা যুক্ত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থন ও অংশগ্রহণ এ আন্দোলন শক্তিশালী হয় এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ। ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে আন্দোলন ব্যাপক গতিশীল হয়। আমি তখন ইডেন কলেজের আই.এস.সি'র ছাত্রী এবং মতিয়া চৌধুরী বি.এস.সি'র ছাত্রী। এসময় ইডেন কলেজের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেয়া হতো। মতিয়া চৌধুরীসহ আমরা অনেক ছাত্রী পাচিল টপকে বেরিয়ে যেতাম ও মিছিলে অংশগ্রহণ করতাম। তখন ছাত্র সমাবেশ হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়। আমতলার সভা শেষে মিছিল টিপু সুলতান রোড হয়ে নওয়াবপুর, ইসলামপুর, সদরঘাট হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ক্যান্টিনে শেষ হতো।[৯৪২]

ছাত্র আন্দোলনের সময় এভাবে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। তৎকালীন মেয়েদের বিভিন্ন সভা-সমিতির মধ্যে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রাখে *বেগম ক্লাব*। এ ক্লাবে মেয়েরা

---

[৯৪০] শাহানারা হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০১

[৯৪১] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯

[৯৪২] মাহফুজা খানম, *ছাত্র রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ আগে ও পরে*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০

একত্রিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে চলমান আন্দোলনে তাদের ভূমিকা কি হবে তা নির্ধারণ করতেন। ১৯৬৩ সালের ৫ অক্টোবর *বেগম ক্লাবে* মেয়েদের নানা অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সমসাময়িক নারী সংগঠনগুলির এক সংবাদ সম্মেলনে ইডেন কলেজের ছাত্রী মতিয়া চৌধুরী মহিলাদের দাবি সমর্থন করে এক বিবৃতি দেন।[৯৪৩] বিশেষভাবে উল্লেখ্য মতিয়া চৌধুরী ষাটের দশকে নারী আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্যতম সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে পূর্ব বাংলার প্রায় প্রতিটি সংগ্রামে দুঃসাহসিক ভূমিকা রাখেন এবং আজ পর্যন্ত রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের একজন সম্মানিত সংসদ সদস্য এবং প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে শামসুন নাহার মাহমুদ নির্বাচকমণ্ডলী বিলের উপর এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি আইন পরিষদসহ নির্বাচকমণ্ডলীতে ২৫ শতাংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখার দাবি জানান। পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য রোকাইয়া আনোয়ার ও সিরাজুন্নেসা চৌধুরী এ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্য বেগম জি.এ খান ও বেগম মনিমুন্নেসা আহাদের বিরোধিতায় তা বাতিল হয়। বিষয়টির মীমাংসা হয় এভাবে যে, মহিলা সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট প্রদেশ থেকে আইন পরিষদের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচিত হবেন।[৯৪৪] উল্লেখ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি এ সময় পুনরায় পূর্ব বাংলার মেয়েরা হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে শিক্ষা আন্দোলন শুরু করে, যার ফলস্বরূপ ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের নামকরণ হয় 'রোকেয়া হল'।[৯৪৫] এ সময় পূর্ব বাংলায় আইয়ুব খান বিরোধী এক প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে তদানীন্তন সরকার দাঙ্গা প্রতিরোধে কমিটি গঠন করে । অন্যদিকে সুফিয়া কামাল, সনজিদা খাতুন, রোকেয়া রহমান কবীর সহ আরো কতিপয় নেত্রী দাঙ্গা বিরোধী কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য এ সময় শেখ মুজিবুর রহমানের (পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট) সাথে জিপ গাড়ীতে করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে পথে নামেন কয়েকজন নারী।[৯৪৬] ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার স্মৃতিচারণায় মাহফুজা খানম বলেন,

---

[৯৪৩] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৯

[৯৪৪] আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৩

[৯৪৫] সেলিনা চৌধুরী, *নারী প্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হল*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৮৫

[৯৪৬] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২২৫-২৪০

> ১৯৬৪ সালে একটি সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় মিছিল নিয়ে এগুতে থাকলে পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে আমার ডানহাতের কব্জি ভেঙ্গে গেল। খুবই যন্ত্রণা হতে লাগল। সন্ধ্যায় হল প্রভোস্ট মেহের কবীর সভা করে ডেকে মেয়েদের অকথ্য ভাষায় বকাবকি করলেন। আমার রোকেয়া হলের সীট বাতিল করে দিলেন। অনেক দেন-দরবার করে পরে সীট ফিরে পাই।[৯৪৭]

আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী সকল দল ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনে ব্যর্থ হলে অবশেষে খাজা নাজিমুদ্দিনের উদ্যোগে পাঁচটি বিরোধী দল নির্বাচনের লক্ষ্যে ৯ দফা কর্মসূচি নিয়ে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' গঠন করে। ১৯৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষে ফাতেমা জিন্নাহ প্রতিযোগিতা করে পরাজিত হন। কিন্তু এ সময় দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ প্রসারিত হয়। উল্লেখ্য ফাতেমা জিন্নাহর রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ পূর্ব বাংলার মেয়েদের মনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে যা নারী জাগরণ ও আন্দোলনকে বেগবান করে।

মূলত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে পূর্ববাংলার নারী নেত্রীরা ধারণা পোষণ করেন সরকারি দলের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে এবং এভাবেই নারীসমাজ প্রগতির দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তা ভুল প্রমাণিত হয়। কেননা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানীদের বঞ্চিত ও শোষণ করতে থাকে। আবার ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্তে যুদ্ধের সময় অনেক নারী সামরিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে নারী সমাজ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থেই যুদ্ধ বাঁধানো হয়েছে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থাও চরম দুরবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে। ফলে পূর্ব বাংলায় জনরোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার ছাত্র রাজনীতি উত্তাল হতে থাকে। ১৯৬৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত সরকার বিরোধী দলগুলির এক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের দাবিতে ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। এর মধ্যদিয়ে পূর্ব বাংলার পরিপূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে যে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে সে সংগ্রামে নারী সমাজের অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ্য এ সময় দেশবরেণ্য রাজনীতিবিদ আমেনা বেগম (১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন) ছয়দফা আন্দোলনে বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব প্রদানের মধ্যদিয়ে আন্দোলনকে বেগবান করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৯৪৮] তিনি ১৯৬৬-

---

[৯৪৭] মাহফুজা খানম, *সাক্ষাতকার*, ০৮.১০.২০১৭, ঢাকা

[৯৪৮] শাহনাজ পারভীন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৪০

১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের মাধ্যমে ছয়দফা আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ আন্দোলনের প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে জয়ী হয়।

এছাড়া ছয়দফা আন্দোলনের সাথে যে সকল নারী ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, বেগম ফজিলতুন্নেসা মুজিব, বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ (১৯৬৭ সালে সংগঠিত মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক), মাহফুজা খানম (ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক ১৯৬৬-৬৭) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ঢাকার বাইরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবার মমতাজ বেগম (কুমিল্লা মহিলা কলেজের সহ-সভাপতি ১৯৬৫-৬৬ এবং কুমিল্লা জেলার ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হিসেবে ১৯৬৫-৬৭ সালে দায়িত্ব পালন করেন), পটুয়াখালীর মনোয়ারা বেগম মনু, টাঙ্গাইলের সুফিয়া খাতুন ছয়দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[৯৪৯]

১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পর শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমেদ দুটি পৃথক ভূমিকাসহ ছয়দফার বর্ণনা করে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান স্বনামে ছয়দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে 'আমাদের বাঁচার দাবি : ছয়দফা কর্মসূচি' শীর্ষক আরেকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এরপর ছয়দফার প্রচারণা ব্যাপকভাবে শুরু হয়।[৯৫০] এ সময় থেকে পূর্ববাংলার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ধীরে ধীরে পাকিস্তান সরকার বিরোধী এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। মাহফুজা খানম বলেন,

> ষাটের দশকে পাকিস্তানের আইয়ুব খান-মোনায়েম খানের বিরুদ্ধে রোকেয়া হলের ছাত্রীদের সচেতন অবরোধ লক্ষ্য করার মতো ছিল। প্রতিদিনই তখন আমতলায় বা নতুন আর্টস বিল্ডিং এ ছাত্রসভা, বিক্ষোভ মিছিল হতো, আর তাতে রোকেয়া হলের ছাত্রীদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো ছিল। রানু আপা, চপলা আপা, ফাহমিদা আপা (রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী) আমাদের সিনিয়র ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। তাদের তত্ত্বাবধানে আমরা রোকেয়া হলে ছাত্রী নির্বাচন করেছি। মতিয়া চৌধুরীকে প্রথম বর্ষে পেয়েছি, পরে তিনি ছিলেন না। ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদের জন্য মালেকা বেগম ও আমি ছাত্র ইউনিয়ন থেকে

---

[৯৪৯] *ঐ*, পৃ. ৪১-৪২

[৯৫০] শাহানারা হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৬

> এবং শফিনাজ বেগম ও মমতাজ বেগম ছাত্রলীগ থেকে নির্বাচন করি। আমি সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে ভিপি নির্বাচিত হই। এ সময়টি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তখন ছয়দফা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, ছয়দফাকে জনগণের কাছে নিয়ে যাবার জন্য দেশের সর্বত্র সভা ও মিছিল নিত্যকার কর্মসূচি ছিল। এসব কার্যক্রমে ছাত্রদের সাথে রোকেয়া হলের ছাত্রীরা সমানতালেই অংশ নিত। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকায় এ সময় আমার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী হয়।[৯৫১]

উল্লেখ্য পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি তখনকার আন্দোলনগুলিতে বেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন পুরুষ নেতারা সে সময় মেয়েদেরকে সংগ্রামে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে মালেকা বেগম বলেন,

> ১৯৬৭-৬৮ সময়কালে আমি উৎসাহিত হয়েছি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ এর সাক্ষাত লাভ প্রেরণায়। পরোক্ষ প্রেরণা দিয়েছেন মনি সিং, জ্ঞান চক্রবর্তী, অনিল মুখার্জি প্রমুখ বিপ্লবীরা। বিশ্ব নারী ব্যক্তিত্ব ও বিশ্ব নারী আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার, সত্যেন সেন প্রমুখ। এছাড়া মতিউর রহমান (আমার স্বামী ও বর্তমান *প্রথম আলো* পত্রিকার সম্পাদক) আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।[৯৫২]

এভাবে ছয়দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বাংলার মেয়েরা রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে থাকে। এক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষ সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের সহযোগিতা লাভ করে।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলায় একটি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ে ১১ দফা দাবি নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় এলে সর্বত্র প্রতিবাদ শুরু হয়। ঢাকার সর্বত্র 'আইয়ুব তুমি ফিরে যাও' পোস্টারে ছেয়ে যায়। অন্যদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে আগরতলা মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[৯৫৩] ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে গুলিবিদ্ধ করে এবং বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য এ সময় প্রফেসর শাহানারা হোসেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুন্নুজান

---

[৯৫১] মাহফুজা খানম, *সাক্ষাতকার*, ০৮.১০.২০১৭, ঢাকা

[৯৫২] মালেকা বেগম, *সাক্ষাতকার*, ৩০.১০.২০১৭, ঢাকা

[৯৫৩] শাহানারা হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১০

হলের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রভোস্ট হিসেবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ছাত্রীদের শান্ত করেন এবং ছাত্রীদের নিরাপদ অবস্থানে (হলের মধ্যে) নিয়ে গিয়ে সার্বক্ষণিক দেখাশুনার গুরুদায়িত্ব পালন করেন।[৯৫৪]

এরূপ পরিস্থিতে ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান ঘটে। এ অভ্যুত্থানে পুরুষের সাথে পূর্ববাংলার নারী সমাজও দুঃসাহসিকতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ ছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জ করে। বিক্ষোভের মুখে ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদ শহীদ হন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য এসময় শিবপুর গ্রামের বাড়ী থেকে আসাদের মা ছাত্র নেতাদের কাছে বাণী পাঠালেন, "আমার আসাদের মৃত্যু হয়নি। আমার আসাদ বলতো, 'মা আগামী দশ বছরের মধ্যে এই মাতৃভূমি নতুন জীবন পাবে।' আমার আসাদের এই স্বপ্ন তোমরা সার্থক করো। এভাবেই আসাদের মা হয়ে ওঠেন যোদ্ধা।"[৯৫৫] আসাদ হত্যার বিরুদ্ধে সর্বত্র সভা, মিছিল ও হরতাল পালিত হয়। আসাদের মৃত্যুতে ছাত্র সমাজ বজ্র কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। গণজাগরণের বিস্ফোরণ ঘটে। উল্লেখ্য সে সময় আসাদের এক বোন রোকেয়া হলের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর কান্না ও আহাজারী রোকেয়া হলের সকল ছাত্রীকে স্পর্শ করে। এরপর ছাত্রীরা শপথ নেয় 'আমরা আর কাঁদবো না বরং আসাদের আরব্ধ কাজ শেষ করব।'[৯৫৬] রোকেয়া হলের ছাত্রী সংসদের নেতৃত্বে পাঁচ-ছয়শত ছাত্রী মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে নিজেদেরকে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করে। আসাদের রক্তমাখা শার্ট পতাকা হিসেবে তারা উড়িয়ে দেয়। এ পতাকা দেখে শামসুর রহমান কবিতা রচনা করেন-

> 'গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
>
> জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
>
> উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায় ...
>
> উড়ছে উড়ছে অবিরাম-
>
> আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে, ...
>
> আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।[৯৫৭]

---

[৯৫৪]শাহানারা হোসেন, *সাক্ষাতকার*, ১৮.১২.২০১৮, ঢাকা

[৯৫৫] মালেকা বেগম, *বিপন্ন নারী*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩১

[৯৫৬] সেলিনা চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭

[৯৫৭] শামসুর রহমান, 'আসাদের শার্ট', কবির *নিজ বাসভূমে* (১৯৭০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত একটি কবিতা

উল্লেখ্য এ মিছিলে তৎকালীন রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের ভিপি আয়শা খানম, জিএস রাশেদা খান ও ছাত্রী ইউনিয়নের মতিয়া চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন। ২২ জানুয়ারি এক বিরাট মৌন শোক মিছিল সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সাধারণ নাগরিক ও মেয়েরা অংশগ্রহণ করেন। দশ হাজারের অধিক পুরুষের এ মিছিলে সহস্রাধিক নারী অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের প্রথম সারিতে মাঝখানে মায়েদের পাশে সুফিয়া কামাল ও বেগম আজিজা ইদরিস এবং ছাত্রী নেত্রী মালেকা বেগম ও দীপা দত্ত অংশগ্রহণ করেন।[৯৫৮] আবার ২৪ জানুয়ারি সুফিয়া কামালের বাসভবনে অনুষ্ঠিত মহিলাদের এক সভায় শোক মিছিল করার প্রস্তাব নিয়ে সন্ধ্যা ছয়টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে মশাল মিছিল বের করে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করা হয়। উল্লেখ্য এ মিছিলে ছাত্রী তরু আহমেদ কালো পতাকা সামনে নিয়ে পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব দেন। অন্যদিকে ২ ফেব্রুয়ারি ইডেন কলেজের হোস্টেলের ছাত্রীগণ একবেলা অভুক্ত থেকে আন্দোলনে হতাহতদের সাহায্যার্থে ডাকসু সহ-সভাপতির নিকট ৫০০ টাকা প্রদান করেন। এ সময় রোকেয়া হলের ছাত্রীরা একই উপায়ে অর্থ সাহায্য প্রদান করেন।[৯৫৯] ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় হাজার হাজার মহিলা (অনেকে বোরকা পরা) মিছিল নিয়ে শহীদ মিনার থেকে শুরু করে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে নওয়াবপুর হয়ে বাহাদুরশাহ পার্কে যাওয়ার সময় রাস্তার দু'পাশ থেকে মানুষ এ মিছিলে ফুল ও গোলাপ পানি ছিটিয়ে সংহতি জানায়।[৯৬০]

মিছিলটি ঢাকা শহরের মা-বোনদের আহ্বান জানিয়ে ২০ জন বিশিষ্ট নারী ও ছাত্রীনেত্রী একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন মহিলাদের পক্ষে- সুফিয়া কামাল, আমেনা বেগম, কামরুন্নাহার লাইলী, জোহরা তাজউদ্দিন, খোদেজা চৌধুরী, রেবেকা মহিউদ্দিন, ফরিদা জামান, লায়লা কবির, বদরুন্নেসা আহমেদ, হুরমতুন্নেসা ওদুদ, খালেদা খানম প্রমুখ। ছাত্রীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন মালেকা বেগম, আয়েশা খানম, হোসনে আরা বেগম, মেহরোজ আলম চৌধুরী সহ আরো অনেকে।[৯৬১] ১৬ ফেব্রুয়ারি *কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল ও বাংলা বাজার বালিকা বিদ্যালয়* সহ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাজপথে মিছিলে অংশ নেয়। ঢাকার বাইরে তখন খুলনায় শিরিন বানু ও নাসিমা বেগমের নেতৃত্বে এবং যশোরে জিন্নাতুন্নেসা (যশোর মহিলা সমিতির সভাপতি)'র নেতৃত্বে মিছিল হয়। *যশোর মহিলা কলেজের* ছাত্রী খালেদা বেগম, নিলুফার বেগম, *সেবাসংঘ বালিকা বিদ্যালয়ের* শিক্ষক মীনা বেগম এবং শওকত আরা

[৯৫৮] শাহনাজ পারভীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩

[৯৫৯] *সংবাদ*, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

[৯৬০] মালেকা বেগম, *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯

[৯৬১] *সংবাদ*, ৮ ফেব্রুয়ারি

সিদ্দিকী, ফয়জুন্নেসা সিদ্দিকী ও আশরাফুন্নেসা মিছিলে যোগ দেন।[৯৬২] অন্যদিকে চট্টগ্রামের খালেদা খানম, দীনা জাহেদ, হামিদা চৌধুরী, হান্নানা বেগম, মুশতারী শফী, সাবেরা শবনম, আয়শা বেগম প্রমুখ নারী আঞ্চলিকভাবে নারীকে সংগঠিত করে গণঅভ্যুত্থান সফল করার প্রচেষ্টা চালান।[৯৬৩] এছাড়া সিলেটে বেগম ফরিদ গাজী, এলিজা সিরাজী এবং নরসিংদী, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সৈয়দপুর, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি জায়গায় ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখ পর্যন্ত সরকার ১৪৪ ধারা ঘোষণা করে। কিন্তু ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ২১ ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার নারী ভাষা শহীদ দিবস পালন করেন।[৯৬৪] মূলত পাকিস্তানী শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আন্দোলনে সামরিক শাসকগোষ্ঠী এ পর্যায়ে ভীত ও শংকিত হয়ে পড়ে। তাই পূর্ব পাকিস্তানের কর্মচারিদের উপর চাপিয়ে দেয় যে, তারা বা তাদের পরিবারের সদস্যরা যদি সরকার বিরোধী কোন কার্যক্রম বা আন্দোলনে যোগদান করে তবে তাদের চাকুরিচ্যুত করা হবে। এরূপ সিদ্ধান্তে পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও তাদের নারীসমাজের মধ্যে তেমন কোন সামরিক শাসন বিরোধী প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায় না। স্বামীর চাকুরীচ্যুতির ভয়ে রাজবন্দির মুক্তির আন্দোলন সমর্থন করা সত্ত্বেও অনেকে দাবিনামায় স্বাক্ষর করেননি, সভা-সমাবেশ ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণও করেননি। আবার অনেকে এসব ভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন। এদের মধ্যে সুফিয়া কামাল, জোবেদা খাতুন, রেবেকা মহিউদ্দিন, সারা আলী, আজীজা ইদরিস, রোকেয়া রহমান কবীর, বেলা নবী প্রমুখ।[৯৬৫] আবার আন্দোলন থেকে বিরত রাখার জন্য অবিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অভিভাবকের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা হয়। আন্দোলনের অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী এক সাক্ষাতকারে বলেন, তাঁর বাবা তদানীন্তন পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তাই আন্দোলন থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সরকার থেকে তাঁর উপর চাপ ছিল। এজন্য তিনি সহযোদ্ধা বজলুর রহমানকে সামাজিকভাবে বিয়ে করে বাবার অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন।[৯৬৬] নারী আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি অসাধারণ ঘটনা।

---

[৯৬২] *দৈনিক আজাদ*, ১ মার্চ

[৯৬৩] ডা. মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩, পৃ. ২১৫

[৯৬৪] সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩১

[৯৬৫] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০

[৯৬৬] আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৪

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান শাসনতন্ত্র ও পরিষদ বাতিল করে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তখন সারাদেশে আবারও সামরিক শাসন জারি করা হয়। উল্লেখ্য ৩১ মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।[৯৬৭] ২৩ ডিসেম্বর তিনি ছাত্র সমাজ, রাজনৈতিক দল ও জনতার প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। উল্লেখ্য এ সময় আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্বে চলে আসেন।[৯৬৮] তখন দলমত নির্বিশেষে সকলেই উপলব্ধি করে পাকিস্তানী অপশাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অবশ্যই নির্বাচনে জয়ী হতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা এবং নানা স্তরের মানুষ নিজ নিজ দাবিতে যখন 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে সারাদেশে সামরিক শাসন বিরোধী স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তখন রাজনৈতিক দল-মত ও আদর্শের উর্ধ্বে সকল মেয়েদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ'। এ সংগ্রাম পরিষদের নেতা ছিলেন সুফিয়া কামাল এবং আহ্বায়ক মালেকা বেগম।[৯৬৯] এ সংগঠনের অনেকে ছিলেন রাজনৈতিক দলের সদস্য, আবার অনেকে নির্দলীয় সমাজসেবী ও গৃহবধূ। *পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদে* তৎকালীন ছাত্রীনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন আয়শা খানম, ফাওজিয়া মোসলেম, মখদুমা নার্গিস, কাজী মমতাহেনা, মুনিয়া আক্তার প্রমুখ। নারীনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন বদরুন্নেসা আহমদ, জোহরা তাজউদ্দিন, নূরজাহান মুরশিদ, সেলিনা বানু, নূরজাহান কাদের, সারা আলী, রাজিয়া বানু প্রমুখ।[৯৭০] রাজধানীসহ পূর্ববাংলার সর্বত্র মহিলা ও ছাত্রীনেত্রীরা সফর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে মহিলা সংগ্রাম পরিষদের অনেক শাখা। এভাবে প্রান্তিক নারীও রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মালেকা বেগমকে সম্পাদক করে গড়ে ওঠে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'।[৯৭১] (বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে)। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের সাথে যুক্ত হয়ে সমসাময়িক নারী নেত্রীরা দেশে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা ও মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে গণভোটে সরাসরি নির্বাচিত করা, রাজবন্দিদের মুক্তি, মহিলা শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকের ন্যায় সমান মজুরী, মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা, শিশু হাসপাতাল স্থাপন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমানো, নারী নির্যাতন বন্ধ করা, পুরুষের ন্যায় নারীর

---

[৯৬৭] সেলিনা চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৮

[৯৬৮] *ঐ*

[৯৬৯] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১

[৯৭০] *ঐ*

[৯৭১] মালেকা বেগম, *সাক্ষাতকার*, ৩০.১০.২০১৭, ঢাকা

জন্য সম অধিকার প্রভৃতির দাবি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়। এ সময় *পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ* বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে নারীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ করার কাজও করতে থাকে। ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে গ্রামবাংলার নারী সমাজ অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। উল্লেখ্য ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে উপকূলীয় জ্বলোচ্ছাসের তাণ্ডবে দেশের উপর প্রবল আঘাত নেমে এলে *পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ* ও অন্যান্য মহিলা সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কাজে ভূমিকা রাখে।[৯৭২]

১৯৭০ সালের গণভোটে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ জয় পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী মেনে না নিলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই আরো অস্থিতিশীল হয়ে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ মতিয়া চৌধুরী ঢাকায় গুলিস্তানের এক পথসভায় দল, মত, নির্বিশেষে সবাইকে এক প্লাটফর্মে সামিল হয়ে বাংলার মানুষকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। পরদিন ২ মার্চ তারিখে পল্টন ময়দানের ন্যাপের জনসভায় এবং ৪ মার্চ কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারের জনসভায় মতিয়া চৌধুরী স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রামাঞ্চলে সংগ্রাম কমিটি ও মুক্তিবাহিনী গঠনের আহ্বান জানান।[৯৭৩] বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সুবৃহৎ এক জনসভায় বাংলার আপামর জনসাধারণকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানান। এ সময় মহিলা পরিষদ শহরে শহরে নারী সমাবেশ করে মেয়েদেরকে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা শুরু করেন। তখন নারী লাঠি হাতে কুচকাওয়াজ করে তৈরি হন এবং স্বামী-সন্তানকে সংগ্রামের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার প্রেরণা দেন।[৯৭৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের তৎকালীন ভিপি ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী আয়েশা খানম ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মহিলা সংগ্রাম পরিষদের সাথে পাড়ায় পাড়ায় মিটিংয়ে যোগ দিয়ে মেয়েদেরকে সংগঠিত করেন।[৯৭৫] অন্যদিকে মাহফুজা খানম ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে অংশগ্রহণ করে যে দিক নির্দেশনা পান তা বুকে ধারণ করে বিভিন্ন কর্মপন্থা স্থির করে পাড়ায় পাড়ায় ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঘন ঘন সভা করেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই ঢাকায় বিভিন্ন মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করে আন্দোলনকে বেগবান করেন।[৯৭৬] এ সময় বেবী

---

[৯৭২] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২

[৯৭৩] আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯১৮, পৃ. ৫৮-৬০

[৯৭৪] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৩

[৯৭৫] আয়েশা খানম, *সাক্ষাতকার*, ০১.০২.২০১৮, ঢাকা

[৯৭৬] মাহফুজা খানম, *সাক্ষাতকার*, ০৮.১০.২০১৭, ঢাকা

মওদুদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অনার্স পরীক্ষার্থি) আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে প্রতিদিন মিটিং মিছিলে অংশ নেন। তিনি স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত তৈরির জন্য ৯ জন বন্ধু নিয়ে *রানার* পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৯৭৭] সুফিয়া কামাল ও মালেকা বেগম মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য ফাস্ট এইড (প্রাথমিক চিকিৎসা) ও সাধারণ প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করেন। এ সময় মেয়েরা পাকিস্তানী শাসন বিরোধী নানা রকমের স্লোগান দিয়ে পোস্টার লেখার কাজও করেন। ঢাকা ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, যশোর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, পটুয়াখালী, সিলেট, নোয়াখালী, দিনাজপুর প্রভৃতি জায়গায় মেয়েরা মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগমুহূর্তে অসহযোগ ও স্বাধিকার আন্দোলনে সরব ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ বাঙালির উপর। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাত বারোটার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অবর্তমানে মুজিব নগর সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের নানা কর্মসূচিতে নারীসমাজ অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক প্রথম দশজন কর্মীর মধ্যে একমাত্র নারী ছিলেন ড. বেগম মুশতারী শফি।[৯৭৮] এভাবে বাংলার মেয়েরা প্রথম থেকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ পরিবারের নারী পাকিস্তান বাহিনীর হাতে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়ণের স্বীকার হন। সুফিয়া কামাল সহ অন্য মেয়েরা আশ্রয়, খাদ্য ও অর্থ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতাকামী জনগণের মনোবল দৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে মেয়েরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। খবর পাঠ করে, কথিকা পড়ে, গান গেয়ে বেতারে অনবরত মুক্তিযুদ্ধের খবর প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা। বেতার শিল্পীরা গঠন করেন 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'।[৯৭৯] এ সংস্থায় যুক্ত ছিলেন নূরজাহান মুরশিদ। তিনি All India Radioতে চাকুরী করতেন এবং তিনি ছিলেন রেডিও'র প্রথম মুসলিম নারী চাকুরীজীবী।[৯৮০] বাংলার রাজনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন নূরজাহান মুরশিদ।

---

[৯৭৭] মাহফুজা খানম, *তোমরাই ধ্রুবতারা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৮

[৯৭৮] অদিতি ফাল্গুনী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১

[৯৭৯] সেলিনা হোসেন, "নারীর জীবন ও নারী অধ্যয়ন প্রতিফলন ও পরস্পর সংযুক্তি", *নূরজাহান মুরশিদ স্মারকগ্রন্থ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৪

[৯৮০] হাসনাত আবদুল হাই, "নূরজাহান মুরশিদ একটি নারীবাদী আলোচনা", *ঐ*, পৃ. ৩১৯-৩২০

মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ববাংলার মেয়েরা কলকাতার গোবরা ক্যাম্পে আওয়ামী লীগ নেত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে বিভিন্ন ক্যাম্পে মেয়েদের অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসা ও সেবিকার কাজ করেন। এদের মধ্যে সুফিয়া কামালের দুই কন্যা সুলতানা কামাল ও সাঈদা কামাল, চিকিৎসক ডালিয়া সালাহউদ্দিন, মিনুবিল্লাহ, খুকু আহমেদ, রেশমা প্রমুখ নারীর নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে মাহফুজা খানম বোমা বানানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাব থেকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য (ল্যাব সহকারীর সাহায্যে) নিয়ে আসতেন। তিনি সরাসরি দুটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। মাহফুজা খানম চার পাঁচজন যোদ্ধাকে সাথে নিয়ে ডিআইটি ভবনের ২য়/৩য় তলায় এবং তোপখানা রোডের USIS লাইব্রেরিতে (আমেরিকানদের) বোমা পেতে রেখে আসেন। এ সময় নারী অস্ত্র প্রশিক্ষণ তথা বন্দুক ও রাইফেল চালনা, ব্যরিকেড তৈরি, লাঠি চালানো, গ্রেনেড ছোঁড়া এবং আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ (যেমন- মরিচের গুড়া শত্রুর গায়ে নিক্ষেপ) গ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকি নির্জন কোন পাহাড়ী জায়গায় বা কোন বাড়ির উঠানে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। অবসরপ্রাপ্ত মেজর, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ নারী প্রমুখ এসব প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। আবার বীর নারী বুকে মাইন বেঁধে শত্রু ট্যাংকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাবনার শিরিন বানু মিতিল পুরুষের বেশে অস্ত্র কাঁধে নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হলের প্রাক্তন ও তখনকার যে সকল ছাত্রীরা বিভিন্নভাবে সংগ্রামে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম সাজেদা চৌধুরী, বদরুন্নেসা আহমেদ, জাহানারা ইমাম, আইভি রহমান, মতিয়া চৌধুরী, মালেকা বেগম, মাহফুজা খানম, আয়শা খানম, সুলতানা কামাল, রাশেদা খানম রীনা, রাফিয়া আখতার ডলি, ফোরকান বেগম, মমতাজ বেগম, এডভোকেট মমতাজ বেগম, ফরিদা আখতার, রোকেয়া খানম, বেবী মওদুদ, আলেয়া ফেরদৌসী, অ্যারোমা দত্ত, ড. ফৌজিয়া মুসলেম, ড. মখদুমা নার্গিস প্রমুখ।[৯৮১] অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে থেকে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা দেন ড. নীলিমা ইব্রাহীম, রাশেদা খান রীনা, সৈয়দা মনিরা আক্তার, নাসিমুন আরা মিনু, জিয়াউন নাহার রোজি, কাজী মমতা হেনা, রাশেদা আমিন প্রমুখ নারী। এছাড়া শব্দ সৈনিক ড. সনজিদা খাতুন, লায়লা হাসান, নাসরীন আহমেদ প্রমুখ নারী মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন। উল্লেখ্য ড. সুলতানা জামানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মেয়েরা কল্যাণীর ক্যাম্পে আশ্রিত পূর্ব বাংলার জনগণ ও শিশুদের সেবা শুশ্রূষা করেছেন।[৯৮২]

[৯৮১] সেলিনা চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০

[৯৮২] মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৪

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি নারী ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশ, ইউরোপ, আমেরিকা, ব্রিটেনের নারী সমাজের সাথে সংহতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর রাজাকার দেশদ্রোহীদের মাধ্যমে দেশের সেরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। এ সময় নির্মমভাবে নিহত হন কবি মেহেরুন্নেসা ও সাংবাদিক আক্তার পারভীন।[৯৮৩] উল্লেখ্য অস্ত্রহাতে রণাঙ্গনে যে সকল নারী অংশ নেন তাদের মধ্যে বরিশালের করুণা বেগম, শোভা রানী, বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা, সাহানা, শোভা, গোপালগঞ্জের আশালতা বৈদ্য, মেহেরুন্নেছা, পটুয়াখালীর মনোয়ারা বেগম, যশোরের সালেহা বেগম, সুনামগঞ্জের পেয়ার চাঁদ, কুড়িগ্রামের তারামন বিবি, রাজিনা আনসারী, নারায়ণগঞ্জের ফোরকান বেগম সহ আরো অনেকে। অস্ত্র ছাড়া সমরক্ষেত্রে অংশ নেন ত্রিপুরার কাঁকন বিবি, পাবনার ভানু নেছা সহ আরো অনেক নারী।[৯৮৪] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৭-৮ মাস সময় শেখ হাসিনা (বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী), বোন শেখ রেহেনা, ছোট ভাই শেখ রাসেল এবং মা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব একই বাড়িতে বন্দি ছিলেন। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও মেয়ে শেখ হাসিনার কৌশলী ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধকে গতিশীলতা দানে সহায়তা করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া, অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা, রান্না-বান্না, আহত যোদ্ধাদের সেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া, প্রয়োজনে হাসপাতালে নেওয়া, নানা রকম তথ্য সরবরাহ, লিফলেট প্রকাশ ও বিতরণ, চিঠিপত্র ও পত্রিকা সরবরাহ, পাক-বাহিনীর ক্যাম্প সনাক্তকরণ, স্বাধীন বাংলা বেতার ও বিবিসি'র খবর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছানো, বস্ত্র ও ঔষধ সরবরাহ করা, জনমত গঠন ও সমাবেশ করা, সর্বোপরি যুদ্ধে অনুপ্রেরণা দান করা প্রভৃতি কাজ এসময় নারীসমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেছে। অন্যদিকে মেয়েরা মুক্তিযুদ্ধের সময় শারীরিকভাবে নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর সৈন্যদের দ্বারা প্রায় ১৪ লাখ নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং স্বামী-পুত্র-কন্যা হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ৪ লাখ নারী ধর্ষিত হয়েছেন।[৯৮৫]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। রাজধানী ঢাকার শহীদ মিনারে সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসভা হয়। কোটি কোটি নির্যাতিত অত্যাচারিত মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী জনগণের শোকাকুল মা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্ত্রী, রাজাকারের হাতে নিহত শহীদ

---

[৯৮৩] *ঐ*

[৯৮৪] শাহনাজ পারভীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩-৯৩

[৯৮৫] ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৫৭

বুদ্ধিজীবীর স্ত্রী, বোন, মা এ সভায় যোগদান করেন। সকলে মিলে এখানে শপথ নেন তারা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলবেন। এভাবে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের সাথে কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে নারী স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার গৌরবে নারী সমান অংশীদার।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ শতকের শুরু থেকে বাংলার নারীসমাজ সীমিত পরিসরে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে শুরু করে এবং তারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণও করতে থাকে। এক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে তাদের বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত থাকা পুরুষতন্ত্র তথা পিতৃতন্ত্রের অচলায়তন ভেঙ্গে এই প্রথমবারের মতো ব্যাপক সংখ্যক বাঙালি নারী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুরুষের সাথে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সফলতার ফলে ধীরে ধীরে বাঙালি নারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে, তারা সাহসী হয়ে ওঠেন। তাই অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম, সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ এবং দেশ বিভাগের পর ভাষা আন্দোলনে বাঙালি নারী প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। মায়ের ভাষা রক্ষার তাগিদে রক্ষণশীল পরিবেশের পরিমণ্ডল ছেড়ে নারীসমাজ রাজপথে বেরিয়ে এসেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সফলতা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের স্পৃহাকে অনেক বেশি সম্প্রসারিত করে। ফলে পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য আন্দোলন, ছয়দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় কার্যক্রম, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজ দুঃসাহসিক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার কৃতিত্ব রেখেছেন। অস্ত্রহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেমন নারী পাকিস্তানি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তেমনি যোদ্ধাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করে মুক্তিযুদ্ধে গতিশীলতা দানে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন। সত্যিকার অর্থে এক নদী রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের গৌরবের পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ নারীর অবদানের কথা অনস্বীকার্য।

উপসংহার

বিশ শতকের শুরুতে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারী মুক্তি আন্দোলন অত্যন্ত কার্যকরীভাবে শুরু হয়। এসময় বাঙালি নারীর অবরোধপ্রথা এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার সূচনা ঘটে। তারা দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত নারী বিরোধী নানা অনাচার থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে কেবল নারী নয় বরং একজন মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি শুরু করে। নারী অধিকার রক্ষায় ব্যক্তি পুরুষের ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত থাকায় নারীকেই এগিয়ে আসতে হয় নিজেদের মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে। এক্ষেত্রে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। নারী হিসেবে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আজকের দিনেও গভীরভাবে অনুভূত হয়। সমাজে সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়া নারীসমাজের জন্য তার ভূমিকা ছিল আলোক শিখার। পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনের একটি মজবুত ভিত্তি রচনা করেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন নারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন তাঁরই আদর্শের পথ ধরে। এভাবে ধীরে ধীরে বাঙালি নারীর শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা নিজেদেরকে জাগরিত করে সংগঠিত হয়ে স্বজাতির অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁরা নানা সময়ে সংঘটিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিতে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব বাংলার নারী জাগরণ এবং আন্দোলন আলোচনার পূর্বে বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্ব এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, বিশ শতকে (১৯০১-১৯৭১) পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে যে নারীবাদী চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটে তা উদারনৈতিক নারীবাদী ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা এখানে বৈপ্লবিক হওয়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল না, যার অন্যতম উপাদান হলো নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি। তাই বিশ শতকে উদারনৈতিক নারীবাদ দ্বারাই বাঙালি নারীজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিকরা প্রভাবিত ছিলেন। উল্লেখ্য বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলায় মার্ক্সসীয় নারীবাদ তথা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী ভাবধারার প্রভাব কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। তবে সার্বিকভাবে আলোচিত সময়ে উদারনৈতিক নারীবাদের আদর্শের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সমাজ অগ্রগতি নির্ণয়ে একটি বড় মাপকাঠি হলো সে সমাজে নারীর অবস্থান এবং তাদের আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা। প্রাচীনকাল থেকে দাসত্বের বন্ধন হতে বেরিয়ে আসার জন্য বাঙালি নারীর দীর্ঘ সংগ্রামের এক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত ব্রাহ্মসমাজের প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের

সূচনা হয়। যার প্রভাব বাংলার নারীর উপরও পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রচলিত গোঁড়া মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছু নতুন পদক্ষেপ সামগ্রিকভাবে বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের কিছুটা সহায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মসমাজ, ইয়ংবেঙ্গল এবং বেশ কয়েকজন প্রগতিমনস্ক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারের পক্ষে জনমত তৈরি ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালি মেয়েদের কয়েকটি সংগঠন ও সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ধীরে ধীরে বাংলার নারীসমাজ তাদের উপযোগী উন্নত সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরন্তর সংগ্রাম শুরু করে। আর এ সংগ্রামের পথ ধরেই আলোচ্য সময়ে পূর্ব বাংলার নারীসমাজ প্রথমে কঠোর অবরোধপ্রথার বেড়াজাল হতে কিছুটা মুক্ত হয়ে বিদ্যার্জন করে সাহিত্য ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ শুরু করে। যা তাদের অগ্রসরমান ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। শুধু গৃহ পরিমণ্ডলের কাজ ব্যতীত নারীর যে আরো বহুমুখী কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার সুযোগ আছে, এ বিষয়টি উপলব্ধির পর উনিশ শতকের শেষ দিক হতে বিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাঙালি নারীর যেরূপ উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয় তাকে নিশ্চিতভাবে নারী জাগরণের যুগ বলে আখ্যায়িত করা যায়। বস্তুত উনিশ শতকের শেষে বাঙালি সংস্কারপন্থীদের চেষ্টায় নারী উন্নয়নের যে ব্যাপক প্রয়াস অনেকটা আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে তা সর্বত্রগামী হতে পারে নি। তবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এ প্রয়াসের প্রভাব ক্রমশ লক্ষ্যগোচর হয়। প্রথম যুগে শিক্ষিত ও উপার্জনশীল সব মেয়েই ছিলেন ব্রাহ্ম অথবা খ্রিস্টান। পরবর্তীকালে হিন্দু এবং মুসলমান মেয়েরাও শিক্ষালয়ে এবং উপার্জনক্ষেত্রে প্রবেশ করে কৃতিত্ব অর্জন করতে থাকেন। নারী প্রগতির এই আশাব্যঞ্জক রূপ একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সামাজিক স্তরে বৈষম্যহীন অধিকার প্রাপ্তি বা প্রতিভা বিকাশের উপযোগী পরিবেশের সুযোগ লাভ- এগুলির জন্য মেয়েদের আরো কিছুটা পথ অতিক্রম করতে হয়।

আমরা দেখতে পাই বিশ শতকের শুরুতে নারীর সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়, আর এ পরিবর্তনে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি উপলব্ধি করেন শিক্ষা ছাড়া বাঙালি নারীর দুর্ভোগ মোচন সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যে তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি মেয়েদের জন্য ছেলেদের সমমানের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা সমাজের কাছে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লেখনীর মাধ্যমে নারীসমাজের তৎকালীন সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়ার অবস্থা চিহ্নিতকরণ এবং তাদেরকে সে দূরাবস্থা থেকে উত্তোরণের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর *মতিচূর, প্রথম খণ্ড* (১৯০৫), *পদ্মরাগ* (১৯১২ সালে রচিত, প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে), *সুলতানার স্বপ্ন* (১৯০৮) সহ সকল রচনায় নারী পুরুষের অসম অবস্থান, নারীর উপর পুরুষ ও সমাজের অত্যাচার, পর্দাপ্রথার নামে নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখা, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে বাঙালি পরিবার ও সমাজে নারী যে

অধস্তন হয়ে পড়ছে তা বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আবার বাস্তবতা মেনে নিয়ে তিনি পিছিয়ে পড়া নারীর সার্বিক উন্নয়নে সমাজের পুরুষের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণের জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সমাজের পুরুষ এগিয়ে না এলে নারীর সার্বিক অগ্রগতি সম্ভব নয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। রোকেয়া দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি নারীর মন-মানসিকতার পরিবর্তনের আকাঙ্খা লক্ষ্য করে তাদেরকে সনাতন চিন্তা-চেতনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে জেগে উঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করতেন নারীর অবশ্যই সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে তাদের মানসিকতা প্রশস্ত করার জন্য এবং নিজেদেরকে আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ করার শিক্ষা দিতে হবে। নারীকে এটাও মনে করিয়ে দিতে হবে যে, ঘর-সংসারের প্রতি যেন কোন অবহেলা না হয়, কারণ সুশৃংখল পরিবারের উপরই দেশের মঙ্গল বা সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

ধর্মের প্রতি মানবজাতি স্বভাবতই দুর্বল। তাই যুগে যুগে পুরুষজাতি ধর্মকে নারী শাসনের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছে। ধর্মের নামে পুরুষসমাজ নারীকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে নারীর উপর প্রভুত্ব করেছে- এ অভিযোগও রোকেয়া উত্থাপন করেন। এরূপ অন্যায় নারীর সহ্য করা উচিত নয় মর্মে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সমাজে প্রচলিত ধর্মের নামে পর্দাপ্রথার দোহাই দিয়ে নারীকে ঘরের কোণে বন্দি করে রাখার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে তিনি লেখাপড়া শিখে নারীর অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর জোর তাগিদ প্রদান করেছেন। নারীর জন্য অর্থ উপার্জন করাটা নারীমুক্তির অন্যতম সূচক যা রোকেয়া উপলব্ধি করেন। তিনি নারীকে পায়ের নীচে শক্তি দেয়ার জন্য অর্থনৈতিক ভীত তৈরির ব্যবস্থা করেছিলেন।

রোকেয়া নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তাদেরকে সচেতন ও জাগ্রত করার লক্ষ্যে নারীমনের হীনতা দূর করার চেষ্টা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি মেয়েদেরকে আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। নারীর হীনতাবোধ দূরীভূত না হলে পুরুষের প্রভুত্ব না মানার মানসিকতা যে নারীর তৈরী হবে না– এ উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। সমাজের অর্ধাংশ নারীসমাজকে বঞ্চিত রেখে জাতীয় উন্নতি যে সম্ভবপর নয়, এ বিষয়ে তিনি সমাজপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় নারীর অধিকার এবং পুরুষ ও নারীর যে সমতা প্রতিষ্ঠার দাবি প্রবলভাবে উঠে এসেছে, তা ছিল তৎকালীন মুসলিম সমাজ সংস্কৃতির পরিবেশে খুবই বৈপ্লবিক এবং বিদ্রোহাত্মক। তিনি নারী পুরুষের সমঅধিকারের দাবি তুলে বলেছেন, নারী-পুরুষ সমাজ দেহের দুটি চক্ষুস্বরূপ। মানুষের সব রকমের কাজকর্মের প্রয়োজনেই দুটি চক্ষুর গুরুত্ব সমান। রোকেয়ার এ ধরনের চিন্তাভাবনা আজকের পৃথিবীতে

জেন্ডার সমতার ক্ষেত্র বিশ্লেষণের মৌলিকসূত্র। জেন্ডার সমতার যে সমাজমনস্ক চিন্তা পরিব্যপ্ত হয়েছে বিশ্বজুড়ে তা কোনো তাত্ত্বিক উদ্ভাবন ছাড়াই রোকেয়া তার আপন জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অনুধাবন করেছিলেন। তিনি গত শতকের শুরুর দিকে যখন এ জায়গাগুলি চিহ্নিত করেছিলেন তখন জেন্ডার ধারণার জ্ঞান একাডেমিক জগতে প্রবেশ করেনি। এখানেই রোকেয়াকে স্মরণ করার যৌক্তিক অনুশীলন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ শতকের নারী শিক্ষার অপরিহার্যতার কথা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের যোগ্য উত্তরসূরী শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ও সুফিয়া কামালের (১৯১১-১৯৯৯) বক্তব্যের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। মেয়েদেরকে শুধু ঘরের কাজ করানোর জন্য গৃহপরিমণ্ডলে আবদ্ধ রাখলে চলবে না সে সত্যটি এ সময়কার নারী জাগরণী কর্মীদের মধ্যেও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এ সময় সমাজে নারীর হীন অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয় এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রবাহ আরো শক্তিমান ও গতিশীল হয়ে ওঠে। আলোচ্য সময়কালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে অনুসরণ করে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী খায়রুন্নেসা খাতুন (১৮৭০-১৯১২), মিসেস এম. রহমান (১৮৮৫-১৯২৬), নূরুন্নেসা খাতুন (১৮৯৪-১৯৭৫), ফাতেমা খানম (১৮৯৪-১৯৫৭), ফজিলতুননেসা (১৮৯৯-১৯৭৭), লীলানাগ (১৯০০-১৯৭০), মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৯), রাজিয়া খাতুন (১৯০৭-১৯৩৪) প্রমুখ মহিলা নারী জাগরণে এবং নারীমুক্তির লক্ষ্যে অনেক জোরালো, বৈপ্লবিক ও বিদ্রোহাত্মক বক্তব্য রেখেছেন। এসকল নারীর চিন্তাচেতনার জগতে ঘিরে ছিল নারী উন্নয়ন। প্রত্যেক নারীর লেখনীতে উঠে এসেছে পূর্ব বাংলার নারী জীবনের নানা সমস্যা এবং এ সকল সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা। এক্ষেত্রে তাদের লেখনী বা চিন্তা চেতনার মধ্যে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তারা প্রত্যেকেই নারীর দুর্দশা মোচনে শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন, পর্দাপ্রথার শিথিলতা দাবি করেছেন এবং নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মিসেস এম. রহমান, ফজিলতুননেসা, শামসুন নাহার মাহমুদ প্রমুখ নারীর প্রতিবাদী বক্তব্যের তীব্রতা প্রমাণ করে যে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে নারী সমাজের মধ্যে সচেতনতাবোধ ও মুক্তির আকাংখা ছিল অদম্য- যদিও এ সচেতনতাবোধ ও মুক্তির আকাংখা জাগ্রত হয়েছিল নারী সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে।

নারী মুক্তির জন্য নারী জাগরণ প্রয়োজন- আর এ জাগরণে এবং নারীর মনোভাব প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে তৎকালীন পত্র-পত্রিকা। যেমন- *ইসলাম প্রচারক* (১৮৯১), *কোহিনূর* (১৮৯৮), *নবনূর* (১৯০৩), *মাসিক মোহাম্মদী* (১৯০৩), *আল-এসলাম* (১৯১৫), *সওগাত* (১৯১৮), *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা* (১৯১৮), *আন্নেসা* (১৯২১), *শিখা* (১৯২৭), *জাগরণ* (১৯২৮), *বুলবুল* (১৯৩৩), *বেগম* (১৯৪৭) প্রভৃতি। এসকল পত্র-পত্রিকা সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের নারী সম্বন্ধীয় চিন্তা-ভাবনা,

আলোচনা প্রভৃতি জনসম্মুখে উপস্থাপন করে বাঙালি মুসলিম নারীর সার্বিক কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বুদ্ধিজীবী ও সচেতন ব্যক্তিবর্গ বাঙালি মুসলিম নারীর অসহায়ত্ব ও করুণ অবস্থা সমকালীন এসব পত্রিকার মাধ্যমে জনসম্মুখে তুলে ধরে এর প্রতিকারের উপায় সম্পর্কেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সামাজিক কুসংস্কার ও নারীর প্রতি অবহেলা ও উদাসীন মানসিকতায় আচ্ছন্ন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা যে সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন এ কথা বারবার উঠে এসেছে। বিশেষ করে *সওগাত* ও *বেগম* পত্রিকা পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে। এ পত্রিকা দুটিতে মেয়েরা নিজেদের কথা একান্ত নিজের মতো করো প্রকাশ করতে পারতো। আবার এ সকল পত্রিকা মেয়েরা নিয়মিতভাবে পাঠ করতো। ফলে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণে ও নারী মুক্তি আন্দোলনে সমকালীন পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

বিশ শতকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীকে প্রগতিশীলতায় বাধা প্রদান করলেও নারীজাগরণে কতিপয় ব্যক্তি পুরুষের কথা স্মরণ করতেই হয়। যেমন- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং তাঁর সমসাময়িক নারী যতটুকু পড়ালেখা শিখেন তা বাবা, ভাই বা কোনো সময় স্বামীর সহযোগিতায় শিখেছেন। আবার ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) নারীশিক্ষা প্রসারে তদানীন্তন বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে অর্থ সহায়তা দিয়েছেন এবং ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করেছেন। আমরা দেখি *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন নিজ তাগিদে এগিয়ে এসে মেয়েদের জাগরণে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন এবং মেয়েদের জন্য পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম এবং ঢাকার শিখাগোষ্ঠীর অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা নারী জাগরণে ও নারীকে মুক্তি আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছেন। ফলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারী প্রগতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও আলোচ্য সময়কালে এ সকল পুরুষের অবদানের কথা স্বীকার করতেই হবে।

তবে একটি বিষয় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে স্পষ্ট যে, পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণে ব্যক্তি নারীরই মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। এ কথাটি ধ্রুব সত্য। এ সময় নারী জাগরণের লক্ষ্য ছিল নারীমুক্তি অর্জন। পূর্বের যাবতীয় অন্যায় অনাচার থেকে নারীর মুক্তি। ফজিলতুননেসা সওগাত পত্রিকায় "মুসলিম নারী মুক্তি" প্রবন্ধে বলেন- 'মুক্তি' শব্দের অর্থ হচ্ছে নিজের মনের মুক্তি প্রাপ্তি। বিশ্ব ও সমাজের সামনে নিজের স্বাধীন সত্তা তুলে ধরা এবং নিজেকে বিচার বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত করাই হচ্ছে একজনের আত্মার মুক্তি। ফজিলতুননেসা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব বাংলায় নারীজাগরণ ও আন্দোলনে ঢাকা বিদ্যালয়ের অবদান অতুলনীয়। লীলানাগের ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ শ্রেণিতে যোগদান এবং ১৯৩৫ সালে করুণাকণাগুপ্তের শিক্ষক হিসেবে (ইতিহাস বিভাগের) নিয়োগকে সে সময়ের নারীর সাহসী পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করা যায়। আবার মুক্তবুদ্ধির

চর্চা এবং নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী *মুসলিম সাহিত্য সমাজ* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলেই গড়ে উঠে। অন্যদিকে আলোচ্য সময়ে বাঙালি মেয়েদেরকে সাংবাদিকতায় দেখা যায়। নূরজাহান বেগম তাদের মধ্যে অন্যতম। নূরজাহান বেগম সহ অপরাপর নারীর লক্ষ্য ছিল বাঙালি নারীর সার্বিক মঙ্গল ও উন্নয়নের মাধ্যমে মুক্তির স্বাদ উপভোগ করানো। এ লক্ষ্যেই তারা সারাজীবন কাজ করে গেছেন।

১৯০১-১৯৭১ খ্রি. সময়ে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণে ও নারী মুক্তির আন্দোলনে বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সংগঠনের অবদান উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা সমিতি *আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম* নারীমুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। এ সমিতি অবহেলিত বাঙালি মেয়েদের নানা সহযোগিতা এবং কুটির শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিশেষ সহায়তা করেছে। এছাড়া তৎকালীন সময়ে বেশ কিছু মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল সমিতি মেয়েদেরকে সংগঠিত করে নিজেদের বিষয়ে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নারী সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় নির্ধারণে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। আমরা দেখেছি *বেগম ক্লাব* দেশি ও বিদেশি নারীকে নিয়ে সমন্বিত সভার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাঙালি নারীর চিন্তা চেতনা তথা নারী ভাবনার আদান-প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে *বেগম ক্লাবের* উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মহিলা ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ক্লাবের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সদস্যরা বেশ উদ্যমের সাথে নারী সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী অধিকার রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। আলোচ্য সময়কালে সবশেষে আমরা *বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ* গঠিত হতে দেখি। এ সংগঠনটি ১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে নারী অধিকার আদায়ে কার্যকর ও বলিষ্ঠ অবদান রেখেছে।

বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু হলে বাঙালি নারীর মানসিক শক্তি ও সাহস ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তারা পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজনীতিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে উৎসাহী হয় এবং ধীরে ধীরে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেও বাঙালি নারী দৃশ্যমান ভূমিকা রাখতে থাকে। এক্ষেত্রে বাঙালি মেয়েদেরকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে প্রথমবারের মতো সক্রিয় হতে দেখা যায়। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী এসময় গৃহকোণ থেকে বেরিয়ে এসে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সভা-সমিতি ও মিছিলে অংশগ্রহণ করে। সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ ছাড়াও মেয়েরা আন্দোলনের কর্মসূচি চরকার প্রচলন, স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার, স্বদেশী ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ ও দান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় থেকেছেন। এভাবে আন্দোলনে যুক্ত হয়ে বাঙালি নারী নিজেদের মধ্যে

রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। এ পর্যায়ে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, সেটি হলো পুরুষ জাতীয়তাবাদীরা নারীকে জাতীয়মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় পুরুষের পাশে নারীর সহায়তাও যে প্রয়োজন সে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে। সমাজ ও দেশের মোট জনসম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অর্ধাংশ নারী- এ বোধটি তখন স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে স্বদেশী আন্দোলনে নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সমসাময়িক সমাজের নানা শ্রেণির নারীকে এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। নারী যে কাজ ছাড়াও জাতীয় আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে- নারীর এ উপলব্ধি এবং নারীর প্রতি সমাজের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন অল্প সময়ের মধ্যে নারীকে খানিকটা সম্মানজনক স্থানে অধিষ্ঠিত করার পরিবেশ তৈরি করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের পথ ধরে পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনে নারীসমাজকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে দেখা যায়। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে বাঙালি নারী দুঃসাহসিক ভূমিকা রেখেছে। আমরা দেখেছি চট্টগ্রামের মেয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। স্বাধীনতার স্বপ্নও নারীকে কত গভীরভাবে আলোড়িত করে তা এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়। এখানে দেখা যায় নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গৌরবের অর্জনকে এগিয়ে দেয় এবং সাফল্য অর্জনে সহায়ক হয়। প্রীতিলতা চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে যাবার পূর্বে এক বিবৃতিতে বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করেন- দেশের মুক্তির সংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য তাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি তার ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, তারা ভগিনীরা কেন উহা পারিবে না? তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন ভারতবর্ষের বোনেরা ভাইদের সাথে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে পারলে সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগদানে তাদের কোনো বাধা নেই। প্রকৃতপক্ষে এসময় বাঙালি নারী কঠোর সংকল্প গ্রহণ করেছে যে, তারা নিজেদেরকে আর দুর্বল মনে করবে না। সশস্ত্র বাঙালি নারী সহস্র বিপদ ও বাধাকে চূর্ণ করে সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করেছেন, যা নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব হিসেবে দেখা যেতে পারে।

আলোচ্য সময়কালে বাংলার গ্রামীণ জনপদে কৃষক আন্দোলনেও নারী অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে। হাজং নৃগোষ্ঠীর রাশিমনি হাজং অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে জীবন দিয়েছেন। তিনি ভারত উপমহাদেশের নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনের প্রথম প্রতীক এবং ঐতিহাসিক টংক আন্দোলনের প্রথম শহীদ। এছাড়া বিশ শতকে মধ্যভাগে কৃষক আন্দোলনে ইলামিত্রের অসাধারণ নেতৃত্ব প্রদানের ভূমিকা সবসময় স্মরণীয়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কৃষক নারী যে তেজোদীপ্ত নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা অতুলনীয়। এ সময় গ্রামাঞ্চলের নারীর ভূমিকা সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকের

দীর্ঘসময় ধরে বাংলার নারীর জীবনে অবিস্মরণীয় জাগরণ ঘটেছে। দুর্যোগে, দুঃসময়ে, সংকটে বাঙালি নারী সাহস ও শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পুরুষের সাথে তারা সমভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এই সাহস ও প্রতিজ্ঞায় বাঙালি জাতির মাতৃভাষার প্রশ্নে ভাষা আন্দোলনে নারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ভাষা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণকারী জাতীয় অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমেদ মনে করেন, ৫২'এর ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন নিজের বিবেকের তাড়নায়, মাতৃভাষার মর্যাদা ও বাঙালি জাতির স্বকীয়তা ও স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। অর্থাৎ এ পর্যায়ে এসে বাঙালি নারীর জাতীয়তাবোধের চূড়ান্ত রূপ আমরা লক্ষ্য করি। মূলত ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান একটি রক্ষণশীল কাঠামোর অধীনে নারীর সর্বত্র অভিগমন সহজসাধ্য ছিল না। তারপরও ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হওয়া রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারী ধর্মের দোহাই দিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকেনি, সভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে এমনকি শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীরাও মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। *রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ* গঠিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালন করেছে। তৎকালে মেয়েরা উপার্জনক্ষম না হওয়ায় অধিকাংশ সময় গায়ের গয়না খুলে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অস্তিত্বের সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রবল তাড়নায় মেয়েরা এভাবে অবরোধের শৃঙ্খল ভেঙ্গে এগিয়ে এসে ইতিহাসে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি করেছে। সত্যিকার অর্থে নারীকে বাদ রেখে ইতিহাসের কোনো বড় অর্জন কখনোই সম্ভব হয়নি।

দেশ, মানুষ, মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও লক্ষ্য অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে নারীর চিন্তা-চেতনা কত গভীর ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারে তারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাঙালি নারী। ভাষা আন্দোলনের সফলতা নারীকে দুঃসাহস যুগিয়েছে। এরপর আর তারা পিছনে ফিরে তাকায়নি। ফলে পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নারী কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৬৬ সালের ছয়দফার প্রচার ও প্রসারে নারীসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান শুরু হলে বাংলার সর্বস্তরের নারীর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। সবশেষে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারী এক অনন্য সাধারণ বহুমাত্রিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে কালজয়ী ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। নারীর এসকল দুঃসাহসিক অগ্রযাত্রা এবং সফলতা নারী জাগরণ ও নারী মুক্তি আন্দোলনের অনিবার্য ফল।

বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকা পিতৃতান্ত্রিকতা বা পুরুষতান্ত্রিকতা, ধর্মীয় বিধিনিষেধ, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, নারীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সমস্যা প্রভৃতি নারী জাগরণের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু সীমিত সুযোগ, পরিবেশের বাধা, সামাজিক পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও বিশ শতকের সূচনালগ্নে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন অসামান্য নারী হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁরই আলোর পথ ধরে

আমরা বেশ কয়েকজন নারীকে এ শতকে নারী জাগরণে ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকায় দেখতে পাই। রোকেয়া এবং তাঁর অনুসারী ব্যক্তিত্বরা তৎকালীন নারীর অধিকার, মানুষ হিসেবে তার মর্যাদা তথা নারীকেন্দ্রিক সমস্যাগুলি দূর করে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য সোচ্চার হয়েছেন। এ সকল প্রতিথযশা মহিলাদের চিন্তাচেতনায় প্রাধান্য পেয়েছে নারীকে শিক্ষিত করতে না পারলে তাদের সঠিক মুক্তি সম্ভব নয়। কেবল জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করালেই বাঙালি নারীর মধ্যে আত্মজাগরণ ঘটতে পারে। নারী সমাজের এই অগ্রসর শ্রেণির নারী নিজেদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দুঃখ-যন্ত্রণা ও সামাজিক নিষ্পেষণ তাদেরকে সমগ্র নারীসমাজের মুক্তির জন্য আন্দোলনে সংগঠিত করতে অনুপ্রাণিত করে। তারা সমগ্র বাঙালি নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার অর্জনের সংগ্রাম করেন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে সমাজে একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। আর এটাই নারীমুক্তি আন্দোলন। এ আন্দোলনের ফলে সমগ্রভাবে প্রথমদিকে নারী সমাজের মুক্তি ঘটেনি সত্য কিন্তু এর ফলে ধীরে ধীরে বৃহত্তর আন্দোলনের পটভূমি রচিত হয়। প্রথম দিকে নারী আন্দোলন পরিচালিত হয় বন্ধন মুক্তির প্রত্যাশায়। অর্থাৎ নারী যেন সমাজে সুকন্যা, সুমাতা, সুগৃহিণীর ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে এ আন্দোলনে যুক্ত হয় ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা। কৃষক, শ্রমিকের ও সাধারণ মানুষের সংকট দূর করা, নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধ করা, নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন এবং পারিবারিক আইনের সংস্কার সাধন। উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙালি নারী বীরত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন।

শত বছর পূর্বে বাংলায় নারী-পুরুষের যে সমঅধিকারের তথা জেন্ডার সমতার যে সমাজমনস্ক চিন্তা পরিলক্ষিত হয় তখন তা ছিল যুগের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসরমান। বর্তমানে এই জেন্ডার সমতা নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে। আবার শতবছর পূর্বে নারীর ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে আজ নারীর সে অধিকারের স্বীকৃতি মিলেছে। বর্তমানে জাতীয়ভাবে, আন্তর্জাতিকভাবে এবং জাতিসংঘের পক্ষ থেকে নারীর ব্যক্তি অধিকার রক্ষার বিশেষ ঘোষণা ও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জাতীয়ভাবে শাসনতন্ত্রে নারী বান্ধব নীতি গৃহীত হচ্ছে। শত বাধা উপেক্ষা করে বাংলাদেশের নারী অগ্রসর হচ্ছে পরিবারে, ব্যক্তি জীবনে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে, দেশের উন্নয়নের কাজে এবং অর্থনৈতিক ভূমিকায়। রাজনৈতিক অঙ্গনেও মেয়েরা এগিয়ে এসেছে অত্যন্ত সফলতার সাথে। মেধা, মননে, চিন্তা, চেতনায়, কর্ম ও স্পৃহায় এক নতুন আলোকিত সমাজ তৈরি হচ্ছে। নারীর এই অগ্রসরমান অবস্থানের পথটি তৈরি হয়েছে বিশ শতকের নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে।

তবে এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিকতার অস্তিত্ব এখনও সমাজে বিরাজমান। এখনও সমাজে নারীর সমঅধিকার ও সম সুযোগের বাস্তবায়ন পুরোপুরি ঘটেনি। এখনও

মেয়েরা পিতার সম্পত্তিতে সমঅধিকার লাভ করতে পারছে না এবং নারী প্রতিনিয়ত নানা রকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। মা যেন তার সন্তানের অভিভাবকত্বের অধিকার লাভ করতে পারে সেটা বাংলাদেশের আইনে সংশোধন দরকার। তাই মানবিক বিবেচনায় নারীর সার্বিক অর্থাৎ আত্মিক ও দৈহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নিরূপিত নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধক সকল বিধি বিধানের পরিবর্তন সাধন করা দরকার। বর্তমানে বাংলাদেশে নারীবান্ধব সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও নারী আন্দোলন শেষ হয়নি। পিতৃতান্ত্রিকতা ও পুরুষতান্ত্রিকতার বাধা-বিঘ্ন থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের দেশের সকল স্তরের নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন। আর এই জটিল অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে হলে আমাদের প্রয়োজন একটি আলোকিত ভাবধারার নতুন প্রজন্ম।

পরিশিষ্ট- ১

আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম, বাঙ্গালা

(নিখিল বঙ্গ মুস্‌লিম মহিলা সমিতি)

নিয়মাবলী

(প্রতিষ্ঠিত-১৯১৬ খৃষ্টাব্দ)

সেক্রেটারী

মিসেস শামসুন নাহার মাহমুদ বি. এ

জয়েন্ট সেক্রেটারী

মিসেস এম. রশীদ

১৯৩৪

আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম, বাঙ্গালা

(নিখিল বঙ্গ মুস্‌লিম মহিলা সমিতি)

পরিচয়

বাঙলার মুসলমান নারী-আন্দোলনের অগ্রনায়িকা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন প্রায় বিশ বৎসর আগে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নারী সমাজের শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া সেই সুদূর অতীতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। ভাবিয়া ভাবিয়া পঁচিশ বৎসর আগে তিনি বুঝিয়াছিলেন, শিক্ষা না হইলে ইহাদের দুঃখ ঘুচিবে না। সেদিন হইতে শিক্ষার জন্য কিভাবে তিনি নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন তাহা আর কাহাকেও নতুন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র এই আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম।

আঞ্জুমনে খাওয়াতীন তাহার এই দীর্ঘকালের জীবনে কি কি কাজ করিয়াছে তাহার বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়, অতীতে বহু বিধবা নারী ইহার নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য পাইয়াছে, বহু বয়ঃপ্রাপ্তা দরিদ্রা কুমারী ইহার সাহায্যে সৎপাত্রস্থা হইয়াছে, বহু অভাবগ্রস্তা বালিকা ইহার অর্থে শিক্ষালাভ করিয়াছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ সেবা ও পরোপকারের কথা উল্লেখ করিলে ইহার সম্পর্কে কিছুই বলা হইল না। কলিকাতার মুসলমান নারী-সমাজের গত বিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়- এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রাখিয়াছে। প্রারম্ভে এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে ইহার প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস হোসেন যখন লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেন তখন তাঁহাকে সমাজের চোখে কতইনা হেয় ও হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিল। মুসলমান মেয়েরা ঘরের কোণ ছাড়িয়া সভা সমিতিতে যোগদান করিবেন, সমাজের কাজ করিবেন, একথা তখন কেউ কল্পনাও করিতে পারে নাই। মিসেস হোসেন হাত ধরিয়া এক একজনকে ঘরের বাহির করিলেন। ক্রমে ইহাদের একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হইল। ধীরে অতি ধীরে তাঁহারা বুঝিলেন, সভা সমিতি কাহাকে বলে। তাঁহারা দেখিলেন নিজেদের দুর্গতি কতদূর চরমে পৌঁছিয়াছে, তাঁহারা শিখিলেন তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে। এক কথায় বলিতে গেলে আঞ্জুমনে খাওয়াতীন প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া দিনের পর দিন চেষ্টার ফলে শত শত মুস্‌লিম নারীর চক্ষু ফুটাইল।

যাঁহারা এই আঞ্জুমনের সঙ্গে প্রথম হইতে ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নবাব-বেগম সলিমুল্লাহ, লেডী শামসুল হুদা, লেডী আব্দুর রহীম, লেডী গজনভী, নবাব-বেগম বদরুদ্দীন হায়দার, মিসেস এ. কে ফজলুল হক ও মিসেস আবদুল করিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে লেডী গজনভী, লেডী আবদুর রহিম, মিসেস এম. এ. মোমিন, নবাব-বেগম ফারুকী, মিসেস আজিজুল হক, মিসেস এ. কে. ফজলুল হক, মিসেস রেজাউর রহমান খান, মিসেস আর আহ্‌মদ, মিসেস নুরুন্নবী চৌধুরী, মিসেস রেশাদ, বেগম আসিয়া খাতুন, এম. ফাতেমা খানম, মিসেস রশীদ, মিসেস সুফিয়া এন. হোসেন, মিসেস গফফার, মিসেস শামসুন নাহার মাহমুদ প্রভৃতি মুসলমান সমাজের অভিজ্ঞ ও কর্ম্মদক্ষ মহিলারা উহার পরিচালক এবং পৃষ্ঠপোষক।

উদ্দেশ্য

মুসলমান নারীসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনই এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য। দীর্ঘকালের সামাজিক কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজে, পারিবারিক জীবনে, সকল দিক দিয়া তাঁহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবেন-

সুগৃহিনী, সুজননী ও সুনাগরিক (Good Citizen) হইয়া সর্ব্বত্র নিজের বিশিষ্ট স্থানটুকু অধিকার করিবেন ইহাই আঞ্জুমনে খাওয়াতীনের একমাত্র লক্ষ্য।

কার্যপদ্ধতি

উপরোক্ত উদ্দেশ্য কার্য্যেপরিণত করিবার আশায় আঞ্জুমনে খাওয়াতীন নিম্নলিখিত ভাবে কাজ করিবেন:

১. নিয়মিতভাবে মেম্বরদের মিটিং ডাকা হইবে। তাহাদিগকে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর ভাবের আদান প্রদান ও সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধনের সুযোগ দেওয়া হইবে এবং সমাজের হয়ে তাঁহাদের প্রেরণা জাগাইবার চেষ্টা করা হইবে।

২. সমিতি নারীসমাজ- সংক্রান্ত সমুদয় সমস্যা ও যাবতীয় প্রশ্নের আলোচনা করিবেন এবং সে বিষয়ে আপন মতামত প্রকাশ করিবেন।

৩. সাধারণ সভাসমূহে শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়, নারী সমাজের কল্যাণকর প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ, শিশুমঙ্গল, শরীরপালন, দেশ বিদেশের নারী আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

৪. সময় সময় ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে এবং অন্যান্য উপায়ে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে সহজ ও মনোরম করিয়া মহিলাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করা হইবে।

৫. সমিতির সভ্যগণ দরিদ্র পল্লীসমূহে যাইয়া আর্ত্ত ও পীড়িতের প্রয়োজন মত যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

৬. এই দারুণ অর্থসঙ্কটের দিনে প্রাপ্তবয়স্কা নারীদিগকে, নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় শিল্প-কর্ম্ম ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাহার দ্বারা তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের সহায়তা করিতে চেষ্টা করা হইবে।

নাম

এই সমিতি আঞ্জুমনে খাওয়াতীনে ইস্‌লাম বাঙ্গালা (নিখিল বঙ্গ মুস্‌লিম মহিলা সমিতি) বলিয়া অভিহিত হইবে।

কর্ম্মকর্ত্তা

ক. এই সমিতির একজন সভানেত্রী ও চারজন সহকারী সভানেত্রী থাকিবেন।
খ. প্রয়োজন অনুসারে একজন সেক্রেটারী, একজন এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী অথবা জয়েন্ট সেক্রেটারী থাকিবেন। অন্ততঃ একজন ইংরেজী অভিজ্ঞ হইবেন। সেক্রেটারীগণ প্রয়োজনমত যথাসম্ভব একে অন্যের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিবেন।
গ. সমিতির একজন কোষাধ্যক্ষ থাকিবেন।

সমিতির সভ্য

ক. যে কোন মুসলমান মহিলা এই সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।
খ. প্রত্যেক সভ্য কমপক্ষে বার্ষিক তিন টাকা চাঁদা দিবেন। যাঁহারা ইচ্ছা করিবেন সমিতির নারী-শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য মাসিক একটাকা বা তদতিরিক্ত চাঁদা দিবেন।
গ. যে সভ্য এক বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত চাঁদা আদায় করিবেন না তিনি কোন বিষয়ে ভোট দিতে পারিবেন না।
ঘ. যে কোন সভ্য এককালীন ২০০ টাকা দিয়া আজীবন সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে পারিবেন।

ঙ. কেহ এই সমিতির মেম্বর হইতে ইচ্ছা করিলে সেক্রেটারীকে জানাইবেন। সেক্রেটারী কার্য্যকরী সভার অনুমোদন লইয়া তাঁহাকে মেম্বর শ্রেণিভুক্ত করিয়া লইবেন।

কার্য্যকরী সভা

ক. মোট ১২ জন সভ্য লইয়া সমিতির কার্য্যকরী সভা গঠিত হইবে। কর্ম্মকর্ত্তাগণ সভার পদবলাৎ সভ্য (Ex- officio member) হইবেন।

খ. সমিতির প্রেসিডেন্ট ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে কোন ভাইস-প্রেসিডেন্ট বা কোন সাধারণ সভ্য কার্য্যকরী সভার কাজ পরিচালনা করিবেন।

গ. সমিতির উন্নতি, অবনতির জন্য কার্য্যকরী সভা সম্পূর্ণ দায়ী হইবেন। সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার, মেম্বর বৃদ্ধি, চাঁদা আদায় ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে সেক্রেটারীকে যথাসাধ্য সাহায্য করা কার্য্যকরী সভার সভ্যদের কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ঘ. যথেষ্ট কারণ ভিন্ন কোন মেম্বর তিনটির অধিক সভায় অনুপস্থিত থাকিলে কার্য্যকরী সভার বিবেচনামত তাঁহাকে উক্ত সভা হইতে অপসারিত করা যাইতে পারিবে।

ঙ. কোরাম ঃ পাঁচজন সভ্য উপস্থিত থাকিলে সভার কাজ চলিতে পারিবে।

চ. বৎসরে অন্ততঃ ছয়টী সভার অধিবেশন হইবে।

ছ. প্রতি তিন বৎসর অন্তর কার্য্যকরী সভা পুনর্গঠিত হইবে। পুরাতন কর্ম্মকর্ত্তা (office bearers) বা মেম্বরগণ পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন।

সাধারণ সভা

ক. বৎসরে ছয়টী সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে, তন্মধ্যে একটী বার্ষিক সভা বলিয়া গণ্য হইবে।

খ. কোরাম (quorum) : অন্ততঃ ১৫ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলে সভার কাজ চলিতে পারিবে।

গ. সভানেত্রীর অনুমতি লইয়া যে কোন মহিলা বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারিবেন।

ঘ. সভায় বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ, ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদির দ্বারা সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার করা হইবে।

ঙ. সভায় নিমন্ত্রিত মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা মেম্বর নহেন তাঁহারা কোন বিষয়ে ভোট দিতে পারিবেন না।

আয়-ব্যয়

ক. মেম্বরদের চাঁদা এবং সমাজহিতৈষী, সহৃদয় ব্যক্তিগণের অর্থ সাহায্যের উপরই প্রধানতঃ সমিতির আয় নির্ভর করিবে।

খ. সেক্রেটারী এবং জয়েন্ট সেক্রেটারীদের মধ্যে একজনের উপর আয়-ব্যয়ের সম্পূর্ণ হিসাব রাখিবার ভার থাকিবে। এই হিসাব রীতিমত কার্য্যকরী সভায় উপস্থিত করিতে হইবে।

গ. বৎসরে অন্ততঃ একবার সাধারণ সভায় হিসাবপত্র দাখিল করিতে হইবে।

ঘ. প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য সেক্রেটারীর হাতে অনুর্দ্ধ কুড়ি টাকা রাখিয়া বাকী সমস্ত টাকা পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে সমিতির নামে জমা রাখিতে হইবে।

ঙ. সেক্রেটারী প্রয়োজন বিশেষে একই বিষয়ের জন্য অনুর্দ্ধ দশ টাকা খরচ করিতে পারিবেন। এই ব্যয় পরে কার্য্যকরী সভায় মঞ্জুর করিয়া লইতে হইবে।

শাখা সমিতি

ক. বাঙলা দেশের যে কোন স্থানে সমিতির শাখা স্থাপন করা যাইতে পারিবে।

খ. প্রত্যেক শাখাসমিতি মূল সমিতিকে বার্ষিক তিন টাকা চাঁদা (affiliation fees) দিবেন।

গ. শাখাসমিতি যথাসম্ভব মূল সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কাজ করিবেন।

ঘ. মূল সমিতি শাখাসমিতিকে সর্ব্বপ্রকারে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবেন।

নারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান

ক. প্রধানতঃ অসহায় অভাবগ্রস্ত মেয়েদের হিতার্থে আঞ্জুমনে খাওয়াতীন এই নারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিবেন।

খ. যথেষ্ট আয়ের অভাবে ও অন্যান্য সামাজিক অসুবিধার দরুণ যতদিন সমিতি শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য যথাবিধি কোন স্কুল পরিচালনা করিতে পারিবেন না, ততদিন পাড়ায় পাড়ায় শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিবেন।

গ. প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাতটীর উর্দ্ধ সংখ্যা ছাত্রী শিক্ষালাভ করিবে।

ঘ. সাধারণতঃ বার বৎসরের নিম্নবয়স্কা ছাত্রী লওয়া হইবে না।

ঙ. সমিতি সম্প্রতি সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে এই কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করিবেন। শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে বর্ত্তমানে কোন বেতন লওয়া হইবে না।

চ. কোন ছাত্রী নিতান্ত দরিদ্র হইলে কার্য্যকরী সভা তাহাকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনিয়া দেওয়ার বিষয়ও বিবেচনা করিবেন।

ছ. সমিতির নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেক কেন্দ্রে সপ্তাহে তিন দিন অথবা দু'দিন ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কাজ করিবেন।

জ. এই কেন্দ্রগুলিতে সেলাই, ছাটকাট, বেতের কাজ ইত্যাদি নানা প্রকার প্রয়োজনীয় অর্থকরী শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে। আচার, চাটনী, জেলী, মোরব্বা ইত্যাদি গৃহস্থ ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর প্রস্তত-প্রণালীও শিখান হইবে। স্বাস্থ্য, শিশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে যাহাতে সাধারণ জ্ঞান জন্মায় তাহারও ব্যবস্থা রাখা হইবে। শিক্ষার্থীর ইচ্ছানুসারে বাংলা বা উর্দ্দু ভাষা এবং সেই সঙ্গে ইংরাজী ও অঙ্ক প্রাইমারী ষ্ট্যান্ডার্ড পর্য্যন্ত পড়ান হইবে।

ঝ. কেন্দ্র সমূহে প্রস্তুত সূচিকর্ম্মাদি এবং অন্যান্য জিনিষ পত্র উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া সমিতি শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিবেন।

ঞ. বৎসরের শেষে সমিতির পক্ষ হইতে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতানুসারে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

ট. অদূর ভবিষ্যতে হোম নার্সিং ইত্যাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্যও সমিতি চেষ্টিত থাকিবেন।

ঠ. সমিতির সভ্যেরা, বিশেষতঃ কার্য্যকরী সভার সদস্যেরা, নিয়মমত কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিবেন এবং তাহাদের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

ড. এই নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কার্য্যকরী সভার উপর ন্যস্ত থাকিবে। কার্য্যকরী সভা তাঁহাদের মধ্যেই এক একজনকে বিশেষ করিয়া এক একটি কেন্দ্রের ভার অর্পণ করিবেন। এই ভারপ্রাপ্ত মেম্বরগণ নিজ নিজ কেন্দ্রের সেক্রেটারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহার আয় ব্যয়, উন্নতি অবনতির জন্য কার্য্যকরী সভার নিকট দায়ী হইবেন। সমিতির সেক্রেটারী ও কার্য্যকরী সভার অন্যান্য মেম্বরগণ তাঁহাদিগকে প্রয়োজনমত সাহায্য করিবেন। তাঁহারা সমিতির সেক্রেটারীর নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবেন।

সমিতি সংক্রান্ত যে কোন বিষয় জানিতে হইলে সেক্রেটারীর সঙ্গে নিম্ন ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন।
২৩, ক্রেমেটেরিয়াম ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আঞ্জুমনের মাসিক চাঁদা দাতাগণের নামের তালিকা

লেডী গজনবী
মিসেস এম. এ. মোমিন
নবাব, বেগম কে. জি. এম. ফারুকী
মিসেস এ. হামিদ
মিসেস মস্‌তরী গোলাম মাওলা
মিসেস ইরাদতুল্লাহ্
মিসেস আজিজুল হক

মিসেস আর. আহ্‌মদ
মিসেস আবদুল করিম
মিসেস এফ. রহ্‌মান
মিসেস কামালুদ্দীন আহমদ
মিসেস কুদরত ই-খুদা
মিসেস এম. ফাতেমা খানম
মিসেস আতাউর রহমান
মিসেস মাহমুদ আলী চৌধুরী
মিসেস আলী আফজল
মিসেস মোহাম্মদ ইস্‌মাইল
মিসেস খলিল আহ্‌মদ
মিসেস রশীদ
মিসেস বদরুদ্দীন আহ্‌মদ
মিসেস ওসমান
মিসেস গাফ্‌ফার
মিসেস ওলিউল ইস্‌লাম
মিসেস মোহাম্মদ আহসান
জোহরা সুলতান বেগম সাহেবা
রওশন আখতার বেগম সাহেবা
মুসতরী বেগম সাহেবা
মিসেস শামসুজ্জোহা
হাজেরা বেগম সাহেবা
মিসেস আহমদ হোসেন
মিসেস আনসার আলী
মিসেস কাজী শামসুজ্জোহা
মিসেস শামসুন নাহার মাহমুদ
মিসেস আলাউদ্দীন আহ্‌মদ
মিসেস জালালুদ্দীন আহ্‌মদ

(সূত্র : তাহ্‌মিনা আলম, 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম', এম. ফিল থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩)

পরিশিষ্ট-২

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'পদ্মরাগ' উপন্যাস সম্পর্কে তদানীন্তন স্কুল ইন্‌সপেক্টর আবদুল করিমের একটি মন্তব্য নিম্নে হুবহু উল্লেখ করা হলো-

13/1, Wellesley Square
CALCUTTA
The 3rd January, 1924

DEAR MRS. HOSSEIN,

Please accept my most hearty congratulations on the completion of your 'Padmarag'. It was with very great interest and pleasure that I went through its manuscript. I have no doubt the book will prove most interesting and instructive to those who read Bengali books. The book seems one of the best of its kind (perhaps the best) in Bengali. Of the new novels I have read one is East Lynne is in English. I am sure the book will have a large sale.

Yours Sincerely
ABDUL KARIM

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচূর' গ্রন্থ সম্পর্কে 'The Mussalman' পত্রিকার ১৯০৮ সালের ৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় এ গ্রন্থের আলোচনা ছিল নিম্নরূপ-

Motichur,- We have received a copy of the 2nd edition of Mrs. R. S. Hossain's "Motichur" and are glad to note certain changes which have made the view expressed therein acceptable of people of different shades to opinion. The book deals principally with the position of woman in our society and the learned authoress impresses upon the necessity of raising the status of her as may enable her to be man's help-mate in life, instead of being a cumbrous burden the weight of which impedes the onward march of man and thus of the entire human race at large. The advanced view of the talented authoress as expressed in the book, her study of human and human weakness, her knowledge of men and things manifasted there in extort admiration of her. Her courage of education is remarkable. In reviewing her book we have been rather unconsciously reviewing herself, but we think we are doing nothing wrong. The book is written in chaste Bengali and the article on 'Sugrihini' or good housewife ought to be read not only by literate women but also by those men who have not bestowed any serious thought on the duties of women. From her delineation of ideal sister, ideal wife and ideal mother, it seems the authoress herself is the embodiment of that ideal. She has said much about the existing Purdah system, but it would be sheer mistake if there be any presumption in anybody's mind that she wants to do away with the system

altogether. Her ideas about nation and nationality as expressed in the book have not been approached even by a minute fraction of the male members of the community and we congratulate the learned authoress on her happy production.

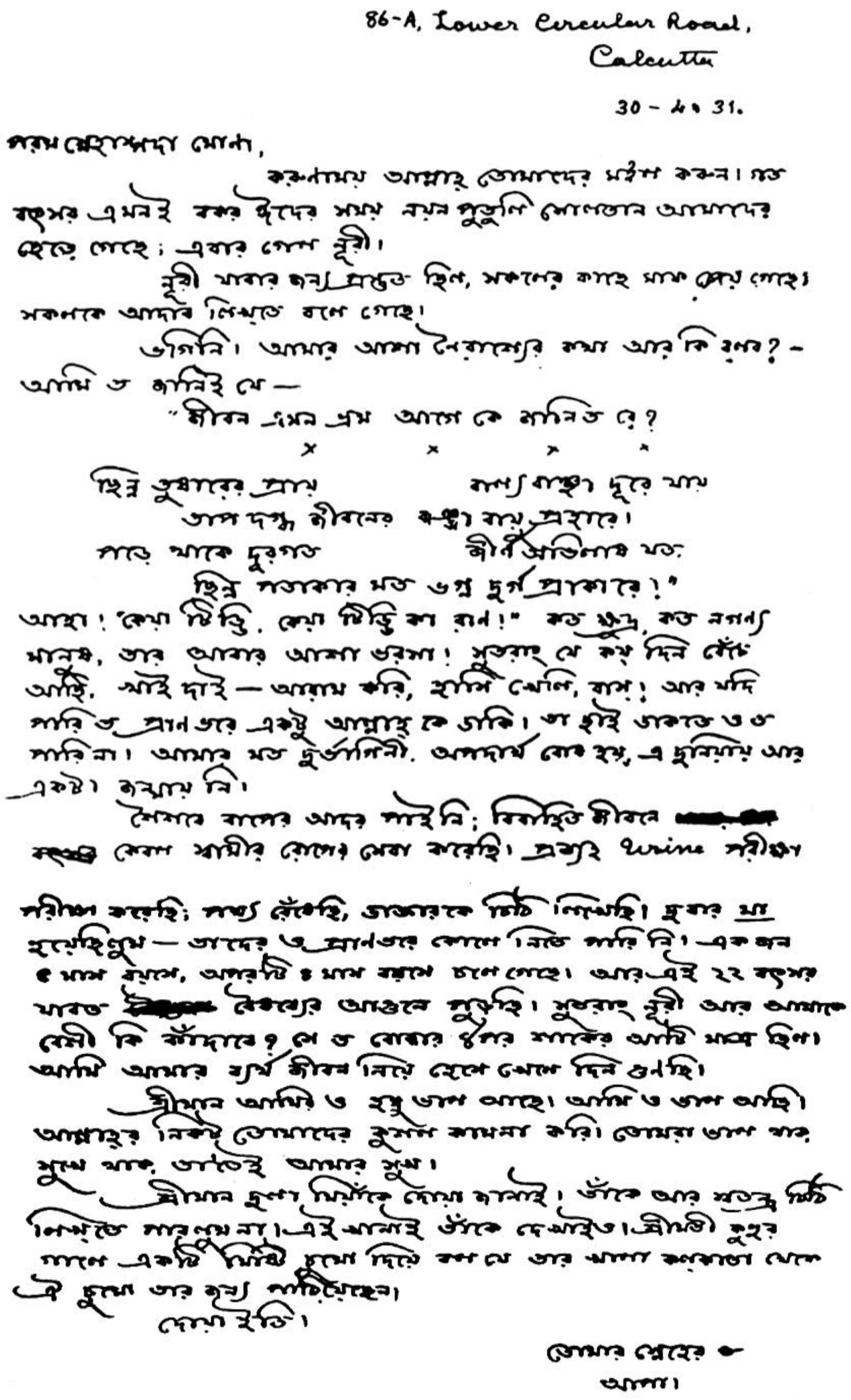

86-A, Lower Circular Road,
Calcutta

30-4-31.

পরম স্নেহাস্পদা বোন,

করুণাময় আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। গত বৎসর এমনই বকর ঈদের সময় নয়ন পুত্তলি সোলতান আমাদের ছেড়ে গেছে; এবার গেল নূরী।

নূরী যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল, সকলের কাছে মাফ চেয়ে গেছে; সকলকে আদাব লিখতে বলে গেছে।

ভগিনি। আমার আশা নৈরাশ্যের কথা আর কি বলব? — আমি ত জানিই যে —

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে?

× × × ×

ছিন্ন তুষারের প্রায় কল্য বাঞ্ছা দূরে যায়
তাপ দগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা বায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।"

আহা! 'কেয়া চিজ্, কেয়া চিজ্ কা জান!" কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য মানুষ, তার আবার আশা ভরসা! সুতরাং যে কয় দিন বেঁচে আছি, খাই দাই — আরাম করি, হাসি খেলি, বাস! আর যদি পারি ত প্রাণ ভরে একটু আল্লাহ্‌কে ডাকি। তা চাই ডাকতে ও ত পারি না। আমার মত দুর্ভাগিনী, অপদার্থ বোধ হয়, এ দুনিয়ায় আর একটা জন্মায় নি।

শৈশবে বাপের আদর পাই নি; বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ Urine পরীক্ষা করেছি; পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দুবার মা হয়েছিলুম — তাদের ও প্রাণভরে কোলে নিতে পারি নি। একজন ৫ মাস বয়সে, অপরটি ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর এই ২২ বৎসর যাবত বৈধব্যের আগুনে পুড়ছি। সুতরাং নূরী আর আমাকে বেশী কি কাঁদাবে? সে ত বোঝার ওপর শাকের আঁটি মাত্র ছিল। আমি আমার ব্যর্থ জীবন নিয়ে হেসে খেলে দিন গুনছি।

শ্রীমান আমির ও হুমু ভাল আছে। আমি ও ভাল আছি। আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের কুশল কামনা করি। তোমরা ভাল থাক, সুখে থাক, তাতেই আমার সুখ।

শ্রীমান দুলা মিয়াঁকে দোয়া জানাই। তাঁকে আর স্বতন্ত্র চিঠি লিখতে পারলেম না। এইখানাই তাঁকে দেখাইও। শ্রীমতী কুহুর গালে একটি মিঠে চুমো দিয়ে বল যে তার খালা কলকাতা থেকে ঐ চুমো তার জন্য পাঠিয়েছেন।

দোয়া ইতি।

তোমার স্নেহের —
আপা।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বাংলা হস্তলিপি

(গোলাম মুরশিদের 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

Sakhawat Memorial Girls' School.

13, Wallyulla's Lane.

Calcutta, the 18th Octr. 1912.

Sir,

Many thanks for your kind letter dated the 14th inst. The money (Rs 10/-) reached me yesterday. Kindly let me know in whose name shall I put this sum in the account book.

As regards your girl, I shall be glad to take her charge. We have prepared a prospectus which we expect

Hoping this will find you & yours in good health & spirit. Can Zeenat smile now? She will have to learn many things!

Yours sincerely

R. S. Hossein.

Moulvi Md Yasin Sahib

Rajshahi

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ইংরেজি হস্তলিপি

(গোলাম মুরশিদের 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

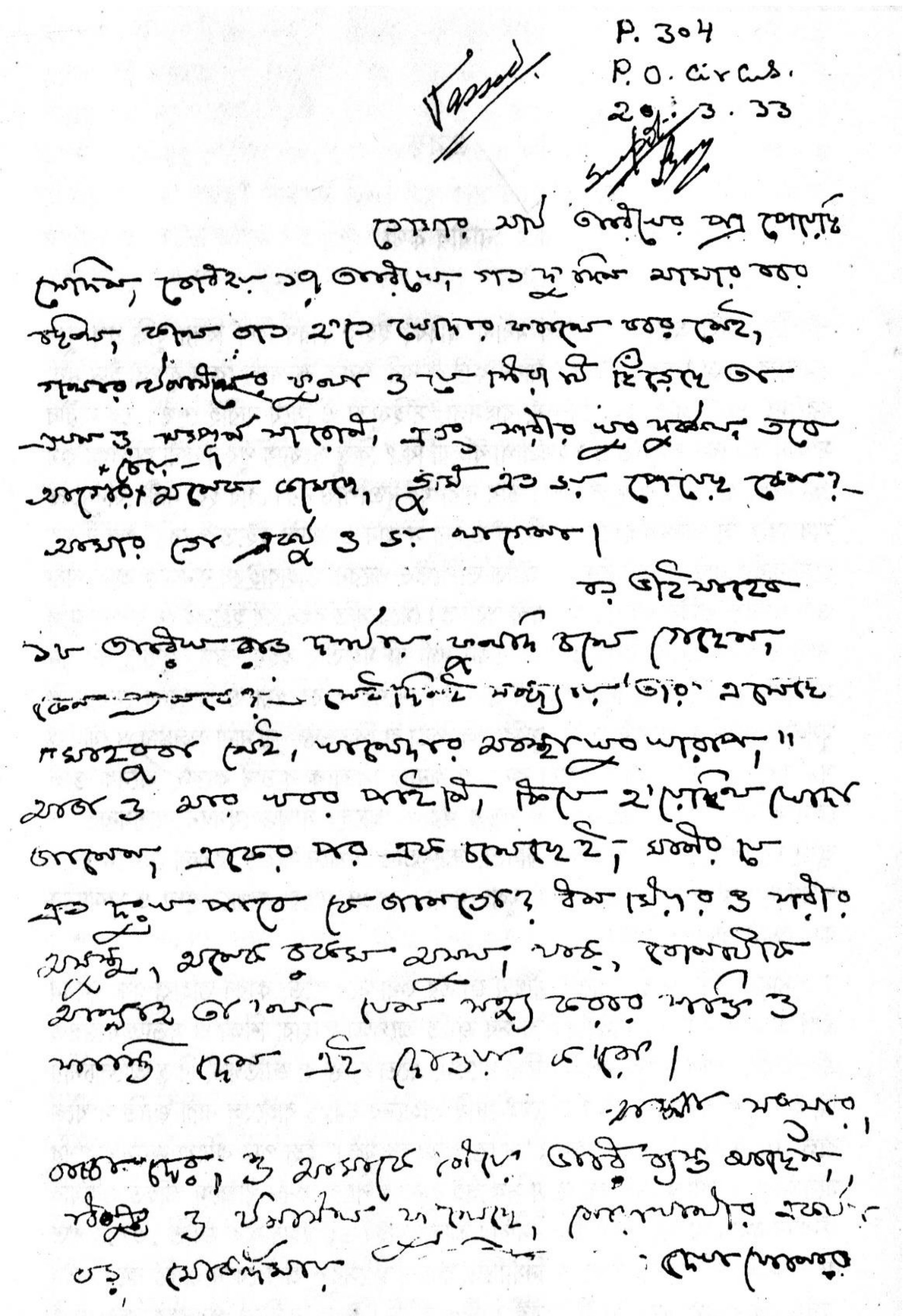

স্বামীর নিকট রাজিয়া খাতুনের স্বহস্তে লেখা চিঠি

(শান্তনু কায়সারের ' রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

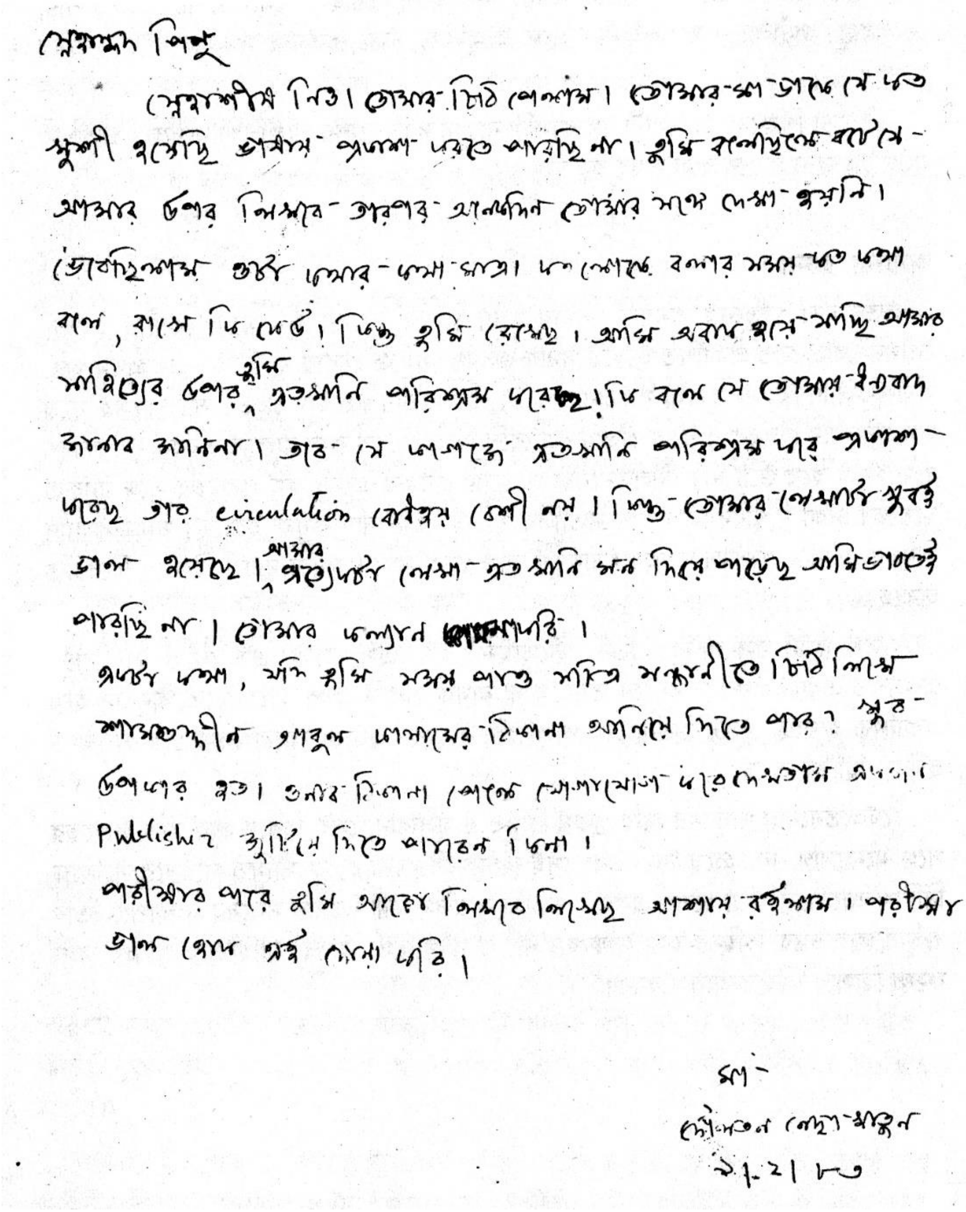
স্নেহাস্পদ পিনু

স্নেহাশীষ নিও। তোমার চিঠি পেলাম। তোমার এত ভাবে যে এত খুশী হয়েছি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তুমি বলেছিলে বইয়ে আমার উপর লিখবে- তারপর অনেকদিন তোমার সাথে দেখা হয়নি। ভেবেছিলাম তুমি আমার কথা ভুলে গেছ। লোকে বলার সময় কত কথা বলে, কাজে কি করে। কিন্তু তুমি রেখেছ। আমি অবাক হয়ে গেছি আমার সাহিত্যের উপর তুমি এতখানি পরিশ্রম করেছ। কি বলে যে তোমায় ধন্যবাদ জানাব জানিনা। তবে যে কাগজে এতখানি পরিশ্রম করে প্রকাশ করেছ তার circulation বোধহয় বেশী নয়। কিন্তু তোমার লেখাটি খুবই ভাল হয়েছে। আমার প্রত্যেকটি লেখা এত মন দিয়ে পড়েছ আমি ভাবতেই পারছি না। তোমার কল্যাণ কামনা করি।

একটি কথা, যদি তুমি সময় পাও সাহিত্য সমকালীনতে চিঠি লিখে শামসুদ্দীন আবুল কালামের ঠিকানা আনিয়ে দিতে পার? খুব উপকার হত। ওনার ঠিকানা পেলে যোগাযোগ করে দেখতাম যদি Publisher জুটিয়ে দিতে পারেন কিনা।

পরীক্ষার পরে তুমি আবার চিঠি লিখছ আশায় রইলাম। পরীক্ষা ভাল হোক এই দোয়া করি।

দোয়া-
দৌলতন নেছা খাতুন
২১.২।৮৩

পুত্রের নিকট দৌলতননেছা খাতুনের স্বহস্তে লেখা চিঠি

(গোলাম কিবরিয়া পিনুর 'দৌলতননেসা খাতুন' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

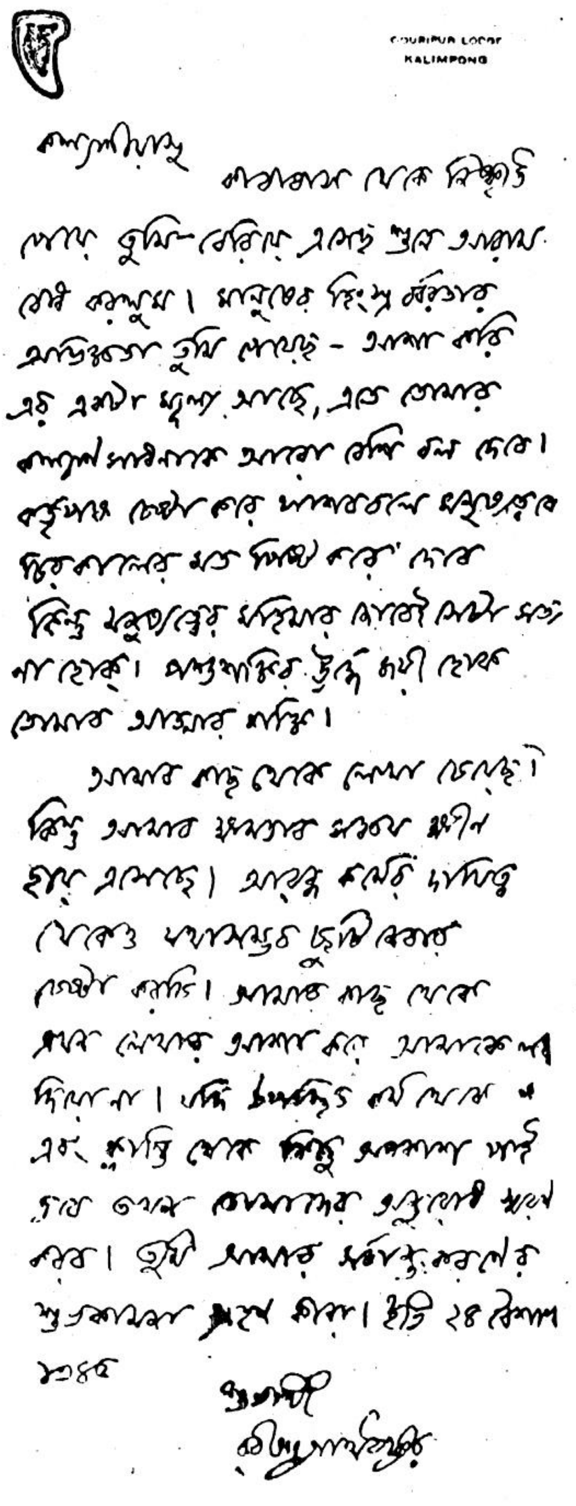

লীলা নাগকে স্বহস্তে লেখা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

(দীপংকর মোহান্তের ‘লীলা নাগ’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

পরিশিষ্ট-৩

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, কলকাতা

(বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত)

রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(গবেষকের নিজের তোলা ছবি)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

(বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণিকা থেকে সংগৃহীত)

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

(স্মরণিকা, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

সহিফা বানু

(বেগম পত্রিকা, ৭৩ সংখ্যা, ২০১৯)

নূরুন্নেসা খাতুন

(সওগাত, ভাদ্র ১৩৩৬)

ফাতেমা খানম

(সওগাত, ১৯৩৭)

ফজিলতুননেসা

(সওগাত, ভাদ্র ১৩৩৬)

লীলা নাগ

('লীলানাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

(হামিদা খানমের 'ঝরা বকুলের গন্ধ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

রাজিয়া খাতুন

(শান্তনু কায়সারের 'রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

শামসুন নাহার মাহমুদ

(স্মরণিকা, শামসুন নাহার হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

সুফিয়া কামাল

(বেগম পত্রিকা, ১৯৮৭)

নূরজাহান বেগম

(বেগম পত্রিকা, ২০১৬)

দৌলতননেছা খাতুন

(বেগম পত্রিকা, ১৯৭৮)

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী

(প্রথম আলো, ৮ জুন, ২০১৭)

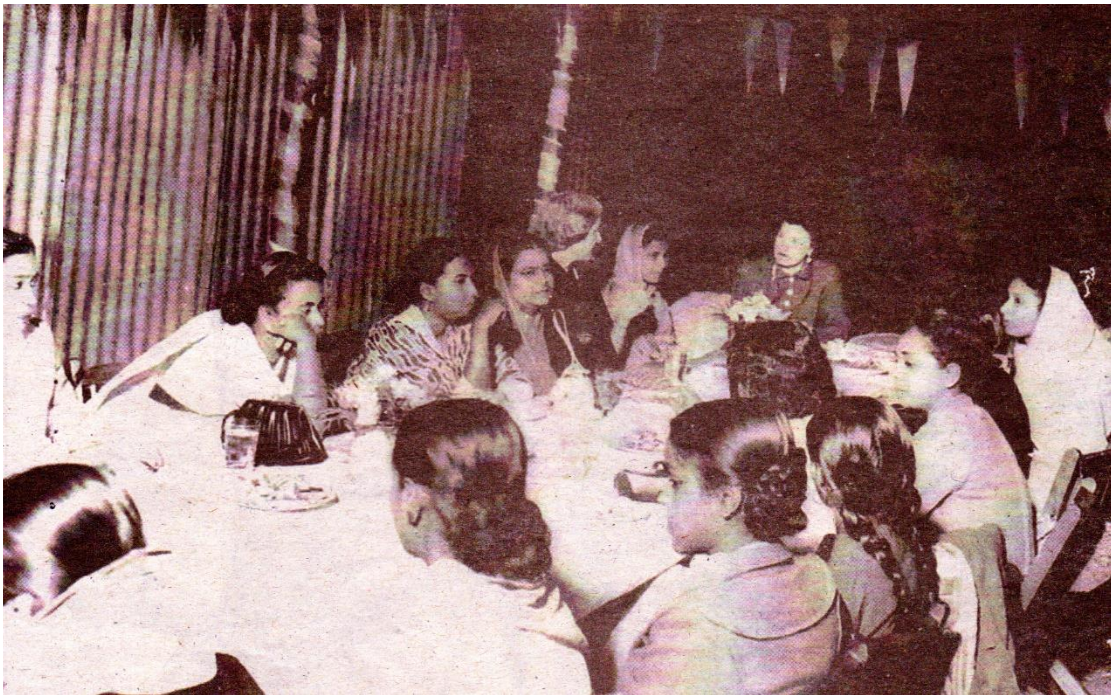

১৯৫৫ সালে বেগম ক্লাবে বিদেশি প্রতিনিধির সাথে শামসুন্নাহার মাহমুদ, নূরজাহান বেগম (ক্লাবের সেক্রেটারী) এবং অন্যান্য নারী

(বেগম পত্রিকা, ৫৪ সংখ্যা, ২৯ মে, ২০১৬)

১৯৫২ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবসে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের শোভাযাত্রা

(অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম কর্তৃক তোলা ছবি)

১৯৭১ সালে ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের মহড়া শোভাযাত্রা

(প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮)

পরিশিষ্ট-৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের ইতিবৃত্ত

পূর্ব বঙ্গের নারীসমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। নারীর সুপ্ত সম্ভাবনাসমূহ যা সুদীর্ঘকাল ধরে চাপা পড়েছিল বৃহত্তর অর্থে তার শৈল্পিক প্রকাশ সম্ভব করে তুলেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

সহমরণ প্রথার দেশে যেখানে নারীকে কল্পনা করা হতো কেবল সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী, দুঃখকষ্টে মৌনা এক প্রতিমূর্তিরূপে সেই দেশে সেই সমাজে শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন মুক্তচিন্তার এক নারীসমাজ গড়ে ওঠে যারা ছিল সামাজিক অসমতা দূর করার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের আন্দোলনে সদা সোচ্চার।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তেভাগা আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনের মতো গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও এই নারীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। পূর্ববঙ্গের নারীর মনোজগতের এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল মূখ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২০ সালের আইনে নারী-পুরুষসহ সকল শ্রেণি-বর্ণের শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের বিষয় স্বীকৃত ছিল। এ আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে 'The University Shall be open to all persons of either sex and of whatever race, creed or class'. সকলের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি নীতিগতভাবে মেনে নেয়া হলেও মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান ছিল। তথাপি ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার বছরেই দুজন ছাত্রী লীলাবতী নাগ ও সুষমা সেনগুপ্ত উচ্চশিক্ষার প্রত্যাশা ও দাবি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

প্রতিষ্ঠাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের যে সকল অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল তাদের অভিভাবকবৃন্দের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক সুবিধার অভাব, ছাত্রীনিবাসের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা সুপারিনটেনডেন্টের অভাব, নিরাপত্তা সমস্যা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, পরিবহন সমস্যা, ইউরোপীয় সেনাদের আতঙ্ক ইত্যাদি।

১৯২১ সালে ভর্তি হওয়া দুই ছাত্রী লীলাবতী নাগ ও সুষমা সেনগুপ্তের আবাসিক সমস্যা ছিল না। তাঁরা উভয়েই বাবার বাসায় অবস্থান করতেন। কিন্তু পরবর্তী বছরসমূহে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের অধিকাংশেরই আবাসিক সমস্যা ছিল প্রধান সমস্যা। ১৯২৫ সালে প্রথম মুসলিম ছাত্রী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ফজিলতুননেসা (এম.এ, গণিত)।

উপাচার্য পি জে হার্টগ ব্যক্তিগতভাবে নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে তথা পূর্ববঙ্গে নারীশিক্ষার তাৎপর্য তিনি যথার্থই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরের বছরগুলোতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে নারীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা এ সময়ে প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। উপাচার্জ জি এইচ. ল্যাংলি সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এ সমস্যা সমাধানে তিনি মেডিকেল স্কুল এবং ইডেন স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হন। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দেয়া হয়। ১৯২৬ সালের ২৮ নভেম্বর চামেরী হাউস (১৭ নং বাংলোতে) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস 'Residence for Woman Students' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট হন প্রিয়াংকা নাগ। এখানে ১২ জন শিক্ষার্থীর আবাসিক সুবিধা ছিল। শুরুতে আবাসিক ছাত্রীরা ঢাকা হলের সাথে যুক্ত থাকতেন।

ফজিলতুননেসা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসের প্রথম সদস্য। ১৯২৬ সালে ছয়জন নারী শিক্ষার্থী ছাত্রীনিবাসে যুক্ত হন। ১২ জনের সুবিধা থাকলেও ৬ জন ছাত্রীর অবস্থান নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খুশি

ছিলেন। ধারণা করা হয় ছাত্রীনিবাসে অবস্থানের সুযোগ আরো অনেক ছাত্রীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে উৎসাহিত করবে।

ফজিলতুননেসার ধর্মীয় অবস্থানের কারণে ছাত্রীনিবাসে আহারে সমস্যা হবে কি না- বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। উল্লেখ্য, জগন্নাথ হলের সব ছাত্র হিন্দু হলেও ব্রাহ্মণদের জন্য আলাদা বাসস্থান ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তবে সে সময়ে সুপারদের প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের একত্রে আহার গ্রহণে কোন সমস্যার উদ্ভব হয়নি।

১৯২৬ সালের ২৮ নভেম্বর Residence for Woman Students প্রতিষ্ঠিত হলেও আবাসিক হলসমূহের মতো এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অবকাঠামো ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো না কোনো হলের সাথে যুক্ত হতে হতো। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বহু নারী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট আবেদন করতেন যেখানে তাদের অধিকাংশেরই আবাসিক সমস্যা এবং অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কথা উল্লেখ থাকতো। রোকেয়া হল থেকে শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হতো। রোকেয়া হল প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের যে কোনো হলে সংশ্লিষ্ট থাকার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করে। হিন্দু ছাত্রীদের ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল এবং মুসলমান ছাত্রীবৃন্দ সলিমুল্লাহ মুসলিম ও ফজলুল হক হলের সাথে সংযুক্ত হন।

নারীশিক্ষার প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব সময় আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিছু অসুবিধা ছিল যার দ্রুত সহজ সমাধান ছিল না। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ছাত্রীনিবাস পরিচালনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

১৯৩০-এর দশকে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হওয়ার কারণ প্রধানত তিনটি : ১. বিশ্বব্যাপী মহামন্দার চাপ; ২. রাজনৈতিক আন্দোলন ও ৩. সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীশিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বারংবার ছাত্রীনিবাস সুন্দরভাবে পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত সুজাতা রায় ছাত্রীনিবাসের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩২ সালে লাবণ্য সেন ছাত্রীনিবাসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ লাবণ্য সেনের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কোনোটাই না থাকা সত্ত্বেও প্রার্থী না পাওয়ার কারণে লাবণ্য সেনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। ছাত্রীনিবাস বলবৎ রেখে সুষ্ঠু প্রশাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ১৯৩৩-৩৪ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক বিবরণীতে বলা হয় : If the arrangements for supervision are satisfactory, the number of women students who desire to come into residence will increase and it will be necessary to provide for them a much larger building’.

১৯৩৭ সালে চারুপমা বসুকে ইংরেজি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। শিক্ষক হিসেবে শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যোগ্যতম প্রার্থী হলেও ছাত্রীনিবাসের সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য একজন মহিলা শিক্ষকের প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চারুপমা বসুকে নিয়োগ দেন। চারুপমা বসু ছাত্রীনিবাসের দায়িত্ব গ্রহণের পর সুষ্ঠু পরিচালনার কারণে ছাত্রী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৯৪১-৪২ সালে শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৯১ জন। ১৯৪২-৪৩ শিক্ষাবর্ষে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪ জন হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুফল, অর্থনৈতিক মহামন্দা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ১৯৪৩-৪৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পেয়ে আবার ৮০ জনে দাঁড়ায়।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের প্রভাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখা গিয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশ মুসলিম লীগের সমর্থক হয় এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার দাবি এ সময়ে উত্থাপন করা হয়। ১৯৪৬ সালের ১২ জুন আজাদ পত্রিকায় লেখা হয় : ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং কলেজের মুছলমান ছাত্রীরা হোস্টেলের অভাবে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের সহিত এক পাকে এবং এক জায়গায় মুছলমান ছাত্রীদের থাকিতে হয়। ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীদের জন্য এরূপ ব্যবস্থাও নাই। ফলে বহু

মুছলমান ছাত্রীকে ভর্তি হইয়াও আবার থাকার অসুবিধার জন্য কলেজ ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। মুছলমান নারীর শিক্ষার প্রসার কামনা করিলে এই ধরণের বাধা বিপত্তি দূর করিতে হইবে'।

তৎকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিষয়টি সাম্প্রদায়িক মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তীকালে এর মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল সাম্প্রদায়িক ছিল না। উল্লেখ্য যে, সাম্প্রদায়িক কারণে সৃষ্ট হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ছিল অসাম্প্রদায়িক।

আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার জনশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকের পক্ষ হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রীদের জন্য কোন পৃথক আবাসিক হল নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে কি না- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট তা জানতে চাওয়া হয়। ১৯৪৬ সালের ২৬ জুলাই উপাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র হোস্টেল নির্মাণের কাজ অতি দ্রুত সম্পাদনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিষয়টি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার পূর্বেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঢাকা হয় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। রাজধানী হিসেবে ঢাকায় বহুসংখ্যক সরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে হল নির্মাণের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অব্যাহত চাপে এক দশক পরে ১৯৫৭ সালে রোকেয়া হল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সকল শিক্ষার্থী ছিলেন অনাবাসিক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের পাঠ গ্রহণকালীন নিরাপত্তার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল অনাবাসিক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন ও পাঠগ্রহণ বা ক্লাস শেষে নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। অনাবাসিক ছাত্রীদের বেশিরভাগ ঢাকায় নিকট আত্মীয় বা স্থানীয় অভিভাবকদের সঙ্গে থাকতেন। অনাবাসিক ছাত্রীদের পরিবহণ হিসেবে প্রথম ব্যবহৃত হতো ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি। ১৯৩০ সালের পর অনাবাসিক ছাত্রীদের পরিবহণের জন্য বাস গাড়ির ব্যবহার শুরু হয় এবং সেই বাসে নিরাপত্তাকর্মীও দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টর নিরাপত্তার বিষয়টি সার্বক্ষণিক তদারকি করতেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকার সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে অধিকাংশ বাস ও যানবাহন দখল করে। যানবাহনের অভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাবাসিক ছাত্রীরা নিয়মিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারতেন না। ১৯৪৩-৪৪ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক বিবরণীতে ছাত্রী সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ হিসেবে যানবাহনের অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়। অর্থনৈতিক মন্দা ও যুদ্ধের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর্থিক সংকটের কারণে অনাবাসিক ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত বাস চলাচল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। ১৯৪৫ সালে প্রায় ১শ' ছাত্রী ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে এসে পড়াশোনা করতেন। কর্তৃপক্ষ বাস পরিবহণ বন্ধ করার ফলে অনাবাসিক ছাত্রীরা সাময়িকভাবে দুর্ভোগের সম্মুখীন হন। অনাবাসিক ছাত্রীদের বড় একটা অংশের অভিভাবকগণ গাড়ি ভাড়া করে বা রিকসায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে অক্ষম হওয়ায়, তারা পায়ে হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে বাধ্য হন। ফলে যাওয়া-আসার পথে বেশ কিছু অনাকাঙ্খিত ও অশালীন ঘটনা ঘটে। এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা বিভাগের নিকট পরিবহণ ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রার্থনা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ছাত্রীনিবাসের দরজা বিকেল ৫টার সময় বন্ধ করে দেয়া হতো এবং ছাত্রীদেরকে এ সময়ের পূর্বেই ছাত্রীনিবাসে প্রবেশ করতে হতো। ফলে পড়ালেখার সুবিধার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৈষম্য থাকত। কেননা সাধারণ নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি বিকেল ৫টার পরও খোলা থাকত। এই পরিস্থিতিতে উপাচার্য ছাত্রীদের কিছুসংখ্যক অতি প্রয়োজনীয় বই লাইব্রেরি হতে সীমিত সময়ের জন্য ছাত্রীনিবাসে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। ফলে অধ্যয়নের সুযোগের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের বৈষম্য বহুলাংশে হ্রাস পায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে (Act xvii of 1920) নারী পুরুষের সহশিক্ষার সমান সুযোগ উন্মুক্ত থাকলেও তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে তা অতি সহজে কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। কেননা আইন সমাজকে পরিবর্তন করতে পারেনি। তখনকার পরিস্থিতিতে নারীর সামাজিক অবস্থান, স্বাধীনভাবে চলাফেরার প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংরক্ষণশীল। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু সম্প্রদায় অগ্রসর থাকলেও নারী সম্পর্কে তারাও যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিল। মুসলমানদের রক্ষণশীলতার মাত্রা ছিল আরো বেশি।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সতের বছরের রেজিস্ট্রারের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উপাচার্য পি জে হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে গিয়ে তাকে কিছু মূল্যও দিতে হয়েছিল।

অধ্যয়নের শুরুতে মিসেস হার্টগ প্রথম ছাত্রী লীলাবতী নাগের সাথে শ্রেণিকক্ষে থাকতেন। এ ব্যবস্থা কিছুদিন চলবার পর একজন মহিলা নিয়োগ করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন ছাত্রীদের আগমন, শ্রেণিকক্ষে গমন, পাঠগ্রহণ এবং পাঠ শেষে নিজের ঘরে অথবা ছাত্রীনিবাসে গমন- সবই ছিল এক প্রকার প্রহরীরক্ষিত। সেই প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপকবৃন্দ, ছাত্রীনিবাসের সুপারিনটেনডেন্ট এবং বেতনভুক্ত গুর্খা সেনা সদস্যবৃন্দ। এসব সম্ভব হয়েছিল নারীশিক্ষার প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিক আগ্রহের জন্যই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মাঝে মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জন্য বিঘ্নিত হতো। সহশিক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য তৎকালীন পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাও ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। বিভিন্ন সময়ে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটতো। ফলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে যে সকল শ্রেণিতে ছাত্রী থাকত তাদের পাঠদান কার্যক্রম সকালের দিকে সম্পন্ন করা হতো। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান ও ডীনবৃন্দ নিজেদের মধ্যে ক্লাসের সময় পরিবর্তন করে নিতেন। পাঠদান কার্যক্রমের এই পরিবর্তন ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হতো।

১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্যসেন-এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পর সতর্কতা হিসেবে বাংলার সকল গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে ইউরোপীয় সৈন্য মোতায়েন করা হয়। স্পর্শকাতর নগরী হিসেবে ঢাকাতেও বিপুল সংখ্যক সৈন্য অবস্থান নেয়। সেকালে ঢাকায় কোনো স্থায়ী সেনানিবাস ছিল না। ফলে ইউরোপীয় সেনাবাহিনীকে স্থান দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার কাছে এবং কিছু অংশ পলাশী ব্যারাকে। ১৯৩২-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ইউরোপীয় সৈন্যদের ব্যবহার, আচরণ ও কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে এ সময়ে বহুসংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারি উপাচার্যের কাছে অভিযোগ দাখিল ও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বিষয়টি নিয়ে সেনা কর্তৃপক্ষের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বহু চিঠি আদান প্রদান চলে। উপাচার্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাত্রীনিবাসের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা আদায় করেন।

এভাবে সময়ের প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত সমস্যাসমূহ অতিক্রম করে এগিয়ে চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া।

(সূত্র : সৌরভে গৌরবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

পরিশিষ্ট-৫

সাক্ষাতকার গ্রহণকৃত নারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১. বাংলাদেশের প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক ও ভাষাকন্যা ড. সুফিয়া আহমেদ ১৯৩২ সালের ২০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মদ ইব্রাহীম (বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও পাকিস্তান কেন্দ্রিয় সরকারের সাবেক আইনমন্ত্রী) ও লুৎফুন্নেসা ইব্রাহীমের সুযোগ্য কন্যা সুফিয়া আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে ১৯৫৩ সালে বি.এ (অনার্স) এবং ১৯৫৪ সালে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৬০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর স্বামী খ্যাতিমান আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যরিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ (১৯৩২-২০০৩)। বাংলাদেশের একজন বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ ও গবেষক সুফিয়া আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি তুরস্কের 'বসফোরাস বিশ্ববিদ্যালয়' এ ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে (১৯৮৪-১৯৮৫) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Wisconsin স্টেটের Milwaukee শহরে অবস্থিত Alvarno College এ ফুলব্রাইট ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবেও (১৯৮৫) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন এবং এ আন্দোলনের একজন অগ্রসৈনিক ছিলেন। তিনি ভাষা আন্দোলন চলাকালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দুঃসাহসিকতার সাথে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে পুলিশী নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। তিনি বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। ভাষা-আন্দোলন সফল করার জন্য মিটিং ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা থেকে ভাষা আন্দোলনের জন্য অর্থ উত্তোলনও করেছেন। পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায় সংঘটিত বিভিন্ন সংগ্রামের সাথে তিনি নানাভাবে যুক্ত থেকেছেন। সমাজসেবক ও নারী সংগঠক সুফিয়া আহমেদ নারীশিক্ষা, নারী উন্নয়ন, নানাপ্রকার সামাজিক ও জনহিতকর কাজের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের নারী স্বাধীনতা ও নারী অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য Steps Towards Development নামক সংগঠনটি ১৯৯৬ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবসে তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে। সুফিয়া আহমেদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, নারীর অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাই পারে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের নারীকে নানা অনাচার-অবিচার থেকে মুক্ত করতে। একুশে পদক প্রাপ্ত এ নারী সম্প্রতি ৯ এপ্রিল ২০২০ মৃত্যুবরণ করেন।

২. ভাষা সৈনিক রওশন আরা বাচ্চু ১৯৩২ সালের ১৭ ডিসেম্বর মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার উছলাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এ এম আরেফ আলী এবং মাতা মনিরুন্নেছা খাতুন। রওশন আরা বাচ্চু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ হতে বি এ (অনার্স), এম এ ডিগ্রি এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ হতে বি এড ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (আনন্দময়ী স্কুল, আজিমপুর গার্লস স্কুল, নজরুল একাডেমি প্রভৃতি) শিক্ষকতার সাথে যুক্ত থেকে ২০০০ সালে ঢাকার বি এড কলেজ (শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ) হতে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। ভাষা আন্দোলন শুরু হলে তিনি দফায় দফায় মিটিং এবং মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় ইডেন মহিলা কলেজ এবং বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সংগঠিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার মূল

সমাবেশস্থলে নিয়ে আসা হয়। এ স্থান থেকেই তদানীন্তন ছাত্রনেতারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা পুলিশের ব্যারিকেড উপেক্ষা করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন। রওশন আরা বাচ্চু ২১ ফেব্রুয়ারি দুঃসাহসিকতার সাথে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশের লাঠির ব্যরিকেড ভেঙ্গে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে পুলিশী নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। মাতৃভাষা রক্ষার্থে তাঁর অবদান অপরিসীম। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিভিন্ন সংগ্রামে বাঙালি নারীর অবদানের যথাযথ মুল্যায়ন এখনো হয়নি। নারীশিক্ষা বিস্তারেও রওশন আরা বাচ্চুর অবদান অপরিসীম। তিনি কুলাউড়া গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিনা বেতনে এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতাও করেছেন। সংগ্রামী নারী রওশন আরা বাচ্চু বাংলাদেশে মেয়েদের অগ্রযাত্রায় শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অন্যদিকে তিনি নারী জাগরণ ও আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে নারীমুক্তির বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য তিনি ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ পরলোকগমন করেছেন।

৩. অধ্যাপক ড. শাহানারা হোসেন ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল হাফিজ এবং মাতা রাবিয়া খাতুন। স্বামী ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ বি এম হোসেন (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)। শাহানারা হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এম. এ, এম ফিল ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৮ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনে গমন করেন। ১৯৬০ সালে লন্ডনের SOAS বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স এবং ১৯৬৫ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্নুজান হলের প্রথম প্রভোস্ট (১৯৬৬-১৯৬৯) হিসেবে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর গবেষণার অধিক্ষেত্র ছিলো বাংলার নারী। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন শাহানারা হোসেন অনেকটা সচেতনভাবেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও পরিবারে নারীর হীনাবস্থা এবং পুরুষের উপর অত্যাধিক নির্ভরশীলতা প্রত্যক্ষ করে ক্ষুণ্ন ও ব্যথিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সমাজ ও পরিবারের দেয়া গণ্ডি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন তাঁর শিক্ষিত ও মার্জিত পিতার সহায়তায়। তিনি মনে করেন, বিশ শতকের শুরু হতে বাংলায় মেয়েদের মধ্যে জাগরণ ও আন্দোলন না ঘটলে তারা আজ আধুনিক হতে পারতেন না। নারীর অধিকার সম্পূর্ণরূপে আদায় করার জন্য তাদেরকে আরো বেশি বিপ্লবী হতে হবে। বাংলা একাডেমির সম্মানিত ফেলো শাহানারা হোসেন ইউজিসি (বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) প্রফেসর হিসেবে (২০১৩-২০১৪) দায়িত্ব পালন করেন। সম্প্রতি তিনি (৩১ আগস্ট ২০১৯) মৃত্যুবরণ করেছেন।

৪. অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ১৯৪০ সালের ২০ অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা কবিরউদ্দিন রহমানী এবং মাতা ফয়জুন্নেছা। শিক্ষিত ও প্রগতিশীল পরিবারের সন্তান হাবিবা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে বি এ (সম্মান), এম এ এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি এ বিভাগে শিক্ষকতা শেষে অবসর গ্রহণ করেছেন। মেধাবী ও অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহে সহায়তা দানের জন্য তিনি নিজ বিভাগে ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। হাবিবা খাতুন মনে করেন বাংলার মেয়েরা নিজ প্রচেষ্টায় এবং পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতায় অবরোধপ্রথা বা ঘরে আবদ্ধ অবস্থা থেকে বের হয়ে বাইরের জগতে এসেছেন। বাঙালি নারী শিক্ষা গ্রহণ করে বেশি সচেতন হয়েছেন। তিনি স্মরণ করেন তাঁর মা, মাতামহী

এমনকি মাতামহীর মাও গৃহে পড়ালেখা শিখেছেন। তাঁর মাতামহী বাড়িতে (বাংলা ঘর বা বৈঠক খানায়) মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তদানীন্তন স্কুল ইন্‌সপেক্টর বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। এখানে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের পড়ানো হতো এবং এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে তিনি (মাতামহী) সরকারের কাছ থেকে মাসিক ২ টাকা বেতন পেয়েছেন। হাবিবা খাতুন ছোটবেলা থেকে বাড়িতে নিয়মিতভাবে বেগম পত্রিকা পড়েছেন। তিনি মনে করেন বিশ শতকের শুরু থেকে বাঙালি মেয়েরা নিজ সমাজ এবং পরিবারের মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়েই তবে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ধীরে ধীরে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে জাগরণ ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে মেয়েদের গৃহ পরিমণ্ডল ছেড়ে স্কুলে পড়তে যাওয়াটা নারীশিক্ষা আন্দোলনের সফলতার নামান্তর এবং মেয়েরা স্কুল থেকেই আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছেন। এখন আর তারা সমাজের রক্তচক্ষুর ভয় পান না। বর্তমানে বাংলাদেশে মেয়েরা অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। তাই তারা নিজস্ব চিন্তা চেতনা দ্বারা প্রতিনিয়ত আত্মউন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা তুলনামূলকভাবে কম সচেতন হওয়ার কারণে অনেকখানি পিছিয়ে রয়েছেন।

৫. শিক্ষাবিদ ও নারীনেত্রী মালেকা বেগম ১৯৪৪ সালের ৪ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আবদুল আজিজ (প্রাক্তন আয়কর বিভাগের কমিশনার) এবং মাতার নাম ফাহিমা বেগম। তাঁর স্বামী মতিউর রহমান বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা ‘প্রথম আলো’র সম্পাদক ও প্রকাশক। মালেকা বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বি এ (সম্মান), এম এ, পিএইচ ডি এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন স্টাডিজ সেন্টার থেকে পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অপরিসীম এবং প্রতিষ্ঠার সময় হতে তিনি এ বিভাগে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। বিদগ্ধ পণ্ডিত মালেকা বেগম বর্তমানে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির Sociology and Gender Studies বিভাগে অধ্যাপনা করছেন এবং এ বিভাগের প্রধান হিসেবে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকে অর্থাৎ ষাটের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে ছাত্র ও নারী আন্দোলনে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকেছেন। উল্লেখ্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের নির্বাচিত সহ-সভাপতি পদে (১৯৬৭-১৯৬৯) অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলাদেশের নারী অধিকার রক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মালেকা বেগম সুদীর্ঘকাল এ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে নারী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। সুফিয়া কামালের সাহচর্যধন্য এ নারী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেরও একজন সক্রিয় সংগঠক। তিনি মনে করেন বাংলাদেশের নারীর বিভিন্ন প্রকার অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে আন্দোলনের বিকল্প নেই। তাই তিনি নারী আন্দোলনকে আরো বেশি বেগবান করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন বাংলাদেশের মেয়েরা এখনও নিজ সন্তানের অভিভাবকত্ব লাভ করতে পারে না এবং পিতার সম্পত্তিতে ভাইদের সমান অংশ তাদেরকে দেয়া হয় না। এজন্য দেশের আইনের সংস্কার প্রয়োজন। এভাবে দেখা যায় কিছুটা অপূর্ণতা থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশে নারী সচেতনতা ও নারী অধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে। অনন্যা সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত এবং নারী বিষয়ক গবেষক মালেকা বেগম ত্রিশটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার প্রায় সবকটি বাংলার নারীকে নিয়ে রচিত। অদ্যাবধি তিনি নিরলসভাবে নারীশিক্ষা বিস্তারে এবং নারী অধিকার রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

৬. শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও সংগ্রামী কর্মী মাহফুজা খানম ১৯৪৬ সালের ১০ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুস্তাফিজুর রহমান খান এবং মাতা সালেহা খানম। তাঁর স্বামী খ্যাতিমান আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ (বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী)। প্রগতিশীল পরিবারের সন্তান মাহফুজা খানম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগ থেকে অনার্স সহ এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁদের পরিবারের পরিমণ্ডলে প্রতিনিয়ত মুক্তবুদ্ধির চর্চা চলতো। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নি মোফাবেজা খানম মুস্তারীর সম্পাদনায় মেয়েদের উদ্দেশ্যে ললনা পত্রিকা প্রকাশ (ষাটের দশকে) শুরু হয়। তিনি শিক্ষকতা পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এ থেকে উপার্জনের অর্থ ছাত্রীদের শিক্ষায় ব্যয় করেছেন। মাহফুজা খানম ছাত্রজীবনে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন। তিনি ডাকসুর ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট (১৯৬৬-১৯৬৮)। সে সময়ের ছাত্র আন্দোলনে, ছয়দফা আন্দোলনে, ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর গবেষণায় বাংলার নারীর সংগ্রামী জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। বিশিষ্ট সমাজসেবক মাহফুজা খানম ২৭ টি ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন যার অধিকাংশ গবেষণা এবং নারীশিক্ষা প্রসারে পরিচালিত হয়। তিনি কুমিল্লায় ইয়াকুবুন্নেছা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি মনে করেন নারীর অগ্রগতি না হলে সমগ্র সমাজ অগ্রসরমান হতে পারবে না। আজ পর্যন্ত আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ সমান দৃষ্টিতে দেখা হয় না, পরিবারে মেয়ে সন্তানকে অধস্তন ভাবা হয়। তাই পরিবারে কন্যার চেয়ে পুত্রের শিক্ষায় অর্থ ব্যয় করতে পিতা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। গৃহকর্মে ছেলের চেয়ে মেয়েকে বেশি নিয়োজিত করা হয় এবং খাদ্য বন্টনের সময় পুত্রসন্তানকে সবচেয়ে ভালো খাবারটি দেয়া হয়, যা পিতৃতান্ত্রিকতারই পরোক্ষ ফল। তবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন নদীর গতিপথের ন্যায় বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলন এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলার নারী সমাজ এ দীর্ঘ সংকীর্ণ পথ দিনে দিনে আরো প্রসারিত করবেন। এভাবে নারী তার সম্পূর্ণ অধিকার আদায়ে সক্ষম হতে পারবেন, সে দিনটি অতি সন্নিকটবর্তী। রোকেয়া পদক প্রাপ্ত মাহফুজা খানম আজ পর্যন্ত নানামুখী কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত নিরলস ও বলিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছেন।

৭. কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন রাজশাহী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এ. কে মোশাররফ হোসেন এবং মরিয়ম-উন-নেছা দম্পতির সুযোগ্য সন্তান সেলিনা হোসেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৬৭ সালে বি এ (অনার্স) এবং ১৯৬৮ সালে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রত্যন্ত এলাকার মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও নিজের পড়ালেখার পশ্চাতে প্রগতিশীল পরিবার ও পিতার একান্ত সহযোগিতার কথা তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমির গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ কথা সাহিত্যিক বাংলা একাডেমির প্রথম নারী পরিচালক (১৯৯৭) হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সেলিনা হোসেনকে ২০১৮ সালে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রিতে ভূষিত করে। খ্যাতিমান উপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংকটের সামগ্রিকতা। যেখানে বাঙালি নারীর প্রাত্যহিক জীবনের সার্বিক বিষয়াবলী প্রাধান্য পেয়েছে। বাঙালির অহংকার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তিনি মনে করেন পর্দাপ্রথার দোহায় দিয়ে নারীকে গৃহকোণে আবদ্ধ করে রেখে কোনো সমাজে প্রগতির বার্তা সূচিত হতে পারে না। কেননা সমাজ নারী-পুরুষের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় পুরুষসমাজ তার পুরুষতান্ত্রিক জায়গা থেকে নানাভাবে নারীকে দমন করেছে। তাতে পুরুষ বা সমাজ লাভবান হয়নি,

বরং ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং সমাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হয়েছে। তাই নারী যখন অবরোধ ভেঙ্গে বাইরে বের হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, চলাফেরার স্বাধীনতা পেয়েছে এবং শিক্ষার আলো পেয়েছে তখন তার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীর সাহসিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, একটা শক্তির জায়গা তৈরি হয়েছে। এভাবে বাংলাদেশে নারী বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে এগিয়ে এসেছেন। একুশে পদক (২০০৯), স্বাধীনতা পদক (২০১৮) সহ অসংখ্য পদকে ভূষিত এ নারী সমাজ পরিবর্তনে লেখালেখি অব্যাহত রেখেছেন।

৮. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বর্তমান সভাপতি আয়েশা খানম ১৯৪৭ সালের ১৮ অক্টোবর নেত্রকোনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোলাম আলী খান এবং মাতা জামাতুন নেছা খানম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বি এ (অনার্স) এবং এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট নারীনেত্রী আয়েশা খানম ১৯৬২ সাল থেকে ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৭-১৯৬৯) এবং সহ সভাপতি (১৯৬৯-১৯৭১) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সংগ্রামী নারী আয়েশা খানম ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনসহ স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে এগিয়ে যেতে যেসব আন্দোলন-সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল সবগুলিতেই তিনি সামনের সারিতে ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি স্বাধীন দেশে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও সমান অধিকারভিত্তিক সমাজ গঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের বলিষ্ঠ কর্মী মনোরমা বসু, আশালতা সেন, সুফিয়া কামাল এবং নূরজাহান বেগমের সাথে সরাসরি নারী অধিকার আন্দোলনে কাজ করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। মেয়েদের উন্নয়নে গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি এবং উয়ারী মহিলা সমিতিতে কাজ করেছেন। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে অদ্যাবধি তিনি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা সমান অধিকারের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন এখন সময় এসেছে শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। আজ বাংলাদেশে মেয়েরা শিক্ষার অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার অর্জন করলেও তাদের নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত হয়নি। তাই রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। তবেই একটি সুখি ও সমৃদ্ধশীল দেশ গঠন করা সম্ভব হবে।

রোকেয়া পদক : নারী জাগরণের ক্ষেত্রে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতি উল্লেখ করে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৯ ডিসেম্বর তারিখে রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীতে সরকারি ভাবে 'রোকেয়া দিবস' উদযাপন এবং 'রোকেয়া পদক' প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য নারী কল্যাণ সংস্থা ১৯৯১ সাল থেকে এ নামের একটি পদক প্রদান শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সাল থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'রোকেয়া পদক' নিয়মিত ভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে নারী শিক্ষা, নারী অধিকার, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণ এবং পল্লী উন্নয়নে অবদানের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি স্বরূপ পদকটি প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে এককালীন চার লক্ষ টাকা, ১৮ ক্যারেট মানের পঁচিশ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

রোকেয়া চেয়ার : নারী শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়ন ও নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য যে সকল শিক্ষাবিদ ও গবেষক কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্য থেকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ২ বছরের জন্য একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'রোকেয়া চেয়ার' এর জন্য মনোনয়ন প্রদান করে থাকে। ২০০৭ সাল থেকে প্রচলিত (২৬ জুন ২০০৭ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ১১১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) এ চেয়ারের জন্য যোগ্য প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হবে। উক্ত শিক্ষককে গবেষণা কর্ম, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের দক্ষতা, নারী মুক্তি এবং নারী উন্নয়ন বিষয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। একজন শিক্ষক জীবনে মাত্র একবারের জন্য এ সম্মান অর্জন করতে পারবেন।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস

ইংরেজি

Adam, William, *Reports on the State of Education in Bengal 1835 & 1838*, Rabindra Bharati University, Calcutta, 1940

Bengal Education Proceedings, 1921, 1923, 1931, 1935, 1937, 1938, 1950

Parliamentary Papers (House of Commons), 1812-13

Proceeding of the Government of Bengal in the Education Department [Education] for the Month of January 1923, Bengal Government Press, Calcutta, 1925

Proceedings of the East Bengal Legislative Assembly, 22nd February 1952, Vol. VII

Progress of Education in Bengal 1902-03 to 1906-07. Third Quinquennial Review, Calcutta, 1908

Report on Public Instruction in Bengal, 1876-1908

Report of the Moslem Education Advisory Committee, Alipore, 1934,

Quinquennial Report on the Progress of Female Education (Dacca, Rajshahi and Chittagong Divisions), 1912-13 to 1916-17

Haider, Mohammad Tawfiqul, *Muslim Intellectual Movement of East Bengal (1926-1938)*, (Unpublished Ph.D Thesis), Department of Islamic History & Culture, University of Dhaka, October 2003

Hossein, Mrs. R. S., *Sultana's Dream,* S. K. Lahiri & Co., Calcutta, 1908

Ikramullah, Shaista S., *From Purdah to Parliament*, Oxford University Press,1963

Islam, Asha, *From Andarmahal to Schools : Female Education in Eastern Bengal in the 19th and early 20th Centuries*, (Unpublished Ph.D Thesis), Department of History, University of Dhaka, 2013

বাংলা

আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের মূল প্রসিডিংস বা কার্যবিবরণী

ইমাম, আখতার, *ইডেন থেকে বেথুন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ঢাকা, ১৯৯০

কামাল, সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়েরী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৩

কামাল, সুফিয়া, *একালে আমাদের কাল*, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮

খানম, জোবেদা, *জীবন খাতার পাতাগুলি*, কাঠামাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

খানম, মাহফুজা, *ছাত্ররাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ আগে ও পরে*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

খানম, মাহফুজা, *তোমরাই ধ্রুবতারা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

খানম, মাহফুজা, *মাহফুজা খানমের ডায়েরি*, ১ম খণ্ড (১৯৪৬-১৯৬৮) ও ২য় খণ্ড (১৯৬৯-১৯৯৫), মূর্ধন্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

চৌধুরাণী, সরলাদেবী, *জীবনের ঝরাপাতা*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৫

দেবী, মানদা, *সেকালের গৃহবধুর ডায়েরি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬

দেবী, রাস সুন্দরী, *আমার জীবন*, কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

বেগম, মালেকা, *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

মাহমুদ, শামসুন নাহার, *আমার দেখা তুরস্ক*, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৫

সেন, আশালতা, *সেকালের কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫

সেন, মনিকুন্তলা, *সেদিনের কথা*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩

সুলতানা, আরিফা, *বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে নারী : ১৯০৫-১৯৪৭*, (অপ্রকাশিত পি এইচ ডি অভিসন্দর্ভ) ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৯

হোসেন, রোকেয়া সাখাওয়াত, *অবরোধবাসিনী*, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৩১

হোসেন, মিসেস আর. এস., *মতিচুর* (প্রথম খণ্ড), ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা, ১৩১৪

হোসেন, মিসেস আর. এস., *মতিচুর* (দ্বিতীয় খণ্ড), ৮৬এ, লেয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা, ১৩২৮

হোসেন, মিসেস আর. এস., *পদ্মরাগ*, ৮৬এ, লেয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা, ১৩৩১

হোসেন, শাহানারা, *বেলা শেষের পাঁচালি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮

হোসেন, হামিদা, *ঝরা বকুলের গন্ধ : স্মৃতি আলেখ্য*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১

দ্বৈতীয়িক উৎস

গ্রন্থ (ইংরেজি)

Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam,* Yale University Press, USA, 1992

Ahmed, Sharif Uddin, *Dhaka : A Study in Urban History and Development*, Curzon Press, London, 1986

Ahmed, Sufia, *Muslim Community in Bengal 1884-1912,* University Press Limited, Dhaka, 1996

Akhtaruzzaman, Md, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2009

Ali, Mohammad Mohar, *The Bengal Reaction to Christian Missionary Activities : 1833-1847,* The Mehrab Publications, Chittagong, 1965

Amin, Sonia Nishat, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal*, E.J. Brill, Lieden, New York, 1996

Azim, Firdous and Zaman, Niaz (eds.), *In Finite Variety : Women in Society and Literature,* University Press Limited, Dhaka, 1994

Bagal, Jogesh Chandra, *Beginings of Modern Education in Bengal Women's Education,* Ranjan Publishing House, Calcutta, 1944

Bagal, Jogesh Chandra, *Women's Education in Eastern India,* World Press, Calcutta, 1956

Bagal, Jogesh Chandra, *Women's Education in India : The First Phase*, World Press, Calcutta, 1956

Banerjee, B. N, *Begams of Bengal*, S. K. Mitra, Calcutta, 1942

Basu, Anath Nath (ed.), *Adam's Report on the State of Education in Bengal,* University of Calcutta, Calcutta, 1944

Basu, Aparna & Ray, Bharati, *Women's Struggle : A History of the All India Women's Conference 1927-1990*, Manohar Publications, New Delhi, 1990

Beauvoir, Simone De, *The Second Sex,* (tr. & ed. H. M Parshley), Jonathan Cape, London, 1953

Bhatta, Bhavadeva, *Prayaschitta-Prakarana*, (ed. Girish Chandra Vidyaratna), Varendra Research Society, Rajshahi, 1927

Bhattacharjee, K.S, *The Bengal Renaissance : Social and Political Thoughts*, Classical Publishing Company, New Delhi, 1986

Borthwick, Meredith, *The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905*, Princeton University Press, Princeton (USA), 1984

Bose, Mandakrata (ed.), *Faces of the Feminine in Ancient, Medieval and Modern India,* Oxford University Press, New Delhi, 2000

Broomfield, J. H, *Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal,* University of California Press, California, 1968

Carpenter, Mary, *The Last Days in England of The Rajah Rammohun Roy,* Trubner & Co., London, 1866

Chakladar, Haran Chandra, *Social Life in Ancient India : Study in Vatsyayana's Kamasutra*, COSMO, New Delhi, 1984

Chakraborty, Rachana, *Higher Education in Bengal, 1919-1947 : A Study of its Administration and Management,* Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd., Calcutta, 1997

Chakraborty, Usha, *Condition of Bengali Women Around the 2nd half of the 19th Century*, The Author, Calcutta, 1963

Chapman, Priscilla, *Hindoo Female Education*, R. B. Seeley and W. Burnside, London, 1839

Cole, E. B and McQuin, S. Coultrup (eds.), *Explorations in Feminist Ethics,* Indian University Press, Bloomington, 1992

Commire, Anne (ed.), *Women in World History, A Biographical Encyclopedia*, (1-17 Volume), Yorking Publications, USA, 1999

Custers, Peter, *Women in the Tebhaga Uprising*, Naya Prokash, Calcutta, 1987

Dani, Ahmed Hasan, *Dhaka: A Record of its Changing Fortunes,* The Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1956

Datta, K. K, *Alivardi and His Times*, World Press Private Limited, Calcutta, 1963

Datta, K. K, *Survey of India's Social Life and Economic Condition in the Eighteenth Century (1707-1813),* Firma K. L Mukhopadhya, Calcutta, 1961

De, Dhurjati Prasad, *Bengal Muslims in Search of Social Identity,* The University Press Limited, Dhaka, 1998

Dil, Anwar and Dil, Afia, *Women's Changing Position in Bangladesh Tribute to Begum Rokeya*, Adorn Books, Dhaka, 2014

Dutt, Kalpana, *Chittagong Armoury Raiders Reminiscences*, Peoples Publishing House Private Limited, New Delhi, 1979

Eaton, M. Richard, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760,* University of California Press, California, 1996

Edwards, Michael, *British India 1772-1947 : A Survey of the nature and effects of alien rule,* Sidgwick & Jackson, London, 1967.

Engels, Dagmar, *Beyond Purdah? Women in Bengal 1890-1939*, Oxford University Press, New Delhi, 1996

Firestone, Shulamith, *The Dialect of Sex,* Bantan Books, New York, 1970

Forbes, Geraldine, *Women in Colonial India : Eassys on Politics, Medicine and Historiography,* Chronicle Books, New Delhi, 2005

Forster, E. M, *Virginia Woolf; The Rede Lecture,* Cambridge, 1943

Freda Hussain (ed.), *Muslim Women*, St. Martin's Press, New York, 1984

Friedan, Betty, *The Feminine Mystique*, Dall, New York, 1994

Fuller, Margaret, *Woman in the Nineteenth Century,* Brown, Taggard and Chase, Boston, 1860 (Originally Published in 1845)

Ghose, J. C (ed.), *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Creative Media Partners, Kolkata, 2018

Gibb, H.A.R, *Ibn Batuta : Broadway Travellers Series*, Vol. IV, Cambridge, London, 1929

Goodall, Norman, *A History of the London Missionary Society, 1895-1945,* Oxford University Press, London, 1954

Greig, Teresa Billington, *The Militant Suffrage Movement : Emancipation in a Hurry,* F. Palmer, University of California, 1911

Hartley, Cathy (ed.), *A Historical Dictionary of British Women*, Europa Publications (Taylor & Francis Group), London & New York, 1983

Hasan, Zoya (ed.), *Forging Identities : Gender, Communities, And The State in India*, Kali for Women, New Delhi, 1994

Hashmi, Taj, *Women and Islam in Bangladesh*, Palgrave Macmillan, New York, 2000

Hossain, Anowar, *Muslim Women's Struggle for Freedom in Colonial Bengal (1873-1940)*, Progressive Publishers, Kolkata, 2003

Humm, Maggie, *A Readers Guide to Contemporary Feminist Theory Criticism,* Harester Wheat Sheaf, New York, 1996

Humm, Maggie, *Feminism : A Reader,* Routledge, London and New York, 1992

Hunter, W. W, *A Statistical Account of Bengal*, Volume. II, (Districts of Nadiya & Jessore), Trubner & Co., London, 1875

Hunter, W.W, *The Indian Musalmans,* Trubner and Company, London, 1876

Hussain, Shahanara, *The Social Life of Women in Early Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1985

Isami, *Futhus Salatin or Shah Namah-i-Hind,* (ed. Aga Mahdi Hussain), Asia Publishing House, London, 1967

Jhones, David E, *Women Warriors : A History*, Potomac Books, Brassey's-US, 1997

Jimutavahana, *Dayabhaga*, (Eng. tr. H.T Colebrooke), *Hindu Law of Inheritance,* Cambridge University Press, 1810

Joarder, Hasina and Joarder, Safiuddin, *Begum Rokeya : The Emancipator*, Nari Kalyan Sangstha, Dhaka, 1980

Kaur, Manmohan, *Women in India's Freedom Struggle*, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1992

Kolmar, Wendy K., *Feminist Theory : A Reader*, (ed. Frances Bartkowski), Mayfield Publishing Company, California, 2000

Kopf, David, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind*, Princeton University Press, New Jersey, 1979

Kumar, Raj, Devi, Rameshwari, Pruthi, Romila (eds.), *Women and the Indian Freedom Struggle*, Pointer Publishers, Jaipur, 2013

Lahiri, Prodip Kumar, *Bengali Muslim Thought, 1818-1947*, K.P Bagchi, Calcutta, 1984

Law, Nagendranath, *Promotion of Learning in India During Muhammadan Rule (By Muhammad)*, Longmans (Green), London, 1916

Majumder, J.K, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India*, The Author, Calcutta, 1941

Majumder, R.C (ed.), *The History of Bangal,* Vol. I (Hindu Period), University of Dhaka, Dhaka, 1943

Miriam Schneir (ed.), *Feminism, The Essential Historical Writings*, Vintage Books, New York, 1972

Mill, John Stuart, *The Subjection of Women,* Longman, London, 1929

Mukherjee, Kanak, *Women's Emancipation Movement in India,* National Book Centre, New Delhi, 1989

Murshid, Ghulam, *Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization 1849-1905,* Rajshahi Sahitya Samsad, Rajshahi, 1983

Okin, Susan Moller, *Women in Western Political Thought*, Virago Publishing, London, 1980

Perumalil, Augustine, *History of Women in Philosophy*, Global Vision Publishing House, New Delhi, 2009

Rahim, Muhammad Abdur, *Social & Cultural History of Bengal*, Vol. II, Pakistan Historical Society, Karachi, 1963

Rahim, Muhammad Abdur, *The Muslim Society and Politics in Bengal A.D 1757-1947*, University of Dhaka, Dhaka, 1978

Raju, V. Rajendra, *Role of Women in India's Freedom Struggle*, Discovery Publishing House, New Delhi, 1994

Richey, J.A, *Selections from Educational Records, part II, 1840-1859,* Bureau of Education, Government of India, Calcutta, 1922

Rover, Constance, *Love, Morals and the Feminists,* Routledge & Kegan Paul, London, 1970

Roy, Rajat Kanta, *Social Conflict and Political Unrest in Bengal 1875-1927*, Oxford University Press, Delhi, 1947

Salik, Sultan Jahan (ed.), *Muslim Modernism in Bengal : Selected Writings* of Delwar Husaen Ahmed Meerza (1840-1913), Bangla Academy, Dhaka, 2015-16 (Fiscal Year)

Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal*, Peoples Publishing House, New Delhi, 1977

Sarkar, Sumit and Sarkar, Tanika, *Women and Social Reform in Modern India*, Pauls Press, New Delhi, 2007

Sarkar, Tanika, *Hindu Wife, Hindu Nation : Community, Religion and Cultural Nationalism*, Indiana University Press, Delhi, 2001

Sattar, Nargis, *Women and Women's Movement in India*, Best Books, Calcutta, 2006

Srivastava, Gouri, *Women Who Created History*, National Council of Education Research and Training, New Delhi, 1997

Taneja, Anup, *Gandhi, Women and the National Movement 1920-47*, Har-Anand Publications, New Delhi, 2005

Tarafdar, Momtazur Rahman, *Husain Shahi Bengal (1494-1538A.D) A Socio-Political Study*, University of Dhaka, Dhaka, 1965

Tong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought,* Westview Press, Oxford, 1998

Verelest, H., *A View of the Rise and Progress of the Present State of the English Government in Bengal*, J. Nourse, London, 1772

Visram, Rozina, *Women in India and Pakistan : The Struggle for Independence from British Rule*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992

Waren, K. J (ed.), *Ecological Feminism,* Routledge, London and New York, 1994

Wollstonecraft, Mary, *A Vindication of the Rights of Men*, J. Johnson, London, 1790

Wollstonecraft, Mary, *A Vindication of the Rights of Woman*, London, J. Johnson, 1792

Zaidi, S. M. H., *Position of Women Under Islam*, Book Tower, Calcutta, 1935

গ্রন্থ (বাংলা)

আকবর, শ্যামলী ও অন্যান্য, *নারীশিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯৮

আখতার, ফরিদা (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯১

আখতার, শাহীন ও ভৌমিক, মৌসুমী (সম্পাদিত), *জানানা মাহ্ফিল বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা ১৯০৪-১৯৩৮*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮

আখতারউদ্দিন, কাজী, *যুগে যুগে মুসলিম নারীশাসক*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১

আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮*, চারুলিপি, ঢাকা, ১৯৬৪

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯

আনিসুজ্জামান ও বেগম, মালেকা (সম্পাদিত), *নারীর কথা বাঙালি নারীর অধিকার সম্পর্কিত ভাবনা*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

আমিন, সোনিয়া নিশাত (সম্পাদিত), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০

আমিন, সোনিয়া নিশাত, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, (পাপড়ীন নাহার অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

আলম, আনোয়ারা, *ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের নারী*, শৈলী প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০০২

আলম, তাহ্মিনা, *বাংলার সাময়িকপত্রে মুসলিম নারী সমাজ ১৯০০-১৯৪৭*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

আলম, তাহ্মিনা, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তাচেতনার ধারা ও সমাজকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২

আলম, মুহাম্মদ শামসুল, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯

আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলার রেনেসাঁ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪

আহমদ, সফিউদ্দিন, *ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট ও ডিরোজিও*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯

আহমেদ, সুফিয়া, *বাংলায় মুসলিম সম্প্রদায়* (সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

আহাদ, অলি, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪

আলী, মোহাম্মদ ইলিয়াস, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উন্নয়ন*, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

ইউসফজয়ী, নওশের আলী খান, *বঙ্গীয় মুসলমান*, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯১

ইসলাম, কাজী নজরুল, *সঞ্চিতা*, কলকাতা, ১৩৭১

ইসলাম, মাহমুদা, *নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২

ইসলাম, মুস্তফা নূরউল (সংকলিত ও সম্পাদিত), *শিখা সমগ্র (১৯২৭-১৯৩১)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

ইসলাম, রফিকুল, *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩

ইয়াসিন, ড. তাহা (সম্পাদিত ও সংকলিত), *নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায়*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

উদ্দীন, মজির, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা*, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৭

উমর, বদরুদ্দীন, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫

উমর, বদরুদ্দীন, *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৮

কাদির, আবদুল (সম্পাদিত), *আবুল হুসেনের রচনাবলী*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬

কাদির, আবদুল (সম্পাদিত), *রোকেয়া-রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৩

কাদির, সাযযাদ, *হারেমের কাহিনী জীবন ও যৌনতা*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭

কবির, মোহাম্মদ হুমায়ূন, *ভাষা আন্দোলন ও নারী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪

কামাল, মেসবাহ ও চক্রবর্তী, ঈশানী, *নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সমকালীন রাজনীতি ও ইলা মিত্র*, উত্তরণ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১

কামাল, সুফিয়া, *সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ*, সাজেদ কামাল (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

কামাল, সুলতানা, *নারী মানবাধিকার ও রাজনীতি*, ইত্যাদি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০

কায়সার, শান্তনু, *রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী (১৯০৭-১৯৩৪)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

কেলী, রিটা মে ও বুটিলিয়ার, মেরি, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়* (নূরুল ইসলাম খান অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১
খান, ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, *মুঘল ভারতের ইতিহাস*, ইতিবৃত্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮
খান, সালমা, *বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০০৬
খানম, আয়েশা, *বাংলাদেশের নারী আন্দোলন প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, ঐতিহ্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯
খানম, রাশিদা আখতার, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র, *বাংলার নারী জাগরণ : সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ*, কলকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ
গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ, *বঙ্গের মহিলা কবি*, (অলক রায় সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৩০
ঘোষ, কালীপ্রসন্ন, *নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব* (অনিন্দিতা বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১৯
ঘোষ, বিনয় (সম্পাদিত), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১৮৪০-১৯০৫* দ্বিতীয় খণ্ড, বীক্ষণ গ্রন্থন ভবন (বীমান কুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত), কলকাতা, ১৯৬০
ঘোষ, সুদক্ষিণা, *মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮
চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ, *অন্দরে অন্তরে, উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রমহিলা*, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা, ১৯৯৫
চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার, *আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ*, সান্যাল এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ
চক্রবর্তী, ড. রতনলাল, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ১৯২১-১৯৫২*, কল্যাণ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪
চক্রবর্তী, রেণু, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০)*, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৮০
চট্টোপাধ্যায়, গীতা, *বাংলা স্বদেশি গান*, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৩
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৯০
চৌধুরী, আবদুল মমিন ও আহমেদ, শরীফ উদ্দিন (সম্পাদিত), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২
চৌধুরী, ড. আবদুল মমিন, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২
চৌধুরী, আবুল আহসান, *আজিজননেছা খাতুন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬
চৌধুরী, সেলিনা, *নারী প্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হল*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১
চৌধুরাণী, ফয়জুন্নেছা, *রূপজালাল*, (মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪
জামান, সেলিনা বাহার, *কালান্তরে নারী*, নারী কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৫

জামান, সেলিনা বাহার (সম্পাদিত), *বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ স্মারকগ্রন্থ*, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০০

জেসমিন, ড. সুলতানা, *বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও নারীশিক্ষা*, ঐতিহ্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

তর্করত্ন, পঞ্চানন (অনুদিত ও সম্পাদিত), *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ

তাবাতাবাঈ, সৈয়দ গোলাম হোসেন খান, *সিয়ার উল-মুতাখ্‌খেরীন* (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনুদিত), দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬

দস্তিদার, পূর্ণেন্দু, *বীরকন্যা প্রীতিলতা*, ঘাস ফুল নদী, ঢাকা, ১৯৯৮

দাস, সুধাময় (সম্পাদিত), *বিপ্লবী রবি নিয়োগী জ্যোৎসনা নিয়োগী স্মারকগ্রন্থ*, রেডিএন্ট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ২০০৬

দাস, সুধাময়, *মনুসংহিতায় বর্ণতত্ত্ব ও নারী*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫

দাস, সুস্নাত, *অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনা-পুনবিচার*, নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২

দাস, হেনা, *নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

দাশগুপ্ত, কমলা, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, জয়শ্রী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯৬

মিত্র, দীনবন্ধু, *দীনবন্ধু রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮১

নাথান, মীর্জা, *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* (খালেদাদ চৌধুরী অনুদিত), দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

নাসিরউদ্দীন, মোহাম্মদ (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, (স্পেশাল ভলিউম), নূরজাহান বেগম কর্তৃক প্রকাশিত, ৩৮ শরৎগুপ্ত রোড, ঢাকা, ১৯৮৫

পারভীন, শাহনাজ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭

পারভীন, শাহিদা, *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২

পিনু, গোলাম কিবরিয়া, *দৌলতননেছা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

ফজল, আবুল, *আবুল ফজলের রচনাবলী*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৫

ফাল্গুনী, অদিতি, *বাংলার নারী : সংগ্রামী ঐতিহ্যের সন্ধানে*, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৭

বন্দোপাধ্যায়, কল্যাণী, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ (নিম্নবর্গের নারীর আর্থ সামাজিক অবস্থান)*, ম্যানস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, হাওড়া, ২০০০

বন্দোপাধ্যায়, ড. সুনীতা, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, কলকাতা, ২০০৫

বন্দোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, *নূরজহান্*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

বন্দোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, *মোগল-বিদূষী*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

বন্দোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, *সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

বন্দোপাধ্যায়, সুরেশ (অনুদিত), *মনুসংহিতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯

বসু, পূরবী, *নোবেল বিজয়ী নারী গৃহে কর্মে সংগ্রামে*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১

বসু, পূরবী, *প্রাচ্যে পুরাতন নারী*, অবসর প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

বসু, পূরবী, *বাংলার স্বরণীয় নারী*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

বসু, স্বপন (সম্পাদিত), *উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা*, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১২

বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ (সম্পাদিত), *অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্ত স্মারকগ্রন্থ, উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০৩

বসু, স্বপন ও মামুন, মুনতাসীর (সম্পাদিত), *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দুই শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র* [অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী সম্মাননা গ্রন্থ], পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০৫

বাগল, যোগেশচন্দ্র, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ

বাগল, যোগেশচন্দ্র, *বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা ১৮০০-১৯৫৬*, কলকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

বাছির, আবদুল, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২

বেগম, গুলবদন, *হুমায়ুননামা*, (মোস্তফা হারুন অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮

বেগম, মালেকা, *একাত্তরের নারী*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪ (প্রথম প্রকাশ ১৯৯০)

বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

বেগম, মালেকা, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০

বেগম, মালেকা, *বিপন্ন নারী*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

বেগম, মালেকা, *যৌতুকের সংস্কৃতি*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৬

বেগম, মালেকা, *সূর্যসেনের স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী নারীদের কথা*, প্যাপিরাস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২

বেগম, মালেকা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বেইজিং কর্মপরিকল্পনা নারীর অগ্রগতির পথরেখা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১

বেগম, মালেকা ও হক, সৈয়দ আজিজুল, ***আমি নারী** তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৪

বেগম, রওশন আরা, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

বেগম, রেজিনা, *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-৪৭)*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, ২০১৬

বেগম, হাসনা, *নারীমুক্তি বেগম রোকেয়া এবং অন্যান্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৭

বেগম, হাসনা, *নৈতিকতা নারী ও সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩

বেবেল, আউগুস্ট, *নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে* (কনক মুখার্জী অনুদিত), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৩

ভট্রাচার্য, শ্রী উপেন্দ্র চন্দ্র, *ভারতের নারী*, কলকাতা, ১৯২৬

ভট্রাচার্য, সূতপা (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক*, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

ভারতচন্দ্র, *অন্নদামঙ্গল*, *(বিদ্যাসুন্দর)*, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৭৬৯

ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া, *বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

মওদুদ, আবদুল, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তার*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৯

মকসুদ, সৈয়দ আবুল, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রুন্নেসা খাতুন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২

মজুমদার, রমেশচন্দ্র (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, জেনারেল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৩০২

মদীনা, কাজী, *আনোয়ারা বাহার চৌধুরী*, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০১

মান্নান, আব্দুল (সম্পাদিত), *নারায়ণগঞ্জের কৃতী সন্তানদের জীবন কোষ*, মশগুল মাহফিল প্রকাশনী, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৮৪

মান্‌নান, মোঃ আবদুল ও মেরি, সামসুন্নাহার, *নারী ও রাজনীতি*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৬

মামুন, মুনতাসীর, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

মাসুদ, হাসানউজ্জামান আল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২

মাসুম, মো. আব্দুল্লাহ আল, *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯২১)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭

মাসুম, মো. আব্দুল্লাহ আল, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

মাহমুদ, মোশ্‌ফেকা, *বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ একটি প্রামান্য জীবনী*, সেলিনা বাহার জামান (সম্পাদিত), বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০১

মাহমুদ, শামসুন নাহার, *রোকেয়া জীবনী*, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৮

মিত্র, প্যারীচাঁদ, *এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ববস্থা*, কলকাতা, ১৮৮০

মিয়া, মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা*, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

মুখোপাধ্যায়, কনক, *নারী মুক্তির প্রশ্নে মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিন*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬

মুখোপাধ্যায়, কনক, *ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা*, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলকাতা, ১৯৮৫

মুখোপাধ্যায়, সরোজ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৩

মুখোপাধ্যায়, হরিদাস ও মুখোপাধ্যায়, উমা, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪

মুরশিদ, গোলাম, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

মুরশিদ, গোলাম, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

মুরশিদ, গোলাম, *রেনেসন্স বাংলার রেনেসন্স*, অবসর প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫

মুরশিদ, গোলাম, *সংকোচের বিহবলতা আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

মুরশিদ, গোলাম, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

মৈত্র, জ্ঞানেশ, *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭

মোহান্ত, দীপঙ্কর, আধুনিকতার অভিঘাত ও শ্রীভূমির নারী জাগরণ [১৮৭৬-১৯৪৭], সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯

মোহান্ত, দীপাঙ্কর, *লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

মোহান্ত, দীপাঙ্কর, *লীলারায় ও বাংলার নারীজাগরণ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯

রফিক, আহমদ, *নারী প্রগতির চার অনন্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬

রহমান, আকিমুন, *বিবি থেকে বেগম বাঙালি মুসলমান নারীর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

রহমান, আতিউর, *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯১৮

রহমান, উর্মি, পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলন, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬

রহমান, এম. আবদুর, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা*, প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৭

রহমান, ডা. মাহফুজুর, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩

রহমান, মিসেস এম., *চানাচূর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

রহমান, হাবিব, (সংগৃহীত ও সম্পাদিত), *নির্বাচিত সংকলন মাসিক জাগরণ পত্রিকা*, ঐতিহ্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭

রহমান, হাবিব, *বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৮২

রহিম, ডক্টর এম. এ, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১৫৭৬ খ্রি.), প্রথম খণ্ড* (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২

রহিম, ডক্টর এম. এ, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.)*, দ্বিতীয় খণ্ড (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালির ইতিহাস* (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১

রায়, প্রদীপ, *বিদ্যাসাগর সামাজিক ব্যক্তিত্ব*, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৮৬

রায়, ভারতী (সংকলিত ও সম্পাদিত), *নারী ও বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ)*, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২

রায়, রাজা রামমোহন, *রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী* (রাজ নারায়ণবসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত), এস. এন, এস. আই, কলকাতা, ১৮৭৩

রায়চৌধুরী, মাখনলাল, *জাহানারার আত্মকাহিনী*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, এস কে লাহিড়ী এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৯০৩

শাহনেওয়াজ, এ. কে. এম, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ : সুলতানি পর্ব)*, প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২

শাহনেওয়াজ, এ. কে. এম, *মোগল মহলে*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮১

শিরোমণি, ভরতচন্দ্র (সংশোধিত), *মনুসংহিতা*, (কুলুক ভট্টকৃত টীকা), অরুণোদয় ঘোষ, কলকাতা, ১৯২৩

সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), *চর্যাগীতিকোষ*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৮

সলীম, গোলাম হুসেন, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, (বঙ্গানুবাদ) শ্রী রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭

সামন্ত, বসন্তকুমার, *হিতকরী সভা স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭

সিরাজ, মীনহাজ-ই, *তবকাত-ই-নাসিরী* (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনুদিত ও সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩

সেন, চন্দ্রকান্ত, *বামাসুন্দরী বা অর্দশ নারী*, কলকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

সেন, দীনেশচন্দ্র, *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯১৪

সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), *চর্যাগীতি পদাবলী*, *(চর্যাচর্যটীকা সমেত)*, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৩

সেন, সুকুমার, *বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৩

সেন, সুব্রতা, *সতীদাহ ও পণপ্রথা উৎস ও বিবর্তনের সন্ধানে*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬

সেন, ক্ষিতিমোহন, *প্রাচীন ভারতে নারী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থমালা, কলকাতা, ১৯৮২

সেনগুপ্ত, গীতশ্রী বন্দনা, *স্পন্দিত অন্তর্লোক-আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা*, কলকাতা, ১৯৯৯

সৈয়দ, আবদুল মান্নান, *বেগম রোকেয়া*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৮৯৩

সুর, অতুল, *ভারতে বিবাহের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭

হক, মফিদুল, *নারী মুক্তির পথিকৃৎ*, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিডেট, ঢাকা, ২০১৪

হাই, মুহম্মদ আবদুল ও আহসান, সৈয়দ আলী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮

হাকিম, আব্দুল (সম্পাদিত), *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৫

হাসনাত, আবুল (সম্পাদিত), *নারীর কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১

হাসান, ড. সৈয়দ মাহমুদুল, ইসলামে নারী, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬

হেলাল, নাসির (সম্পাদিত), *মুন্সী মেহেরউল্লা জীবন ও কর্ম*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

হেলাল, বশির আল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

হোসেন, আনোয়ার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৭১)*, প্রগতিশীল প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬

হোসেন, মিতালী ও হায়দার, ইরাজ (সম্পাদিত), *নারী সতীদাহ ও পর্দাপ্রথা*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০১৪

হোসেন, শওকত আরা, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১-১৯৩৬ অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯০

হোসেন, শাহানারা, *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪

হোসেন, সালমা (সম্পাদিত), *সাহিত্যে মুসলিম নারীদের অবদান*, মেলা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮

হোসেন, সেলিনা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৭

হোসেন, সেলিনা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯

হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড [অ-ন], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬

হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনীতি ও আন্দোলন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫

হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নারী ও সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯

প্রবন্ধ (ইংরেজি)

Banu, Ayesha, "Global-Local Interactions : First Three Decades of the Women's Movement in Bangladesh", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities)*, (ed. Akmal Hussain), Vol. 60, No. 2, December 2015

Hartman, Heidi, "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a more Progressive Union," (ed. Lydia Sargent), *Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism,* South End Press, Boston, 1981

Hussain, Shahanara, 'Glimpses in the Condition of Bengali Muslim Women, During the later half of the Nineteenth Century : A Study Based on the

Bamabodhini Potrika', *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Vol. 3, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi, 1978

Hussain, Shahanara, "Karimunnesa Khanam Choudhury- A Notable Bengali Muslim Lady of the 19th century", *The Rajshahi University Studies,* Vol. IX & X, Rajshahi, 1978 and 1979

Jahan, Rounak, "Public Policies Women and Developments : Reflections on a Few Structural Problems", (eds. Rounak Jahan and Papanek Hanna), *Women and Development : Perspectives from South and South-East Asia,* The Bangladesh Institute of Law and International Affairs, Dacca, 1979

Mir Tamanna Siddika and Mahmuda Khatun, "Re-Reading Muslim Women's Right's in Bangladesh", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, (Humanities),* (ed. Akmal Hussain), Vol. 59, No. 2, December 2014

Nayeem, Dr. Asha Islam, "The Attitude Towards Women's Educaton in Eastern Bengal in the Twentieth Century", *Bangladesh Historical Studies,* (eds. Professor Abu Md. Delwar Hossain and others), Vol. XXIII, 2012-14

Nayeem, Asha Islam, 'Women's Emancipation Through Education in 19th Century Eastern Bengal : Private Enterprise or Government Agency?', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* (Humanities), Vol. 60 No-1, June 2015

Qader, M. Abdul, "Purdah and Seclusion in Ancient India", *The Proceedings of the Pakistan History Conference,* 1953

Roy, Bharati, "Swadeshi Movement and Women's Awakening in Bengal 1903-1910", *Calcutta Historical Journal,* Vol. X, N. 2, 1985

প্রবন্ধ (বাংলা)

আকাশ, অধ্যাপক এম.এম., "বীরকন্যা প্রীতিলতা : আত্ম পরিচয়ের সন্ধানে", *মাস্টার দা সূর্য সেন স্মারক বক্তৃতা-২০১৮*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮

আখতার, ড. শিরীন, "উনিশ ও বিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষা, সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা ২০১৪*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯ নভেম্বর ২০১৪

আনিসুজ্জামান, "সুফিয়া কামাল : চিরন্তন প্রেরণার উৎস", (আনিসুজ্জামান ও অন্যন্য সম্পাদিত), *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ*, ঢাকা, ২০১১

আমিন, সোনিয়া নিশাত, "নারী ও সমাজ", (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩

আহমদ, ওয়াকিল, "বাংলার বিদ্বৎসভা : ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৭ম সংখ্যা, জুন ১৯৭৮

আহমেদ, ড. সুফিয়া, "বায়ান্নোর স্মৃতিকথা", বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ (কার্যনির্বাহী কমিটি ২০১৬-২০১৭ এর প্রথম মাসিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত প্রবন্ধ)

আহসান, ড. রোজি মজিদ ও খাতুন, ড. হাফিজা, "ঢাকা নগরীর নারীর আর্থ সামাজিক পরিচয় : কালের বিবর্তন", *ইতিহাস*, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা* (ওয়াকিল আহমদ ও মো. আখতারুজ্জামান সম্পাদিত), চুয়াল্লিশ বর্ষ, কার্তিক-চৈত্র ১৪১৬ / ডিসেম্বর ২০১০

ইসলাম, মাহমুদা ও রহমান, বিলকিস, "পরিবার সনাতন থেকে আধুনিক", (সোনিয়া নিশাত আমিন সম্পাদিত), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০

খাতুন, হাবিবা, "ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ও অধিকার", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, জুন ১৯৮৮

খান, মুহাম্মদ জাকারিয়া, "বাংলাদেশের নারী শিক্ষায় জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটারের ভূমিকা", *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, পৌষ-চৈত্র ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

খানম, আয়শা, "সুফিয়া কামাল ও বাংলাদেশে নারী আন্দোলন", (সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন*, *রাজনীতি ও আন্দোলন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫

ঘোষ, তপস্যা, "বাঙালি মেয়ে-উনিশ থেকে একুশ", (স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত), *অধ্যাপক বিজিত কুমার দত্ত স্মারক গ্রন্থ*, *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০

পালিত, চিত্তব্রত, "বিপ্লবী লীলারায় ১৯০০-১৯৭০", (আবদুল মমিন চৌধুরী ও শরীফউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল*, প্রথম খণ্ড (রাজনীতি সমাজ প্রশাসন), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০২

বড়ুয়া, জিতেন্দ্রলাল, "নারীর অবস্থান : গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম", *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ৫৭বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩

বসাক, শীলা, "রামমোহন ও নারীর স্বাধিকার", (ড. তাহা ইয়াসিন সম্পাদিত ও সংকলিত), *নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায়*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

বসু, নির্বাণ, "মণিকুন্তলা সেন (১৯১১-৮৭) রাজনীতির ভিতরে ও বাইরে", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৫-৩৬॥ ১৪১৯-২১/মে-২০১৫, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি*, ঢাকা

ব্যানার্জী, মল্লিকা, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই একটি ভাবনা", *পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ*, *বেথুন কলেজ*, কলকাতা, ২০০১

বেগম, মালেকা, "লীলানাগ ও তাঁর জীবন সাধনা", *নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা*-২৬, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬

বেগম, মালেকা, "রাজনীতি : অন্দরমহল রাজপথ ও সংসদ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী", (সোনিয়া নিশাত আমিন সম্পাদিত), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০

মন্ডল, পলাশ, "ঢাকার 'দীপালি সংঘ' থেকে 'শ্রীসংঘ' : লীলারায়ের (১৯০০-৭০ খ্রিস্টাব্দ) চিন্তা ও কর্মের বিবর্তন", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, সংখ্যা ৩৫-৩৬, ১৪১৯-১৪২১/মে ২০১৫

মমতাজ, আহমদ, "মাস্টার দা সূর্যসেন : চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও তৎকালীন মুসলিম সমাজ", *বাংলা একাডেমি পত্রিকা* (শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত), ৫৭ বর্ষ; ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

মামুন, মুনতাসির, "উনিশ শতকের পূর্ববাংলার সভা সমিতি", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ডিসেম্বর ১৯৮৩

মুখোপাধ্যায়, ঈশানী, "লীলারায়ের যুগে নারীমুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম", (অজয় রায় সম্পাদিত) *লীলানাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

মুখোপাধ্যায়, কনক, "জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে অগ্নিযুগ মুক্তির সংগ্রামে নারী ও প্রীতিলতার অবদান", *অগ্নিযুগের দুই বিপ্লবী মৃত্যুঞ্জয়ী রোকেয়া ও প্রীতিলতা*, (মালেকা বেগম সম্পাদিত), ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

রায়, অজয়, "প্রগতিশীল আন্দোলন : নূরজাহান মুরশিদ", (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত), *নূরজাহান মুরশিদ স্মারকগ্রন্থ*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

সিদ্দিকা, মোবার্‌রা, "নারীবাদী মিসেস এম. রহমান", *আই বি এস জার্নাল*, (প্রীতিকুমার মিত্র ও অন্যান্য সম্পাদিত), ৮ম সংখ্যা ১৪০৭, প্রকাশ কাল : আষাঢ় ১৪০৮/ জুন ২০০১, রাজশাহী

সুলতানা, আরিফা, "উনিশ শতকে বাংলায় নারী শিক্ষা", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৫-২৬, বর্ষ ১৪০৫-১৪০৮/ ১৯৯৮-২০০১

সুলতানা, অধ্যাপক আরিফা, "বঙ্গবঙ্গ ও বাঙালি নারী", *অধ্যাপক মুহাম্মদ ইসহাক ট্রাস্ট ফান্ড বক্তৃতা* ২০১৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ৪ঠা অক্টেবর ২০১৬

হক, অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল, "রেনেসাঁসের সন্ধানে", *অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড বক্তৃতা* ২০১৭, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ৩ অক্টেবর ২০১৭

হালিম, অধ্যাপক সাদেকা, "নারীর ক্ষমতায়ন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ", *মুস্তাফিজুর রহমান খান ও সালেহা খানম ট্রাস্ট ফান্ড বক্তৃতা* ২০১৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ২০১৬

হোসেন, সেলিনা, "ইতিহাসের পথযাত্রায় নারীর প্রতিরোধ", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা* ২০১৬, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৩ নভেম্বর ২০১৬

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, "সরোজিনী নাইডু : উপমহাদেশে নারী-আন্দোলন ও ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৯৭

পত্র-পত্রিকা (ইংরেজি)

Amrita Bazar Patrika, 23 March, 1980

The Calcutta Review

The Moslem Chronicle

The Mussalman, (Abul Kashem), 1906

The Statesman, 4 November, 1928

The Statesman, 16 November, 1928

The Statesman, 29 November, 1928

পত্র-পত্রিকা (বাংলা)

অনাথিনী, (থাকমনি দেবী), ১৮৭৫

অন্তঃপুর, (বনলতা দেবী), ১৮৯৮

আনন্দ বাজার পত্রিকা, (শারদীয় সংখ্যা), ১৩৩৮-১৩৩৯,

আন্নেসা, (বেগম সফিয়া খাতুন), ১৯২১

আল এসলাম, (মোহাম্মদ আকরম খাঁ), ১৯১৫

আল ইসলাহ, (মোহাম্মদ নূরুল হক), ১৯৫২

ইসলাম প্রচারক, (মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ), ১৮৯১

কোহিনূর, (মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী), ১৮৯৮

জয়শ্রী, (লীলানাগ), ১৯৩১

জাগরণ, (এম. আহ্মদ আলী), ১৯২৮

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (অক্ষয় কুমার দত্ত), ১৮৪৩

নবনূর, (সৈয়দ এমদাদ আলী), ১৯০৩

বঙ্গমহিলা, (মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়), ১৮৭০

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, (মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক), ১৯১৮

বামাবোধিনী পত্রিকা, (উমেশদত্ত), ১২৭০

বেগম পত্রিকা, (নূরজাহান বেগম), ১৯৪৭

বুলবুল, (শামসুন নাহার মাহমুদ ও হাবীবুল্লাহ বাহার), ১৯৩৩

মিহির, ১৮৯২

মাসিক মোহাম্মদী, (মোহাম্মদ আকরম খাঁ), ১৯০৩

মাহে নও, ১৯৫২

শিখা, (আবুল হুসেন), ১৯২৭

সওগাত, (মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন), ১৯১৮

ঢাকা প্রকাশ, ১৮৬৩